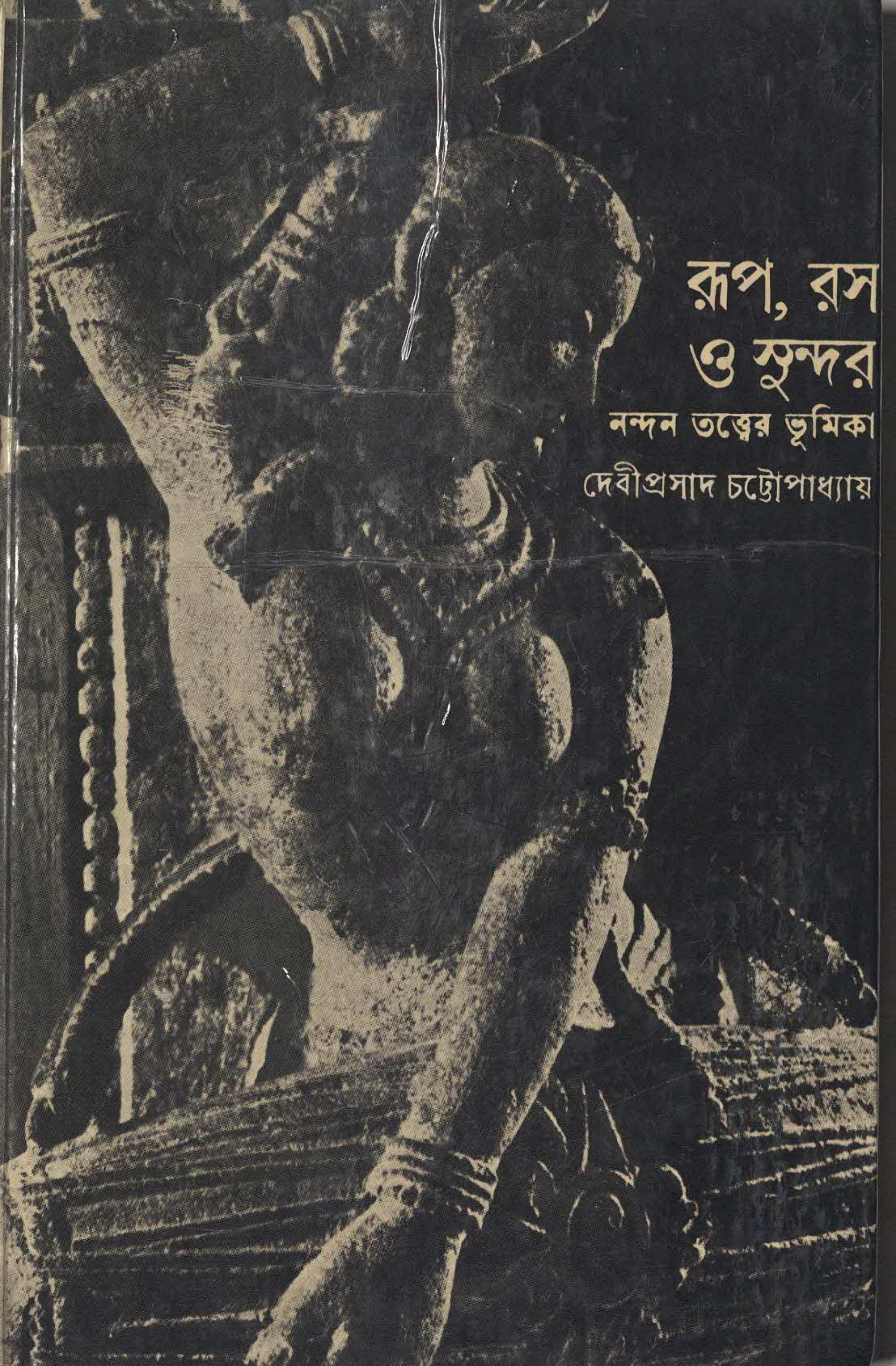


রূপ, রস ও সুন্দর

নন্দন তত্ত্বের ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রূপ, রস ও সুন্দর

রূপ, রস ও সুন্দর

নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ:
আশ্বিন, ১৩৮৮/সেপ্টেম্বর, ১৯৮১

প্রকাশক: শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য
ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ: শ্রীধীরাজ চৌধুরী

ব্লক: ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি

মূল্য: পয়তাল্লিশ টাকা

মুদ্রক: শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

Individuals and Societies : A Methodological Inquiry, 1967

Societies and Cultures, 1973

History, Society and Polity, 1976

Individuals and Worlds : Essays in Anthropological Rationalism, 1976

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা যারা সাহিত্য পাঠ করি, অন্যান্য শিল্পের অনুরাগী এবং অল্পাধিক দর্শন চর্চা করি, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁদের ধ্যান-ধারণার প্রকাশ তুলনায় নগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখরা এই দিকে আমাদের পথিকৃৎ। সাম্প্রতিক কালে যাঁদের রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীর দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, বিষ্ণু দে, নন্দলাল বসু, সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও আবু সৈয়দ আয়ুব তাঁদের অন্যতম। আরো কিছু গুণিজনদের (যেমন হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায় ও সুধীরকুমার নন্দীর) লেখা পাঠ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিছু মূল্যবান রচনা যে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ এবং তার জন্য আমি দুঃখিত। উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের তো দর্শনশাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকার রয়েছে। দর্শনের সঙ্গে অন্যান্যদের শাস্ত্রগত পরিচয় না থাকলেও যা (নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে) আরো গুরুত্বপূর্ণ—দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি বা বোধি—তাই ছিল।

এঁদের রচনা পড়তে পড়তে যে-কথাটি আমার বারবার মনে হয়েছে তা হল : এঁদের চিন্তার ঝোঁক সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্বের কোনো একটি বিশেষ দিকে। কখনো-বা এঁদের ঝোঁক প্রাচীন বা সুপরিচিত কোনো গ্রন্থকর্তার দিকে। সামগ্রিকভাবে নন্দনতত্ত্বের দিকে, মূল প্রশ্নগুলির দিকে, যে-কোনো কারণেই হোক এঁরা যথোচিত দৃষ্টি দেন নি। ইংরাজী ভাষাভাষী জন হস্পার্স ("মিনিং এ্যাণ্ড্ ট্রুথ ইন দি আর্ট্স্", ১৯৪৬), থিওডোর গ্রীণ ("আর্ট্স্ এ্যাণ্ড্ দি আর্ট অভ্ ক্রিটিসিজ্ম্", ১৯৪৭), মন্‌রো বিয়ার্ড্স্লে ("ঈস্থেটিক্স : প্রব্লেম্স্ ইন দি ফিলসফি অভ্ ক্রিটিসিজ্ম্", ১৯৫৮), স্টল্‌নিৎজ্ ("ঈস্থেটিক্স এ্যাণ্ড ফিলসফি অভ্ আর্ট ক্রিটিসিজ্ম্", ১৯৬০), অথবা গম্ব্রিখ ("আর্ট এ্যাণ্ড ইল্যুশন", ১৯৬০) যে-জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে নন্দনতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলির (একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে) সংবদ্ধ উত্তর দেওয়ার সযত্ন চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙ্গলা শিল্প ও সাহিত্যের যে-ভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং শিল্প- ও সাহিত্য-রসিকদের যে-ভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই অভাব কিছুটা আশ্চর্যের বৈ কি! বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনার সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব চর্চার এই আপেক্ষিক অভাব সঙ্গতিহীন। এই অভাব দূর করবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও শিক্ষাগত অধিকার কিছুই আমার নেই। কাঙ্ক্ষিত কর্মের অর্ধক্ষম সূচনাও কাঙ্ক্ষিত।

এই গ্রন্থ রচনার দুঃসাহস যে আমি করেছি তার জন্য মূলত দায়ী আমার প্রয়াত বন্ধু শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। (পবিত্র রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে রচিত) তাঁর গ্রন্থ "রবীন্দ্রদর্শন" ও অসংখ্য আলোচনা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে ও উৎসাহ যুগিয়েছে। এই গ্রন্থে যে বহু ভুল-ত্রুটি থেকে গেল, যে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, তার সম্পূর্ণ দোষ ও দায়িত্ব, বলাবাহুল্য, আমার—আমার অশিক্ষার। বাঙ্গলা ও ইংরাজী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা আমি জানি না। এই দুটি ভাষায়ও আমার অধিকার সীমিত। বিদেশী ব্যক্তি, স্থান ও শিল্পকীর্তি প্রভৃতির নাম লিখতে গিয়ে আমি অনেক ভুল করেছি। বাঙ্গলা বানানের ব্যাপারেও একই রীতি অনুসরণে আমি ব্যর্থ হয়েছি (যেমন, কোনো/কোন, ঙ্গ/ংগ, ঙ্ক/ংক প্রভৃতি)। শুদ্ধিপত্র জুড়ে গ্রন্থের অশুদ্ধ মুদ্রিত শব্দ-সংখ্যা আর বাড়াতে চাই নি। তাছাড়া আমার ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক জটিল ও দুর্বোধ্য। বিষয়বস্তুর গভীরতা ও সূক্ষ্মতা অক্ষুণ্ণ রেখেও যোগ্যতর গ্রন্থকার ভাষাকে কিছুটা সহজ ও স্বচ্ছল করতে পারতেন। গ্রন্থ পাঠ ক'রে, ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে কোনো পাঠক যদি আমাকে জানান আমি যথার্থই উপকৃত হব। যোগ্যতর কোনো গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয়ের দোষ-ত্রুটি দূর ক'রে এবং নতুন ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যদি রচনা করেন তাহলে বাঙ্গলা শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

গ্রন্থ রচয়িতার পক্ষে ঋণ স্বীকার একটি সানন্দ কৃত্য। এই রচনার মানসিক সূত্রপাত ১৯৬২-৬৩ সালে লণ্ডনের ওয়ারবুর্গ ইনস্টিটিউটে গম্ব্রিখের বিশ্লেষণদীপ্ত ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে। তারপরে ১৯৬৭-৬৮ সালে যখন ইণ্ডিয়ান একাডেমী অভ্ ফিলসফিতে নন্দনতত্ত্বের উপর (কলিংউডের "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অভ্ আর্টস্"এর উপর) একটি সেমিনার নিয়েছিলাম তখন আবার নন্দনতত্ত্বের প্রশ্নগুলির দিকে মন দিই। সেই সেমিনারে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছে, ডক্টর (শ্রীমতী) অরুণা মজুমদার, ডক্টর সত্যজিৎ চৌধুরী, ডক্টর (শ্রীমতী) অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাক্তন ছাত্রী ও বন্ধুদের কাছে, আমি ঋণী। বঙ্গীয় দর্শন সংসদের কয়েকটি অধিবেশনে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে মনে পড়েছে তাঁরা হলেন প্রয়াত ডক্টর প্রীতিভূষণ চ্যাটার্জি, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শেফালী গুপ্তা, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর (শ্রীমতী) মীণাক্ষী রায়চৌধুরী, ডক্টর সঞ্জীব ঘোষ ও প্রয়াত মানব সান্যাল।

গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ "সপ্তাহ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের মূল বিষয়ের দার্শনিক প্রস্তাবনা প্রথম আমি করি "ইণ্ডিভিজুয়াল্স্ এ্যাণ্ড ওআর্ল্ড্স্ : এসেজ ইন এ্যান্থ্রপোলজিক্যাল র‍্যাশনালিজ্ম্" (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৭৬) গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে 'অথেন্টিসিটি, ক্রিয়েটিভিটি এ্যাণ্ড রিয়ালিটি'তে (রচনাকাল ১৯৭৫)। বস্তুত বাঙ্গলা রচনায় হাত দিই ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে। স্বধর্মী ও বিধর্মী নানা কাজের ভীড় ঠেলে, পঠন-পাঠন, প্রশাসন, রাজনীতি, অন্যান্য লেখার দায়-দায়িত্ব, বাধা-বিপত্তির মধ্যে সময় ক'রে এই গ্রন্থ রচনা করতে সাড়ে চার বছরের মত লেগে গেল।

যিনি এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দেখলে সকলের থেকে বেশী সমালোচনা করতেন ও প্রীত হতেন সেই প্রতিভাবান দার্শনিক ও শিল্পরসিক আজ আর নেই। প্রিয় বন্ধুর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে "রূপ, রস ও সুন্দর : নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা" উৎসর্গিত হল।

এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ সযত্নে পাঠ ক'রে ও মন্তব্য জানিয়ে যাঁরা আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সহকর্মী ডক্টর কল্যাণ সেনগুপ্ত, ডক্টর শেফালী মৈত্র ও কবি-বন্ধু শঙ্খ ঘোষ। তাঁদের বক্তব্য শুনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি লেখা পরিবর্তন করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের মন্তব্য অনুসারে যে আমি লেখা পরিবর্তন করিনি, আশা করি, আমার সে অবিনয় তাঁরা স্বগুণে মার্জ্জনা করবেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত সযত্নে পাঠ ক'রে, বহু ভুল-ত্রুটি দূর ক'রে আমাকে বিশেষভাবে উপকার করেছেন অধ্যাপক অলোক রায়। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি নির্বাচনে ও অন্যান্য অনেকভাবে উৎসাহ-উপদেশ দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেছেন শিল্পী-বন্ধু (দিল্লী আর্টস্ কলেজের) অধ্যাপক ধীরাজ চৌধুরী। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্যের যত্ন ও যোগ্যতা এবং শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগ ও উৎসাহ তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাকে গভীরতর করেছে।

মহালয়া, ১৩৮৮
দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচনা

গ্রন্থের মূল বক্তব্য ও যুক্তিবিন্যাস যাতে পাঠক সহজে অনুসরণ করতে পারেন তার জন্য সূচনায় তাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। নেতিবাচকভাবে বললে : শিল্পস্বাতন্ত্র্যতত্ত্বের বা কলাকৈবল্যবাদের আমি বিরোধী। এই মতবাদ ("আর্ট ফর আর্টস্ সেক") তত্ত্ব হিসেবে অযৌক্তিক এবং স্লোগান হিসেবেও অনাকর্ষনীয়। ইতিবাচকভাবে বললে : শিল্পীর প্রতিভা সমাজায়ত ; শিল্পকর্ম সেই প্রতিভাপ্রসূত বস্তুজগতের মনোরম রূপান্তর (বা বিকার)। মনোজগৎ তো বটেই তথাকথিত মৌলিক প্রতিভাও প্রথমত দেহাশ্রয়ী, দ্বিতীয়ত সমাজাশ্রয়ী এবং শেষ বিচারে জগদাশ্রয়ী। শিল্পীর প্রতিভা ও কল্পনা দ্বারা রূপ ও রসের সম্মিলনে সৃষ্ট শিল্প কোনো তৃতীয় জগতের ছায়া বা অনুকরণ নয়। মনোজগৎ ও বস্তুজগতের বাইরে আক্ষরিক অর্থে কোনো তৃতীয় জগৎ,—রূপের স্বতন্ত্র জগৎ নেই। তথাকথিত দেশ-কালোত্তীর্ণ রূপজগৎটি হল মনোজগৎ দ্বারা বস্তু-জগতের কিংবা মনোজগতেরই অমূর্ত (এ্যাবস্ট্রাক্ট) দীর্ঘস্থায়ী সৃষ্টি। এক অর্থে, সুঅর্থেই, রসও জগল্লীন। আরো সঠিক বোধ হয় বলা : রস দেহলীন ও মনোলীন। রস প্রসঙ্গে জগদতিরিক্ত (ট্রান্সেন্‌ডেন্টাল) সত্তার, একত্বের, যে কল্পনা করা হয়েছে তা যুক্তিসিদ্ধ তো নয়ই, অনুভবসিদ্ধও নয়। দেহাশ্রিত ও সামাজিক রস-বোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো রসের সত্তা নেই। শিল্পের রূপে, শৈলীতে বা স্টাইলে বিধৃত ও প্রকাশিত রস শিল্পীর অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত হলেও তা, এক অর্থে, শিল্পীর মনোজগৎ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। আর তাই শিল্পীর জীবন না জেনেও তার শিল্পকীর্তির রস উপভোগে আমরা অংশত সমর্থ। শিল্পী-নিরপেক্ষ শিল্পকীর্তির রস উপভোগের পশ্চাৎপটে, বিচার করলে দেখা যাবে, রয়েছে এক সমাজায়ত, সংস্কৃতি-নির্ভর ও ঐতিহ্য-লালিত রসবোধ।

অভিনব গুপ্তের রসতত্ত্বের দুর্বলতা তাঁর শৈব বৈদান্তিক পরাতাত্ত্বিক (মেটাফিজি-ক্যাল) মতবাদের দুর্বলতারই অঙ্গমাত্র। শিল্পরস বিধৃত সমাজে, সামাজিক ব্যবহারে ও ভাষায় ; শিল্পরস উপভোগ্য মানব দেহে-মনে। যা মানবিক তা'ই সামাজিক। সামাজিক আধারহীন, মানবিক দেহ-মনের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন-মূল কোনো রস নেই। সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতার নির্যাসকেই এক সার্বভৌম (স্বতন্ত্রেরও অধিক) রসরূপে, এক পরাতত্ত্বরূপে, কল্পনা করা হয়েছে। আমি দেখাবার চেষ্টা করব যে, রসের এই দুর্মর সামাজিক দিকটিকে অভিনব গুপ্ত পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেও তাঁর মূল প্রবণতা রসের অদ্বৈত তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করা।

"তত্ত্ব" শব্দটি সংস্কৃতে তো বটেই বাঙলা ভাষায়ও কখনো কখনো "রিয়ালিটি" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রধানত অবিশ্যি এই শব্দটি "থিওরি" বা তজ্জাতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আমি লোকরীতি অনুসরণ ক'রে দু অর্থেই ব্যবহার করেছি। ব্যবহারের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করলে অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট হবে। ইংরাজী শব্দ "অন্টোলজি" ও "মেটাফিজিক্সে"র বাঙলা প্রতিশব্দ হিসেবে পরাতত্ত্ব শব্দটি প্রচলিত। নতুন সংজ্ঞা দিয়ে অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা না ক'রে আমি প্রচলিত ব্যবহার অনুসরণ করাই শ্রেয় ভেবেছি। ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রই জানেন যে "প্রতিশব্দ" কথাটিই বড় গোলমেলে। ব্যবহারের প্রসঙ্গ বা প্রস্থান (সিস্টেম) নিরপেক্ষভাবে অর্থ নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমি ঘোরতর সন্দিহান।

রূপকেও (রসের মতোই) তার পরাতাত্ত্বিক দূরত্ব থেকে কাছে এনে বুঝতে হবে। রূপ মানব অভিজ্ঞতায় নিহিত। রস ও অভিজ্ঞান, রসের অভিজ্ঞতা, রূপাশ্রিত। রূপ ও রস অন্যোন্য আশ্রয়ে আশ্রিত। রসহীন রূপ অমূর্ত কল্পনা মাত্র। রূপহীন রস অন্ধ দেহানুভব মাত্র। কিন্তু "সম্পূর্ণ রূপহীন অনুভব" নিছক কল্পনা, অনুপলব্ধ বিশ্বাস মাত্র। রূপ ও রসের দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ অনুভবসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। শিল্প-বিচারের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়। রূপ ও রসের অন্বয় হল কি না শিল্প-বিচারের তা মূল কথা। অন্বয় বা সামঞ্জস্য নানা রকমের হতে পারে,—ঐতিহাসিক, সাম্প্রতিক (সমাজ-স্বীকৃত), ভবিষ্যৎ-মুখী ও আদর্শসন্ধী। অন্বয় হতে পারে সম বা বিষম। অন্বয় (প্রধানত) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হতে পারে : অন্বয় আবার (প্রধানত) বুদ্ধি-গ্রাহ্যও হতে পারে। "ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য" ও "বুদ্ধি-গ্রাহ্যে"র মধ্যে পার্থক্য প্রাধান্যের স্তরভেদের, জাতিভেদের নয়। রূপ ও রসের, রূপ ও বিষয়বস্তুর মৌল দ্বৈততা, জাতিভেদ, অস্বীকৃত, —অনুপস্থিত বলেই অস্বীকৃত। রস ও শিল্পের বিষয়বস্তুর তুলনায় রূপ স্বভাবতই অমূর্ত ও তুলনায় স্থায়ী। স্থায়ী মানে চিরস্থায়ী বা নিত্য নয়। রসের বিচারে ও শিল্পবস্তুর বিচারে চাই রূপ বা রূপসংগ্রহ। রূপ যেহেতু সমাজাশ্রিত এবং যেহেতু যা সমাজাশ্রিত তা'ই ঐতিহাসিক, রূপ দিয়ে যে-বিচার হয় তা কখনো নিত্য বা শাশ্বত হতে পারে না। হয়ও না। বিচার, পুনর্বিচার, পুনর্নব বিচার,—শিল্প-বিচারের অন্ত্য পর্ব বা শেষ ব'লে কিছু নেই। শিল্প-বিচার, রস-বিচার তো বটেই, তার কিছু অধিকও। নানা রকমের রূপৌচিত্য, রসৌচিত্য এবং অন্বয়ের বিচার অপরিহার্য। শিল্প-বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় রূপ ও বিষয়বস্তুর অন্যোন্য-ও-দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বীকার না করলে, তাদের দ্বৈততা মেনে নিলে, যে-সকল সমস্যা দেখা দেয় তা দুরতিক্রম্য। রূপকে নিত্য ও বিষয়বস্তুকে অনিত্য (বা ঐতিহাসিক) কল্পনা করলে তাদের সম্মিলন কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? কোনো অদৃশ্য দৈব মিলনসূত্র (একপ্রকার টেলিওলজি) কিংবা মিলনের কারণবিহীন

সম্ভাব্যতা ও অন্তহীন আকস্মিকতা (*adhocism*) মেনে নিতে হয়। কোনো বিকল্পই যুক্তিসিদ্ধ নয়।

আমার মূল বক্তব্য ব'লে যা উল্লেখ করলাম তার আনুষঙ্গিক অনুভব, উদাহরণ ও যুক্তিতর্ক প্রভৃতি এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছি। চেষ্টা করেছি প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কের দুর্বলতা দেখাতে। সফল হয়েছি কিনা তার বিচার করবেন মননশীল পাঠক। আমার নন্দনতাত্ত্বিক বক্তব্যের পশ্চাৎপটে রয়েছে সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার মতামত যা আমি বিস্তৃতভাবে অন্যত্র আলোচনা করেছি ("ইণ্ডিভিজুয়াল্স্ এ্যাণ্ড সোসাইটিজ ; এ মেথডলজিক্যাল ইনকোয়ারি", এ্যালায়েড পাবলিশার্স, ১৯৬৭ ; ঐ, বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি, ১৯৭৩ ; "সোসাইটিজ এ্যাণ্ড কালচার্স", ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৭৩ ; এবং "হিষ্টরি, সোসাইটি এ্যাণ্ড পলিটি", ম্যাকমিলান, নতুন দিল্লী, ১৯৭৬)। আলোচ্য গ্রন্থে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে একটি কথা বলি। গ্রন্থটি "নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা"ই হল। তার অধিক কিছু, মনঃপূত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা, হল না। নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়েছে তাকে স্পষ্টতর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করবার জন্য শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা নানা কারণেই আমার পক্ষে সম্ভব হল না। চিত্রশিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকর্ম থেকে যদিও কিছু কিছু উদাহরণ দিয়েছি, বিশ্লেষণ করেছি, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। গ্রন্থের মূল্য যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্যও রঙীন চিত্র সংযোজনের লোভ সংবরণ করতে হয়েছে। ইচ্ছা ছিল নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে আমার যা মত তা আধুনিক বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে (১৯২৫-৭৫) প্রয়োগ করব, ফলশ্রুতি বিচার করব ও পাঠকের কাছে নিবেদন করব। কিন্তু আর কি কোনোদিন নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ-প্রকল্পে হাত দিতে পারব?

শিল্পীসত্তা, শিল্পবস্তু ও সমাজ

কী ভাবে শিল্পবস্তুর-স্বরূপ সবচেয়ে সন্তোষজনক ভাবে বোঝা যেতে পারে ? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে আরো দুটি প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এক ঃ শিল্পীসত্তার সঙ্গে শিল্পবস্তুর সম্বন্ধ কি ? দুই ঃ সমাজের সঙ্গে শিল্পবস্তুর সম্বন্ধ কি ? এই দুটি প্রশ্ন ছাড়াও, অনেকে মনে করেন, আরেকটি প্রশ্নও শিল্পবস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক। তা হল ঃ শিল্পীসত্তার সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক ? প্রতিটি প্রশ্নেরই, বিশেষতঃ প্রথম দুটির, পূর্ব-ধারণা (assumption) রয়েছে। যেমনভাবে একটি ইট, দোয়াত বা অন্য কোন একটি স্থূল জড়বস্তুখণ্ড দেখা যায়, ধরা যায় ও বোঝা যায় তেমনভাবে শিল্পবস্তু বোঝা যায় না। এমন কি, অনেকে এও মনে করেন, যেমন-ভাবে একটি মতামত, থিওরি বা বাক্য বোঝা যায় তেমন করেও শিল্পবস্তু বোঝা যায় না। ব্যক্তি-বিজ্ঞানীকে বাদ দিয়েও বৈজ্ঞানিক মত পরীক্ষা ও বিচার করা সম্ভব। দার্শনিক মতামত গ্রহণ-বর্জন প্রসঙ্গেও এই কথা বলা যেতে পারে। এই সূত্র ধরে এ কথা বলা খুবই স্বাভাবিক যে, অনেক শিল্পবস্তু আছে, যেমন অজন্তার বা বেইরুটের নিকটবর্তী পাহাড়ের গুহাচিত্র, যাদের স্রষ্টা শিল্পীর পরিচয় অজ্ঞাত ; কিন্তু তাতে ঐ সব শিল্পবস্তুর রসভোগে আমরা ব্যর্থ বা বঞ্চিত হই না। বরং কেউ কেউ মনে করেন, শিল্পের চরিত্র থেকে শিল্পীর ও তার সমাজের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব।

শিল্পী, শিল্প ও সমাজপ্রসঙ্গে এইমাত্র যা বললাম তাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ শিল্পী ও সমাজ নিরপেক্ষভাবেই শিল্পের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং সে সত্তাকে তার স্বাতন্ত্র্যেই সন্তোষজনকভাবে বোঝা যায়, তাহলে প্রথম প্রশ্নদুটির গুরুত্ব সামান্য হয়ে যায়। কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে শিল্পবস্তুর যে স্বরূপ বোঝা যায় তা অগভীর এবং অনুরূপ ভাবেই অগভীর শিল্পীসত্তার পরিচয় বর্জিত শিল্পবস্তুর স্বরূপ। আমার মূল প্রশ্নের লক্ষ্য "সব থেকে সন্তোষজনকভাবে" বোঝার চেষ্টা করা। অনুষঙ্গ থেকে, বহিরঙ্গ থেকে, শিল্পবস্তুকে যে বোঝা যায় না তা নয় ; বোঝা যায়। কিন্তু সে বোঝায় যতটা জিজ্ঞাসা ও উৎসাহ জাগে ততটা তৃপ্তি বা সন্তোষ মেলে না। অতৃপ্তি ও অসন্তোষের উৎস-সন্ধানে যখনই বার হই, তখনই আমরা শিল্পবস্তুর বহিরঙ্গ থেকে, রূপ থেকে, অন্তরঙ্গে ও ভাবের দিকে এগোতে থাকি এবং তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যের চৌকাঠ পার হয়ে যাই। শিল্প তখন রসিক জিজ্ঞাসুর কাছে শিল্পীর পরিচয় ও সমাজের অদৃশ্য পট উন্মোচন করতে সুরু করে। বস্তুর

বিধিরেখা, দেশ-কাল অতিক্রম ক'রে শিল্পবস্তু তখন তার শিল্পসত্তা উন্মোচন করে। শিল্পের স্বকীয় সত্তা সীমিত ও অগভীর। শিল্প-সৌন্দর্যের রসভোগে মগ্ন হয়ে যখন আমরা অন্তহীন আস্বাদ অনুভব করি তখন সেই অন্তহীনতার কারণ বস্তুধর্মী নয়, কারণ হল মানবধর্মী, শিল্পীসত্তার সঙ্গে সহমর্মিতা জন্য, —সমাজায়ত শিল্পীসত্তার সঙ্গে সহ-অনুভবজাত। এজন্য অবশ্য এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, শিল্প নিছকই অনুভব-আস্বাদনের ব্যাপার এবং এক্ষেত্রে বিচারের অবকাশ নেই।

কীভাবে, কতরকমভাবে, শিল্পীসত্তা শিল্পবস্তুতে প্রকাশিত বা প্রক্ষিপ্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবেই দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে শিল্পী মূলতঃ সৃষ্টির আকুতিতে সৃষ্টি করেন এবং সেই আকুতি স্বভাবতই তাঁর ব্যক্তিজীবনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। প্রভাব সৃষ্টিক্ষম উপকরণগুলির গুরুত্ব বা তীব্রতার তারতম্য অনুসারে শিল্পের রূপভেদ ও চরিত্রভেদ ঘটে। শিল্পীর জীবনের অভিজ্ঞতা হতে পারে তিক্ত ও করুণ; কিন্তু তার নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধও এই রকম হতে পারে যে, জনহিতার্থে নিজের অভিজ্ঞতাকে নিছক ব্যক্তিগতভাবে গোপন রাখা এবং তার শোভন-শিক্ষাপ্রদ নির্যাসকে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়তঃ, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কিংবা বাস্তবধর্মিতার অনুরোধে কোন কোন শিল্পী মনে করেন যে অভিজ্ঞতার অবিকৃত প্রকাশ শুধু সত্য বলে নয় শিল্প-মূল্যেও সমৃদ্ধ। এ মতের একটি ভাষ্য হতে পারে 'শিল্পকর্ম এক প্রকার অনুকরণ।' নৈসর্গিক জগতের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, মনের অন্তর্গতির বিন্যাস ও জটিলতা এবং সামাজিক জীবনের মিলন-দ্বন্দ্বের ইতিকথার সত্য বর্ণনা সার্থক শিল্পকর্মও বটে।

এই দুধরণের সম্বন্ধই অল্পাধিক সচেতন বা চেতনাসাধ্য। প্রথম সম্বন্ধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে: শিল্পী তার সকল আকুতি সম্পর্কেই সচেতন হতে পারে কি না? বহু মনঃসমীক্ষকই বলবেন, 'না'। এ প্রশ্নও উঠেছে: আকুতি গোপন রাখার প্রবণতা কি স্বাভাবিক সামাজিক? শিল্পীসত্তা ও শিল্পবস্তুর সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধ সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তার প্রাসঙ্গিকতা দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্বন্ধ সম্পর্কেও স্পষ্টত উপস্থিত। অবচেতনার জগতের যদি স্বাতন্ত্র্য থাকে, তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভিন্ন নিয়ম থাকে তাহলে সচেতন আকুতি দিয়ে কিভাবে সেই জগতের সঠিক বর্ণনা করা সম্ভব হবে? অবচেতনার বিচিত্র বিকৃত গতি-প্রকৃতি মনঃসমীক্ষণে নির্ণয় করা সম্ভব হলেও তার সত্য বর্ণনা শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃত হবে কি?

এই সব প্রশ্নের ও সমস্যার কথা বিবেচনা ক'রে শিল্পীসত্তা ও শিল্পবস্তুর সঙ্গে তৃতীয়

আর এক শ্রেণীর সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সামাজিক অনুশাসন পরা অহং-এর শক্তি ও ভূমিকা নিয়ে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে ক্রমাগত অবদমন করে এবং অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আত্মচরিতার্থতার জন্য অলীক কল্পনার (fantasy) আশ্রয় নেয় ও তার মাধ্যমে শিল্পরূপ পরিগ্রহ করে। এই মত অনুসারে শিল্প-শিল্পীসম্বন্ধ শুধু ব্যক্তিগত নয় অবচেতনও বটে। শিল্পসৃষ্টিতে সমাজের ভূমিকা পরোক্ষ, পরা অহং-এর মাধ্যমে কার্যকর। সমাজ সেক্ষেত্রে অন্তর্লীন ও ব্যক্তিমানসের অন্তর্গত। যৌন আকাঙ্ক্ষা ও অসুস্থ স্নায়বিক কামনা সমাজের অন্তর্লীন বা অহংকৃত অনুশাসনের ভয়ে শুধু বিকৃত ও বিপথগামী হয় না, তৃপ্তির প্রত্যাশায় মহত্তর স্বীকৃত ও মোহন (সাব্লিমেটেড) রূপ পরিগ্রহ করে।

এই তৃতীয় মত সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। অবচেতনার কি স্থির, স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কাঠামো আছে? শিল্পকর্মের সূক্ষ্ম-সুকুমার গঠন দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে অবচেতন-মানস স্বীয় শক্তি ও প্রেরণাতেই শিল্প সৃষ্টি সম্ভব করে। অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কারণ যদি হয় পরা অহং বা অন্তর্লীন সামাজিক অনুশাসন, তাহলে সমাজভেদে অনুশাসনভেদে অবচেতনার কাঠামো, অবদমিতের স্বরূপ ও অবদমনের পরিমাণ পৃথক বা অল্পাধিক হতে বাধ্য। একবার যদি স্বীকার করা হয় পরা অহং সমাজায়ত, তাহলে শিল্পীর অবচেতনার সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধ ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত বলে দেখান কঠিন।

প্রথম প্রশ্ন ছিল : শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ কি? মোটামুটি তিনভাবে এর উত্তর দেওয়া যায়। 'মোটামুটি' বলছি এইজন্য যে বিশ্লেষণ করলে এর প্রত্যেকটি মতেরই একাধিক রূপ আবিষ্কার সম্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল : শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর বিশ্লেষণ করলে শিল্পী ও সমাজের সম্বন্ধ—যা আমার তৃতীয় প্রশ্নের বিষয়—সম্পর্কে বোধহয় একটি স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যেতে পারে। সমাজ শিল্পকে মোটামুটি তিন-ভাবে প্রভাবিত করে। শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধও তাই তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

এক : সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশ শিল্পের রূপ ও ভাব নিয়ন্ত্রিত করে। এবং এই নিয়ন্ত্রণ কার্য্য-কারণের। বলা যেতে পারে, ক যদি হয় সমাজের রূপ ও ভাব, তাহলে খ হবে শিল্পের রূপ ও ভাব। সংক্ষেপে বললে, ক এর জন্য খ। ধর্মীয় বিশ্বাস, দেশাচার, রাজনৈতিক অবস্থা, উৎপাদনব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছুই ক-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠবে : কি কি বিশেষ সামাজিক ঘটনা ও অবস্থায় খ যে ক-এর জন্য তা সুনির্দিষ্টভাবে দাবী ও প্রতিষ্ঠা করা যাবে? বলা হয়েছে, রবি বর্মা যে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি এঁকেছেন তার কারণ তিনি ছিলেন অভিজাত সমাজের—ত্রিবাঙ্কুর রাজ-পরিবারের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ রবি বর্মার থেকে কিঞ্চিৎ

বয়োকনিষ্ঠ হলেও প্রায় সমসাময়িক বলা চলে। অথচ রবীন্দ্রনাথের ছবিতে পৌরাণিক বা ধ্রুপদী ভাবের অভাব লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত পরিবারের মানুষ ছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ দুজাতের শিল্পকর্ম করেছেন। একক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রোমান্টিক (কখনও মিস্টিক), অন্যক্ষেত্রে আধুনিক। প্রায় একই কথা অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বলা চলে। তিনি পৌরাণিক, কালীঘাটের পটুয়াদের অনুসরণে লৌকিক এবং শেষ জীবনে কিছু কিউবিস্টিক ধরণের ছবিও এঁকেছেন। সমাজ-কাঠামো ও তার পরিবেশ-প্রভাব মোটামুটি একই রকম থাকলে তাকে কারণ হিসেবে ধ'রে সেই সমাজের শিল্পীর বিভিন্ন জাতের শিল্পকর্মকে কার্য্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যুক্তির দিক থেকে জোরালো হয় না।

দ্বিতীয় মতটি দুভাগে উপস্থাপন করা যায়। শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ সহগ; অর্থাৎ সমাজ কাঠামোর গতি-প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের গতি-প্রকৃতির এমন একটি অনুবন্ধ বা সহগ (কো-রিলেশনাল) সম্বন্ধ আছে যা পরিমাণ দিয়ে নিভুর্লভাবে নির্দিষ্ট করা না গেলেও সাধারণভাবে ইঙ্গিত বা সঙ্কেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। অন্যভাবে বললে বলা যায়, শিল্প হল সমাজের প্রকাশ (এক্সপ্রেশন) বা প্রতিফলন। বিশ্লেষণ করলে এই মত যে রূপ নেয় তা খুব স্পষ্ট বা সহজবোধ্য নয়।

উদাহরণস্বরূপ মিকেলেঞ্জেলোর (১৪৭৫-১৫৬৪) কথাই ধরা যাক। তিনি নানা রকম চিত্র ও মূর্ত্তি রচনা করেছেন—পৌরাণিক ("স্বর্গোদ্যান থেকে আদম ও ঈভের নির্বাসন"), ধর্মীয় ("ক্রুশবিদ্ধ সেণ্ট পিটার") এবং বাস্তবধর্মী ("বিদ্রোহী দাস")। জীবনে সচ্ছল ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তদানীন্তন ইতালীর বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বাস করেছেন। বলা শক্ত, কোন বিশেষ সমাজ তাঁর শিল্পকর্মে প্রকাশিত। একই সময়ে একই দেশে বিভিন্ন সমাজ থাকতে পারে। বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন সমাজের শিল্পী বা সাহিত্যিক একই জাতের শিল্পসৃষ্টিতে নিরত। শিল্পের প্রসঙ্গে সমাজের ধারণা আরও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। শিল্পীর সমাজ, ভূগোল ও ইতিহাসের বাহ্যিক সীমানা সহজেই অতিক্রম ক'রে থাকে। যদিচ প্রথম মতের (ক এর জন্য খ) কঠোর নিগড় দ্বিতীয় মতে (ক-এর প্রকাশ বা সহসম্বন্ধবদ্ধ খ) নেই; তবু ঐ প্রকাশ বা সহসম্বন্ধের চরিত্র ও স্থিরতা সামান্যধর্মিতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে।

তৃতীয় মত হল, শিল্পের সঙ্গে সমাজের কোন সামান্যধর্মী সম্বন্ধ দেখান। এই মত প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। বিশেষ কোন একটি শিল্পকর্ম কিভাবে কল্পিত ও সৃষ্ট হল তার সামাজিক পশ্চাদপট বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন মিলার্ড মেইস[১] দেখাতে চেয়েছেন, ফ্লোরেন্সে ও সিয়েনাতে যে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মমূলক চিত্রশিল্পের দিকে প্রবল প্রবণতা

দেখা দিয়েছিল তার কারণ ১৩৪০ থেকে '৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ দুটি অঞ্চলে নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক দুর্বিপাক দেখা দিয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যেশিল্পে ৪০-এর দশকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগ যথেষ্ট ছায়াপাত করেছিল। এ জাতীয় উদাহরণ অনায়াসে বাড়ান যেতে পারে। সমস্যা হল এই উদাহরণগুলির সত্যিই কোন জাত বা সামান্যধর্ম আছে কি না, অর্থাৎ এই ঘটনা পারম্পর্য নেহাৎই আপতিক কি না এবং তা হলে এদের ভিত্তিতে কোন থিওরি প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা,—এসব প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্ন থেকে গেলেও এ কথা স্বীকার্য যে, প্রথম দুটি মতের তুলনায় এই মতটির দাবী ও প্রস্তাবনা অনেক বেশী সীমিত ও স্বাভাবিক।

শিল্প ও সমাজের সম্পর্কিত থিওরিগুলি যত বেশি ব্যাপক সামান্যধর্মী করার চেষ্টা হয়েছে থিওরিগুলি ততই সমালোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে আর্নল্ড হাউজার-এর[২] এবং লুসিয়েন গোল্ডম্যান-এর[৩] বক্তব্য মার্ক্সবাদী চিন্তায় প্রভাবিত। সমাজ-কাঠামোর জন্য শিল্পচরিত্র, ক খ-এর কারণ, এবং সমাজকাঠামো ও শিল্পচরিত্র সহগামী, ক খ এর সহগামী, এই দুটি মতবাদই এত ব্যাপক যে এর ব্যতিক্রম সহজেই দেখান সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শিল্পসাহিত্যের এই ব্যাপকতা গুণের পরিবর্তে দোষের ব্যাপার হয়। মতটি ব্যাপকধর্মী হলেও ব্যতিক্রমের বাহুল্যে এর বিষয়বস্তু অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, ব্যতিক্রমগুলি মতকে খণ্ডন করছে না দেখাবার জন্য হাউজার ও গোল্ডম্যান ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের কথাটির উপর বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করেন। যদি কেউ উদাহরণ দেখায় যে ক সমাজে শুধু খ শিল্পই নেই, গ ও ঘ শিল্পও আছে, কিংবা, কার্যকারণ ও সহগামী মতামতের দিক থেকে যা আরো মারাত্মক, ক আছে কিন্তু ক-বর্গের কোন শিল্পই নেই,—শিল্প যা আছে তা চ ও ট বর্গের। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শুধু অপরাধ, যৌন আবেদন ও দ্বন্দ্বমূলক শিল্পই সৃষ্টি হচ্ছে না, ধর্ম, পুরাণ, সেবা ও অন্যান্য বিষয়ক শিল্পও তো সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া সময়ের সীমা ভেঙে শিল্পী এ যুগের কথা ও-যুগে এবং ও-যুগের কথা এ-যুগেও বলতে পারেন। যাঁরা সৃষ্টিশীল কল্পনার শক্তিতে সময়ের সীমা ভাঙতে পারেন, তাঁরা কেন সমাজের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে পারবেন না? শীতেও বসন্তের কোকিল ডাকতে পারে। সত্তর বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ বা গ্যয়টে প্রথম প্রেমের সৌরভ-সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন। যাঁরা ইতিহাস-স্রষ্টা তাঁরা সর্বদা ইতিহাসের পথরেখা অনুসরণ করেন না, নতুন পথ সৃষ্টি করেন। শিল্পকর্ম গোষ্ঠীকর্ম নাও হতে পারে। শিল্প ও সমাজ কাঠামোর সম্বন্ধকে ব্যতিক্রমহীন সাধারণ মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে একে হয় অপরীক্ষণযোগ্য নিছক জল্পনা নয়ত শূন্যগর্ভ বিশ্বাসে পরিণত করা হয়। এ প্রসঙ্গে

গম্বি্রখের বক্তব্য[৪] অত্যন্ত চিন্তাশীল ও প্রণিধানযোগ্য। যে মত বা থিওরি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পকর্মের সামাজিক কারণ নির্দেশ করা যায় ব'লে দাবী করা হয় তা ঐ শিল্পকর্মের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা হতে পারে না, মনস্তুষ্টির ভাষ্য হতে পারে মাত্র। ব্যাখ্যা (এক্সপ্লানেশন) এবং ভাষ্যের (ইন্টারপ্রিটেশনের) পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর, বিশেষত এর কার্যকারণ ভাষ্যটি, যে সব অসুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছে তা বোধহয় অংশত দূর করা যায় যদি আমরা শিল্পের উপর সমাজের প্রভাব বুঝতে গিয়ে এর বিপরীত দিকটাও, সমাজের উপর শিল্পের প্রভাব, বুঝবার চেষ্টা করি। শিল্প কীভাবে সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয় সে সম্পর্কে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকতে পারে এবং আছে। কিন্তু শিল্পের উপর সমাজের প্রভাব অনস্বীকার্য। এ প্রভাবের উৎপত্তি, বিস্তার, বিন্যাস, উপকরণ এবং বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সযত্ন বিবরণ সাপেক্ষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাজায়ত চরিত্র উদ্ঘাটন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। শিল্পে জ্ঞানের উপকরণ ও সত্যের দাবী গৌণ। এক্ষেত্রে অনুভব, ইচ্ছা ও কল্পনার গুরুত্ব সমধিক। তদুপরি জ্ঞান-লব্ধ জগতের কিছু পরিবর্তন না ঘটালে শিল্পরস সৃষ্টি কঠিন। যা প্রাকৃতিক, যা স্বাভাবিক, যা যেখানে যখন যেমন আছে বা ঘটছে তার সত্য বর্ণনা কদাচিৎ শিল্পরস সৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত। অনুকরণ যখন শিল্প হয় তখন অনুকৃতির মধ্যে শিল্পী অনুকৃত বিষয়বস্তুর রূপ ও ভাবের কতোগুলো দিক রঙ, ধ্বনি, রেখা, দৃশ্য, গতি প্রভৃতির মাধ্যমে এমন রীতি ও গুণসহ প্রকাশ ও পরিবেশন করে যাতে শিল্পরসিক প্রসন্ন হয়। শিল্পসৃষ্টির সাধারণ নিয়ম বেঁধে দেওয়া বড় শক্ত। শিল্পকর্ম মূলতঃ তাই উৎসাহ, স্পৃহা ও সাধনাসাপেক্ষ— শিক্ষা বা পাঠসাপেক্ষ নয়। শিল্প ও সমাজ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন আয়তক্ষেত্রের সাধারণ প্রভাবের বহির্ভূত নয়। শুধু সমাজ শিল্পকে নয়, শিল্পও সমাজকে প্রভাবিত করে।

যে সব কারণে শিল্পের উপর সমাজের প্রভাবকে নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়মে বাঁধা যায় না সে-সব কারণগুলি সমাজের উপর শিল্পের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আরও বেশি ভাবে, বিচিত্রভাবে, সক্রিয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী কোন শিল্পকে একভাবে গ্রহণ করে না। একই শিল্প বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। বয়স, জীবিকা, জীবনের অভিজ্ঞতা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা কারণে এক সমাজের নানা গোষ্ঠী নানা রকম শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। মানুষের, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও জাতির ইচ্ছা, প্রবণতা, মূল্যবোধ ও নীতি আজ সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিশান প্রভৃতি মারফৎ বহুলপ্রচারিত প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। শিল্প তার কৌলীন্য কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন ক'রে প্রচার যদি বৃদ্ধি করতে পারে, তাহলে সমাজের উপর তার প্রভাব সমধিক হতে বাধ্য।

শিল্প ও সমাজের দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব আরো একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলেছে। শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম ও ব্যাখ্যা যে এত অসুবিধাজনক তার কারণ কি এই যে শিল্পের স্বরূপ এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব? শিল্প বলতে তাহলে কি আমরা একই জিনিষ বুঝি না বা বোঝাই না? যা সব বোঝাই—তার মধ্যে কি গোষ্ঠীসাদৃশ্য, হিবট্‌গেনস্টাইনের ভাষায় family resemblance ও, নেই?

সঙ্গীতশিল্প, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্প আছে। সাহিত্যও শিল্প। অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতিও শিল্প। সৃষ্টি, সৃষ্টির ক্ষমতা, দক্ষতা, সৃষ্টি-কর্মশিল্প নানারকম হতে পারে। সৃষ্টিকর্মের পদ্ধতি ও পরিণাম, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবণতাও, শিল্প বলেই আখ্যাত হয়। বলা হয়, নিদ্রিত শিল্পীও, অর্থাৎ যে শিল্পী শিল্পকর্মে নিরত নয়, সেও (তার ক্ষমতা-প্রবণতার জন্য) শিল্পী বলেই পরিচিত। যদি প্রশ্ন হয়ঃ কোন (বা কোন কোন) সামান্য ধর্মের জন্য এইসব পাঁচমিশেলি সব-কিছুকেই শিল্প বলা হবে? শিল্প কি অনুকরণ? শিল্প কি প্রকাশ? শিল্প কি প্রক্ষেপ? শিল্প কি বাস্তব জগতের মনোরম বিকৃতি? শিল্প কি ব্রহ্মস্বাদের সহোদর স্বাদ সৃষ্টি? শিল্প কি অপূর্ণ কামনার উৎসৃজন? নাকি, শিল্প দিব্য তত্ত্বের আভাস? এইসব এবং সম্ভবতঃ শিল্পসম্পৃক্ত অন্যসব জিজ্ঞাসার প্রত্যেকটি ইতিবাচক উত্তরের বিরুদ্ধ উদাহরণ কোন না কোন শিল্প ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা কঠিন নয়। তার অর্থ কি এই যে শিল্পের (নাকি 'শিল্প' শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারের) সামান্য ধর্ম নেই? তাই যদি না থাকে তাহলে তাদের নামসর্বস্ব গোষ্ঠী সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শিল্পের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ —ভেবে বোঝা যাবে না। দেখার অর্থ সামাজিক পরিবেশে ঐ শব্দের ব্যবহার দেখা। এই মতের বিশদ বিশ্লেষণ না করেও কটি প্রশ্ন তোলা যায়? যা দেখব তার ধারণা না থাকলে দেখব কি? যা দেখব তা সঠিক দেখছি কি না তার নিয়মগুলি সাধারণ ও স্থায়ী কি না? ঐ নিয়মগুলি কোন ধারণানিবদ্ধ নয় কি? ঐ নিয়মগুলির পরিবর্তন হলেও নিরবচ্ছিন্নতা আছে। এক্ষেত্রে (হিবট্‌গেনস্টাইনের) সুদীর্ঘ দড়ির মধ্যস্থিত নাতিদীর্ঘ সুতোর উপমা যথাযথ খাটেনা।

তবে একটি কথা ঠিক যে, সমাজের ব্যবহার বা প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে ধারনার অর্থ বা সংজ্ঞা ঠিক করতে গেলে ধারণার অপপ্রয়োগকে, এমন কি বিরুদ্ধ প্রয়োগকেও চিহ্নিত করা কঠিন। এই মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবশ্য হিবট্‌গেনস্টাইনের গোষ্ঠীসাদৃশ্যের বক্তব্য গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। অর্থ, নিরর্থ বা কদর্থের সীমারেখা ভাষা ব্যবহারের সামাজিক রীতি থেকে বুঝতে হবে এবং এই সামাজিক রীতিগুলিকে ব্যক্তিমানসের অভিজ্ঞতা নির্ভর মনে করা চলবে না। ব্যক্তিমানসের অভিজ্ঞতা

সামাজিক ও অর্থপূর্ণই হতে পারে না যদি তা রীতিবদ্ধ না হয়। অনন্যতার দোহাই দিয়ে যে অভিজ্ঞতাকে রীতির উর্দ্ধে কল্পনা করা হয় তার স্বরূপ ও অর্থ কখনও ভাষায় চিহ্নিত ও সমাজে সঞ্চারিত করা সম্ভব হত না। ভাষার যে-অংশের 'ব্যবহার' যথার্থই অনন্য তার ব্যবহার নেই। আর ভাষার যে অংশের 'ব্যবহার' সকল সামাজিক ব্যবহার নিরপেক্ষভাবেই অর্থপূর্ণ তার অর্থ বোঝা অসম্ভব।

শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ বুঝতে সব থেকে বেশি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে শিল্পী ও সমাজের সম্বন্ধ যদি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সমাজ সরাসরি শিল্পে প্রকাশিত, প্রক্ষিপ্ত, অনুকৃত বা প্রতিবিম্বিত হয় না। শিল্পী, শিল্পীর মন সর্বদাই সমাজকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে। সূর্যের আলো যেমন স্ফটিকের মধ্য দিয়ে নানা রঙে বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত হয়, সমাজের কাঠামো, ধ্যানধারণাদি ব্যক্তিমানসের অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, আশা, কামনাদির জন্য নানাভাবে শিল্পসাহিত্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ একদিকে যেমন সম্পূর্ণ অনন্য নয়, অন্যদিকে তেমনি দেশ-কালের সীমা অতিক্রম ক'রে অতি বেশী সামান্যধর্মী নয়। সম্পূর্ণ অনন্য নয় বলেই সমাজ-কাঠামো শিল্পের সঙ্গে অন্ততঃ সহগ সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে। "ক এবং খ" জাতীয় শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাই স্বীকৃত এবং প্রয়োজনীয়। শিল্পীর স্বাধীনতা বা অভিজ্ঞতাদির বৈশিষ্ট্য সমাজের প্রভাবকে সম্পূর্ণ বিকৃত, পরিবর্তিত বা বিপরীত করে দিতে পারে না। পক্ষান্তরে, শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ যদি ব্যতিক্রমহীন এক অতি ব্যাপক নিয়মে বেঁধে দেওয়া যেত তাহলে শিল্পীর নিজস্ব ভূমিকা ব'লে কিছু মানবারই প্রয়োজন হত না।

শিল্পীসত্তা শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধ প্রভাবিত করে। শিল্পী নিজেকে, নিজের মনকে কীভাবে দেখে তা দ্বারাও তার শিল্পকর্ম, তার উপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের উপর তার প্রভাব প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে। শিল্পীর স্বভাব ও প্রভাব বেশ কিছুটা নির্ভর করে তার সম্পর্কে সমাজ কি মনে করে তার উপরেও বটে। কোন শিল্পী যদি মনে করে, মন দেহ-অতিরিক্ত কিছু নয়, কিংবা মন ঠিক দেহ না হলেও দেহধর্মী অর্থাৎ তার বিস্তার-ধর্ম (স্পেশালিটি) আছে, এবং অন্য কোন শিল্পী যদি মনে করে মন নিরবয়ব, বিস্তার-ধর্মহীন, এবং ঈশ্বররূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গস্বরূপ, তবে তাদের শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম পৃথক হতে বাধ্য। কোন শিল্পী যদি বিশ্বাস করে, তার কর্তব্য এমন ধরনের শিল্প সৃষ্টি করা যা সমাজের পরিবর্তন বা বিপ্লব আনবে এবং অন্য কোন শিল্পী যদি মনে করে তার কর্তব্য রস অনুভূতির প্রকাশ করা, প্রকাশের জন্য প্রকাশ, বিশেষ কোন সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রকাশ করা নয়, তাহলে তাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং প্রকাশভঙ্গী পৃথক হতে বাধ্য। যে শিল্পী মূলতঃ রস ও আনন্দ সৃষ্টির জন্য কল্পনার উপর নির্ভর করে,

বাস্তব অবস্থাকে বিকৃত বা গোপন করে আর যে শিল্পী মূলতঃ জনচেতনা সৃষ্টির জন্য বাস্তবকে, বা বাস্তবের বিশেষ একটি অংশকে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবেগপূর্ণভাবে প্রকাশ করে তাদের শিল্পকর্ম ভিন্ন হতে বাধ্য। এক কথায়, শিল্পীর জীবনবোধ জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনদর্শন এবং বিশ্ববীক্ষা (যদি থাকে) তার শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করে।

শিল্পের মধ্যে শিল্পী শুধু নিজেকে নয়, সমাজকেও প্রকাশ করে। যা তার নিজের জীবন তাও সমাজের সঙ্গে ভাষা, বিশ্বাস, আচার-বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। সমাজ সরাসরি, কার্য-কারণসূত্রে, শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে না বা প্রতিবিম্বিত হয় না। শিল্পীসত্তা এতদুভয়ের মধ্যে, এতদুভয়েরই অংশরূপে —বিচ্ছিন্ন-স্বতন্ত্রভাবে নয়, জাগ্রত ও সক্রিয়। যারা সমাজের সঙ্গে শিল্পের কাঠামোগত (স্ট্রাকচারাল) সম্বন্ধের কথা বলেন তারা জটিল সত্যটিকে অতিসরলভাবে উত্থাপন করেন ; অজ্ঞাতসারে শিল্পীকে সমাজ-কাঠামোর স্থূল চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা ক'রে তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র অন্তরঙ্গ ইতিকথাকে অস্বীকার করে বসেন। লুকাস এবং গোল্ডম্যানপ্রমুখ মার্ক্সবাদী, শিল্পতাত্ত্বিকদের লেখায়[৫] এই প্রবণতা স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মন্তব্যটি শিল্পীমন সমাজ ও জগতের কাঠামো-সম্পর্কিত।

শিল্পীর মনে সমাজ-কাঠামোর প্রতিবিম্ব যদি হয় স্পষ্ট ও অপরোক্ষ তাহলে স্বীকার করতে হয় মানবসমাজেও কার্যকারণতত্ত্ব প্রায় প্রাকৃতিক স্তরের মতোই কার্য্যকর। সামাজিক তত্ত্ব হিসেবে নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার না করেও মার্ক্সবাদী দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে এই সমালোচনার উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। উত্তরের সারকথা হল, সামাজিক কাঠামোর গৌণ নানা প্রভাব যদিচ মানুষ তার বুদ্ধি ও কর্ম দ্বারা প্রতিহত ও পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু তার মূল প্রভাব থেকে সে নিস্তার পেতে পারে না। আলোচনা করলে দেখা যাবে এই "মূল প্রভাব" একপ্রকার নিয়ন্ত্রণবাদ, একটি পরাতত্ত্ব মাত্র। কোন অভিজ্ঞতাই এই তত্ত্ব খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। অভি-জ্ঞতার অন্তরালে বা চেতনার বাইরে থেকেও যদি কোন সামাজিক প্রভাব শিল্পীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় তাহলে শিল্পী যথার্থই কালের পুতুল। যুগধর্মই তার ধর্ম। সমাজধর্মই তার ধর্ম। বলাবাহুল্য, মার্ক্সবাদী নন্দনতাত্ত্বিক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ডায়েলেকটিকের সাহায্য নিয়ে সীমিত মানব স্বাধীনতার তত্ত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

ফ্রয়েডের মতে মানুষের মনে সমাজ-কাঠামোর প্রভাব খুবই পরোক্ষ, অস্পষ্ট এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিকৃত। সমাজের অনুশাসনে সে ভীত। অয়েদিপাউস কমপ্লেক্সে নিষিদ্ধ-অথচ-শঙ্কিত ব্যক্তির জন্য ব্যর্থকামনায় সমাজের প্রতি সে প্রতিহিংসা-

পরায়ণ। ব্যর্থকাম শিল্পী তার কাম্যবস্তুকে শুধু সমাজের রক্তচক্ষু থেকে নয়, নিজের সচেতন মন থেকে দূরে নিয়ে যায় ও অলীক কল্পনায় বিকৃত করে রেখে দেয় তার অবচেতনায়। পরা অহংকে এড়িয়ে স্বপ্নে বা মূর্চ্ছায় সৃষ্টির মাধ্যমে সে নিষিদ্ধ কাম্যবস্তুর মুখোমুখি হতে চেষ্টা করে। ফ্রয়েডের মতে হিস্টিরিয়া শিল্পসৃষ্টির ব্যঙ্গচিত্র, কিন্তু ভ্রান্তচিত্র নয়। লক্ষণীয় এই যে, ব্যক্তিমনের কাঠামো, চেতন ও অবচেতন দুয়েরই কাঠামো, সামাজিক কাঠামোর প্রভাব থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য বুঝতে মূলতঃ সাহায্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মজীবন, বিশেষতঃ শৈশব, বাল্যজীবন ও যৌন অনুষঙ্গ। সমাজের প্রাসঙ্গিকতা তার রীতিনীতির নিষেধ থেকে, ব্যক্তির পরা অহং থেকে, পরোক্ষভাবে বুঝতে হবে। ব্যক্তির মন, সমাজ ও বিশ্বব্যাপী কোন বিশ্ববীক্ষা বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভব ব'লে ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন না এবং এ বিষয়ে তিনি মার্ক্সের সমালোচক ছিলেন। ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে সনাতন মার্ক্সীয় সমালোচনা হল, তিনি বুর্জোয়া সমাজের অবচ্ছিন্ন (এ্যাটমিক) বা আত্মচ্যুত (এ্যালিয়েনেটেড) মানুষকে ও ব্যর্থকাম বিকৃত রুগ্ন মনো-চিত্রকে ভিত্তি (মডেল) ক'রে সমাজ, সভ্যতা, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ চিত্র দেবার চেষ্টা করেছেন। মার্ক্স ও ফ্রয়েডের যুগ্ম প্রভাবে কিছু প্রগতিশীল আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী দেখাবার চেষ্টা করেছেন, মার্ক্সের মতে যে উৎপাদন পদ্ধতি ও তদ্‌উদ্ভূত রীতিনীতিগুলি মানব স্বাধীনতার অন্তরায় ও আত্মচ্যুতির কারণ তাই প্রকারান্তরে ফ্রয়েডের সমাজ-নিষেধ ও ব্যক্তির পরা অহং প্রমুখ ধারণায় প্রকাশিত। মার্ক্স বা ফ্রয়েডের পক্ষে এই ভাষ্য গ্রহণযোগ্য কি না সেটা অবশ্য আরেক প্রশ্ন। মনে রাখো ভালো, সমালোচক বা ভাষ্যকার নিজেও শিল্পী হতে পারেন ঃ সার্থকতরগণ তাই হয়ে থাকেন।

শিল্পীর চেতন ও অবচেতন মনসহ সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমাজের, এবং এমন-কি বিশ্বজগতের, কাঠামোগত সম্বন্ধ একটি মৌলিক জাতিসত্তায় (আর্কেটাইপে) বিধৃত। শিল্পীর সৃষ্টির উৎস, তার অন্তর্দৃষ্টি, ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিক এবং জাগতিক। শিল্পীর দৃষ্টিপ্রদীপে তাই ত্রিকাল এবং সর্বদেশ উদ্ভাসিত। ইয়ুং[৭] তার এই তত্ত্ব দিয়ে শিল্পীমানস সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় বক্তব্য (শিল্পী-মানস অবচ্ছিন্ন, বিকৃত এবং সমাজের সঙ্গে অতি পরোক্ষভাবে জড়িত) খণ্ডন করতে চান। মনোজগৎ ও বিশ্বজগৎ বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা ও নিয়মগুলি মূলতঃ প্রাকৃতিক এবং বস্তুত তা সামাজিক, সমাজ-স্বীকৃত বিজ্ঞান থেকে গৃহীত,—মার্ক্সের এই তত্ত্বও ইয়ুং গ্রহণ করেন না। কিন্তু তার নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি পরাতাত্ত্বিক (মেটাফিজিক্যাল) এবং বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার অতীত।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্যটি হল শিল্পী যে একটি নির্দিষ্ট অর্থে তার নিজস্ব দেশ-কালের

সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত সেই বিষয়ক। খুব অস্পষ্ট হলেও শিল্পী একটি রসিক সমাজ, দর্শক বা শোতৃমণ্ডলীকে মনে রেখে শিল্প রচনা করেন। শিল্পের রীতি, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য যুগে-যুগে সমাজে-সমাজে পালটায়। এক যুগের রচনাশৈলী আরেক যুগে কৌতুকের, এমন কি পরিহাসের, বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের স্টাইলে জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ যদি কবিতা লিখতেন তাহলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে তা সমাদৃত হত না। লক্ষণীয় এই যে, এ যুগের রসিক যখন ঐ যুগের শিল্পরীতির নিজস্ব নিরপেক্ষ সমালোচনা বা মূল্যায়ন করেন তখন তিনি অন্য যুগের ও সমাজের শিল্পী তার নিজস্ব যুগের ও সমাজের প্রচলিত ও প্রত্যাশিত শিল্পরীতি অনুসরণ করছেন না বলে সাধারণতঃ বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন না। শিল্পীর ও শিল্পকর্মের সামাজিক ও ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা একটি অতি প্রচলিত মত। তা বলে সকলে এ মত মানেন না। কেউ কেউ বলেন, শিল্পী বিশেষ যুগ ও সমাজের মানুষ হলেও তার সৃষ্টি (সার্থক হলে) সকল যুগ সমাজের কাছে স্বীকার্য ও আনন্দদায়ক। শিল্পী বিশেষ যুগের মানুষ হলেও তার শিল্পকর্মে সংশ্লিষ্ট যুগের সমাজের পরিবেশ-প্রভাব থাকলেও তাতে তার শিল্পকর্মের রস-আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না। বিক্রমাদিত্যের যুগ ও সমাজ কালিদাসের কাব্যলোকের সীমা নয়। কিংবা বেগম আখতার যখন গজলে তান ধরেন "কোয়েলিয়া মাৎকরপুকার" এবং ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেট্টি কবিতা লেখেন "I shall not hear the nightingale/ Sing on, as if in pain" তখন তাদের শিল্পকর্মের রসাস্বাদনের জন্য রসিকের পক্ষে শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে (তাদের কে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি আর কে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় গায়িকা) জ্ঞান সাধারণ অর্থে নিষ্প্রয়োজন। "সাধারণ অর্থে" বলছি এই জন্যে যে একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে যে, ভাষা, শিল্পরীতি ও অন্যান্য কারণে শিল্পসমাজের মতো রসিক সমাজও ব্যাপক হলেও সীমাহীন হতে পারে না। অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পসত্তার সমাজাপেক্ষিকতা প্রকট না হলেও সত্যই উপস্থিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মর্তব্য। শিল্পের প্রকারভেদে শিল্পীর, ও শিল্পের সমাজাপেক্ষিকতার প্রকটতা-প্রচ্ছন্নতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। একটি সাহিত্যকর্ম, তারাশঙ্করের উপন্যাস "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা", যে ভাবে একটি দেশ-কালের সঙ্গে জড়িত সেই ভাবে একটি সঙ্গীত, বীটোভেনের Eroica বা Aurora, কোন দেশ-কালের সঙ্গে জড়িত নয়। একই ধরনের শিল্পকর্মের মধ্যেও এই পার্থক্য রয়েছে। মিকেলেঞ্জেলোর নগ্ন পুরুষ চিত্রগুলিতে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে ঈশ্বরের নিকট মানুষের আত্মা কেমন উন্মোচিত (রেনেশাঁস যুগের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস); পিকাসোর অন্যতম বিখ্যাত নগ্ন চিত্র ড্রায়াড (১৯০৮) এ তিনি মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয়তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই চেষ্টা মিকেলেঞ্জেলোর চেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট। আধুনিক শিল্পের অন্যতম প্রধান ও প্রবল প্রবণতা হল মানুষের ও প্রকৃতির সাধারণ দৃশ্যরূপের তুলনায় তার ভাবরূপকে, শিল্পীমানসে তার প্রভাবরূপকে দেখানোর চেষ্টা। এই চেষ্টা যতো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা অমূর্ত হচ্ছে শিল্পকর্মে সমাজের প্রভাব ততো পরোক্ষ ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে রসিকসমালোচকের ভাষ্য ও ব্যাখ্যার অবকাশ। শিল্পে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাঙ্কেতিকতার অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা, অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা, রহস্য ও ব্যঞ্জনা। এতে শিল্পমূল্য ব্যাহত হচ্ছে কি না তা মতামতের ব্যাপার। কেউ বলেন, এর ফলে শিল্পরস উপভোগ মূলতঃ বুদ্ধি-ভাবনার ব্যাপার হয়ে উঠেছে এবং রসিক গোষ্ঠী সীমাবদ্ধ ও অভিজাত হয়ে পড়ছে। এর আরেক ফলশ্রুতি হল দু শ্রেণীর শিল্প ও রসিক সমাজ সৃষ্টি হচ্ছেঃ বিচার-প্রধান মানুষদের জন্য এবং নিছক প্রমোদ বা উপভোগের জন্য। আবার কেউ কেউ বলেন, শিল্পরূপ যতো অমূর্ত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হচ্ছে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষলব্ধ জীবনের ও জগতের সহজ প্রতিচ্ছবি থাকছে না, রসিকের দায়িত্ব স্বাধীনতা ও সমালোচকরূপে সৃষ্টি, ব্যাখ্যা ও কল্পনার সুযোগ ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে মতই আমরা গ্রহণ করি না কেন, অমূর্ত শিল্পের ক্ষেত্রে ত বটেই, প্রত্যক্ষলব্ধ জীবন-জগৎ নিয়ে যে সব শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও রসিক সমালোচক রসবিকৃতি না ঘটিয়েও শিল্পকর্মের নানারকম ব্যাখ্যা দিতে পারেন। পদার্থবস্তুর থেকে শিল্পবস্তুর এই পার্থক্য বড় গুরুতর। পদার্থবিদ্যার নিয়ম দিয়ে বস্তুর স্বরূপ ও পরিবর্তন বোঝা তুলনায় সোজা। কিন্তু শিল্প-বস্তুর এমন কোন স্থির-নির্দিষ্ট স্বরূপ ক নেই যাকে দেখিয়ে দেওয়া (অস্টেন্সিভ্‌লি ডিফাইন করা) যায় এবং তার কারণ কাঠামোর খ-র সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দেশ করে বলা যায় যে, ক-এর জন্য খ। শিল্পে সমাজের প্রভাব বহুরেখ আলোর মতো এবং রেখাগুলি ইউক্লিডের জ্যামিতির ধর্মানুসারী নয়। এই রূপক নিঃসন্দেহে জটিল,—কিন্তু ভুল নয়। পরিশেষে গোড়ার কথায়ই ফিরে আসি।

"শিল্পবস্তুর স্বরূপ কি?" এই প্রশ্ন না তুলে যে "শিল্পবস্তুর স্বরূপ কীভাবে সবচেয়ে সন্তোষজনকভাবে বোঝা যেতে পারে?" এই প্রশ্ন তুলেছি তা থেকে আমার প্রবণতা অনুমেয়। শিল্প-ক্ষেত্রে স্বরূপের প্রশ্ন গৌণ এবং তার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। তবু, আমি যে প্রশ্ন মৌল প্রশ্ন বলে তুলেছি তার সন্তোষজনক উত্তর পেলে ঐ প্রশ্নোত্তর কিছুটা সহজবোধ্য হয়। আমি প্রথম দেখাতে চেয়েছি শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক নানা রকম হতে পারে এবং রকমগুলি সাধারণ নিয়মে বাঁধা শক্ত। অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির সুনির্দিষ্ট মনোবিজ্ঞান রচনার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত হতে পারেননি।[৮] একটি ব্যাপার যা বোঝা গেছে তা হল এই যে, মৌল শিল্প-

সৃষ্টির প্রেরণা, ধারণা ও প্রকাশ নির্দিষ্ট সমাজ ও ইতিহাসের পরিমণ্ডলে বুঝবার চেষ্টা করলে অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা, হঠাৎ তৈরী করা ব্যাখ্যার দুর্বলতা অনেকাংশে দূর করা যায়। দ্বিতীয়তঃ আমি চেষ্টা করেছি দেখাতে যে শিল্প সমাজের সম্বন্ধ কার্যকারণ বা সহগামিতার সাধারণ তত্ত্ব দিয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় না। কারণ, এসব তত্ত্ব বা নিয়মের বহু ব্যতিক্রম অনায়াসে দেখান যায়। বিশেষ শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ সম্যকভাবে বুঝতে হলে সেই বিশেষ দেশ-কালকে ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে হবে। সেই বিশেষ দেশ-কালের সীমানার মধ্যেও সাধারণ ধারণা ও নিয়মের ব্যবহার অপরিহার্য। তাছাড়া শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধকে একতরফাভাবে, শুধুই সমাজের দিক থেকে, বুঝলে ভুল হবে। শিল্প ও সমাজের সম্বন্ধকে সমাজের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাঠামোর অংশরূপে বুঝতে হবে। বিজ্ঞাপন, প্রচার, প্রমোদ প্রভৃতি বহু বিস্তৃত ও লৌকিক শিল্পের প্রয়োগ ও প্রভাবে সমাজের রীতি, আচার, মূল্যবোধ, এক কথায় কাঠামো, নিঃশব্দে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, আমার মতে, শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের দিকে তাকানো, সমাজকে বোঝার চেষ্টা করা। শিল্পীর আত্মজীবনী দিয়ে বা নিছক তার মনকে বুঝে সমাজকে বোঝার কথাও বলছি না। শিল্পকর্ম নিরপেক্ষভাবেও শিল্পীমনের স্বকীয় চরিত্র নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু শিল্পীমন শিল্পকর্মের মাধ্যমেই কেবলমাত্র পারে তার সমাজকাঠামোয় পরিবর্তনের দাগ কাটতে, কারণ সৃষ্টি করতে, প্রভাব-পরিধি বিস্তৃত করতে। শিল্পের জন্য সমাজে যে পরিবর্তন আসে তা এতই বিভিন্ন ও বিচিত্র যে ব্যক্তি-শিল্পীর নিজস্ব ও আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করলে তার ব্যাখ্যা দেওয়া দুষ্কর। শিল্পের বিষয়রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যতো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট হয়ে আসছে, কল্পনা ও চিন্তার আধিক্যে শিল্পকর্ম যতো বেশি অমূর্ত হয়ে আসছে, শিল্পে সমাজের প্রভাব আবিষ্কার করা ততো কঠিন হয়ে উঠছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাঠামো যতো বেশি জটিল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে উঠছে কার্যকারণ ও সহগামিতার সাধারণ তত্ত্বের প্রয়োগ ততো সীমিত হচ্ছে এবং অপপ্রয়োগের শঙ্কা বাড়ছে। শিল্পবস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে সমাজ-কাঠামো এবং শিল্পীর ব্যক্তিজীবন বহির্সীমার ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র; আসল আবিষ্কারের উপায় সহানুভূতিশীল সমাজায়ত বিশ্লেষণ,—বিশ্লেষণ দিয়ে শিল্প-ও-সমাজের জটিল গ্রন্থির উন্মোচন।

শিল্প কি অনুকৃতি, না কি বিকৃতি?

প্রসঙ্গের অবতারণা।

আয়নার ফ্রেমের উপর ব'সে চড়ুই কাচে নিজের প্রতিবিম্ব ঠোকরাচ্ছে—এ আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি। আমার একটি পোষা কুকুর ছিল। সে ছোট বেলায় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে প্রথমে চিৎকার করত এবং পরে আয়নার পিছনে সেই অস্তিত্বহীন কুকুরটিকে খুঁজত। কোকিলের ডাক অনুকরণ করলে কোকিল আবার ডাকে: মানুষের ডাকের স্বাভাবিক বিকৃতি সত্ত্বেও কোকিল বার বার ডাকে। কথিত আছে, অ্যাপেলেসের আঁকা একটি ঘোড়ীর ছবি দেখে একটি ঘোড়া তার সঙ্গে সঙ্গমোন্মত্ত হয়েছিল এবং য়ুক্সিসের আঁকা আঙুরের ছবি দেখে পাখিরা তা খাবার চেষ্টা করেছিল।[১]

উল্লিখিত উদাহরণের চড়ুই, কুকুর, কোকিল, ঘোড়া এবং পাখিদের কাজ সম্পর্কে আমরা কৌতুক অনুভব করতে পারি কিন্তু প্রশংসা করব না। বরং হয়ত বলব, "একদম বোকা।" এ তো গেল সংশ্লিষ্ট পশুপাখিদের বিচারবোধের উপর মন্তব্যের দিক। কিন্তু কেউ যদি অন্য দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলে, "ঘোড়াকে বা পাখিকে ছবি এঁকে ভোলাতে পারে যে সব শিল্পী, নিঃসন্দেহে সেই সব অ্যাপেলেস ও য়ুক্সিসেরা আমাদের প্রশংসার্হ" এবং আমরা যদি সেই প্রশংসায় সায় দিই, যা স্বাভাবিক, তাহলে পরোক্ষে এটুকু অন্তত আমরা মেনে নিলাম যে, প্রশংসার যোগ্য শিল্প সার্থক অনুকরণও হতে পারে। তাছাড়া পরোক্ষে এ-ও মেনে নেওয়া হলো যে, অনুকরণজনিত যে অধ্যাস (প্রত্যক্ষ) হলো তা-ও শিল্পীর সার্থকতার পরিচায়ক। প্রত্যক্ষদর্শী (অর্থাৎ যার অধ্যাস হলো সে) যদি পশুপাখি না হয়ে মানুষ হয় তাহলে আমরা কী বলব? আমার পরিচিত এবং বিশেষত পরিচিতা কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা বিয়োগান্ত বা ধর্মমূলক সিনেমা দেখতে গিয়ে হলের মধ্যে সশব্দে অশ্রুমোচন বা বহুকষ্টে অশ্রু সংবরণ করেন। এ ক্ষেত্রে সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালককে না হয় তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসা করলাম। যাঁরা শিল্পের জন্য, প্রভাবে বা অনুরাগে, কেঁদে ফেললেন বা কাঁদো-কাঁদো হলেন তাঁদের কি রসিকজন বলব? ছবিটাকে না হয় বললাম "খুব বাস্তবধর্মী", কিন্তু যিনি ভাবে-রসে অভিভূত হয়ে কাঁদলেন তিনি তো সাময়িকভাবে "সার্থক" শিল্পরসের প্রভাবে দৃষ্টরূপ যে বাস্তব নয় এবং মনোহর অধ্যাসমাত্র তা ভুলে গেছেন। এ ক্ষেত্রে

কান্নার কারণ বাস্তবধর্মী অনুকরণ ও অধ্যাস-প্রত্যক্ষ-জনিত রসভোগ। অন্য দিক থেকে বলা যেতে পারে, বিচার-শক্তি বা যুক্তি-মনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে রসিক ব্যক্তি অনুকরণকে অনুকরণ ব'লে বুঝতে পারেননি এবং তাই কেঁদেছেন।

প্লাতোপন্থী কেউ বলতে পারেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে বহুশ্রুত এ কথাগুলি সত্য যে শিল্প অনুকরণধর্মী, অধ্যাস সৃষ্টির সহায়ক কারণ এবং যুক্তি-বিচারের বিরুদ্ধধর্মী।" ঐতিহাসিক প্লাতো বস্তুত এ কথা বলেছেন কি না সে-প্রসঙ্গ নিতান্তই গৌণ। যদি শিল্প সম্পর্কে ঐ মন্তব্যত্রয় সত্য হয় ও আদর্শ সমাজ থেকে শিল্পীকে নির্বাসনের প্রস্তাব ওঠে তাহলে আমরা কী বলব?

শিল্পের অনুকৃতিতে ও বিকৃতিতে দেশ ও কাল।

ধরে নিচ্ছি আমরা যা বলব তা যুক্তিসিদ্ধ হবে ও আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে। টাইগার হিল্ থেকে সূর্যোদয়, কন্যাকুমারী বা মালাবার হিল্ থেকে সূর্যাস্ত, হাওয়ায় হিল্লোলিত দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ শস্যশিখা প্রভৃতি প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে ও আনন্দ দেয়। সুন্দর এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির কেউ যদি ফটো তুলে বা এমন-কি স্কেচ এঁকেও আমাদের দেখায় আমাদের মনে সৌন্দর্য অনুভূতি ও আনন্দ জাগারই কথা। কিছু কিছু নন্দনতাত্ত্বিক সখেদে মন্তব্য করেছেন, ইদানীংকার শিল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান নেই বললেই চলে।[২] প্রশ্ন উঠতে পারে: প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অন্য যে বাস্তব বিষয়সমূহ পৃথিবীতে রয়েছে তা যদি অবিকৃতভাবে আমরা দেখি বা শুনি তাতে আমাদের মধ্যে সৌন্দর্যের ও আনন্দের অনুভব জাগতে পারে, কিন্তু তাকে কি শিল্পধর্মী বলা ঠিক হবে? সেই পুরনো প্রশ্ন: ফটোগ্রাফি কি ফটোগ্রাফি হিসেবেই শিল্প বলে পরিগণিত হতে পারে? নাকি, তার মধ্যে অধিক কিছু, যেমন বিশেষ এক প্রকার বিন্যাস (কম্পোজিশন), থাকা দরকার? বস্তু বা মনোজগতের অবিকৃত স্বরূপ কি স্বধর্মেই নান্দনিক অর্থে মনোরম? না কি কিছু বিকৃত-বিন্যাস অপরিহার্য? সুন্দর-অসুন্দর দুয়েরই অভিজ্ঞতা নান্দনিক অর্থে মনোরম হতে পারে। মূল জিজ্ঞাসা হলো: শিল্প সৃষ্টির জন্য অনুকৃতিই কি যথেষ্ট, না বিকৃতিরও প্রয়োজন আছে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আর দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া হয়তো শিক্ষাপ্রদ হবে। সকল প্রকার অনুকৃতি ও বিকৃতি কেন নান্দনিক অর্থে মনোরম হয় না? কেন কেবলমাত্র কোন কোন বিশেষ অনুকৃতি মনোরম হয়ে ওঠে এবং শিল্প বলে পরিগণিত হয়?

শিল্পমাত্রই বোধহয় অল্পাধিক বিকৃতিসাপেক্ষ। "বিকৃতি" এখানে কদর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে

না। আক্ষরিক অর্থে "বিকৃতি" বুঝতে হবে। বিকৃতির মধ্যে নিহিত রূপান্তর, পরিবর্তন। এ কথা ইংরাজী শব্দ আর্টের সঙ্গে aritificial (কৃত্রিম)-এর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই বলছি না। বরং, পক্ষান্তরে, এই সম্পর্কের মূলেও রয়েছে মনোরম বা মনোহর বিকৃতির প্রয়োজন। প্রথমেই দেখান যেতে পারে যে, অনুকৃতিও হুবহু অনুকৃতি হয় না। কোনো মানুষ বা অন্য কিছুর যখন চিত্র বা ভাস্কর্য রচনা করা হয় তখন সাধারণত তার বাস্তব উচ্চতা, বিস্তার ও অন্যদৈশিক বৈশিষ্ট্যের হেরফের ঘটে। কালের দিক থেকেও হেরফের ঘটে। জীবনের ও ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি ক্ষণ, ভাব বা ভঙ্গিকে যদি সমগ্রের অনুকৃতি ব'লে দেখান হয় তাহলে সে অনুকৃতি যথাযথ কি না এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া কঠিন।[৩] তাছাড়া জীবন, তা সে মানবিক বা নৈসর্গিক যাই হোক না কেন, কালধর্মে অবগাহিত, অর্থাৎ বহমানতা তার অন্যতম অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, অথচ শিল্পে তাকে প্রকাশ করা হয় স্থির বা স্থাণুভাবে। কালধর্মকে দেশধর্মে রূপান্তরণের এই যে চেষ্টা তা-ও শিল্পের অবশ্যম্ভাবী বিকৃতির একটি দিক। চলচ্চিত্রে যদিও চাক্ষুষ শিল্পের বিকারজনিত এই দুর্বলতা দূর করার কিছু চেষ্টা হয়, তবে তা অন্য কারণে সফল হতে পারে না। মনে রাখা ভাল, সকল শিল্প চাক্ষুষ নয়। সে সব ক্ষেত্রে দৈহিক স্থাণুধর্ম কালিক গতিধর্মকে ক্ষুণ্ণ করতে সার্থক।

দ্বিতীয়ত কালিক বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক কীভাবে সকল প্রকার সাহিত্যকর্মকে, বিশেষত কাব্যকে, প্রভাবিত করে তা লক্ষণীয়। এ প্রভাবও বিকৃতির সহায়ক ও অনুষঙ্গ। যে রসভাব ও তীব্রতা সাহিত্য ও কাব্যসৃষ্টির উৎস তা যে পর্যন্ত তার প্রাথমিক তীব্রতা না হারায়, সৃজনশীল কল্পনার স্থৈর্যে অন্য রূপ পরিগ্রহ না করে, সে পর্যন্ত তাকে শিল্প ব'লে পরিগণনা করা হয় না। বড় জোর তাকে শিল্পের উপাদান ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এক কালের শিল্পী আরেক কালের উপাদান নিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে সমর্থ হন। রামের জন্মের পূর্বেই তাই রামায়ণ রচনা সম্ভব হবার কথা শুনি। বস্তুত রামের আগে জন্ম হয়েছিল না কি রামায়ণ আগে রচিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে মুখ্য নয়। মূল কথা হলো, শিল্পের বিষয় যখন শিল্প হয় তখন তাতে কালের আঁচড় পড়ে; তবে এই আঁচড়ের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অতীতকে বর্তমান, ভবিষ্যৎকে সাম্প্রতিক এবং বর্তমানকে ঐতিহাসিক বা অনাগতরূপে চিত্রিত ও মনোহরভাবে বিকৃত করা শিল্পে হামেশাই হচ্ছে।

শিল্পে দূরত্ব॥

জগৎ ও জীবনের অনুকৃতি ও বিকৃতি দুই-ই যুগপৎভাবে শিল্পে উপস্থিত। অনুকৃতির অসম্পূর্ণতা, তা সে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে ভাবেই হোক না কেন, বিকৃতির সামিল

ও তার প্রয়োজন মেটায়। প্রায়ই আমরা উপন্যাসে-নাটকে দেখি কয়েক শ' পাতার বিস্তারে এবং বিশেষভাবে নির্বাচিত কতগুলো ঘটনা ও সংলাপের মাধ্যমে কোনো মানুষ, পরিবার, সমাজ বা জাতির নাতিদীর্ঘ, কখনো কখনো অতি দীর্ঘ, অধ্যায় বা ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। যে-ঘটনা বাস্তব জগতে ঘটতে ত্রিশ-চল্লিশ বছর লেগে যায় তা আমরা উপন্যাসের পাঁচ সাত শ' পাতার মধ্যে, সিনেমা হলে দু বা তিন ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত পরিসরে, শিল্প হিসেবে উপভোগ করি। এ-সব ক্ষেত্রে পরিবর্জন ও তজ্জনিত বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। এ কথা সত্য যে যা পরিবর্জিত হয়, অর্থাৎ যা নেই, তার তাৎপর্য যা পরিগৃহীত থাকে, অর্থাৎ যা আছে, তার বিন্যাস থেকে রসিক পাঠক বা দর্শক অনুধাবন ও উপভোগ করতে পারেন। বিকৃতি ও অনুকৃতির শিল্পমূল্য নিঃসন্দেহে রসিকজনসাপেক্ষ ও শিল্পীর বিন্যাস ও পরিবেশনের উৎকর্ষ ও কৌশল সাপেক্ষ।

এ প্রসঙ্গে বিকৃতি-অনুকৃতির দৈশিক কালিক দিকের তুলনায় আত্মিক বা মানসিক দূরত্বের দিকটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা দেখান যেতে পারে।[৪] স্বল্প ক্ষণের একটি ঘটনাকে ঘিরে একটি বড় কাহিনী রচনা করা যায়। ঘটনাটির দেশ-কাল, পরিচয় হয়ত খুবই সংক্ষিপ্ত, এবং তার গুরুত্ব হয়ত একটি কি দুটি মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবু তার বিশ্লেষণ, পূর্বাপর ঘটনাসংস্থান, শিল্পীর নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার প্রক্ষেপণ···সব মিলিয়ে অনুকৃত বিষয়ের পরিচয় ও বিস্তার মূলের তুলনায় শিল্পের পটভূমিতে অনেক ভিন্ন হয়ে যায়। ভিন্ন হয়েও (কিংবা ভিন্ন হয়েই) হয়ত শিল্প হিসেবে উপভোগ্য হয়। জেমস্ জয়েস, ব্রেশ্‌ট্ ও সতীনাথ ভাদুড়ীর কোনো কোনো লেখায় আমার বক্তব্যের উদাহরণ মিলতে পারে।

বিকৃতির কু-প্রভাব ও অনুকৃতির অন্ধত্ব দূর করার আগ্রহে শিল্পীকে একটি ব্যাপারে সতর্ক হতে দেখা যায়। বাস্তবধর্মিতার নামে শিল্পী এমন কোন বিষয়কে সরাসরি শিল্প হিসেবে উপস্থাপিত করতে চান না যা দেখে বা শুনে রসিকের প্রতিক্রিয়ার ভাষা হবে "কুৎসিত", "ভয়াবহ", "অশ্লীল", "ন্যক্কারজনক" কিংবা "হ্যাঁ, জীবনে এমনতর ঘটনা ঘটে আমরা সবাই জানি, তা বলে কি ওসব অমনভাবে দেখাতে বা শোনাতে হবে।" আমার এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য এ কথা বলা নয় যে, যা "কুৎসিত" বা "ভয়াবহ" তা শিল্পের বিষয় হতে পারে না। নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু, বলা-বাহুল্য, সে-সব ক্ষেত্রে এমনতর অধিক কিছু থাকে যার ফলে বিষয়বস্তুরূপে যা কুৎসিত বা ভয়াবহ শিল্পবস্তুরূপে তার মনোহর বিকার বা রূপান্তর ঘটে যায়। "হাঞ্চব্যাক অব নটারডাম"-ও "শাপমোচনে"র অরুণেশ্বরকে স্মরণ করা যেতে পারে।

দৈশিক দূরত্ব যে শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তা আরেক ভাবেও দেখান যায়। দৃশ্যবস্ত

যদি চোখের খুব কাছে থাকে তা হলে দেখা ঠিকমত হয় না ; চক্ষু ও বস্তুর মধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবধান চাই। নতুবা দৃশ্যবস্তুর বস্তুরূপ দেখা গেলেও শিল্পরূপটি অনায়াসে চোখকে ফাঁকি দেয় ; এ কথা শ্রাব্য শিল্পের গান সুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা যারা গান ভালবাসি তারা গান শোনার জন্যও "হিজ মাস্টার্স ভয়েজ"-র কুকুরটির মতো গ্রামোফোনের চোঙার অতো কাছে গিয়ে বসি না। এমন কি প্রিয়জন প্রিয় গানও যদি কানের খুব কাছে এসে গাইতে শুরু করে তাহলে "ঝালাপালা"র কথা মনে হয়—সুরের পরিবর্তে শব্দ প্রত্যক্ষ হয় মাত্র।

মানসিক দূরত্বের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আবার শাপমোচনের অরুণেশ্বরের কথাতেই ফিরে আসা যাক। তার দেহরূপ ছিল কুৎসিত অথচ তার প্রেমিকা কমলিকার চোখে তার প্রেমরূপ দেহরূপকে সুন্দরে রূপান্তরিত করে তুলল একদিন। প্রেম যেমন মানুষের দেহরূপের রূপান্তর ঘটাতে পারে তেমনি পারে শিল্পকর্ম বস্তুরূপকে শিল্পরূপ দিতে। রূপ থেকে এই যে রূপান্তর তা ঘটে মনোজগতে,—বস্তু জগতে নয় ; কিন্তু এ-জাতীয় মনোরম ঘটনার সার্থক প্রকাশ রসিক মানুষের মনোহরণে সমর্থ। সার্থক শিল্পবস্তু রসিকের মনোহরণ করেও তাকে তা বিস্মৃত করিয়ে রাখতে পারে এবং পরিবর্তে আরেক কল্পিত, সৃষ্ট জগৎকে সাময়িকভাবে বস্তু জগৎ ব'লে বিশ্বাস ও তদনুরূপ অনুভব উৎপাদনে সমর্থ হয়। প্রেমে কুৎসিত কি করে সুন্দর হয় ? ঘৃণায় সুন্দর কি করে কুৎসিত হয় ? সার্থক শিল্পসৃষ্টি কী করে দেশ-কালের বস্তুরূপের ব্যত্যয় বা রূপান্তর ঘটায় ?

আগেই বলেছি এ রূপান্তর মানসিক। মানসিক হয়েও বাস্তবিক। মানসিক হয়েও মায়াবী নয় ; মায়াবী হয়েও মায়ারূপ সঙ্গোপনে সার্থক। নিছক মানসিকতা দিয়ে শিল্পরূপটির ব্যাখ্যা হয় না। এই মানসিকতার একটি বিশেষ গতিপ্রকৃতি আছে যার অনুধাবন আবশ্যিক। যে মন, রসিক যে জন, শিল্পের বিষয়বস্তুকে জানতে, দেখতে বা শুনতে চাইছে তার আর ঐ বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি মানসিক ব্যবধানও আছে। ব্যবধানের স্বরূপ কখনো বাস্তব ঘটনা, যেমন ধোঁয়া, কুয়াসা, দেয়াল, কারাগার বা নিছক দৈশিক দূরত্ব। কখনো ব্যবধানের স্বরূপ মানসিক, যেমন, লজ্জা, সংকোচ, ভয়, ঘৃণা বা সংশয়। সার্থক শিল্পী এই দু-রকম ব্যবধানের স্বরূপকে রূপান্তর ও একাকার করতে পারেন। দুই রূপকে একরূপ, দুই আকারকে একাকার করতে গেলে ত্রি-দেশাত্মক ঘটনাকে দ্বি-দেশের পরিসরে আনতে গেলে রূপান্তর বা বিকৃতি অনিবার্য। কালের বিস্তৃত ও অবাধ পারম্পর্য যা বস্তুজগতে ঘটে, যেমন কোন বলশালী অশ্বের ধাবমান রূপটি, তাকে যখনি ক্যানভাসের দ্বি-দেশে এবং স্থাণুধর্মে ধরে রাখা হয় তখন বিকার মনোরম হলেও বিকারই। বিচার করলে স্পষ্ট হবে, বিকৃতি এখানে অনুকৃতির ব্যর্থতাজনিত, স্বেচ্ছাকৃত

বিকৃতি নয়। অনুকরণ যদি পরিহার করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য হতো তাহলে যে কোন চিহ্নকে অশ্বের সমার্থক বলে সংজ্ঞা দিয়ে তাকেই অশ্বের চিত্ররূপের সার্থক বিকল্প ব'লে উত্থাপনের চেষ্টা করতে পারতেন। সে রকম চেষ্টা নিশ্চয়ই সম্ভব; কিন্তু সে-চেষ্টা শিল্প-চেষ্টা বলে পরিগণিত হবে না। সংজ্ঞা, চিহ্ন ও সঙ্কেত যখন মানসিক দূরত্বের মায়াবী রূপকে নিঃশেষে নিধন করতে পারে তখন জ্যামিতি, অঙ্ক বা যুক্তিশাস্ত্রের স্পষ্টতা ও ঋজুতা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু শিল্পের রম্য রূপ তখন অনুপস্থিত। জ্যামিতি বা দেশের পরিমাপে যে দুয়ারটুকু থেকে আমার দূরত্ব নেই বললেই চলে তা পার হতে আমার কেন সংশয় তা ইউক্লিড বলেন না, বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথ।

এই মানসিক দূরত্ব (সাইকিকাল ডিস্টান্স)-কে কেন্দ্র ক'রেই একটি সানন্দ (বা বেদনাদায়ক হলেও) মনোরম উৎকণ্ঠা (সাসপেন্স) সৃষ্টি করেন নাট্যকার। উপন্যাসের প্লট সৃষ্টিতেও ঔপন্যাসিক প্রায়ই এর সাহায্য নেন। বাস্তবের অনুকরণকে সংগোপন করার জন্য এবং বিকারকে মনোরম করার জন্য দূরত্বের ভূমিকা শিল্পতত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দৈশিক শিল্প ও কালিক শিল্প ॥

এই গুরুত্বকে আরেক ভাবে দেখা যাক। প্রাচীন ও আধুনিক অনেক শিল্পতাত্ত্বিকই শিল্প সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, স্থাণুধর্মী শিল্প (আর্টস অব স্পেস বা প্লাস্টিক আর্টস), যেমন, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং ধ্বনিময় শিল্প (আর্টস অব টাইম) যেমন, সঙ্গীত, কাব্য, নৃত্য, চলচ্চিত্র।[৫] যদি মনে করা হয়, যে স্থাণুধর্মী শিল্পগুলি বিশেষ স্থানে বা দেশে স্থির, তাদের কেবলি বিস্তার বা একটি মাত্র রূপান্তর (ইউনি-ডাইমেনশন) আছে, তাহলে ভুল হবে। আর, পক্ষান্তরে, যদি মনে করা হয় যে, ধ্বনিময় ও গতিময় শিল্পগুলির একাধিক রূপান্তর বা রূপের গভীরতা আছে এবং তা কেবল আন্তর প্রত্যক্ষেরই বিষয়, তাহলেও একটি জটিল ব্যাপারকে অতি সরল করা হবে। দেশের সঙ্গে বহিঃপ্রত্যক্ষের এবং কালের সঙ্গে আন্তর প্রত্যক্ষের ঘনিষ্ঠ অথচ বিশ্লিষ্ট সম্পর্কের কথা কাণ্ট আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাণ্টের এই প্রত্যক্ষ বিষয়ক তত্ত্বের পশ্চাতে রয়েছে দেশ-কালের নিরাপেক্ষিকতার অন্ত কথা এবং আপেক্ষিকতার অস্ফুট আদি কথা। দেশ ও কালের সত্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন,—এমন একটি ধারণা দর্শনের ইতিহাস থেকে নন্দনতাত্ত্বিকদের চিন্তাকে দীর্ঘদিন ধরেই প্রভাবিত করে আসছে। অথচ বাস্তব প্রত্যক্ষে, বিশেষতঃ নান্দনিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, দেশ-কাল যে একাকার হয়ে যায় এমন একটি অনুভবের কথা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ স্বীকৃত হবার বহু পূর্ব

থেকে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পরসিক বার-বার বলছিলেন। চিত্রশিল্প যে নিছকই স্থাণুধর্মী (plastic) নয়, দেশের একটি মাত্র স্তরে—বিস্তারে—বন্দী নয় তা রবীন্দ্রনাথের "তুমি কি কেবলি ছবি ?" প্রশ্নে ও তার প্রস্তাবিত উত্তরে, "নও শুধু ছবি"তে, স্পষ্ট। ছবিকে তিনি বলেছেন, "তব সুর বাজে মোর গানে।" দেশাশ্রিত ছবির যদি কালাশ্রিত সুর-গান থাকা সম্ভব হয় তাহলে স্থাণুধর্মী শিল্পও ধ্বনিময়, গতিময় শিল্পের সীমারেখা মুছে না গেলেও অস্পষ্ট হয়ে আসে। "নৈশব্দের বাণী" বা "বর্ণের ধ্বনি" অর্থহীন পদ নয়। ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বোদ্‌লেয়ার স্মৃতি ও অনুধ্যানের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। স্থাণুধর্মী ছবিকে প্রত্যক্ষ করলেই তার পূর্ণ রূপ উদ্‌ঘাটন বা প্রকাশ হয় না, তাকে প্রত্যক্ষ করার পরে অনুধ্যান করতে হবে, তবে তার গভীরতর অনুন্মোচিত রূপস্তরগুলি আস্তে আস্তে কালগত পারম্পর্যে উন্মোচিত হতে থাকবে। তাঁর ভাষায়, শিল্প হলো সুন্দরের অনুধ্যান বা স্মৃতিচারণ। লক্ষণীয়, অনুধ্যানে দেশাশ্রিত ছবি বা মূর্তি কালের পারম্পর্যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর হলেও বিকৃত বা স্বধর্ম (এক্ষেত্রে স্থাণুধর্ম) ভ্রষ্ট হচ্ছে ;—বিস্তার (এক্সটেনশন) পারম্পর্যে (সাকসেশনে) রূপান্তরিত হচ্ছে।

পারম্পর্যের সুকল্পিত বিন্যাস যে স্থাণুধর্মেও গতির অনুভব সঞ্চার করতে পারে তার সুন্দর উদাহরণ মেলে স্থাপত্য শিল্পে। যখন আমরা অজন্তার চৈত্যগৃহের (হল), গুহা ২৬, স্তম্ভের বিন্যাস, মাদুরা ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রের বিচিত্র জটিল অথচ নিখুঁত জ্যামিতিক রূপরেখা দেখি, বিস্তৃতির ভঙ্গিমা শিল্পচাতুর্যে তখন স্থিতিধর্মের পরিবর্তে চেতনায় গতি ও আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করে। এথেনা ও হেরার ডোরিক স্টাইলের মন্দিরের স্তম্ভগুলির বিশালতা সত্ত্বেও তাদের সন্নিবেশ, সংস্থাপনার বিন্যাস ও সন্নিহিত নিসর্গ চিত্র তাদের দেহে এক দেশোত্তীর্ণ রূপস্পর্শ রেখে গেছে। অ্যামিয়েন ও কোলোনের গথিক গির্জার সূক্ষ্ম কারুকর্মে পূর্ণ, সরু, সুদীর্ঘ স্তম্ভগুলির উৎক্ষেপণ, বহু উর্ধ্বে শান্ত বঙ্কিম সম্মিলন এবং উর্ধ্ব থেকে শান্ত-নম্র প্রেক্ষণের, নির্ভুল অন্বয় পাথরের নিষ্প্রাণ স্থৈর্য কেড়ে নিয়ে কীভাবে যেন এক অন্য কোথাও, অন্য কোন লোকে অভিযাত্রার সূচনা সঞ্চারে সার্থক হয়ে গেছে।

এখন যা বলছি তার ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বর্ণনার সঙ্গে আরোপন, জ্যামিতির গুপ্ত কৌলীন্যের সঙ্গে অনুভবের উদ্ভাস একাকার হয়ে গেছে, বস্তুরূপ গৌণ হয়ে গেছে, রসিক চৈতন্যে প্রাধান্য পেয়েছে শিল্পরূপের অন্বয় ও সৌন্দর্যবোধ। সার্থক শিল্পকর্মে দেশ-কালের ভেদরেখা শুধু লুপ্যমান নয়, তাদের অন্বয়ও অনুভবসিদ্ধ। ছবি সেখানে শুরু হয়ঃ সুরের মাত্রা সেখানে তার অঙ্ককে সার্থকভাবে সংগুপ্ত রাখে। দেশ-কালে সংস্থিত বস্তুজগতের এ বিকার মনোহরণ করলেও বিকার।

কিউবিজ্‌ম্ ও শিল্পের স্বাতন্ত্র্য ॥

বিকৃতির অনিবার্যতাকে ঘিরে বহু ঘোষিত একটি শিল্পধারণার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক। বলা হয় শিল্পের একটি নিজস্ব জগৎ আছে এবং তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করলে শিল্পে দেশ-কালের অন্তহীন রূপান্তরের সদ্ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। শিল্পের স্বাতন্ত্র্য প্রচলিত অর্থে একটি সমস্যার ব্যাখ্যা হয় বটে, কিন্তু আরেকটি প্রশ্নের অভ্যুদয় ঘটে : শিল্পে অনুকৃতির ভূমিকা অস্বীকৃত হয়।

"শিল্পের জন্যই শিল্প" বা শুধু "আনন্দের জন্যই শিল্প" এ জাতীয় কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এই বক্তব্যের দুটি দিক আছে। প্রথমত, জগৎ ও জীবন তাদের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে শিল্পের বিষয় হতে পারে না বা শিল্পলোকে প্রবেশ করতে পারে না। শিল্পলোকের এমন একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে তার ফলে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ বা বস্তুরূপ এখানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দেশ-কাল ও বস্তুজগৎ, এমন-কি সমাজজগৎ, সম্পর্কে সাধারণ নিয়মগুলি শিল্পের জগতে অনেকাংশে অপ্রযোজ্য। "অনেকাংশে" বলছি এই জন্য যে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য হলে এই দুই জগতের রূপ ও রূপান্তরের পার্থক্যও তুলনা করা অসম্ভব হতো। শিল্পের জগতে বস্তুজগতের রূপান্তর বা বিকার ঘটে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। দ্বিতীয়ত, বাস্তবধর্মিতার আতিশয্য শিল্পকে ইতিহাস, ভূগোল কিংবা সমাজবিজ্ঞানে পর্যবসিত করে ফেলতে পারে। এই সব বিদ্যায় আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রূপ ও তন্নিহিত সত্য পরিচয় খুঁজি। বুদ্ধির ব্যবহার এই সব বিদ্যায় প্রধানত বিচারমূলক এবং বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ প্রয়োগে ও উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে, শিল্পে কল্পনার ব্যবহার মুখ্য এবং বিচারের ব্যবহার, আনুষঙ্গিক প্রয়োগ ও উপকরণ সংগ্রহ গৌণ। হতে পারে যে তারাশঙ্করের লেখায় বীরভূমের ভূগোল এবং বিভূতিভূষণের লেখায় গ্রাম-বাঙলার উদ্ভিদের নির্ভুল পরিচয় পাই, কিন্তু সেই বাস্তবধর্মিতা নিশ্চয়ই তাঁদের লেখক হিসেবে সার্থক হবার মূল উৎস নয়। কল্পনা ও রসসৃষ্টির অনুরোধে জগৎ ও জীবন যদি শিল্পে রূপান্তরিত না হয় তাহলে আমরা বিচারে নির্ভুল বিজ্ঞান পেতে পারি,—শিল্প সৃষ্টি হবে না। সার কথা হলো, শিল্পের সার্থকতার জন্য তার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন।

কিউবিস্ট শিল্পের সার্থকতা ও নীতিকে অনেক শিল্প-সমালোচক শিল্পের স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৬] রং-এর পরিবর্তে কাঠামো, অনুভাবালুতার পরিবর্তে রূপপ্রাথর্য, নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের পরিবর্তে জ্যামিতিক আকার-প্রাধান্য কিউবিস্ট আন্দোলনের মূল নীতি। অর্ধ গোলাকৃতি (স্ফেরিক্যাল), উঁচু নিচুতে সমান গোলাকৃতি (সিলিণ্ড্রিকাল), কোণাকৃতি ও অনির্দিষ্ট বক্ররেখার

সমন্বয়ে পিকাসো ও ব্রাক প্রমুখ শিল্পীরা সনাতন পদ্ধতির (এমন-কি ইম্প্রেশনইজ্‌ম্‌-এর) বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সনাতন জ্যামিতি ভেঙ্গে যে-শিল্পজগৎ কিউবিস্টরা তৈরি করতে সুরু করলেন তার স্বাতন্ত্র্য যাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না হয় তার জন্য তাঁরা তাঁদের ছবিতে নিজেদের নাম পর্যন্ত সই করতেন না।

তথাপি যা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় তা হলো এই—বাইরের দৃশ্য আকার ও শ্রাব্য ধ্বনি থেকে অন্তরের রূপ ও সুরে অন্তর্যাত্রা সেজান (Mountains of Provence, ১৮৮৬), সোরা (Bridge at Courbevoie ১৮৮৬), ভ্যানগগ (Wheatfield and Cypress Trees, ১৮৮৯) প্রভৃতির চিত্রশিল্পে ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইওরোপীয় শিল্পচিন্তায় ছবির মতো নিখুঁত হবার চেষ্টা ছেড়ে' এমন এক সঙ্কেতময় রূপান্তরের চেষ্টা সুরু হয়েছিল যার পরিণাম ইম্প্রেশনইজ্‌ম্‌ এবং কিউবিজ্‌ম্‌। শিল্পকর্ম যে জীবন-জগতের নিখুঁত অনুকৃতি না হলেও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি হতে পারে এই বিশ্বাস শিল্পের নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করল, উৎসাহ যোগাল নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার। এ-প্রসঙ্গে আমার কাছে সব থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা এই কিউবিস্টদের একদা-কুলগুরু পিকাসোর একটি উক্তি ঃ "আমরা যারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছি তাদের মনে একটি অস্পষ্ট আকুতি রয়েছে কেমন করে (নানা প্রকার বিষয়ের মধ্য দিয়ে একটি) সমঞ্জস রূপে (অর্ডার) ও স্থাপত্য ভঙ্গীতে (আর্কিটেকটনিক) উত্তীর্ণ হতে পারি।"[৭] এই রূপ ও ভঙ্গী যদি নিতান্তই মূল্যহীন হতো তাহলে যেকোনো বিচ্ছিন্ন বিষয়ের জ্যামিতিক সমষ্টি শিল্প ব'লে পরিগণিত হতে পারে। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদীপ-আলোকে রূপ ও ভঙ্গীর তাৎপর্য স্পষ্ট। তাদের সমন্বয় সঙ্কেত অনুসারে বিভিন্ন বিষয় তাদের বিচ্ছিন্নতা হারায়, আর সেই সঙ্কেত অনুসরণ ক'রে শিল্পী এলোমেলো জ্যামিতিক জঙ্গলের মধ্যেও অন্বয় ও সামঞ্জস্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জগৎ ও জীবনের নানা রূপ (ফর্ম) আছে। বর্ণ গন্ধাদি,—যা সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—বাদ দিলেও জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করার এই যে পদ্ধতি তা মূলত বৌদ্ধিক,—বিচারমূলক। জ্যামিতিক ভাঙ্গচুরের মধ্যেও বুদ্ধির সাহায্যে চোখ অন্বয়, সামঞ্জস্য, অর্ডার ও হার্মনি, আবিষ্কার করতে পারে। এমনি করেই অচেনা আশ্চর্য শিল্পলোকের সঙ্গে অস্পষ্ট হলেও বস্তুজগতের একটি নির্ণেয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৮] ছিন্ন সংযোগ তবু যা থেকে যায় তা অংশত শিল্পীর মন ও সমাজবোধ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব, আর অংশত তা শিল্পীর ইচ্ছাকৃত রূপান্তরের সাধনা। কিউবিস্ট তো স্পষ্টত বলেই নিয়েছেন যে, তিনি জগতের নিখুঁত ছবির মতো শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহী নন ; তাঁর উদ্দেশ্য মনের অস্পষ্ট আকৃতিতে দৃশ্যরূপ দেওয়া। এবং এই রূপ দিতে গিয়ে গাঁগা বা

মাতিসের সমতল চিত্র অঙ্কনের দুর্বলতা দূর করার জন্য ভাঙা জ্যামিতির সাহায্যে গভীরতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। যে জটিল জ্যামিতি কিউবিস্টের প্রয়োজন গভীরতার বাস্তব ধর্ম সৃষ্টির জন্য সে জ্যামিতির ভাঙাচোরা রূপ যাতে রসিকের রস ভোগের অন্তরায় না হয় তার জন্য শিল্পী তার উপাদান বেছে নেয় চেনা বিষয় থেকে। পিকাসো ও ব্রাকের বহু চিত্রেরই বিষয়বস্তু মানুষ, নারী, ফল, বেহালা ইত্যাদি অতি চেনা-জানা বিষয়। অস্পষ্ট আকৃতি প্রকাশের অনুরোধে কিউবিস্ট শিল্পী জ্যামিতিকে ভাঙতে পারে, কিন্তু জগৎ ও জীবনের মৌল পরিচিতি থেকে খুব সীমিত অর্থেই পলায়ন করতে সমর্থ হয়। কোনো কোনো শিল্পসৃষ্টিতে অনুকৃতির ভূমিকা গৌণ হতে পারে, কিন্তু অনুপস্থিত হতে পারে না। এমন কি কিউবিজ্‌ম্‌-এও নয়।

রূপ ও রস ॥

বলা হয় শিল্পকর্মের বীজ নিহিত শিল্পীর সৃষ্টিশীল কল্পনায়। কল্পনার মধ্যে যতই সৃষ্টিশীলতা থাকুক না কেন তার পরিধি রূপ-নির্ণীত। কল্পনা যখন শিল্পকর্মের বীজ তখন তা মূলতঃ রসাবিষ্ট ও বিচার-মূলক নয়। তথাপি রসকে ঘিরে সৃষ্টিকর্ম সার্থক হয় না যদি তা উপযুক্তরূপে না সন্নিবিষ্ট হয়।[৯] রূপ ও রসে বিরোধ নেই বটে, পার্থক্য আছে। রূপ ও রসের যথার্থ সন্নিবেশ সম্ভব হয় না যদি অন্তর্লীন বুদ্ধি উভয়ের সম্পর্ক, উপযোগ্যতা বিচার না করে। রস রূপে অন্তর্নিহিত নয়; রূপে রস প্রকাশিত; রস ও রূপের পার্থক্য আছে ব'লেই জ্যামিতিক রেখা, বিন্দু, কোণ, গোল ও গোলার্ধের নানা সমন্বয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব, অনুভাব, বিভাব ও রসসৃষ্টি করতে পারে। শিল্পীর কল্পনা রসকে তার মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের দেশ থেকে দেশান্তরিত ও কাল থেকে কালান্তরিত করতে পারে। রূপকে রস থেকে বহুলাংশে বিশ্লিষ্ট (এ্যাবস্ট্রাক্ট) করা যায় এবং রসহীন কোন প্রসঙ্গে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। রূপ ও রসের সম্পর্ককে বুদ্ধি দিয়ে বহুলাংশে বিশ্লিষ্ট করা গেলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিউবিস্টদের প্রিয় জ্যামিতিক রূপের সাহায্যে কতগুলি রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত করা যায়, আর কতগুলি করা যায় না। এর মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন প্রকার রস প্রকাশে রূপের যে সামর্থ্য বা যোগ্যতা আছে তা সীমাহীন নয়। রূপের তুলনায় রসের ও রস-সঞ্চারক অনুভাবের বৈচিত্র্য অনেক বেশি; তবু তা অন্তহীন নয়। অন্য দিক থেকে বলা যায়ঃ একাধিক রসানুভবের অন্তর্লীন রূপ হয়ত এক। অনেক শব্দ কয়েকটি রূপে অন্বিত হলে একটি সুর হয়। কিংবা, সাতটি রঙ গোলার্দ্ধের রূপে দিনের আলোয় জলভরা আকাশে সন্নিবিষ্ট হলে একটি রামধনু হতে পারে। কয়েকটি রঙ অনেকগুলি বুরুশের

আঁচড়ে কোন ক্যানভাসে কয়েকটি বিশেষভাবে ("ভাব" এখানে "রূপ"-এর সমার্থক) একত্র হলে একটি চিত্র হতে পারে।

যে দিক থেকেই বলি না কেন শিল্পের বিশ্লেষণ করলে দেখান যায় যে রূপ ও রসের সংযোগ রসকে যেমন রূপের খাঁচায় বন্দী করে না, রসও তেমনি নিজস্ব, স্থির ও অন্তর্লীন রূপ ব'লে কোনো কিছুকে শিল্পী কল্পনার পটে অনিবার্যভাবে প্রক্ষেপ করে না। শিল্পী-কল্পনার এই স্বাধীনতায়ই খুঁজতে হবে অনুকৃতির সীমানা এবং বিকৃতি বা রূপান্তরের সসীম বৈচিত্র্য।

রস

প্রসঙ্গ অবতারণা ॥

আমরা যখন কোন সুন্দর ছবি বা সার্থক নাটক দেখি, কিংবা মধুর গান শুনি আমাদের মনে একটি সুখপ্রদ "ভাব" জাগে। সত্যিসত্যি ঐজাতীয় অভিভাবকে "ভাব" বলা ঠিক হবে, নাকি "অনুভব" বলা ঠিক হবে তা আরো বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তাছাড়া সুন্দর ছবি দেখলে বা মধুর গান শুনলে সবার মনেই সুখপ্রদ "ভাব" জাগে কি না, এবং জাগলেও সেই "ভাব" কে "সুখপ্রদ" বলা ঠিক হবে, নাকি "আনন্দপ্রদ" বলা ঠিক হবে এ-জাতীয় বহু বিচার-বিতর্ক অনিবার্য। কারণ, আমার মতে, রস, নন্দনতত্ত্বের রস, একটি সরল ধারণা নয়, এর নানা দিক, লক্ষণ ও বৈচিত্র্য আছে। সরল, নির্বিশেষ, এক ও অভিন্ন রস ব'লে যদি কোন কিছু থাকেও তাহলে তা অনির্বচনীয় এবং তার ধারণা নিয়ে বিচার-বিতর্ক চলে না। অথচ আমরা জানি নন্দনতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ, বিস্তার ও তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের মূল ধারণা হল নান্দনিক অভিজ্ঞতা। রস সেই নান্দনিক অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু। "নান্দনিক অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু" বললেও রসের ভূমিকা নির্দেশ করা হয় মাত্র, তার স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় না।

রস কি ?

রসের প্রকৃতি কি এবং একটি বাক্যে তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বহু নন্দনতাত্ত্বিক যত সমস্যা সৃষ্টি করেছেন সমস্যা সমাধানে ততটা আলোক সম্পাত করতে পারেন নি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর ভাষ্য ("অভিনব ভারতী") লিখতে গিয়ে অভিনবগুপ্ত দেখাচ্ছেন যে ভরত "রস" শব্দটি একবচনেই ব্যবহার করেছেন। "ন হি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।" রস মূলত একই, শুধু রসোদ্রেকের কারণভেদে, রূপভেদে তাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়।[১] "লোচন" গ্রন্থে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, রস এবং নাট্য মূলতঃ একই। "প্রীত্যাত্মা চ রস স্তদেব নাট্যম্।" মনের একটি অনির্বচনীয়বিশ্রান্তির নামই রস। ভট্ট নরসিংহ বলেন, কূটস্থ আত্মার স্বাদরূপে রস এক ও অভিন্ন। এ-জাতীয় কথা, রসের অদ্বৈত ও অভিন্ন প্রকৃতির কথা, আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন কবিকর্ণপুর ("অলংকার কৌস্তুভ")। রজ ও তমোগুণলেশহীন মনের একটি স্থায়ী সত্ত্বগুণে রসাস্বাদের অংকুর আনন্দরূপে সংস্থিত। আনন্দধর্মে রস এক, উপাধিভেদে তা বহু হয়।

সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, এদের দার্শনিক মতভেদের জন্য এদের

মূল কথা এক জাতীয় হলেও এক নয়। কারো মতে রস একটি গুণ, শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ। প্রশ্ন উঠতে পারে: শুদ্ধরূপে সত্ত্বগুণ মনে আদৌ থাকতে পারে কি না? কবিকর্ণপুর রস ও রসের স্থায়ীভাবের মধ্যে যে ভেদরেখা টানেন তা কি আসলে রসের দেহাশ্রয়ী প্রকৃতির পরোক্ষ স্বীকৃতি নয়? সেক্ষেত্রে তাকে মনের শুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপে চিহ্নিত করার যুক্তি কি? দার্শনিক মতের কৌলীন্য রক্ষার জন্য উল্লিখিত দার্শনিকদের অনেকেই নান্দনিক অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বাস্তব চরিত্রের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন তাঁদের স্ব স্ব দর্শনপ্রস্থান নিঃসৃত তাত্ত্বিক বক্তব্যকে। অভিনবগুপ্তের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে তার শৈব বৈদান্তিক মতের সঙ্গে নান্দনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় প্রদর্শন করা। সত্যিকার খাদ্যরসিক যখন কোন সু-পানীয় পান করে তখন রসনা বাধাবিঘ্নহীন রস আস্বাদে সংতৃপ্ত হ'য়ে অনুভব করে "আহা, এই পানীয় দ্রব্য ঠিক এই রকম।" খাদ্যরসিকের সঙ্গে লোভী খাদকের পার্থক্যের প্রতি অভিনবগুপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খাদ্যলোভীর পান বা ভোজন বাধাবিঘ্নহীন নয়, বৈষয়িক লাভ বা অন্য ভাব ও অযোগ্যতাবশত সে যা পান বা ভোজন করে তাতে তার রসনার পূর্ণ তৃপ্তি হয় না বা পরমানন্দ লাভ হয় না। উপমা বাদ দিলে অভিনবগুপ্তের বক্তব্যের দার্শনিক নির্যাস বোধহয় এইরকম। প্রকৃত রসাস্বাদে রসিক তার জ্ঞাতারূপী আত্মায় বিশ্রাম লাভ করে ("প্রমাতৃতাবিশ্রান্তি")। আত্মা যদি রসাস্বাদনের সময়ে আত্মসন্নিবিষ্ট বা আত্মমগ্ন না হয়ে বহির্বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তখন ঐ প্রমাতৃতা-বিশ্রান্তি হয় না। ফলত রসভোগে বিঘ্ন ঘটে। বিষয়ের তাড়না ও বিঘ্নমুক্ত আত্মা রসের আস্বাদে পরমানন্দ লাভ করে, চমৎকার অনুভব করে এবং সহৃদয়তার একঘনতায় (রসঘনতায়) উত্তীর্ণ হয়। আত্মার রসঘন অবস্থায় সংস্থিত হবার পথে বিঘ্ন শুধু বহির্জাগতিক বিষয় নয়, আরো অনেক কিছু। (১) রসোদ্রেককারী বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই। তার জন্য চাই নিজস্ব অভিজ্ঞতা অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্য বা অন্য কিছুর মাধ্যমে পরিচয়। (২) রসভোগের বিষয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বা সামীপ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ না হওয়া। কিছুটা দূরত্ব প্রয়োজন। কিছুটা নাট্যধর্ম প্রয়োজন। নতুবা চৈতন্য আত্মমগ্ন না হ'য়ে বিষয়লগ্ন হতে গিয়ে নান্দনিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুত হয়, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক, সামাজিক সত্যাসত্য বিনিশ্চয়ের অন্য পথে চলে যায়। পূর্বপ্রবন্ধে আমি এই নান্দনিক মানসিক দূরত্বের কথা ও গুরুত্ব আলোচনা করেছি। (৩) এই দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা নিজস্ব সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। রসাস্বাদনের জন্য নিজের অহংবোধ থেকেও কিঞ্চিৎ মুক্তি, কিছু দূরত্ব রক্ষা আবশ্যিক। পরিহার্য "নিজসুখাদিবিবশীভাব" এ

জন্যই, বিভিন্ন পশ্চাদ্‌পট, আবহসঙ্গীত এবং ক্যরিওগ্রাফির অনুষঙ্গ দরকার। এর ফলে দর্শক-শ্রোতা কিছু সময়ের জন্য হলেও তার নিজস্ব অহংবোধের প্রাবল্য থেকে মুক্তি লাভ করে। যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য শুধু বহির্জগতের বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও প্রবল প্রভাব থেকে নয় মনোজগতের অহংসর্বস্ব ভাব-অনুভব-আবেগ থেকেও মুক্তি আবশ্যিক। (৪) যথার্থ প্রত্যক্ষের যা অন্তরায় তা রসাস্বাদনের অন্তরায়। প্রত্যক্ষই পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষের বহির্দ্বার যদি অন্তরায়মুক্ত না হয় তাহলে রসাস্বাদনে অপূর্ণতা থেকে যায়। (৫) স্পষ্টতার অভাবও (স্ফুটত্বাভাবও) সময় বিশেষে রসাভাব ঘটায়। "সময়বিশেষে" বলছি এইজন্য যে শিল্পবস্তুর অর্থ ও তাৎপর্য যদি নিঃশেষে স্পষ্ট করার চেষ্টা হয় তাহলে যাকে আগে বলা হয়েছে নাট্যধর্ম বা দূরত্ব রক্ষার প্রয়োজন তার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। শুধু নাট্যধর্মিতা যেমন রসের অন্তরায় তেমনি স্পষ্টতার নামে শুধু বাস্তবধর্মিতাও রসের অন্তরায়। যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য মনকে (কেউ বলবেন আত্মাকে) বিষয় ও বিষয়ী দুদিক থেকেই অল্পাধিক দূরত্ব রক্ষা করতে হবে। (৬) একটি না একটি মূল মানসিক অবস্থা নাটকে যদি প্রাধান্য লাভ না করে তাহলে রসাস্বাদ সঠিক হয় না। মূল চারটি মানসিক অবস্থা হল রতি, ক্রোধ, উৎসাহ ও নির্বেদ। রতির স্থায়ীভাব হল শৃঙ্গার এবং লক্ষ্য কাম। ক্রোধের স্থায়ী ভাব রৌদ্র, লক্ষ্য অর্থ। উৎসাহের স্থায়ীভাব বীর, লক্ষ্য কাম, ধর্ম ও অর্থ। নির্বেদের স্থায়ীভাব শান্ত, লক্ষ্য মোক্ষ। মানসিক অবস্থাগুলিকে যে-ভাবে ভাগ করা হয়েছে, স্থায়ীভাব ও লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তা সর্বদা সঠিক নয়। অন্তর্লীন বাসনার চেতন রূপকে বলা হয়েছে স্থায়ীভাব। বাসনা সংসার-সম্ভূত এবং সংসার অনাদি। অভিনবগুপ্তের এই মনস্তাত্ত্বিক বিভাগ ও ব্যাখ্যা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না এবং এর অন্তর্নিহিত পরাতত্ত্বও নানা অসুবিধায় পূর্ণ। (৭) রসাস্বাদের সপ্তম অন্তরায় "সংশয়যোগ।" একই অনুভবের একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন, অশ্রু শোকেরও হতে পারে, আবার আনন্দেরও হতে পারে। সকল বাধাবিঘ্নমুক্ত রসচেতনার রূপ অলৌকিক এবং তা স্মৃতি ও অনুমান প্রভৃতি থেকে লব্ধ লৌকিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্ব স্বীকার করার অসুবিধা অনেক। প্রথমত, আগেই যে-কথা আমি উল্লেখ করেছি, মানসিক চৈতন্যের ইতিহাস ও ভূগোল তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণ করলেও এই মত প্রমাণ করা শক্ত যে আমাদের বহু বিচিত্র নান্দনিক অভিজ্ঞতার সকল উত্থান-পতন-বিলয়ের পশ্চাতে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থায়ীভাব আছে। দ্বিতীয়ত, এই মতও বিশ্বাস করা কঠিন যে বাধাবিঘ্নমুক্ত হলে সহানুভূতিপূর্ণ ("হৃদয়সংবাদ") বশত রসিকজন

সকল মানসিক ঘটনার মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করে আর তার জন্য রসের অভিজ্ঞতা নৈর্ব্যক্তিক ও সার্বজনীন হয়ে ওঠে। রস অভিজ্ঞতার এই পরম অবস্থাকে বলা হয়েছে তন্ময়ীভাবনা এবং এই অবস্থায় দেহ ও ইন্দ্রিয়বোধ অনুপস্থিত। দেহ ব্যতীত আত্মবোধ উপলব্ধি অসম্ভব। রস অভিজ্ঞতার পরম পর্যায়ে শিল্পবস্তুর সকল বৈশিষ্ট্য একটি নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণ চৈতন্যে বিলীন হয়ে যাবে—এ কথা মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী পরাতত্ত্ব কোন কিছু দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আমি এ কথা মানতে রাজী আছি যে, এমন কোন রসঘন নান্দনিক অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যে-স্তরে উত্তীর্ণ হলে বিষয়ভেদ অস্পষ্ট বা এমন-কি অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। এই জাতীয় অভিজ্ঞতা পরিশীলন ও যত্নসাপেক্ষ। এবং এর জন্য মনের ইচ্ছাশক্তি ও অমূর্তীকরণ ক্ষমতার ক্রমান্বয় ব্যবহার আবশ্যিক। নান্দনিক রসের নির্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী নয়, "স্থায়ীভাব" বা "অনাদি সংসার" প্রসূতও নয়। এই "তন্ময়ভাবনার" "তৎ"শিল্পবস্তু ও শিল্পবস্তুর সঙ্গে রসিকচিত্তের গভীর সহানুভূতিপূর্ণ বিশিষ্ট চেতনা ; এই "তৎ"কে আত্মা বললে বক্তব্য প্রমাণ করা শক্ত হবে। এই তন্ময়চেতনার জন্য অভিনবগুপ্ত যে-সব শর্ত আরোপ করেন (তন্ত্রালোক, ২য় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়), যেমন রসভাবনার বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকেও তাতে একাত্ম করা, তা শুধু অযৌক্তিক নয় অসম্ভবও বটে। দেহ-হীন রসচেতনা অসম্ভব। দেহোত্তীর্ণ রসচেতনা দেহী চেতনারই অমূর্ত উপমামাত্র।

রস, ভাব ও ধারণা ॥

রস ও ভাবের সম্পর্ক তলিয়ে দেখলে রস আস্বাদনে দেহের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়। একদিকে অনেকে রসকে এক এবং শিব রূপে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদিকে রসের সঙ্গে প্রত্যক্ষের, আবেগ ও অনুভবের ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষায় "ভাব" শব্দটি কখনো অনুভব, আবেগাদির সহগ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো-বা "ধারণা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যখন বলা হয় "এর সঙ্গে ওর ভাব-ভালবাসা আছে" কিংবা "আর আড়ি নয়, ভাব" তখন প্রথম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু যখন বলা হয় "অমুকে সৌন্দর্য ও রস সম্বন্ধে বহু কথাই বলল বটে, কিন্তু ভাব দুটি তেমন স্পষ্ট হল না" তখন শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। দ্ব্যর্থবোধের সম্ভাবনা এড়াবার জন্য আমি তাই প্রশ্ন তুলছি ঃ রস ও ধারণার সম্পর্ক কি? রস প্রসঙ্গে ধারণার গুরুত্ব এইজন্যই আমি দেখাতে চাইছি যে এমন কতগুলি ক্ষেত্র আছে, যদিও তাদের সংখ্যা সীমিত, যেখানে রস মূলতঃ ধারণা-বিজড়িত। রসের মূল সম্পর্ক যে ভাবের সঙ্গে সে বিষয়ে ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিকরা বারবারই বলেছেন। রসের শিব ও শান্ত রূপটির দিকে

মন দিলে আবেগ ও অনুভূতির প্রাবল্যবর্জিত রসের অমূর্ত (অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট) রূপটি স্পষ্ট হতে থাকে। সমন্বয় ও সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করলে, যেমন জ্যামিতিতে ও গণিতে, মন একটি বিশেষ ধরণের বৌদ্ধিক রস (ইন্টেলেকচুয়াল লাভ) অনুভব করে। এই রসকে অ-নান্দনিক ও নিছক বৌদ্ধিক ব'লে অস্বীকার করলে ভুল হবে। প্রথমত আমরা হামেশাই শুনে থাকি "উনি খুব বড় বিজ্ঞানী (বা গণিতজ্ঞ) এবং উনি ওঁর গবেষণাগারে (বা অঙ্ক কষায়) মগ্ন বা বুঁদ হয়ে থাকেন ; আসলে উনি ওর মধ্যে গভীর রস পান।" স্পিনোজা ও আইনস্টাইন দু'জনই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সামঞ্জস্য ও নিখুঁত নিয়মানুগ চরিত্রের কথা ভেবে'ও উপলব্ধি ক'রে আনন্দ অনুভব করেছেন। বৌদ্ধিক হলেও একে অন্তত স্পিনোজার ঈশ্বরানুভূতি বা ব্রহ্মানন্দ বলতে আপত্তি নেই। সুসমঞ্জস ও নিখুঁত নিয়মানুগ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে অনেকেই ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে মনে করেন। এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ ও রস প্রত্যক্ষ বা চিন্তা ক'রে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তাকে অনেকেই নান্দনিক ব'লে স্বীকার করে থাকেন। শিল্পীর সৃষ্টি ঈশ্বর-কৃত সৃষ্টির উপমা বা অনুকরণমাত্র। যদিও ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে রসকে প্রধানত শ্রোতা ও দর্শকের দিক থেকে বোঝবার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে শিল্পীর দিক থেকে রস কি ও শিল্প সৃষ্টিতে রসের ভূমিকা ও অবদান কী তা বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই। যে-রসবোধের অভাবে (নাটক বা চিত্রের) দর্শক ও (সঙ্গীতের বা কাব্যের) শ্রোতা শিল্পের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না সেই রসবোধের অধিকারী না হলে নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী বা কবি রসিকচিত্তে রসোদ্দীপনে সক্ষম হবে কী ভাবে, শিল্পের স্রষ্টা হবে কী করে? সার্থক রসিক ও সমালোচক এক অর্থে স্রষ্টা : ঐ অর্থেরই নিহিত তাৎপর্যে শিল্পী নিজে রসিক ও স্রষ্টা দুই-ই। রসিকের তুলনায় অতিরিক্ত যে গুণটি শিল্পীর থাকা চাই তা হল একটি ধারণা বা ভাবের ঐক্যে সৃষ্টির বিষয়টিকে—তা সে যতই জটিল হোক না কেন—প্রকাশের প্রাক্কালে তো বটেই প্রারম্ভে ও প্রকাশনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংহত ও সংবদ্ধ রাখতে পারা। এ-ক্ষেত্রে কল্পনা ও বুদ্ধি শিল্পীর মূল সামর্থ্য যোগায়।

অবেগ, অনুভব প্রভৃতির সঙ্গে ভাবের যে-দিকটি জড়িত রসের চরিত্র বোঝবার জন্য তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাদু পানীয় যেমন নানা উপাদানে তৈরি করা হয়, রসসূত্রে ভরত বলছেন, রসও তেমনি নানা উপাদানে তৈরী। উপাদানগুলি হল নানা প্রকার ভাব,—স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব। ভরত যদিও নাট্যপ্রসঙ্গে রসের কথা উল্লেখ করেছেন অভিনবগুপ্ত একে কাব্যক্ষেত্র এবং পরবর্তী আচার্যগণ শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। স্থায়ীভাব প্রচ্ছন্ন প্রবণতা রূপে

মানুষের মনে থাকে। একে সুপ্ত সংস্কারও বলা যায়। যোগ্য কারণে ও উপযুক্ত পরিবেশে স্থায়ীভাব প্রকট বা জাগ্রত হয়। ব্যভিচারীভাব ততক্ষণই স্থায়ী হয় যতক্ষণমাত্র যোগ্য কারণ ও উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখ ও মৃত্যুতে শোক অনুভব করা, প্রিয়বস্তুর ধ্বংসে ক্রুদ্ধ হওয়া, নারী দেখে পুরুষের মনে কামনা অনুভব করা ইত্যাদি স্থায়ীভাবের উদাহরণস্বরূপে অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন। ব্যভিচারীভাব স্থায়ীভাবের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যভিচারীভাব স্থায়ীভাবকে প্রস্ফুট করে। নানা রঙের ও রকমের স্বচ্ছ পাথর বা স্ফটিক যদি কয়েকটি সুতোয় গাঁথা হয়, তাহলে সুতোগুলিকে স্থায়ীভাব ও পাথরের টুকরোগুলিকে ব্যভিচারভাব কল্পনা করা যেতে পারে। উপমাটি অভিনবগুপ্তের। সুতোর রঙ যেমন পাথরে প্রতিফলিত হয় তেমনি নানারঙের পাথর সুতোগুলিকে রঙীন করে। ভরত আটটি স্থায়ীভাব এবং তেত্রিশটি ব্যভিচারীভাবের উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্তের মতে, এই শ্রেণীবিভাগ মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং আলঙ্কারিকদের খেয়ালখুশি নয়। ভরত আরো এক প্রকার ভাবের কথা বলেছেন, সাত্ত্বিকভাব। হেমচন্দ্র এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, সাত্ত্বিকভাব প্রধানত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ও মানসিক বিষয়। অনুভূতির সময়ে স্থূল বস্তুর—জল, আগুন, বায়ু প্রভৃতির—আধিক্যে সাত্ত্বিকভাবের রূপভেদ ঘটে যেমন, (যথাক্রমে) অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথু ও স্বরভঙ্গ। মম্মটপ্রমুখ অনেক আলঙ্কারিকই সাত্ত্বিকভাবগুলিকে অনুভাবেরই অন্তর্গত ব'লে মনে করেন এবং স্বতন্ত্র মনে করার সঙ্গত কারণ খুঁজে পান নি।

স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারীভাব হল রসোপলব্ধির অভ্যন্তরে দুটি উপাদান; বিভাব ও অনুভাব দুটি ব্যহিক উপাদান। ভরতের মতে, বিভাব, কারণ, নিমিত্ত ও হেতু শব্দগুলি সমার্থবাচক। বিভাব হল স্থায়ী অনুভূতি। প্রকাশ ও প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যে বিভাব রসানুভূতির বিষয় হয়ে ওঠে। প্রেমের কবিতা শুনলে বা প্রেমের চলচ্চিত্র বা নাটক দেখলে যে প্রেমের অনুভূতি জাগে তা বিভাব। লক্ষণীয়, বস্তুজগতের কোন কারণ থেকে সরাসরি বিভাবের উৎপত্তি হয় না। প্রকাশ ও প্রতিবেদনের সৌকুমার্য ও ব্যঞ্জনা থেকে বিভাবের উৎপত্তি; এবং অনেক সময়ে এ জন্য বিভাবকে অতীন্দ্রিয়ও মনে করা হয়। বিভাবকে, এই যে অতীন্দ্রিয় রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা তা কু-অর্থে পরাতাত্ত্বিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই অসঙ্গতি বিভাবের শ্রেণীকরণ ও ব্যাখ্যা থেকে দেখান যেতে পারে। বিভাব দু' শ্রেণীর : আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপনবিভাব। উদাহরণ দিতে গিয়ে আলঙ্কারিক বলছেন, "শকুন্তলা" নাটক দেখে' দর্শকচিত্তে যে কাম অনুভূতি জাগে তার আলম্বনবিভাব সুন্দরী শকুন্তলা। তার যৌবন শোভা ও মালিনী নদীতীরে তপোবনের শান্ত পরিমণ্ডল উদ্দীপনবিভাব। আলম্বন অনুভূতি জাগায় এবং উদ্দীপন তাকে রসঘন

বা সমৃদ্ধ করে। আধুনিক যুগের সার্থক চিত্রপরিচালকগণ শুধু সুদর্শন অভিনেতা ও সুন্দরী অভিনেত্রী রূপ আলম্বনবিভাবেরই সন্ধান করেন না উপযুক্ত স্টুডিও সেট ও আউটডোর শুটিং দিয়ে উপযুক্ত উদ্দীপন বিভাবও পরিবেশন করেন। অভিনেত্রী আলম্বনবিভাবের নানা সাত্ত্বিক অলঙ্কার বা স্বাভাবিক শ্রীর কথা বলা হয়েছেঃ যথা, ভাব, হাব, হেলা, শোভা, শান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য, ধৈর্য, লীলা, বিলাস, বিভ্রম, ললিত, প্রণয়ভাব, কৃত্রিম ক্রোধ, কৃত্রিম ঔদাসীন্য প্রভৃতি (মোট সংখ্যা কুড়ি)। আলঙ্কারিক ধনঞ্জয়ের মতে, প্রথম তিনটি দৈহিক, পরবর্তী সাতটি নিজস্ব স্বভাব-জাত এবং বাকীগুলি আলম্বনবিভাবের মনোভাব-সঞ্জাত। এই তৃতীয় মনোভাব-সঞ্জাত শ্রেণীতে বিশ্বনাথ আরো আটটি অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন, মদ, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি। সত্যি সত্যি এই অলঙ্কারগুলির পৃথক ও প্রতিপাদ্য মানসিক বাস্তবতা আছে কি না তা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। অলঙ্কারগুলির বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করার নিয়মও অস্পষ্ট। তবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অলঙ্কারশাস্ত্র ও নন্দনতত্ত্বে রসের যে-সব আলোচনা দেখা যায় তা বাঙ্গলা ভাষায় আলোচনা করার দুটি অসুবিধা স্পষ্ট। এক, আমাদের অনেকেরই ইংরাজী ভাষার সঙ্গে এবং কারো কারো ইংরাজী ভাষায় লিখিত মনোবিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত পুস্তকাদির সঙ্গে অল্পাধিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় আছে। দুই, সংস্কৃত ভাষায় নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় সে-সব শব্দ অনেক ক্ষেত্রে আর ব্যবহৃত হয় না; অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও তা হয় পরিবর্তিত অর্থে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন ধারণা প্রকাশের জন্য নতুন শব্দ প্রয়োগ ও ভাষা ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, নতুন নতুন শিল্পের আঙ্গিক আবিষ্কারের ফলে এবং মনোবিজ্ঞানের নতুন বিশ্লেষণ ও বিকাশের ফলে নতুন ধারণার উদ্ভাবন ও প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ-জাতীয় অসুবিধার কথা আমি ইতিপূর্বে "ভাব" প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। "অনুভাব" প্রসঙ্গেও এ-জাতীয় অসুবিধা লক্ষণীয়। অনুভাবের একটি অর্থ যা ভাবের পরে ঘটে ("অনু' উপসর্গ দিয়ে যা বোঝানো হচ্ছে) এবং যা ভাবের ইঙ্গিত বা সঙ্কেত। বাঙ্গলা ভাষায় "অনুভব" শব্দ যা বোঝায় তার সঙ্গে সংস্কৃত "অনুভাবে"র বেশ পার্থক্য আছে। "অনুভব" বিশেষ্য ও ক্রিয়া দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়; "অনুভাব" কেবলি বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে "অনুভাবনীয়" বা "অনুভাব্য" ব্যবহারে ব্যাকরণগত বাধা নেই। "ভাব" নিয়েও সমস্যা আছে। "ভাব" কি "emotion" নাকি "permanent mood"? প্রায়শই "ভাব" emotive disposition (ভাবোদ্দীপক প্রবণতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমার ধারণা।

এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবের মাধ্যমে রস উপভোগ সম্ভব হয়। বিভাবের আলোচনায় দেখা যায় তার আলম্বন ও উদ্দীপনা, অন্ততঃ আলম্বন, প্রয়োজন। নতুবা রস উপভোগে বিভাবের অবদান বাস্তবায়িত হয় না। অনুভাবও যে শারীরিক কতগুলি চিহ্ন বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাগ বা অনুরাগাদিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তার কারণ এদের মধ্যে নির্ণেয় সম্বন্ধ আছে। মূল কথা বিদেহী বিভাব নেই। বিদেহী অনুভাবও নেই। রসিক বা রসভোক্তা যদি দেহকে বাদ দিয়ে পরাতাত্ত্বিক আত্মায় বা আত্মস্বরূপে আশ্রয় নেন এবং রসের স্বাদ পান তবে সে স্বাদ অনির্বচনীয় এবং সেক্ষেত্রে নান্দনিক বলার বিশেষ তাৎপর্য নেই।

রস ও রসের অভিজ্ঞতা ॥

রস সম্পর্কে আমি যা বলতে চাইছি, রস অল্পাধিক দেহাশ্রিত, তা যদি সত্য হয় তাহলে আরো কতগুলি বহুপ্রচলিত মত গ্রহণ করা শক্ত। এক, সরাসরি রস অনুভব করা যায়; একের রসভাবে বা রসের অভিজ্ঞতায় অন্য এক/একাধিক (ধরেই নিলাম রসিক) ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অধিকার বা অংশগ্রহণ (কো-এমপেথি) সম্ভব। দুই, রসের সাধারণীকরণ (য়ুনিভারর্সালাইজেশন) সম্ভব। তিন, একের রস, অর্থাৎ রসিক তার রস, অন্য রসিকে সঞ্চার (কমিউনিকেশন) করতে পারেন। আমার মনে হয়, রসের ক্রুতি, বিস্তার ও বিকাশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এত বেশি দেহাশ্রয়ী যে প্রচলিত মতগুলি বিশ্লেষণে উত্তীর্ণ হয় না।

নাটকের শকুন্তলার প্রতি অভিনেতা দুষ্মন্তের প্রেম (নাকি, "প্রেমের অভিনয়" বলব ?) দেখে' দর্শক যে রস পায় তা কি দুষ্মন্তের প্রেমে তার সরাসরি অধিকার স্থাপন বা অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় ব'লে ? অভিনেতা দুষ্মন্ত ও অভিনেত্রী শকুন্তলা যে ঐতিহাসিক বা সত্যিকার দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা নয় তা বলা বাহুল্যমাত্র। দর্শক যাদের দেখছে তারা নাটকের চরিত্র মাত্র, যদিও বাস্তব রক্তমাংসের মানুষ; যা দেখছে তা অভিনয়। যদি সে অন্তত কিছু সময়ের জন্য ভুলে না যায় যে সে যাদের দেখছে তারা সত্যিকার শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত নয় এবং যা সে দেখছে তা অভিনয় নয় তাহলে তার পক্ষে (শকুন্তলার প্রতি) দুষ্মন্তের প্রেমরসে অবগাহন অসম্ভব। কিন্তু আমরা জানি, উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখতে দেখতে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেমরসের অভিজ্ঞতা আমাদেরি অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হল : কেমন করে তা সম্ভব হয়? দর্শক চোখে দেখে নায়কের অভিনয়; কেমন ক'রে সে অনুভব করবে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেম। চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে তা নায়ককে (মানুষকে) দেখা যায়, প্রেমের অভিনয় (হাব-ভাব) দেখা

যায়, এমন-কি প্রেমের কথাবার্তাও শোনা যায়, কিন্তু নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেমের অনুভূতি কেমন ক'রে প্রত্যক্ষ করা বা অন্যভাবে জানা যাবে? এ-জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা (যেমন, ভট্টলোল্লট ও জগন্নাথ) অবতারণা করেছেন। সাধারণত আমরা জানি, প্রত্যক্ষের বিষয় ও তার গুণ (সমূহ) একই সঙ্গে জানা যায়। কিন্তু, সমস্যা হল, গোলাপ ফুল ও তার (গুণ) লাল রঙ, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেমন একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় তেমন ক'রে নিশ্চয়ই নায়ক (দুষ্মন্ত) ও নায়িকার (শকুন্তলার) প্রতি তার প্রেম একই সঙ্গে একই ভাবে, লৌকিক প্রত্যক্ষে, জানা যায় না। এ-জাতীয় ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক দার্শনিকেরা অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। আমি যদি বলি "সুগন্ধ গোলাপ ফুল দেখছি" অথবা "ঠাণ্ডা বরফ দেখছি" তাহলে আমি নিম্নোক্ত দুটির একটি ব্যাখ্যা হয়ত দেবার চেষ্টা করছি। এক, ফুল বা বরফ যা প্রত্যক্ষের বিষয় তা চোখ দিয়ে দেখছি, আর স্মৃতি থেকে বরফ যে ঠাণ্ডা (যা একদা স্পর্শ থেকে বা অন্যভাবে ঠাণ্ডা ব'লে জেনেছিলাম) কিংবা গোলাপ ফুল যে সুগন্ধ (যা একদা ঘ্রাণ থেকে বা অন্যভাবে সুগন্ধ ব'লে জেনেছিলাম) তা প্রসঙ্গের আনুকুল্যে ও যোগ্যতায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষের বিষয়ের উপর আরোপ করছি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই আরোপণ স্মৃতিনির্ভর না হয়ে শ্রুতিনির্ভরও হতে পারে। দুই, কেউ কেউ একে অলৌকিক প্রত্যক্ষ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন এবং, তাঁদের মতে, এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষবশত। দ্বিতীয় মতানুসারে অনুপস্থিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ সম্ভব। বলা হয়, যোগীপুরুষেরা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কালের ব্যক্তি, বিষয় ইত্যাদিকে অলৌকিকভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাহলে কি আমরা মনে করব, নায়কের অভিনয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষই আমাদের রস অনুভূতির উপায়? অর্থাৎ, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, লৌকিকভাবে দেখছি (প্রত্যক্ষ করছি) দুষ্মন্তকে আর শকুন্তলার প্রতি তার প্রেম দেখছি (প্রত্যক্ষ করছি) অলৌকিকভাবে। প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে : চোখের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয় কিভাবে? প্রেম তো বর্ণহীন। তা তো দেখার উপযুক্ত বিষয় হতে পারে না। যা দেখবার তা শোনা যায় না। যা শোনবার তা দেখা যায় না। যা বোঝবার বা অনুমান করবার তা দেখা যায় না : অন্তত যখন যা বোঝবার বা অনুমেয় ঠিক তখনি তা তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সময়ের সীমায় ও শাসনে প্রত্যক্ষের বিষয়ের সঙ্গে বোঝবার বা অনুমান করবার বিষয়ের একটি পার্থক্য থেকে যায়। প্রেম আমরা বুঝি, দেখি না। নাটকের কাহিনী ও সংলাপের অর্থ থেকে আমরা প্রেম বুঝি। প্রেমের লক্ষণ থেকে প্রেমকে বুঝতে হয়। লক্ষণ যথার্থ ই বোঝবার বিষয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। কারণ, লক্ষণ সঙ্কেতধর্মী, অর্থপূর্ণ। সঙ্কেতের অর্থ প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

রসের অভিজ্ঞতায় বিচার-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ—দুয়েরই যুগ্ম ভূমিকা আছে। একাধিক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সম্পূরক সম্মিলন হলে রসোদ্রেক সমধিক হয়। গান মূলত কান দিয়েই শুনি, তবু যার গান শুনছি তাকে চোখে দেখতে পারলে যেন মনের তৃপ্তি বেশি হয়। রেডিও থেকে এইজন্য বোধহয় টেলিভিশন বেশি জনপ্রিয়। এবং এই একই কারণে কোন বক্তব্য প্রচার ও সঞ্চারের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র রেডিওর থেকে বেশি সার্থক। এর দৈহিক কারণও আছে। চোখ, নাক, গলা ও কানের মধ্যে নিঃসন্দেহে পার্থক্য আছে। আবার এদের মধ্যে আংশিক সম্পূরক চরিত্রও বর্তমান। সর্দিতে যদি নাক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঘ্রাণের অসুবিধায় খাবার স্বাদে তারতম্য ঘটে। বলবার ও শুনবার ক্ষমতা ও অক্ষমতার মধ্যে যোগাযোগ আছে। দৈহিক যোগ্যতা ও ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের আনুকূল্য ছাড়া রসের অভিজ্ঞতা পূর্ণতা লাভ করে না। অবশ্যই এসব বুদ্ধির ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বুদ্ধি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণধর্মী ও তার জন্য রস অভিজ্ঞতার উপাদান ও সম্পূরক কারণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ফলত রসের অভিজ্ঞতা বাস্তবায়িতই হয় না এমন কথা বিশ্বাস করবার উপযুক্ত যুক্তি নেই। বরং, একাধিক উদাহরণ (বিশেষত গেস্টাল্ট সাইকোলজি) দিয়ে দেখানো যায়, বুদ্ধির সংশ্লেষণ বা সংবদ্ধ করবার ক্ষমতাও প্রচুর। বোধহয়, দ্বিতীয় ক্ষমতাই আদিম ও মৌলিক এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা তার থেকে উদ্ভূত। স্থানান্তরে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

এই সংশ্লেষণী ক্ষমতাবশত একের সংবেদনশীল মন অপরের অভিজ্ঞতা বুঝতে পারে। এই বোঝা নিছক বৌদ্ধিক নয়। এর সঙ্গে অনুভূতি, সুখ-দুঃখের মৃদুতা-তীব্রতা ও আনুষঙ্গিক গুণগুলি জড়িত। কিন্তু তার থেকে এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, একের অনুভূতি/অভিজ্ঞতা অপরের অনুভূতি/অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুগভীর সংবেদনশীলতাবশত আক্ষরিক অর্থে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। একাধিক ব্যক্তির, এমনকি রসিক সমাজের, সহানুভূতির তাদাত্ম্যতত্ত্ব তাৎপর্যপূর্ণ রূপক মাত্র ;—তার অধিক কিছু নয়। এর তাৎপর্য যেটুকু আমি বুঝি তা হল এই : একই সমাজে, রস প্রকাশের মোটামুটি একই জাতীয় ধারায় যারা অবগাহিত ও পরিশীলিত তারা কালক্রমে অনুকূল ও উপযুক্ত পরিবেশে একই রকম (কিন্তু ঠিক এক নয়) অনুভূতি বা অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ, উপনীত হয়। এবং এই রস অনুভূতির/অভিজ্ঞতার জন্য কোন অলৌকিক চিত্তবৃত্তির বা প্রত্যক্ষ ক্ষমতার কল্পনা অনাবশ্যক।

যা আবশ্যিক তা এক কথায় বলা শক্ত। রসের অভিজ্ঞতার জন্য প্রথম যা প্রয়োজন, রসিক মন, অল্পবিস্তর তা সবারই আছে। রসের পরিশীলনে নিশ্চয়ই এই

সার্বজনীন ক্ষমতার উদ্বোধন সহজ হয়, জাগরণ স্থায়ী হয় এবং বিচার নির্দিষ্ট সমাজে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। দ্বিতীয়ত, পরিশীলিত রস নিছক অভিজ্ঞতানির্ভর নয়; অনেকাংশে স্মৃতিনির্ভরও বটে। অভিজ্ঞতার অভাবে এবং এমন-কি কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার উপস্থিতিতেও রসের উদ্বোধন ও জাগরণে রসিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য ও সামীপ্য থেকে মনকে একটু দূরে, মানসিক দূরত্ব, একটু মুক্ত রাখার চেষ্টা করে। এবং মনের সেই মুক্তাঙ্গনে খেলা করার সুযোগ পায় স্মৃতি। বলাবাহুল্য এই স্মৃতি নিছক পূর্ব অভিজ্ঞতার অবিকল পুনর্জাগরণ বা পুনরুত্থাপন (রিপ্রোডাকশন) নয়, অতীত অভিজ্ঞতার অবিকৃত পুনরানয়ন নয়। মুক্তির দোর খুলে' ইচ্ছার ডাকে সাড়া দিয়ে যে স্মৃতি আসে তা একপ্রকার কল্পনা, সৃষ্টির অঙ্কুরগর্ভ স্মৃতি, এবং এতে অতীত রূপান্তরিত ও সংস্কৃত। তৃতীয়ত, রসের অভিজ্ঞতা কিছু সঞ্চারণ ক্ষমতা সাপেক্ষ। যে-ক্ষমতাবলে স্রষ্টা রসিক রস অনুভব করতে সমর্থ হয় সেই ক্ষমতাবলই অন্যের মনে রস সঞ্চার করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কাব্যপ্রতিভা থাকলে কবি কাব্যরস নিজে অনুভব এবং প্রকাশ করতেও পারেন; কিন্তু অন্যের মনে সঞ্চার করা সহজ ও স্বাভাবিক না-ও হতে পারে। তার জন্য যার কাছে সে রস পরিবেশন বা নিবেদন করা হয় তারও রসবোধ থাকা দরকার। তা না হলে যা ঘটে তার লৌকিক স্বীকৃতির একটি অতি-শোনা প্রকাশ হল: "রসটি মাঠে মারা গেল।" অর্থাৎ, রসের প্রকাশ কেউ (বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি) বুঝল না, সমাদৃত হল না। একই ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে ভাষার "নীরস বাচ্যার্থ" সঞ্চার করা, বোঝা ও বোঝানো, অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ, কিন্তু "সরস ব্যঙ্গার্থ" সঞ্চার তত সহজ নয়। অনুরাগের প্রথম পর্বে প্রেমিক যদি প্রেমিকাকে বলে বসে "আমি তোমার সঙ্গসুখ কামনা করি" তাহলে প্রেমিকা এক ভাষাভাষী হলে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেও বাচ্যার্থ ঠিকই বুঝবে, কিন্তু বোধহয় প্রেমিকের রসবোধের তারিফ করবে না। কারণ, আদপেই কথাটি রসের নয়। প্রেমিক যদি প্রেমিকাকে বলত, "তুমি হাসলে পরে দু'গালে যে দুটি টোল পরে আমার তা বারবার দেখতে ইচ্ছে করে" কিংবা "এই শনিবার সন্ধ্যায় যদি তোমার জন্য 'নিউ এম্পায়ারে' 'রবিতীর্থে'র 'শাপমোচন'-এর টিকিট কাটি তোমার বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করবেন ?" তাহলে প্রেমিকাটি (যদি তার রসবোধ থাকে) ব্যঙ্গার্থ বুঝতে ভুল করবে না। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই প্রশ্ন ওঠে "কোনও সমাজে হাসলে পরে গালে-টোল-পরা কি অসৌন্দর্যের চিহ্ন হতে পারে না ?" "রবিতীর্থ" "শাপমোচন" "নিউ এম্পায়ার" শব্দগুলির অর্থ কি এবং, তাছাড়া, প্রেমিক ও প্রেমিকার একসঙ্গে কোন প্রমোদানুষ্ঠানে যেতে হলে আদৌ কেন অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন ইত্যাদি ভাষাগত ও সামাজিক প্রশ্নের পরোক্ষ অবতারণা রসসঞ্চারের

আরেকটি দিকের, চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের, ইঙ্গিতবাহী। সম সমাজায়ত চেতনা ব্যতীত, পরস্পরের বোধগম্য ভাষার সূক্ষ্ম আনুকূল্য ব্যতীত, রস সঞ্চার সহজ নয়। আমি একথা বলছি না যে, যা সহজ নয় তা আদৌ সম্ভব নয়। বস্তুত সমাজের বিস্তার ও রস সঞ্চারের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। রস সঞ্চারের শর্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এটিই আমার শেষ মন্তব্য। যে-রস বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য তার সামাজিক বিস্তারও বেশি। ঐতিহাসিক সংবাদের বিবিধ বিবরণ হয়ত সে-রসকে আরো নিবিড়ভাবে সঞ্চারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তা-ও নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট শ্রোতা বা দ্রষ্টার সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক বিবিধ বিবরণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে কি না তার উপর। এক দেশ-কালের সাহিত্য অন্য দেশ-কালের ভাষায় অনুবাদ করলে দেশান্তরের ও কালান্তরের রসিক পাঠক/শ্রোতা/দ্রষ্টা তার রস সম্পূর্ণ উপভোগ করতে না পারলেও প্রভূতভাবে যে পারে তার কারণ যে-ভাবকে রসের আশ্রয়ে প্রকাশ করা হয়, রূপ দেয়া হয়, তার অর্থ, নিছক অভিধা নয়, অন্য ভাষায়, ভিন্ন দেশ-কালেও, প্রকাশ করা যায়। রস যে রূপাশ্রিত, ধারণা যে রসের প্রচ্ছন্ন অধিকরণ তা রসের অনুধ্যানে ক্রমশ স্পষ্ট হয় এবং রসের বিচার-বিতর্কে তা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। রস প্রকাশিত হলেই সঞ্চারিত হয় না। এ দুয়ের ব্যবধান ঘোচায় একদিকে রসিক মন এবং অন্যদিকে অনুকূল পরিমণ্ডল। অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি সেই পরিমণ্ডলের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ। রসহানির কিংবা রসসৃষ্টিতে সার্থকতার প্রসঙ্গে যখন সংশ্লিষ্ট মানুষের মানসিকতা, রসবোধ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয় তখন, এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, রসের সামাজিক আধার অস্বীকৃত হল কিংবা মানসিক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হল। মনের নিজস্ব আছে, সামাজিকত্বও আছে। রসবোধের অভাব বহুক্ষেত্রে পরিমণ্ডলের অভিশাপ।

রসের অভিজ্ঞতায় সুখ-দুঃখ ও আনন্দ ॥

রসের অভিজ্ঞতা সুখময় হতে পারে, দুঃখময় হতে পারে, আবার আনন্দময়ও হতে পারে। হাস্যরসের অভিজ্ঞতা সুখময়। করুণ রসের অভিজ্ঞতা দুঃখময়। আনন্দ বোধহয় শান্তরসের অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতমভাবে জড়িত। "বোধহয়" বলছি এজন্য যে শান্তরসের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বে বহু বিতর্ক হয়েছে, নানা বিরোধী মতামত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য মূল কথায় যাবার আগে "রসের অভিজ্ঞতা" পদটিকে কেন্দ্র ক'রে যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে তা পরিষ্কার করা দরকার। এক, রসকে দু'ভাবেই

ভাবা যেতে পারে, একপ্রকার অভিজ্ঞতা—অনুভূতি হিসেবে এবং ধারণা হিসেবে। যা অভিজ্ঞেয় তার অল্পাধিক স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব ; কিন্তু সকল ধারণাকে অভিজ্ঞতার রস-গন্ধ-স্পর্শাদির মধ্যে আনা সহজ নয়। "সহজ নয়" কথার অর্থ "সম্ভব নয়" বলছি না। যদি এমন কোন ধারণা থেকে থাকে যার কোন উদাহরণ নেই, উপমা নেই, বা এমন-কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমাপ্রতিম কোন লক্ষণাদিও নেই, তবে তার পরিচয় দেওয়া, পরিচয় ভুল হলে বোঝা ও বোঝানো অসম্ভব। যে অভিজ্ঞতার কোন-না-কোনভাবে উদাহরণ বা উপমা দেওয়া যায়, অন্যের মনে যাকে সঞ্চার করা যায় তার সম্পর্কেই সার্থক আলোচনা, মত বিনিময়, সম্ভব। দুই, রসকে রস হিসেবেই সুখময়, দুঃখময় ইত্যাদি বলা যায়। এবং, অনেক ক্ষেত্রে, বলা হয়ও। তলিয়ে দেখলে বা অনুধ্যানে দেখা যাবে এ-সব কথা দ্ব্যর্থবোধক। (ক) এক হতে পারে "সুখময় রস" বলতে রসের চরিত্র বর্ণনা অথবা রসের গুণ নির্ণয় করা হচ্ছে। (খ) কিংবা হতে পারে বিষয়টি সুখের ও তার শিল্পসুন্দর পরিবেশনে যে অভিজ্ঞতা জাগ্রত হল তাকে সুখময় বলা হল। যে কোন অভিজ্ঞতার শ্রেণী নির্ণয়ে উদ্দিষ্ট বা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে নির্ণায়ক বা ক্রাইটেরিঅন হিসেবে ব্যবহার করা যায় ; অথবা দাবি করা যায়, অন্তর্নিহিত চরিত্রের জন্য কোন রসের অভিজ্ঞতা সুখময়, কোন রসের অভিজ্ঞতা দুঃখময়। দ্বিতীয় বিকল্প বলায় প্রধান অসুবিধা ঃ বিভিন্ন রসের অভিজ্ঞতাকে শুধু স্বতন্ত্র নয় সার্বভৌম ব'লে পরোক্ষে স্বীকার করতে হয়। এবং সেক্ষেত্রে সার্বভৌম বিভিন্ন রস-অভিজ্ঞতাগুলিকে কেন এক জাতিভুক্ত ব'লে কল্পনা করা হবে ? সব রসই যদি জাতি-বিচারে এক হয় তবে সে অনন্য জাতির লক্ষণ অনির্বচনীয়, এবং লক্ষণনির্ণয় অসম্ভব। আর যখন তা বচনীয় ও সম্ভব হয়ে ওঠে তখন তার সংশ্লিষ্ট—উদ্দিষ্ট বিষয়রূপটি প্রচ্ছন্ন থাকলেও নির্ণেয়। শেষে স্বীকার করা ভালো নন্দনতত্ত্বে যে রস-অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছি তা কখনোই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সুখ বা দুঃখের স্পর্শোত্তীর্ণ হতে পারে না।

আনন্দের কথা বোধহয় একটু স্বতন্ত্র। একটু স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। অভিজ্ঞতায় দেহ-ভূমিকার স্তরভেদে ও তীব্রতাভেদে সুখ-দুঃখের থেকে আনন্দ-নিরানন্দ কম বেশি ভিন্ন। সুখের মতো আনন্দও দেহলগ্ন। আনন্দে চোখে জল আসে, দেহে রোমাঞ্চ জাগে। সুখের তুলনায় আনন্দ কম বিষয়মুখী। সুখে যত উদ্দীপনা আছে ততো সন্তোষবোধ নেই। আনন্দে যত তৃপ্তি আছে তত তাপ নেই। সুখের বিস্তার কম ; স্থায়িত্বও কম। সুখের বিষয় বিষয় হিসেবে সুখের অভিজ্ঞতার থেকে বেশি বিস্তৃত ও স্থায়ী হলেও সুখ তাতে সতত সংলগ্ন থাকতে পারে না। সুখে যত তরঙ্গ আছে তত গভীরতা নেই। আনন্দে স্বমুখিতা, স্বাধীনতা ও গভীরতা বেশি। সুখে দহন আছে, ক্ষয় আছে ; আনন্দে শান্তি।

অভিনব গুপ্ত বারবার তাঁর রচনায় রসের অভিজ্ঞতা আলোচনা প্রসঙ্গে দৈহিক সুখ-দুঃখ ও আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর "তন্ত্রালোক" গ্রন্থে যোগাবশিষ্ঠমহারামায়নের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। বশিষ্ঠ এক জায়গায় রামকে বলছেন, "যে সাংসারিক সমুদ্র পার হয়ে গেছে সে (যা খুশি) পান, জীবনধারণ, যৌনভোগ করতে পারে।" কারণ, সে বস্তুত জীবনমুক্ত। জীবনমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উদ্দাম ইন্দ্রিয় পরায়ণ হওয়া আর সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে গিরিগুহায় বাস করা একই,—একই প্রকার আনন্দদায়ক। আনন্দে যে বিশ্রান্তি পেয়েছে তার শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি আনন্দের শান্তিতে লীন হয়ে যায়। অভিনব গুপ্তের মতে, সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগই আত্মানন্দের, শিবানন্দের, অভিব্যক্তি। এমন-কি নিষিদ্ধ ত্রি-মকারের মধ্যেও শিবরস। ত্রি-মকারের (মদ্য, মাংস ও মৈথুন) সম্মিলন পরমানন্দস্বরূপ। এই পরমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এক ও অভিন্ন।

নান্দনিক অভিজ্ঞতায় দেহের ভূমিকা অল্পাধিক সকল নন্দনতাত্ত্বিকই স্বীকার করেন। বিতর্ক দেখা দেয় এই ভূমিকার গুরুত্ব ও লক্ষ্য নিয়ে। আনন্দের গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে অনেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির গুরুত্ব শুধু কমিয়ে দেখান তা নয় রসের অভিজ্ঞতায় এঁরা অনুকূল অনুষঙ্গও নয় বরং নিছক অন্তরায়—এমন একটি মত প্রকাশের চেষ্টা করেন। অথচ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ভূমিকা যদি শরীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উদ্ভাবনী ও নতুন দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিদেহ নান্দনিক রসাস্বাদ অলীক কল্পনামাত্র। দেহ সাধারণভাবে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বিশেষ শিল্পবস্তুর সানন্দ অভিজ্ঞতা শুধু সম্ভবপর করে না তাদের আনুকূল্যে স্মৃতিতে তাদের সজীব সংরক্ষণ ও কল্পনায় বিকাশ সম্ভবপর করে। বস্তুত যে সামাজিক জগতে আমরা বাস করি, যে রসিকসমাজকে পরোক্ষে উদ্দেশ্য ক'রে আমরা শিল্পবস্তু রচনা বা সৃষ্টি করি সেই সমাজের আত্মপরিচয় আমি, আমার দেহ, সাপেক্ষ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমি বিশ্বজগতের কেন্দ্র। এ কথার অর্থ এ-ও নয় যে, আমি ও আমার দেহ আমার সমাজের কেন্দ্র। রসের অভিজ্ঞতায় দেহের ভূমিকা বুঝতে হলে জগতের ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা কী তা বোঝা দরকার। বোঝা দরকার "দেশে ও কালে," "অন্তরে-বাহিরে", "দূরে-কাছে"—এ-সব মৌলিক ধারণার তাৎপর্য। কারণ এই ধারণাসমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সহায়তায় আমরা আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর, আমাদের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করি। এমন-কি আমাদের নিজেদের মানসিক জগতেও যে-সব ভাবনা, কামনা ও কর্মপ্রকল্প আছে তাদের পারস্পরিক এবং তাদের সঙ্গে দেহের, দেহ মাধ্যমে জগতের ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয় করতেও এই ধারণাগুলি কীভাবে এবং কতো বিভিন্নভাবে দেহাশ্রিত তা বোঝা দরকার। এ-কালে ফ্রয়েডই প্রথম স্পষ্ট করে বোঝালেন, সুখ-দুঃখ,

তৃপ্তি-অতৃপ্তি শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে, এমন-কি জ্ঞেয় না জাগ্রত চেতনা দিয়েও, সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না। তারজন্য অবচেতনার ভূমিকাও বোঝা দরকার। সৌভাগ্যবশত, ফ্রয়েডীয় অবচেতনা ও তার ভূমিকা (অন্তত অংশত) বাস্তবিক নিরীক্ষাযোগ্য এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর জাতীয় পরাতাত্ত্বিক ধারণামুক্ত। আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখাতে পেরেছে, ইন্দ্রিয় সুখ সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়-নির্ভরও নয়। উদাহরণস্বরূপ সামর্থ্য/অসামর্থ্য অনেকক্ষেত্রেই আঙ্গিক নয়,—আত্মবিশ্বাস, ভয়, সংকোচ, পূর্বস্মৃতি, নৈতিক ধারণা, অর্থাৎ কতগুলি মানসিক ও সামাজিক কারণসমষ্টিজনিত। আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমাদের দেহ-মন, শুধু দেহ নয় মনও, এই কারণসমষ্টির অন্তর্গত। ফলত, "বহির্জগতের" সঙ্গে সম্পর্কে আমরাই শুধু বিষয়ী আর অন্য সকল বস্তু ও ব্যক্তি বিষয়মাত্র,—এ কথা ভাবা ভুল হবে। দেকার্তে বা সাংখ্য দার্শনিকদের মতো এ কথাও ভাবা ভুল হবে যে, বিষয়জগতে আমাদের আত্মা অন্তর্ভুক্ত নয়, "আমাদের দেহ" বিষয় হিসেবে ঐ জগতের অংশ। এক অর্থে, আমরা—আমাদের দেহ-মন—বহির্জগতের অন্তর্ভুক্ত এবং বিষয়-জগতের অংশ ; আরেক অর্থে, আমাদের দেহ-মন, শুধু মন নয় দেহও, বিষয়ীস্বরূপ। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। একই বাস্তব সমগ্রের এই দুটি পরস্পর সম্পূরক দিক। কিন্তু সম্পূরণের রূপ, অংশ ও ইতিহাস পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতার কারণ মূলত দেহের দৈশিক ও কালিক সংস্থান। তাছাড়া প্রত্যক্ষের, গভীরতা-অগভীরতা, পৌনঃপৌণিকতা বা দুর্লভতা, একান্ত মনঃসংযোগ বা ঔদাসীন্য প্রভৃতিও চেতনায় বিষয়রূপ/বিষয়ীরূপের প্রতিপত্তি বিস্তারে ও প্রাধান্য সংরক্ষণে সাহায্য করে। যখন অভিনবগুপ্ত সুখ-দুঃখোত্তীর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্রান্তির কথা বলেন তখন প্রত্যক্ষলভ্য বিষয় জগতের প্রতি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহ-ইন্দ্রিয়াদির প্রতি, মনঃসংযোগহীন, উদাসীন, এবং ফলত গুরুত্বধর্মহীন একটি লৌকিক মানসিক অবস্থাকে অলৌকিক সত্তাশ্রিত অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। বিষয় সম্বন্ধবর্জিত, শুদ্ধ বিষয়ীস্বরূপে, আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মস্বাদ একটি জল্পনা (স্পেকুলেশন) মাত্র। এই কল্পনার ভিত্তি, শক্তি ও উৎক্রান্তি ক্ষমতা সবই বিষয়-প্রত্যক্ষ থেকে আহৃত। অমনোযোগে, ঔদাসীন্যে, সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষহীনতায়, বিস্মরণের ফলে বিষয় যখন অস্পষ্ট হয়ে আসে, বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (প্রবল ইচ্ছার/অনিচ্ছার ক্রমাগত চাপে) নিঃশেষে মন থেকে "মুছে যায়" তখন আমরা ভুল করে ভাবি এটাই বুঝি বিষয়হীন চেতনা। নিঃশেষে "মন থেকে" কিছুই মুছে যায় না। শরীরের একটি অঙ্গ অস্ত্রোপচার ক'রে বাদ দিলেও শরীর বিজ্ঞানীরা জানেন পরে সেই অঙ্গেরই ব্যথা (মনে ?) অনুভব/প্রত্যক্ষ করা যায়। দেহ ও মনের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টানা যায় না। দেহ ও মন একইসঙ্গে বিষয় ও বিষয়ী। অভিজ্ঞতার

অভাবে বিষয় যেমন স্মৃতিকল্পে পর্যবসিত হতে পারে তেমনি আবার অভিজ্ঞতার আনুকুল্যে অমূর্ত ভাব স্মৃতিকল্পে এবং স্মৃতিকল্প প্রত্যক্ষীভূত বিষয় হতে পারে। ব্যর্থ বা ক্ষুব্ধ প্রেমিকা যখন বলে "না, সে নেই, আমার কাছে সে মরে গেছে" বা লেডী ম্যাকবেথ যখন শূন্যে রক্তাক্ত ছোরা দেখে আঁৎকে ওঠে তখন যা ঘটে তা নিছক কল্পনা বা কাব্য ব'লে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। প্রথম ক্ষেত্রে বিষয় থেকেও নেই—ব্যক্তিহিসেবে জীবিত থাকলেও তার কাছে বিষয় হিসেবে "মৃত।" দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তু নেই, কিন্তু কল্পনার প্রাবল্যে স্মৃতিকল্প বিষয়ের রূপ নিয়েছে।

আমার যুক্তি, রসের অভিজ্ঞতায় দেহের ভূমিকা সম্পর্কে আমার বক্তব্য, যদি সঠিক হয়, তাহলে এই প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যা বলতে চেয়েছিলাম তা স্বীকার্য। এক, সরাসরি রসের অভিজ্ঞতা হয় না। রসের অভিজ্ঞতা প্রায়-নির্বিশেষ হলেও কখনো সত্যি-সত্যি নির্বিশেষ হয় না। দেশ-কালে নিহিত মানবদেহ, দেহাশ্রিত সুখ-দুঃখবোধ, রসের অভিজ্ঞতাকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বিষয়াশ্রয়ী ও বিশিষ্ট করে রাখে। যে অভিজ্ঞতা নিজের সত্তার, চৈতন্যের, মুখোমুখি হতে গিয়েও নিরাভরণ বা বাধাবন্ধহীন সাক্ষাৎ পায় না সে অভিজ্ঞতা অন্যের সত্তার বা চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পেতে পারে,—এ কথা ভাবা ভুল হবে। "সাক্ষাৎ" এক্ষেত্রে সম্মিলন বা তাদাত্ম্য (তৎ+আত্ম+বোধ) অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে sympathy (sym=সহ এবং pathos=অনুভূতি) বা সহানুভূতি, অন্যের অনুভূতিতে আমার বাধাবন্ধহীন অধিকার বা অংশগ্রহণ এবং, বিপরীত-ক্রমে, আমার অনুভূতিতে অন্যের অনুরূপ অধিকার বা অংশগ্রহণ কি তাহলে সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় "হাঁ" বা "না" ব'লে দেয়া অনুচিত। সহানুভূতি এক অর্থে, প্রচলিত অর্থে, নিশ্চয়ই সম্ভব। একের সুখে বা দুঃখে অন্যের সুখ বা দুঃখ পাওয়ার ঘটনা কিছু দুর্লভ নয়। নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর পরে শোকাতুর এক পরিজনের কান্না দেখে অন্যান্য পরিজনের কান্না পাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা অনেকেই দেখেছি। সহানুভূতির এই অর্থ সহজেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যখন বলা হয়, "এমনটিও হওয়া সম্ভব যে অলৌকিক ক্ষমতা বলে বা বহু পরিশীলিত রসবোধ দ্বারা একে অপরের অভিজ্ঞতায় অভিন্ন অংশীদার হতে পারে" তখন সত্যিকার সমস্যা দেখা দেয় এবং এ সমস্যার সমাধান আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। সহানুভূতি আক্ষরিক অর্থে সম্ভব নয়। তাদাত্ম্য সহানুভূতি রূপকমাত্র। তবে এ রূপক গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী এবং একে অস্বীকার করলে সূক্ষ্ম-সুন্দর জাতীয় সঞ্চারের ব্যাখ্যা দেয়া অসম্ভব। মানুষের দৈহিক ও সামাজিক সত্তা আক্ষরিক সহানুভূতি সম্ভব হওয়ার গভীর অন্তরায়। দুই : ঐ একই কারণে রস-অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণ (য়ুনিভার্সালাইজেশন) সম্ভব নয়। রসবোধের ক্ষমতা সবার সমান বা এক নয়,এক হতেও

পারে না। দেশ-কাল শুধু আমাদের দেহকে নয় মনকেও এমন একটি বিশিষ্টভাবে আপন্ন করে যে সুগভীর যোগধ্যানেও তার থেকে মুক্তি নেই। এক সমাজের বা যুগের বীররস অন্য সমাজে বা যুগে হাস্যরসও হয়ে যেতে পারে। এক দেশের গ্রাম্য বা অসভ্য শৃঙ্গার রস দেশান্তরে পরিশীলিত ও শোভন ব'লে বিবেচিত হয়েছে। এক যুগে বা সমাজে যে ছবি অশ্লীল উলঙ্গ ব'লে সমালোচিত হয়েছে অন্য যুগে বা সমাজে, অনেক ক্ষেত্রে একই সমাজে যুগ পরিবর্তনের ফলে, তা সুন্দর নগ্ন ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিন বা শেষ কথাটি আমি আগেই বলেছি। সঞ্চার সার্থকতার কোন দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা নেই। আজ শিল্পী যা মানসিক বৈকল্যবশত সঞ্চার করতে অক্ষম কাল হয়ত অনুকূল পরিবেশে এবং রসিক সমাজের কাছে তা সঞ্চার করতে সক্ষম হবেন। সঞ্চার প্রসঙ্গে তাই আমরা প্রায়ই এ-জাতীয় কথা শুনি, "অসময়ে গান গাইতে বল্‌লে কী আর গান হয়", "শিল্পীর আজ মেজাজই ছিল না", "দর্শকমণ্ডলী যদি এমন হয় তা হলে ভালো নাটকও মন্দ হয়ে যায়।" সঞ্চার শুধু প্রকাশসাপেক্ষ নয় গ্রহণসাপেক্ষও বটে। প্রকাশ ও গ্রহণ দুই-ই আবার পরিবেশসাপেক্ষ। পরিবেশ বলতে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মানুষদের রসবোধ, রুচি, মনোভাব, দৃষ্টি, উদ্দেশ্য প্রভৃতিও মনে রাখতে হবে। এক কথায় রস সঞ্চারের স্থায়ী, স্থির, সর্ব দেশ-কালে প্রযোজ্য কৌশল বা বিদ্যা জানা নেই।

নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঞ্চার যখন সার্থক হয় তখন শুধু মন নয় দেহও তাতে সাড়া দেয়। রসিক সুখী হয়। সুরসিক আনন্দিত হয়। সন্তোষবোধ দেহ-মনকে সংপ্লাবিত করে। শিল্পরস অভিজ্ঞতায় নিহিত সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ফলে স্নায়ুর শুধু ক্লান্তি নয় ব্যাধিও কমবেশী দূর হয়। যে-সব দর্শকেরা ভীড় ঠেলে' সাধ্যের তুলনায় অধিকতর সাধে টাকা ব্যয় ক'রে সিনেমা ও থিয়েটারে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা সবাই সুরসিক না হতে পারেন কিন্তু ন্যূনতম এ-সত্যটুকু স্বীকার করতে হবে যে তৎসত্ত্বেও তাঁরা শিল্পরসে প্রবল-ভাবে আকৃষ্ট হন। এবং এই আকর্ষণের একটি বাস্তব দিক হল যে, সিনেমা-থিয়েটারের অবাস্তবতা সত্ত্বেও তাঁরা শিল্পরসের অভিজ্ঞতায় কমবেশী তৃপ্ত বোধ করেন।

রস ও রসের শ্রেণীভেদ ॥

রস যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বাদবৎ বা মোক্ষস্বরূপ হয় তাহলে আদৌ তার শ্রেণীকরণ করা সম্ভব কি না? নির্বিশেষ 'রসের বিশেষ রূপ বা রকম নিঃসন্দেহে শক্ত। "নির্বিশেষের বিশেষ রূপ" এই ধারণাতেই স্ব-বিরোধ আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল ঃ রস আদৌ নির্বিশেষ কি না? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বেই আমি দেবার চেষ্টা করেছি ঃ রস স্বসমুত্থ বা স্বয়ম্ভু নয়; কোন বিষয়কে অবলম্বন ক'রে রস রসিকজনের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়; এবং

এই বিষয় হয়ে ওঠার পথে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু (যথা, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত উপাখ্যান, কোন নিসর্গ দৃশ্য, কোন প্রেম, বিরহ বা ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীত) ছাড়াও তাদের প্রকাশভঙ্গি এবং পশ্চাদ্বর্তী দেহ-অবস্থা ও বিশেষ ইন্দ্রিয়লভ্য গুণাবলীও (যথা, ধ্বনি, বর্ণ, গন্ধও) অবদান যোগায়। বিষয়বস্তু যে শিল্পবস্তু ও রসের বিষয় হয়ে ওঠে এ-প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের গুরুত্বও মনে রাখা উচিত : তা হল অর্থ। অর্থবোধ একটি বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে শরীর-ও-ইন্দ্রিয়বোধের ঊর্ধ্বে একটি বিশেষ রসপ্রদায়ী বা আনন্দ-সঞ্চারী বিষয়ে রূপান্তরিত করে। রস অভিজ্ঞতাকে মনের ভেতর থেকে সম্ভব করে স্থায়ীভাব, আর তাদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রস্ফুট করে ব্যভিচারীভাব। বিভাব রস আস্বাদনের বাহ্যিক কারণ এবং, আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, প্রকাশভঙ্গির গুণে তা রসবস্তুকে বিষয়ের রূপ দেয়। অনুভাব আরো বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য : নাটকে বা চলচ্চিত্রে একে দেখান সহজ। কবি কল্পনায় কাব্যেও এ দেখান সম্ভব। কথা না ব'লে মেঘদূতের যক্ষ যখন সুদূরস্থ প্রেমিকার ছবি আঁকে বা তাঁর বিরহে তাঁকে ম্রিয়মান উদাসীন দেখায় তখন কবি অনুভাবের সাহায্যে রসকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিচ্ছেন।

নাট্যশাস্ত্রে ভরত আটটি বা আট প্রকার রসের উল্লেখ করেছেন : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। মূল বা "প্রকৃতি-রস" বলতে বোঝানো হয়েছে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস ও রৌদ্র। বলা হয়, অন্যান্য রস এই মূল চারটি থেকে নিঃসৃত। বারবারই আলঙ্কারিকেরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে একেবারে মূল যে রস তা এক ও অভিন্ন। সেই এক অঙ্কুর থেকে কীভাবে বিভিন্ন রসের উত্থান বা উদ্ভব সম্ভব হয় তারও বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। কেউ স্থায়ীভাব, ব্যভিচারীভাব, বিভাব ও অনুভাব দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বা (যেমন ধনঞ্জয়) বিভিন্ন মানসিক অবস্থা—বিকাশ, বিস্তার, ক্ষোভ ও নিক্ষেপ দিয়ে রস বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। আমার মতে রস বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেবার পূর্ব ধারণাটি—রস স্বসত্তায় এক ও অভিন্ন—ভুল। তাছাড়া যে কারণে রস স্বসত্তায়ই বিচিত্র বা বিশিষ্ট তা' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিছক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হতে পারে না। রসের অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য আধার শিল্প-রসিকের মধ্যে রয়েছে : তার উদ্বোধন, বিকাশ ও বিস্তার কীভাবে হবে তা সাধারণভাবে কিছুটা বলা যায়, যেমন আমি বলার চেষ্টা করেছি ; কিন্তু নিশ্চিত নিখুঁতভাবে সকল ক্ষেত্রে কী হবে না-হবে তা বলা শক্ত, বোধহয় অসম্ভব।

বলা হয়েছে, হাস্যরসের উদ্ভব শৃঙ্গার রস থেকে, করুণ রস রৌদ্র রস থেকে, অদ্ভুত রস বীররস থেকে এবং ভয়ানক রস বীভৎস রস থেকে। এই রকম সুদৃঢ় অবরোহী সম্বন্ধে কীভাবে তথাকথিত মৌলিক রস চারটির সঙ্গে গৌণ রস চারটিকে সংযুক্ত করা যায়

তা আমার জানা নেই। শৃঙ্গার রসের কারণ ও অনুষঙ্গ থেকে হাস্যরসের কারণ ও অনুষঙ্গ বহুক্ষেত্রেই পৃথক। এ কথা অন্যান্য তিনটি ক্ষেত্রেও কমবেশি প্রযোজ্য। বীররস থেকে হাস্যরস, হাস্যরস থেকে করুণ রস এবং শৃঙ্গার রস থেকে অদ্ভুত রসের উদাহরণ কিছু দুর্লভ নয়। ভাবলে ও খুঁজলে রসসমূহের মধ্যে অন্যান্য সম্বন্ধও সমন্বয় আবিষ্কার কিছু কঠিন নয়। যে "কারণে" হাস্য ও শৃঙ্গার, করুণ ও রৌদ্র প্রভৃতি রসকে এক অপর-নিঃসৃত ব'লে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে তা বোধহয় এই : হাস্য ও শৃঙ্গার উভয় রসের আস্বাদনেই মনের বিকাশ ঘটে ; করুণ ও রৌদ্রের আস্বাদনে মনের বিস্তার ; বীর ও অদ্ভুতে ক্ষোভ ; এবং ভয়ানক ও বীভৎসে বিক্ষেপ। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখান যাবে এ "কারণ" ঠিক নয়। হাস্য ও শৃঙ্গারে মনের বিকাশ না ঘটে' লঘু ও নীচুতাও বাড়তে পারে। শৃঙ্গার রস বহু ক্ষেত্রে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্য। তা ছাড়া "বিকাশ" কথাও দ্ব্যর্থবোধক। এর অর্থ হতে পারে দেহ-মনের উত্তেজনা (টেনশনের) হ্রাস (রিলাক্সেশন), মুক্তি (পার্গেশন) অথবা প্রকৃতই উন্মোচন ও উদ্বোধন। করুণ রস কখনো কখনো মানসিক বিস্তার ও প্রসার ঘটায় ঠিকই ; কিন্তু কখনো কখনো মনকে বিষণ্ণ ও দুর্বলও করে তোলে। দেহ-মনের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও তা থেকে মুক্তি উভয় ব্যাপারেই সাধারণত করুণ রসের প্রভাব সমধিক। "সাধারণত" বলছি এ-জন্য যে ছকেবাঁধা এ সব ফর্মুলার ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম দেখান কঠিন নয়। যখন অভিনব গুপ্ত বলেন যে, শৃঙ্গার ও হাস্য উপভোগ্য, করুণ ও রৌদ্র সম্পদ বা অর্থদায়ক, অদ্ভুত ও বীর ধর্মগুণোদ্দীপক ইত্যাদি ; অর্থাৎ যখন তিনি এই রসগুলির ঘনিষ্ঠতা দেখাতে চান মানবজীবনের কী কী উদ্দেশ্য তারা সাধন করতে পারে (যেমন ভোগ (কাম ?), অর্থ, ধর্ম প্রভৃতি) তা দিয়ে তখনও এ-বক্তব্য আমার কাছে ছকে-বাঁধা ফর্মুলা ও অগ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়। এই ফর্মুলাক ব্যতিক্রমের শুধু একটি বহু পরিজ্ঞাত উদাহরণ দিচ্ছি : আমরা শুধু শৃঙ্গার ও হাস্য রসই উপভোগ করি না, করুণও করি ; বিষণ্ণ বিষয়বস্তুর সার্থক বিয়োগান্তক নাটক, সিনেমা বা অপেরায় চোখের জল সংবরণ ক'রে বা মুছে' আমাদের অনেকেই একাধিকবার টিকিট কেটে যাই। এ কথা সত্যি যে, শৃঙ্গার রস ("Oh ! Calcutta !") যে-ভাবে উপভোগ করা যায় "King Lear"-এর করুণ রসের নাটক সে-ভাবে করা যায় না। তাহলে তো আরো নিখুঁতভাবে বললে স্বীকার করতে হয় যে : যে-ভাবে "Oh ! Calcutta !" (নাটক), "Lady Chatterley's Lover" (উপন্যাস) কিংবা Fellini-র "La Dolca Vita", বিশেষত "Satyricon" (ফিল্ম)-এর শৃঙ্গার রস ও যে-ভাবে উপভোগ্য "শকুন্তলা" বা As you Like It"-এর শৃঙ্গার রস সে-ভাবে নয়। শুধু আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপন বিভাবের পার্থক্যের জন্য নয় অন্যান্য বস্তুগত,

বিষয়গত, মানসিক ও সামাজিক কারণে শিল্পরসের অভিজ্ঞতা নানা বিচিত্রভাবে পৃথক হতে বাধ্য।

যে আটটি রসের উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া নবম আরেকটি রস, শান্ত রসের, অস্তিত্ব আছে কি নেই এ নিয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে শান্ত রসের, এই নবম রসটির উল্লেখ ছিল না। অনুমান, পরবর্তীকালে শান্ত রসের সমর্থক ভাষ্যকারদের কেউ নাট্যশাস্ত্রে শান্ত রসের উল্লেখ বা ইঙ্গিত আছে—এই মত প্রচার করেছেন। অভিনব গুপ্ত যুক্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন কেন ভরত শান্ত রস স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, শান্ত রসের স্থায়ীভাব তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মস্বরূপ (আনন্দ) রতিপ্রমুখ অন্যান্য সকল স্থায়ীভাবের উর্ধ্বে এবং সেজন্যে তাদের উৎসরূপে একে স্বীকার করা উচিত। পৃথকভাবে শান্ত রস স্বীকার্য নয়। "অতএব পৃথগস্য গণনা ন যুক্তা।"[২] আনন্দবর্ধনও "ধ্বন্যালোক"-এ ভরতের বক্তব্য প্রসঙ্গে শান্তরসের উল্লেখ করেন নি। তাঁর মতে শান্তরসের স্থায়ীভাব "তৃষ্ণাক্ষয়-সুখ" বা বাসনার বিনাশ-জাত সুখ,—নির্বেদও নয়, সামও নয়। অধ্যাপক রাঘবনের মতে, "মহাভারত"-এর কথা বাদ দিলে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" ও "সৌন্দরনন্দ" প্রভৃতি ধর্মীয় কাব্যে শান্তরসের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়।[৩]

শান্তরসকে পৃথক একটি রস, নবম রস, রূপে স্বীকৃতির বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দেখান হয়েছে। এক, ভরত এর উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয় যুক্তি অভিনব গুপ্তের। শান্ত-রসের স্থায়ীভাব ব'লে যে সম্-কে উল্লেখ করা হয়েছে এই সম্ভাব হল অনুভব, কর্ম প্রভৃতির অন্ত বা বিনাশ স্বরূপ। এই যুক্তিতে শান্তরসকে অস্বীকার করলে আরো অনেক রসকেও অস্বীকার করতে হয়। শান্তরসের পর্যন্তভূমি বা চূড়ান্ত যদি রঙ্গমঞ্চে বা বা অন্যত্র চাক্ষুষ রূপ দেওয়া না যায় সে যুক্তিতে শৃঙ্গারের বা চূড়ান্ত বা পর্যন্তভূমি, যৌনসঙ্গম, তা-ও রঙ্গমঞ্চে চাক্ষুষ রূপ দেওয়া যায় না। আর এই যুক্তিতে শান্তরসের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হলে শৃঙ্গাররসের স্বাতন্ত্র্যও অস্বীকার করতে হয়। শান্তরসের অসম্ভব শর্তকে শিথিল ক'রে অনেকে তাই বলেন, শান্ত ও সত্যসন্ধী মনের চিত্রই শান্তরস সৃষ্টির পক্ষে পর্যাপ্ত,—অনুভব, কর্মাদির সম্পূর্ণ বিনাশ করা নিষ্প্রয়োজন। স্থিতপ্রজ্ঞ নায়ককে ঘিরে শান্তরস সৃষ্টি করা সম্ভব। শান্ত রসের বিরুদ্ধে তৃতীয় যুক্তি হল এর সাধারণীকরণ অসম্ভব। সামগ্রিকভাবে মানবজাতির পক্ষে শান্তরস আস্বাদন করা অসম্ভব হবার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যায় আবৃত জগৎ-সংসারে মানুষ রাগ-দ্বেষের বশবর্তী। তার পক্ষে পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, পদ, সম্পদ প্রভৃতির আকর্ষণ ভুলে' সম্ভাবের ভিত্তিতে শান্তরস আস্বাদন করা সম্ভব নয়। কিংবা সম্ভব হলেও খুব শক্ত। আনন্দবর্ধনের এই যুক্তি

তিনি নিজেই খণ্ডন করে গেছেন। পৃথিবীর বহু মানুষই ইন্দ্রিয় সুখভোগাদিতে আসক্ত হলেও এ কথা তো সত্য যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, বিষয়ভোগে বিরাগী এবং আশয়শুদ্ধ সাধু বা সাধুবৎ। আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষের কাছে শান্তরসের আবেদন অনস্বীকার্য। তাঁর কাছে শৃঙ্গার ও বীর রসের আবেদন সাধারণত নেই কিংবা থাকলেও অতি গৌণ। কোন রসের আবেদনই সার্বজনীন হতে পারে না। আর এজন্য শান্তরসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ভুল হবে। চতুর্থত, শান্তরসের বিরুদ্ধে আরেকটি যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে এই রকম। নাটক বা কাব্য মানুষ উপভোগ করতে চায়। সে চায় প্রমোদ, স্ফূর্তি, বিলাস এবং এ-জাতীয় অন্য কিছু। যে-সব শিল্পকর্মে শান্তরস পরিবেশিত হয়েছে তা শিল্পকর্ম হিসেবে উপভোগ্য হতে পারে না।

এই সব যুক্তিই অনেকের মতে অগ্রহণীয়। কারণ, এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, রসিক মানুষ শুধু আমোদ-প্রমোদের জন্যই শিল্পরস উপভোগ করে। তাদের মতে, মোক্ষ ভাবাপন্ন হয়ে মানুষ রাম, কৃষ্ণ বা শিব প্রভৃতি দেবতাদের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্য, নাটক ও অন্যান্য শিল্পকর্মে শান্তরস আস্বাদন করে থাকে। বহু আলঙ্কারিক ও নন্দনতাত্ত্বিকই শান্তরস স্বীকার করে গেছেন। উদ্ভট এবং লোল্লট শান্তরসের অন্যতম আদি প্রবক্তা। রুদ্রট ও রাজশেখরও শান্তরসকে স্বীকার করেছেন। আনন্দবর্ধন শান্তকে শুধু স্বীকার করেন নি, গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছেন। অভিনব গুপ্ত একে শ্রেষ্ঠ রসের মর্যাদা দিয়েছেন। ধনঞ্জয়ের মতো কেউ কেউ আছেন যাঁরা নাটকে শান্তরসকে অস্বীকার করেন, কিন্তু কাব্যে এই রসকে স্বীকার করেন।

নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মোপলব্ধিজাত শান্তরসের মিল দেখতে গিয়ে আমরা যেন এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ভুলে না যাই। আত্মোপলব্ধিতে নিশ্চয়ই আনন্দ আছে, কিন্তু, বলা হয়, সে-আনন্দ অনির্বচনীয়। এবং সে-আনন্দের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন তাঁর জীবনে নাকি গভীর, গূঢ় পরিবর্তন আসে; গোটা জীবনধারাই পাল্টে দেয়। নান্দনিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এ-জাতীয় গভীর, গূঢ়, ব্যাপক ও স্থায়ী জীবনধারার পরিবর্তনের কথা ওঠে না। নান্দনিক প্রসঙ্গে তাই অনেকে "আনন্দ" শব্দটি ব্যবহার না ক'রে "প্রীতি", "সুখ", "বিনোদ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। নান্দনিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সহানুভূতি বা সহৃদয়ত্বই যথেষ্ট,—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা আত্ম-সাক্ষাৎকার নিষ্প্রয়োজন। অভিনব গুপ্ত ও অন্যান্য কয়েকজনের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ নন্দনতাত্ত্বিকের মতে যৌন প্রেমই নাটকের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

কাব্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং এমন কি অনেক নাটক আছে যেখানে শৃঙ্গার রস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সকল শিল্পকর্মেই অল্পাধিক যৌনতার আবেশ সৃষ্টি যে সম্ভব তা আমি

স্বীকার করি। কিন্তু বস্তুত এমন অনেক রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম, নানা ধরণের শিল্পকর্ম, আছে যার মধ্যে রসিক ভক্তি, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যবোধ বা নির্মল শান্তির স্বাদ পায়। এমন অনেক ধ্রুপদ, ভজন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি শুনেছি যা শুনে আমার মনে হয়েছে এর থেকে প্রিয়তর কাম্য আর কোন সন্তোষ (অভিজ্ঞতা) আমি ভাবতে পারব না। ব্লেক, রবীন্দ্রনাথ ও এলিঅটের এমন অনেক কবিতা পড়েছি যা পড়ে' মনে হয়েছে, এই আনন্দের তুলনা নেই। নান্দনিক এই সকল অভিজ্ঞতাতেই একটি দৈহিক অনুরণন আছে। রূপ ও রসের সামঞ্জস্যে রসিকের দেহ-মন সংপ্লাবিত ক'রে যে আনন্দ অনুভূত হয় তা শুধু গভীরভাবে সন্তোষদায়কই নয় আন্তরিকভাবে কাম্যও। তথাপি বলব যোগানুভূতির বিষয়শূন্য (বা-শূন্যপ্রায়) শান্ত-সমাহিত ভাব এর থেকে পৃথক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশালতায়, সূক্ষ্মতায় মন অভিভূত হয়, তৃপ্ত হয় ঃ কিন্তু এই ভাবগুলি ক্রমাগত আকাঙ্ক্ষাধর্মে উদ্দীপ্ত, চলিষ্ণু,—ঠিক যেন শান্ত নয়। যোগানুভূতিতে, এমন-কি সবিকল্প সমাধিতেও, মানুষের চৈতন্য অনেক বেশী আত্মস্থ, স্বমুখী ও শান্ত।

শান্ত রসকে স্বীকার করলে রসের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে স্বতন্ত্র রস ব'লে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী। কেউ ভক্তি ও প্রীতিকে ভাব ব'লে স্বীকার করেন এবং উৎসাহ, হর্ষ ও এ-জাতীয় ভাবের অন্তর্গত ব'লে মনে করেন। প্রীতি কিন্তু রতি বা ভক্তিমূলক ভালবাসা থেকে পৃথক। বাৎসল্যও ভালোবাসা। স্নেহও ভালোবাসা। এইসব মানসিক অবস্থাগুলিকে রস বলা হবে, নাকি ভাব বলা হবে, তা নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তাদের পার্থক্য অনস্বীকার্য।

লৌল্য রস প্রসঙ্গেও এই বিতর্ক রয়েছে। এর স্থায়ীভাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে গর্ধ। নায়কোচিত গুণাবলীর বিপরীত গুণাবলী দেখা যায় যে-চরিত্রে, যেমন রাবণ বা দুর্যোধন, সে-চরিত্রকে ঘিরে এই রসের অবতারণা। সীতার প্রতি রাবণের আকর্ষণ ও লোভ লৌল রসের উদাহরণ ব'লে কথিত হয়েছে। অভিনব গুপ্ত একে স্বতন্ত্র রসের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। লৌল্য তাঁর মতে অবস্থাভেদে হাস্য বা রতির অন্তর্ভুক্ত। সীতার প্রতি রাবণের লোভের অনৌচিত্য হাস্য রসের উদ্রেক করে। লৌল্য আসলে রসই নয়,—রসাভাস।

অন্যান্য নন্দনতাত্ত্বিকেরা আরো অনেক রসের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা, স্নেহরস —স্থায়ীভাব আর্দ্রতা ; ব্যসন রস—স্থায়ীভাব আসক্তি ; দুঃখ রস—স্থায়ীভাব অরতি ; সুখ রস—স্থায়ীভাব সন্তোষ। ভোজ মনে করেন, মূলত রস একটিই মাত্র, শৃঙ্গার বা অহঙ্কার বা অভিমান। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে তিনি আটটি রস ছাড়াও শান্ত, প্রেয়স, উদাত্ত ও উদ্ধত এই চারটি রসের উল্লেখ করেছেন। উদাত্তের স্থায়ীভাব মতি এবং

উদ্ধতের স্থায়ীভাব গর্ভ। নায়ক চরিত্রের মূল রূপটিই যেন একটি রস দিয়ে স্থিরীকৃত। ধীর-শান্ত নায়ক চরিত্রের মূল রস শান্ত ; ধীর-ললিতের প্রেয়স ; ধীরোদাত্তের উদাত্ত ; এবং ধীরোদ্ধতের উদ্ধত।

ভক্তিকে অন্যতম রস ব'লে যাঁরা জোর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বোপদেব, হেমাদ্রি, কবিকর্ণপুর এবং মধুসূদন সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, এঁদের মত একরকম নয়। মূল রস ভক্তি, বোপদেবের মতে, অন্য আটটি রস এবং শান্ত রসের মধ্য দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত। বিষ্ণুচরিত্রে মনোনিবেশ ভক্তির স্থায়ীভাব। বিষ্ণুচরিত্র শ্রবণ এর উদ্দীপনবিভাব। এবং বিষ্ণুভক্ত (-কে দেখা বা শোনা এর) আলম্বন বিভাব। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ভক্তিরসের আলোচনা ও স্বীকৃতি বঙ্গদেশেই ব্যাপক হয়েছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা প্রাচীন আচার্যগণ যে আটটি রসের কথা বলে গেছেন তাছাড়াও শান্ত, বাৎসল্য, সখ্য এবং দাস্য রস চারটি স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে এই বারটি রসের মধ্যে মূল হল শৃঙ্গার। এবং শৃঙ্গার হল কৃষ্ণের জন্য রতি। মধুর ও উজ্জ্বল নামেও এই রস পরিচিত।

মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদী হয়েও ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। ভক্তিরসের তিনি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি রতিকে তিনি ভক্তি বলেন না। চিত্ত বা অন্তঃকরণ ভজনাবশত ভগবৎরূপগ্রহণ করলে তাকেই তিনি ভক্তি বলেন। দ্রুতচিত্তের বা নরম প্রকৃতির মানুষ ভক্তিমার্গ অনুসরণ করে। অদ্রুতচিত্তের বা দৃঢ়প্রকৃতির মানুষ সাধনা-অর্জিত নির্বেদের মাধ্যমে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে। জ্ঞান চিত্তপ্রসাদ লাভের উপায় হিসেবেও কল্পিত হয়েছে। ভক্তির স্থায়ীভাব "ভগবৎআকারতা" প্রাপ্ত চিত্ত ; তুলসী-চন্দনাদি এর উদ্দীপন-বিভাব ; এবং মুদ্রিত নয়ন বা আনন্দাশ্রু অনুভাব। ভক্তির আলম্বন ঈশ্বর ; আস্বাদিত রসও, পরমানন্দও, ঈশ্বর ; এবং এর স্থায়ীভাব—চিত্তও—ঈশ্বর। আলম্বন (ঈশ্বর) হল বিম্বরূপ এবং আমাদের চিত্তস্থ স্থায়ীভাব হল প্রতিবিম্ব। চিত্তবৃত্তিই অনির্বচনীয় আনন্দপূর্ণ রসে পরিণতি লাভ করে।

আলঙ্কারিকেরা আরো বহু রসের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, ভানুদত্তের মায়া রস এবং গঙ্গাধরের চিত্ররস। চিত্ররস সংকর রস ; পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন রসসাংকর্যে এর উৎপত্তি। কার্পণ্য ও ব্রীড়ানকও রস হিসেবে কথিত হয়েছে।

এত বেশি সংখ্যক রসের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। প্রথমতঃ, রসের স্বরূপ নির্ণয়ে সকল আলঙ্কারিক ও নন্দনতাত্ত্বিক কি একই মানদণ্ড বা বিচার-পদ্ধতি ও সংজ্ঞার উপর নির্ভর করেছেন ? দ্বিতীয়তঃ, রস বলতে তাঁরা সকলে কি একই পদার্থ বোঝেন ? এই দুটি প্রশ্নের সদুত্তর মিললে (ক) "রস মূলত এক" এবং (খ)

"রস বস্তুতই অনেক" এই দুটি ভিন্ন মতের ভিন্নতার কারণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্ট বোঝা যাবে। অভিনব গুপ্তের 'লোচন থেকে এটা বোঝা যায় যে, একটা সময় এসেছিল যখন রসশাস্ত্রের আলোচনায় নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। কেউ শুদ্ধ বিভাবকেই রস বলছিল ; কেউ স্থায়ী ভাবকেই রস বলছিল ; কেউ সঞ্চারী ভাবকে ; কেউ এদের সকলের সংমিশ্রণকে ; কেউ-বা কাহিনীকেই রস বলছিল। প্রথমে বোধহয় বোঝা দরকার যা রস নয়। ভাবের ভিত্তিগুলি, চরিত্র, আলম্বন বিভাব, রস হতে পারে না। চন্দ্রালোক, দক্ষিণ বাতাস প্রভৃতি জড় বস্তু রস হতে পারে না। যা রসকে উদ্দীপ্ত করে তাকেও অনেকে রস বলতে নারাজ। এমন-কি চোখের জল বা দেহরোমাঞ্চকেও রস বলা ঠিক হবে না। রসের প্রকাশ রস নয়। প্রকাশ এক প্রকার হলেও পশ্চাদ্বর্তী অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে বাধা নেই। রস-অভিজ্ঞতার ভিন্নতা শুধু প্রকাশ থেকে অনুমান বা নির্ণয় করা শক্ত।

রস বুঝতে হবে রসের অভিজ্ঞতা থেকে। আধুনিক যুগে যেসব মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক অভিজ্ঞতাসহ সকল মানসিক ধারণাকেই, এমন কি মনের ধারণাকেও, দৈহিক ও অন্যান্য সামাজিক আচরণে, যেমন ভাষা ব্যবহারে, পর্যবসিত করতে চান ও চেষ্টা করেছেন তাঁদের পক্ষে রসের সদ্ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত। অভিজ্ঞতার গভীরে প্রবেশ করলে, অনুধ্যান করলে, বোঝা যায় যে যে-অভিজ্ঞতাকে বাইরে থেকে, ভাষা ব্যবহার থেকে, এক ও অভিন্ন ব'লে মনে হয় "বস্তুত" তা ভিন্ন। এই যে এককে অনেক মনে হওয়া এবং অনেক কিছুকে এক মনে হওয়া এ-বিষয়ে স্পষ্ট হতে গেলে অভিজ্ঞতার অনুধ্যান প্রয়োজন। রসের ক্ষেত্রেও দুটি বিপরীত ধারা ও সে-রকম প্রশ্ন আছে : এক রসের মধ্যে কি একাধিক রসের উপস্থিতি ও আবিষ্কার অসম্ভব ? বিভিন্ন রসের মধ্যে কি একটি জাতিগত ঐক্য বা সাদৃশ্য নেই ?

শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যে এর দুটি স্তর আছে—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। হরিপালদেব মনে করেন, শৃঙ্গার, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ তিনটি স্বতন্ত্র রস। ভরত-কথিত আটটি রস ছাড়াও তিনি শান্ত, বাৎসল্য, ব্রাহ্ম, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ—এই পাঁচটি রস—স্বীকার করেন। শৃঙ্গার রসে শুচিতা ও উজ্জ্বলতা আছে। এবং এ রস পরিশীলিত ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষদের মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ ও কামাতুর মানুষদের মধ্যে যে রস দেখা যায় তাকে শৃঙ্গার রসাভাস বলাই উচিত হবে। যথার্থ শৃঙ্গার রস অনিত্য ও ক্বচিৎ দৃষ্ট। মনুষ্যেতর পশুপক্ষীদের মধ্যে যে যৌনপ্রধান আচরণ দেখা যায় তা থেকে সম্ভোগ রস আস্বাদ হয়,—শৃঙ্গারাভাসও নয়। শৃঙ্গার ও সম্ভোগ রস দুই-ই সুখদায়ক। কিন্তু বিপ্রলম্ভ দুঃখদায়ক, মলিন। হতে পারে যে বিপ্রলম্ভের কারণ শৃঙ্গার অথবা সম্ভোগ ; কিন্তু তাহলেও কার্য হিসেবে বিপ্রলম্ভের স্বাতন্ত্র্য, হরিপালের মতে, ক্ষুণ্ণ হয় না। শৃঙ্গারের

স্থায়ীভাব হল আহ্লাদ, সম্ভোগের রতি এবং বিপ্রলম্ভের অরতি। শৃঙ্গার, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের মধ্যে এই ভেদরেখা টানা মানসিক-দৈহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা সন্দেহজনক। রতি ও অরতির পার্থক্য বোধহয় স্তর বা পর্যায়গত, শ্রেণীগত নয়। ঔৎসুক্য ও আকাঙ্ক্ষা যদি অতি প্রবল হয় তাহলে রতির "উপস্থিতি"ও অরতি ব'লে মনে হতে পারে এবং ফলত সন্তোষের পরিবর্তে বিষাদ ও মালিন্যবোধ দেখা দিতে পারে। সম্ভোগ বিরহে, বিষাদে বা মালিন্যে শেষ হতে পারে। একের রতি অন্যের অরতি হতে পারে। বিপ্রলম্ভ ও করুণার সীমারেখাও খুব স্পষ্ট নয়। রুদ্রভট্ট বোধহয় ঠিকই বলেছেন, বিপ্রলম্ভও রতিহীন নয়। রতিনির্ভর সম্ভোগও অরতির উৎকণ্ঠায় বিপ্রলম্ভমুখী। সম্ভোগের রতিস্তর সুখময় হলেও তার বিপ্রলম্ভমুখিতা দুঃখের ছায়ানুস্যূত। মানুষের অভিজ্ঞতার জগতে ভূগোলের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের স্পষ্ট রেখা নেই ঃ পার্থক্য অনুভব করা যায়, ভেদরেখা টানা যায় না।

শৃঙ্গারের ক্ষেত্রে যেমন নানা সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা হয়েছে হাস্য, করুণা প্রভৃতি অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও এরকম চেষ্টা লক্ষণীয়। স্মিত হাস্য থেকে অট্টহাস্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মানুষের স্বভাব—শান্ত, উদ্দাম প্রভৃতি—অনুসারে ভরত ছয় প্রকার হাস্য রসের কথা বলেছেন। পরে তিনিই আবার ছয়কে (মানুষের স্বভাব অনুসারে) তিন শ্রেণীতে—উত্তম, মধ্যম ও অধম—সীমাবদ্ধ করেছেন। পরিশেষে তিনি বলছেন, সকল হাস্যই বোধহয় স্বগত নয়তো পরগত, হয় আত্মস্থ নয়তো পরস্থ।

বলা হয়েছে, করুণাও তিন প্রকার ঃ ধর্মনাশজনিত করুণা, অর্থনাশজনিত করুণা এবং শোক (প্রিয়জনের বিয়োগ) জনিত করুণা। এই শ্রেণীভেদও অসন্তোষজনক। প্রিয়বস্তু, ভোগ, প্রয়োজনীয় বিষয় বা ক্ষমতা/নৈপুণ্য নাশ থেকে করুণার উৎপত্তি হতে পারে। বরং অর্থনাশের তুলনায় স্বার্থনাশ বললে বোধহয় অধিকতর সংখ্যক করুণার উৎপত্তি বোঝানো যেতে পারে। ভোগ বা সম্ভোগ নাশ থেকে যে করুণার উৎপত্তি তার থেকে বিপ্রলম্ভের পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। তাছাড়া ধর্মনাশজনিত করুণাকে উত্তম, অর্থ (সম্পত্তি) নাশজনিত করুণাকে মধ্যম এবং প্রিয়জনের শোকজনিত করুণাকে অধম বলাও বোধহয় ঠিক নয়। প্রিয়জনের জন্য যে শোক অনুভূত হয় তার থেকেও উত্তম করুণার উৎপত্তি হতে পারে। এবং হয়েওছে। ইতিহাসের, মানসিক বাস্তবতার, অন্তহীন বৈচিত্র্য অস্বীকার ক'রে রসের সংখ্যা ও শ্রেণীভেদ শুধু সংজ্ঞা বা নির্বাচিত লক্ষণের ভিত্তিতে নির্ণয় করা ঠিক হবে না।

যেমন বিভিন্ন রসের বৈচিত্র্যের ও বৈবিধ্যের কথা বলা হয়েছে তেমনি আবার তাদের ঐক্যের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আলঙ্কারিক ও নন্দনতাত্ত্বিক আচার্যদের

মধ্যে মতভেদ আছে। কোন মূল রসটি ঘিরে ঐক্য দানা বাঁধে এবং কীভবে তা সব থেকে ভালোভাবে বোঝা যাবে?

অভিনবগুপ্ত শান্ত রসকেই মূল রস মনে করেছেন এবং এই রসটিকে কেন্দ্র করেই অন্য সকল রসের সমন্বয় করার কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে শান্ত রস মানুষের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মোক্ষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাছাড়া কাব্যিক বা অন্য নান্দনিক অভিজ্ঞতা স্বরূপতই অলৌকিক,—জাগতিক সমস্ত বিষয়ের প্রভাবমুক্ত, বাধাবন্ধহীন এবং অনির্বচনীয়। শান্ত রসের স্থায়ীভাব আত্মা এবং আত্মাউদ্দীপিত চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তির নামই শৃঙ্গার, করুণা প্রভৃতি। স্থায়ী সকল ভাবের মধ্যে স্থায়ীতম এই আত্মাভাব। রতি এর প্রকৃতি ; হাস্য, করুণা প্রভৃতি এর বিকৃতি।

অভিনবগুপ্ত যেমন শান্তরসকে কেন্দ্র ক'রে সকল রসের একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছিলেন ভোজ তেমনি শৃঙ্গার রসকে কেন্দ্র ক'রে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। অবিশ্যি ভোজ শৃঙ্গার রসের একটু নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সকল ভাবের মূল উৎস অহঙ্কার। নামান্তরে তাকে শৃঙ্গার ও অভিমানও বলা যায়। অহংকার আত্মা নয়,—আত্মার গুণ এবং পূর্বের শুক্ল বা শুভ কর্মের ফলস্বরূপ। এই অহং-কারবশতই মানুষ শুধু নিজেকেই নয় অন্য মানুষ, জীব ও জড় ও বস্তুকেও ভালোবাসতে পারে। অহঙ্কারই আত্মরতি। এবং এই সেই মূল রস যার মধ্য দিয়ে অন্য সকল রসের, এমন কি শান্ত রসের, আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। ভোজের বক্তব্যে সাংখ্য ও ন্যায়ের প্রভাব স্পষ্ট। অহঙ্কার থেকে অন্যান্য রস নিঃসৃত নয়। অহঙ্কার অন্যান্য রস অভিজ্ঞতার আবশ্যিক আধার, কেন্দ্র বিন্দু।

আদিকবি বাল্মীকি থেকে কীটস এবং তার পরেও বহু শিল্পী-কবি করুণার মধ্যেই হৃদয়কে রসমাধুর্যে আর্দ্র করার সর্বোত্তম ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন। এ কথা সত্য যে কোন নন্দনতাত্ত্বিকই করুণা রসকে কেন্দ্র ক'রে অন্য সকল রসের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নি। তবে "উত্তররামচরিতে" ভবভূতির এমন একটি চেষ্টা প্রচ্ছন্ন আছে বলে অনেকে মনে করেন। আনন্দবর্ধন রামায়ণকে করুণা রসের মহাকাব্য ব'লে উল্লেখ করেছেন। এ মত ভবভূতিরও সমর্থন পেয়েছে।

কোন রসকে প্রধান রস বলা হবে না কি সমন্বয়সূত্র ব'লে স্বীকার করা হবে তা অনেকটাই সংশ্লিষ্ট রসিক ব্যক্তির এবং অংশত দেশ-কালের উপর নির্ভর করে। রসের প্রাধান্য ও প্রাবল্য রসিক ব্যক্তির গ্রহিষ্ণুতার ও সংবেদনশীলতার উপর নির্ভরশীল। একই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রসের প্রতি বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট হয়। কৈশোরে হাস্যরস, যৌবনে শৃঙ্গার ও বার্ধক্যে করুণ ও শান্ত রসের প্রতি আকর্ষণ

স্বাভাবিক ও সাধারণ হলেও এ-সবের ব্যতিক্রমও দুর্লভ নয়। আমাদের সমাজে যে-বয়সে অনেক মানুষই ভক্তি, শান্ত ও বাৎসল্য রসে সমধিক আকৃষ্ট হয় সে-বয়সেই পাশ্চাত্য দেশে অনেক মানুষ শৃঙ্গারের প্রতি প্রবল অনুরাগে অনড়। দৈহিক ও মানসিক সবলতার সঙ্গে রস নির্বাচন ও অস্বাদনের সম্পর্ক সহজবোধ্য। ফলে দেহ-মনের স্বাস্থ্য-সবলতা সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ধ্যান-ধারণার উপর কোন রস কখন কার কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে।

গোটা ব্যাপারটি আরো একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। মনোজগতে ও সমাজে কোন নির্দিষ্ট, স্থির ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। একই মন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনের রূপ ধারণ করে, রূপান্তরিত হয়। মানুষ হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। আনন্দের মুহূর্তে চোখে জল আসে। এক ভাব থেকে অন্য ভাবে, এক ভাব থেকে অন্য অনুভবে, এক অনুভব থেকে অন্য অনুভবে এবং এক অনুভব থেকে অন্য ভাবে উত্তীর্ণ বা বিচ্যুত হয়ে যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। মনের গতি-প্রকৃতি, বিকাশ-আবরণ সঙ্কোচন সত্যিই এত বিচিত্র ও ছন্দায়িত যে নির্দিষ্ট নিয়মে তাদের আয়ত্ত-আবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। শুধু মন দিয়ে মনকে অনুসরণ করা, ক্রমাগত অনুসরণ করা, অনুসৃত পথরেখা লক্ষ্য (ফেনোমেনোলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন) করা এবং পরে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ রূপ দেখলে তা তুলে ধরা এবং অন্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা সব যথাসাধ্য তুলনা করা—মনের এসব জটিল ও ভঙ্গুর অন্তর্গতির অধ্যয়ন নান্দনিক অভিজ্ঞতার চরিত্র-চিত্র বুঝতে ও বোঝাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। নান্দনিক অভিজ্ঞতার স্তরে, যেখানে অনুভূতির প্রাধান্য প্রায় অনিবার্য, নিজেকে বোঝা, অপরকে বোঝা ও বোঝানোর মধ্যে স্থির ও পূর্ব-নির্ধারিত সীমারেখা নেই ; থাকলেও অস্পষ্ট ; নিজের কাছেও অস্পষ্ট। আর তাই বারবার অভিজ্ঞতায় অবগাহন এত আবশ্যিক। রূপভেদে, অর্থপ্রতীতীভেদে, অভিজ্ঞতার প্রভাব পরিবর্তিত হয়ে যায়। রূপ দিয়ে ধরা যায় না, অর্থ দিয়ে বাঁধা যায় না; তবু নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল পুঞ্জকে, প্রবাহকে, রূপ আর অর্থ দিয়েই মনশ্চক্ষের সামনে বারবার ফিরিয়ে আনতে হয়। কোন রূপ, কোন অর্থ যে কখন কোন রসিকের প্রধান নির্ভর বা সম্বল হবে তা জানতে হলে তার মনের ইতিকথা, তার সমাজের ইতিহাস জানা দরকার। এক সমাজের, একই দেশ-কালের, মানুষ হলে একই রসিক সমাজের অংশীদার হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

রসের অনুষঙ্গ ॥

রূপ রসের ধারক, বাহক এবং অংশত সঞ্চারক। "অংশত" বলছি এইজন্য যে সঞ্চারণ নিছক রূপ-নির্ভর নয়। রূপ রসের পূর্বানুভব এবং অনুষঙ্গ দুই-ই। রূপের আনুকূল্য না পেলে রস তার নান্দনিক তাদাত্ম্যও রক্ষা করতে অসমর্থ। রূপের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে অবলম্বন ক'রে রস বিকশিত, উদ্ভাসিত এবং সঞ্চারিত হতে পারে।

বলাবাহুল্য, রসের বিকাশ ও উদ্ভাসের জন্য প্রধান প্রয়োজন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সবলতা, প্রফুল্লতা ও উন্মুখতা। রসের আধার অনুকূল না হলে তার বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। দেহ যদি সতেজ ও প্রফুল্ল না থাকে তাহলে মনের বিষয়-অনুরাগ প্রবল হয় না। মনের রসময়তার মূল উৎসগুলি হল আস্পৃহা, উৎসাহ, উন্মুখতা ও বিষয়-অনুরাগ। বিষয়ে বীতরাগ মন নীরস হতে বাধ্য। মন যখন মনকে নিয়েই খেলা করে, মন দিয়েই রস সৃষ্টি করে, তখন মনই মনের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়। এই অর্থে নান্দনিক মন বা চেতনা কখনো সাক্ষী-স্বরূপ নয়। এমনকি শান্তরসে নিবিষ্ট মনও বিষয়ে বীতরাগ নয়। আসলে শান্ত রসের আস্বাদে মন ইন্দ্রিয়-তাড়িত চঞ্চলতা ও উত্তেজনার উর্ধ্বে উঠতে পারে কিংবা ঐ জাতীয় মানসিক সংক্ষোভগুলিকে প্রশমন করতে পারে। অসংক্ষুব্ধ, শান্ত, সংযত এই রসভাবে আনন্দ আছে, অপ্রমত্ত চেতনার স্নিগ্ধতা আছে।

কল্পনাও রস সৃষ্টির সহায়ক। স্মৃতিনির্ভর কল্পনা ততটা নয়, সৃজনধর্মী কল্পনাই প্রধানত রস সৃষ্টিতে ও সৃষ্ট রসের সঞ্জীবনে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারে। কল্পনায় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পুনরাবৃত্তি বা পুনরাভিনয় হতে পারে। কিন্তু বস্তুত সৃজনধর্মিতার জন্য কল্পনায় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয়ের অধিক কিছু উপস্থিত। প্রত্যক্ষের বিষয় থেকে মন যত দূরে—দেশ-কালের বিচারে দূরে—যায় ততই তার পক্ষে বিষয়ের বস্তুরূপ থেকে শিল্পরূপে এবং শিল্পবিষয়ের এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হবার (নীতিগত) স্বাধীনতা বেশী (লভ্য)। নীতিগতভাবে যা লভ্য তা'ই যে লব্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। কল্পনা স্মৃতির পুনরাবৃত্তিতেই শেষ হতে পারে। অবসন্ন দেহ-স্নায়ুকোষের কল্পনাও স্মৃতির অধিক কিছু হয়ে উঠতে অসমর্থ। কল্পনার সৃজনধর্ম যদিচ স্বাধীনতার, মুক্ত মনের, দান তবু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই পরবর্তী "অধিক"টুকু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ বা তাৎপর্য-উদ্ভূত। মনের মুক্তি, কল্পনার সৃজনক্ষমতা, শুধু দেশ-কালের দূরত্বজনিত নয় চিন্তার সক্ষমতা জনিতও বটে। প্রত্যক্ষের অধিক যা কল্পনায় মেলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তত একাধিক বিষয়ের সাহচর্য বা সম্মিলন থেকে, তাদের সম্বন্ধের রূপসংগ্রহ (প্যাটার্ণ) থেকে, উদ্ভূত। অর্থাৎ, কল্পনার বিষয় যেমন সক্রিয়ভাবে চিন্তার ফলে পরিবর্তিত হতে

পারে, তেমনি আবার প্রত্যক্ষলভ্য বিষয়পুঞ্জের নিশ্চেষ্ট অনুধাবন থেকেও হতে পারে। দেহ, প্রত্যক্ষ, কল্পনা ও চিন্তা—ঐ ক্রমান্বয়ে—বস্তুকে বিষয়ে, বস্তুরূপকে শিল্পরূপে, রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে।

বিষয়সৃষ্টিতে কল্পনার তুলনায় ঢের বেশী প্রভাব বিস্তার করে প্রতিভা, বলা যেতে পারে, শিল্প প্রতিভা। বিষয়বস্তুর রূপান্তরণে এবং নান্দনিক বিষয় সৃষ্টিতে কল্পনার তুলনায় প্রতিভা অনেক বেশী মুক্ত এবং সেইজন্য মৌলিকতার দাবীদার। কল্পনার বিষয়ে অভিজ্ঞতার ছাপ যতটা স্পষ্ট ও সরাসরি প্রতিভাসৃষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে তা নয়। কল্পনা সাধারণত বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের রূপ ও রকমগুলিকে পরিবর্তন করে, বিষয়সমূহকে তাদের সংশ্লিষ্ট বস্তুর পরিধিতেই পুনরুদ্ভাসিত করে—সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করে না। একই সম্বন্ধে একাধিক বিষয়কে কল্পনা করা যায়। সম্বন্ধের একই রূপে আরো অধিক বিষয়কে কল্পনা করা যায়। বিষয় কল্পনা ও বিষয় সৃষ্টির মধ্যে স্পষ্ট না হলেও পার্থক্য আছে। সৃষ্টি যখন কল্পিত বিষয় তখন মূলত বস্তুর স্মরণ, স্মৃতিচারণ বা অনুধ্যান। প্রতিভার প্রভাব বস্তুর আশ্লেষ থেকে, স্মৃতির দৈশিক-কালিক নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে, বিষয় মুক্ত, মুক্ত পথচারী,—কিন্তু উধাও নয়। বস্তুর আশ্লেষ ব্যর্থ করতে প্রতিভার তুলনায় হয়তো চিন্তা আরো সার্থক : নান্দনিক জগতে বিষয়ের প্রতি প্রতিভার যে অনুরাগ আছে ও সেই অনুরাগের জন্য পৌনঃপুনিক প্রত্যাবর্তন আছে চিন্তার সে চরিত্র ও প্রবণতা নেই,—অন্তত অতটা নেই। শিল্পজগতে চিন্তার ভূমিকা প্রধানত বিষয়ের বিন্যাসে, সামঞ্জস্য বিধানে,—ঠিক বিষয় সৃষ্টিতে নয়। নান্দনিক কল্পনার মূল ঝোঁক বিষয় সৃষ্টি। বলাবাহুল্য, সৃষ্টির প্রসঙ্গে চিন্তার ও কল্পনার ভূমিকায় যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। চিন্তার মতো এ প্রসঙ্গে কল্পনাও কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয় বিন্যাসে হাত দেয়। চিন্তা প্রধানত বিষয় আবিষ্কারে ব্যস্ত : কল্পনা ব্যস্ত বিষয় সৃষ্টিতে। চিন্তা প্রধানত সত্যসন্ধী ; কল্পনা সৌন্দর্য-মাধুর্য-আনন্দসন্ধী। চিন্তার জগতে কল্পনা সত্যের অ-দেখা মানচিত্র আঁকতে সাহায্য করে, নিজে সত্যসাক্ষাৎকারের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দাবী করে না। কল্পনার জগতে চিন্তা শিল্পজগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেও সামঞ্জস্য, সংহতি, সমন্বয় প্রভৃতি মৌল ধারণার শাসন দিয়ে ঐ জগতের বিষয়গুলিকে বাঁধতে চায়, দূরবর্তী ও অস্পষ্ট হলেও সত্যের আভাস দিতে চায়,—সম্পূর্ণ অ-বাস্তব, অ-সম্ভাব্যতার হাস্যকর পরিণাম থেকে বাঁচাতে চায়। রস সৃষ্টিতে অনুষঙ্গ হিসেবে কল্পনার দান সহজে উপভোগ করা যায়। রস সৃষ্টিতে চিন্তার অবদান অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে সঞ্চারিত ; এবং এ দিকটি অনুধাবনসাপেক্ষ।

প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার বাস্তব সত্য থেকে কল্পনার মুক্তির উপর জোর দিতে গিয়ে

কেউ কেউ বাস্তব নাস্তিকেই কল্পনার ভিত্তিরূপে উল্লেখ করেছেন। কল্পনার বিষয় চৈতন্যস্থিত,—বস্তুস্থিত নয় ; এবং বস্তুজগতে ঐ বিষয়ের অনুপস্থিতিই কল্পনার বিষয়রূপে তার আবির্ভাবের আবশ্যিক শর্ত। এই যুক্তিতে সার্ত্র বলেন, কল্পনার বিষয় হওয়া আর স্মৃতির বিষয় হওয়া এক কথা নয়।[৪] কল্পনা তার বিষয়কে অল্পাধিক অ-বাস্তব ক'রে তবে তাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও এমনকি স্মৃতির বিষয় থেকে পৃথক করে, স্বতন্ত্র করে, স্বাধীন চরিত্র দেয়। কল্পিত বিষয়ের এই ব্যাখ্যা থেকে সহজেই কেউ মনে করতে পারে যে সার্ত্র বুঝি বাস্তবতাবিরোধী। এই সম্ভাব্য সমালোচনার উত্তরে তাঁর বক্তব্য : যা অস্তি নয় তা নাস্তি হয় না ; সেই বিষয়কেই কল্পনা করা যায় যা অন্য কোন-না-কোন রকমে পৃথিবীতে রয়েছে। কল্পনার বিষয়—চৈতন্যস্থ—হবার ব্যাপারটিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে তার অনুপস্থিতিকে—অভাবকে—সার্ত্র নাটকীয়ভাবে দেখাতে চান।

স্থানান্তরে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, শিল্পবস্তু সৃষ্টির ব্যাপার,—নিছক নিশ্চেষ্ট অভিজ্ঞতার ব্যাপার নয়। এবং সেখানে এ-ও দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বাস্তব পৃথিবীর, বিষয়বস্তুর, অল্পাধিক বিকৃতি শিল্পের জগতে অনিবার্য। পক্ষান্তরে স্বীকার্য বাস্তব পৃথিবীর অল্পাধিক অনুকৃতি। সৃষ্টির স্পৃহায় ও চেষ্টায় কল্পনা বস্তুজগৎকে বিকৃত করে ; এই বিকার, বলাবাহুল্য, সৌন্দর্যসৃষ্টির অনুরোধে। বিকারজনিত পার্থক্যকে নাস্তিরূপে প্রথমে উপস্থাপন ক'রে পরে চৈতন্যের বিষয়মুখিতাকে অনুসরণ ক'রে বস্তুজগতে আবার তাকে অন্যরূপে আবিষ্কারের চেষ্টা ও তার মনস্তাত্ত্বিক "বর্ণনায়" আমি সার্ত্রের কোন মৌলিকতা দেখি না। পরন্তু সার্ত্র যাকে বর্ণনা বলছেন তা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। কল্পপ্রতিমা (ইমেজ)-কে চৈতন্যস্থিত দেখানোর জন্য বস্তুজগতে তার নাস্তি নাটকীয়ভাবে দেখানো নিষ্প্রয়োজন এবং বোধহয় একার্থে ভুলও। কল্পপ্রতিমা কল্পনাজনিত বলেই মানসিক এবং সেজন্য একই সময়ে একই অর্থে বস্তুজগতে থাকতে পারে না। কিন্তু বস্তুজগতে তার না থাকাটা যদি যথার্থই মৌলিক সত্য ও বাস্তবিক সত্য হত তাহলে অলীক কল্পনা (ফ্যান্টাসি) ও সৃজনধর্মী কল্পনার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখানো যেত না। তাছাড়া, তাহলে সার্ত্র কল্পনার বিষয়মুখী আকাঙ্ক্ষাধর্মিতা অনুসরণ ক'রে [ব্রেন্টানো-হুসারেল পদ্ধতিতে] ভিন্ন পথে কল্পপ্রতিমার বাস্তব ভিত্তি দেখানোরও প্রয়োজন অনুভব করতেন না। কল্পনা বিষয়গত প্রভাবাধীন হয়েও অভিজ্ঞাত বিষয়ের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে অনভিজ্ঞাত বিষয়সমষ্টির দিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ও নান্দনিক সৃষ্টির সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট।

সৌন্দর্য সৃষ্টির ও আনন্দদানের অনুরোধে বস্তুজগৎ যখন প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সাড়া

দিতে পারে না ইন্দ্রিয় তখন কল্পনার আনুকূল্য চায়। রসাভাসের বিপর্যয় বা বিকার এড়াবার জন্য জাগ্রত চেতনার এই হল পূর্ব পদক্ষেপ। কল্পনার উত্তম যে সব সময়েই ইন্দ্রির-অবদানের অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্য তা নয়। সৃষ্টির আকুতিতে, সৃষ্টির উদ্ভব —চেতনা থেকে পরিণামের সন্ধানে কল্পনা স্বধর্মেই সক্রিয়। তাছাড়া শুদ্ধ চিন্তার অমূর্ত অবলম্বনহীনতার দৈন্য দূর করার জন্যও কল্পনার ডাক পড়ে।

কল্পনা বলতে সার্ত্র যা বোঝাতে চান তা সংস্কৃত নন্দনতাত্ত্বিকদের মতে প্রতিভার সমগোত্রীয়। বিশেষত আনন্দবর্ধন প্রতিভাকে মৌলিক সৃষ্টির ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূল উৎস ব'লে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিভা তার মৌলিকতা ও বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য বস্তুজগৎ থেকে নিষ্ক্রমনের প্রয়োজন নেই; বোধহয় সম্ভবও নয়। কারণ বস্তু—, উদ্ভিদ—, এবং প্রাণী-জগতে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তবু যে প্রতিভা ব্যক্তিমানুষের সীমিত ক্ষমতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েও অনন্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম তার হেতু খুঁজতে হবে রসের সৌন্দর্যে ও ধ্বনির বৈচিত্র্যে, শব্দের সুষমায় ও সঙ্গীতে। প্রতিভাই পারে এক দিয়ে অপর কিছুকে, চাঁদ দিয়ে মুখকে, লীলাপত্র গণনা দিয়ে লজ্জাকে, বোঝাতে। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রসের পরেই মূল্যবান এই গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। আর তাই বস্তুজগতের বিষয়সমূহের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হলেও তাদের কবি কল্পিত সমন্বয়ের সংখ্যা অন্তহীন। কোন বস্তুই বিষয়রূপে স্বধর্মে সুন্দর বা নান্দনিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই প্রতিভাপ্রসূত রচনানৈপুণ্যে—স্টাইলে—ধ্বনির সুষমার সঙ্গে অর্থের উচিত উদ্বাহ। একটি বাণীকেই যেমন গুণী গায়ক নানা ভাবে গাইতে পারেন একটি বিষয়কেই তেমনি সার্থক কবি নানা ভাবে, রসে, ভঙ্গীতে পরিবেশন করতে পারেন।

কাব্যের অলঙ্কার ও রচনানৈপুণ্য রসাঙ্গ, রসের অনুষঙ্গমাত্র। অলঙ্কার ও স্টাইল দুই-ই যে-নান্দনিক বিষয়ের অঙ্গ, কবিতা বা ছবি তা সে যাই হোক না কেন, সেই অঙ্গীর সঙ্গে উচিত সম্বন্ধে না আবদ্ধ হতে পারলে তারা রসাঙ্গ হিসেবে অসার্থক। নাটক ও চিত্রের তুলনায় কাব্যিক রস সৃষ্টির জন্য অলঙ্কার ও স্টাইলের গুরুত্ব অনুষঙ্গ হিসেবে সমধিক। মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ভাষা ব্যবহার করার যে সুবিধা ও স্বাধীনতা নাট্যকারের আছে তা কবির নেই। রঙ ও তুলি দিয়ে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিস্তারের বস্তুপ্রতিম পটভূমিতে চিত্রশিল্পী তার উদ্দেশ্য অনুরূপ রস-প্রভাব সৃষ্টিতে অন্তত এক দিক থেকে কবির তুলনায় রসিক ব্যক্তিকে রস উপভোগে অধিক সাহায্য করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, মনে রাখা ভালো, নাটক ও বিশেষত চিত্রশিল্পের রস উপভোগে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ভূমিকা সমধিক উল্লেখযোগ্য। কাব্যের ক্ষেত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য, সকল

প্রকার শিল্পকর্মের নান্দনিক রস উপভোগেই বুদ্ধি-বিচারের অবদান অল্পাধিক অনিবার্য (শুধু আবশ্যিক নয়)। কাব্য রস উপভোগে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবদান প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ব'লে শ্রবণকে নন্দিত করতে পারে এমন সকল অনুষঙ্গেরই—অলঙ্কার, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাদির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাও চিত্রধর্মী হতে পারে—যেমন মন্তাজ ঃ যেখানে কবি চিত্রপ্রতিম ভাষা, ভাব ও (কখনো কখনো উচিত) ধ্বনি সহযোগে তুলির কাজ বাণীতে সম্পন্ন করেন। চিত্রধর্মী কবিতা আনন্দদায়ক এবং অর্থবহও ; তবে ব্যঞ্জনাধর্ম তাতে নেই কিংবা থাকলেও লঘু।

কাব্যের প্রাণ ধ্বনি। আনন্দবর্ধন তিন প্রকার ধ্বনির কথা উল্লেখ করেন ঃ বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। কাব্যের প্রাণ যে—ধ্বনি তা অভিনবগুপ্তের মতে রসধ্বনি। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি আসলে রসধ্বনির সহকারীধ্বনি। ধ্বনি অভিধা (ডিনোটেশন) নয়, লক্ষণাও নয় ; অথচ উভয়ের উপর নির্ভরশীল ; এবং কার্যত উভয়ের অধিক। লক্ষণমূল (অবিবক্ষিত-বাচ্য) ধ্বনিতে প্রাথমিক অর্থের গুরুত্ব অতি অল্প। অভিধামূল (বিবক্ষিত-বাচ্য) ধ্বনিতে প্রাথমিক অর্থ ই গুরুত্বপূর্ণ—লক্ষণার কোন ভূমিকা নেই। ধ্বনি শব্দ-শক্তি-মূল হতে পারে, আবার অর্থশক্তি মূলও হতে পারে। বাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টিতে কখনো ধ্বনির পক্ষে শব্দের শক্তিই পর্যাপ্ত ; কখনো অর্থের শক্তি প্রয়োজনীয়। বস্তুধ্বনিতে শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যে বোঝানো হয় কোন ঘটনাকে কিন্তু ইঙ্গিত করা হয় অন্য কোন অর্থকে। অলঙ্কারধ্বনিতে বোঝানো হয় কল্পিত কোন কিছুকে (যা বস্তু নয়) আর তা প্রকাশ করা হয় এমন শব্দের মাধ্যমে যে তা অলঙ্কারের রূপ পরিগ্রহ করে। রসধ্বনি একলক্ষ্য ঃ রস সৃষ্টিই তার একমাত্র লক্ষ্য। অন্য সবকিছু—অলঙ্কার, গুণ প্রভৃতি—তার অনুষঙ্গ। রসবাদী ও ধ্বনিবাদীর বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝি ; কিন্তু বিরোধের কারণ আমি দেখি না। অলঙ্কার কখনো কখনো রসসৃষ্টির সহায়ক না হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। অলঙ্কারের নিজস্ব মূল্য অকিঞ্চিৎকর ঃ রসসৃষ্টির সহায়ক হিসেবেই তার গুরুত্ব যথার্থ নান্দনিক গরিমা লাভ করে। কাব্য বা অন্য কোন শিল্পকর্মকে অলঙ্কৃত করার আগে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর যে-প্রশ্ন নিজের মনে তোলার কথা তা হল ঃ এ-সব অলঙ্করণ রসিক মনের কাছে আমার শিল্পের রস সঞ্চারের অন্তরায় হবে, না কি সহায়ক হবে ? অলংকারের ভারে ও বৈচিত্র্যে যেন রসবিকৃতি বা, এমনকি, রসাভাস না ঘটে। যুগে-যুগে, বিভিন্ন সমাজে অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুতর মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আধুনিক কালে বহু সমাজেই শিল্পের রস সৃষ্টি ও সঞ্চারের ব্যাপারে শিল্পীরা নিরলঙ্কার সহজ ভাব ও ভাষার সাহায্য নেবার পক্ষপাতী। যখন জটিল বা যন্ত্রণাময় বক্তব্যকে ঘিরে রস সৃষ্টির চেষ্টা

করা হয় তখন যদিও বিরুদ্ধ ও সঙ্ঘাতধর্মী রঙ, শব্দ ও ধ্বনি, রেখা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়, তথাপি অলঙ্কার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাহুল্য ব'লে বর্জন করা হয়। বরং, পক্ষান্তরে, রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্মের "স্বাভাবিক সুন্দর" দেহে অলঙ্কার, অনেকের মতে, রসিক দৃষ্টিকে নন্দিত না ক'রে পীড়িত করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্রুপদী শিল্প-চেতনা ও তদানুষঙ্গিক রীতি-নীতির দিকে দৃষ্টি ফিরছে। সে-সব ক্ষেত্রেও আধুনিকতার স্পর্শে-প্রভাবে ধ্রুপদী চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষনীয়। এ-প্রসঙ্গে কাব্যে এজরা পাউণ্ড ও বিষ্ণু দে, সঙ্গীতে রবিশঙ্কর ও নৃত্যে উদয়শঙ্করের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এক অর্থে, ইতিহাস, ঐতিহাসিক চিন্তা ও কর্মমাত্রই, অতীত-সম্পৃক্ত হলেও ইদানীন্তন। শাশ্বত নয়।

শিল্পরসে ঔচিত্য ও অনৌচিত্য ॥

সার্থক রস সৃষ্টির প্রসঙ্গে ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য। শিল্পবস্তু যে বস্তুজগতের নিয়মাদির অনুগত নয়, কিংবা শিল্পের জগতে কল্পনা ও সৃষ্টির প্রভূত অবকাশ আছে তা বলাবাহুল্য। তবু কোন রসের সঙ্গে কোন পরিমণ্ডল, কোন সংলাপ, বর্ণ, ধ্বনি বা সঙ্গীত, কোন বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জা খাপ খায় কিংবা খায় না—বারবারই সে প্রশ্ন ওঠে। আর, সে-প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে শিল্পজগতের সঙ্গে সমাজ-ও—বস্তুজগতের (প্রত্যক্ষ না হলেও) পরোক্ষ একটা সম্বন্ধ খুঁজতেই হয়। ভরত নাট্যবিচার প্রসঙ্গে বারবার তাই সার্থক রসসৃষ্টির জন্য "রসপ্রয়োগ ক্ষেত্রে"র ও "লোকধর্মিতা"র কথা তুলেছেন। মনুষ্যপ্রকৃতি ও তার আচার-ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ ভুলে' রসবিচার খুব শক্ত। প্রায় অসম্ভব। সম্ভব হলেও অসম্পূর্ণ। শোকাতুরা নারীকে যদি উৎসবের বেশ পরানো হয় কিংবা গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারে যদি বিধবাকে সধবার খাদ্য দেওয়া হয় তাহলে এ-জাতীয় কাহিনী সংবলিত সাহিত্য, নাটক বা চলচ্চিত্রকে অনৌচিত্য দোষে দূষ্য ব'লে নিঃসন্দেহে সমালোচনা করা হবে। যে দেশের লোকধর্মের সঙ্গে এ-সব কাহিনী সঙ্গতিহীন সে-দেশে এ-সব কাহিনী সমালোচিত হলেও দেশান্তরে তা না-ও সমালোচিত হতে পারে।

ঔচিত্য নানা রকমের হতে পারে। এক : ভাষাগত ঔচিত্য। শিল্পী যে-রস সৃষ্টি করতে চায় তাকে তদনুরূপ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। প্রেম রস সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই রুদ্র বা বীভৎস রসের ভাষা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে না। দুই : পাত্র বা পাত্রীর চরিত্রানুরূপ রস সৃষ্টি বা বিকাশই নান্দনিক প্রয়োজন। তাছাড়া নাটক বা উপন্যাসের চরিত্রের মনোভাব ও সেই ভাবাপন্ন সময়ে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে উচিত সম্বন্ধও রস সৃষ্টির

জন্য প্রয়োজন। শোকের মনোভাব পরিহাসের ভাষায় প্রকাশিতব্য নয়। যদি কখনো মনোভাব, ভাষা ও আচার-ব্যবহারে অনুচিত সম্পর্ক বা অনন্বয় দেখা দেয় তাহলে তাকে ছলনা, খলতা, বা আত্মগুপ্তি বলা যায়।

সমগ্রসন্ধিতে প্রতিটি অংশ বা অঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে সম্পূরক, সঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া দরকার। এই দরকার "রসৌচিত্যে"র দরকার। সমগ্র নাটক, উপন্যাস, বা মহাকাব্যের বিভিন্ন অঙ্ক, অধ্যায় বা পর্ব যদি পূর্বাপর সম্বন্ধরহিত হয় তবে তারা মূল রস সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে না। মূল কাহিনী থেকে আপাতবিচ্যুত অংশও কোন-না-কোন অর্থে মূল কাহিনীর রসবিকাশের সহায়ক। যখন কোন শিল্পকর্ম পরিষ্কার একটি বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা না ক'রে শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে (ইম্প্রেশনে) কিছু বোঝাতে চায় তখনও রসৌচিত্যের এই নিয়মটি, অংশের সঙ্গে সমগ্রসন্ধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ রক্ষা, প্রযোজ্য। তবে উঁচু দরের শিল্পীরা, বিশেষত নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, এই নিয়মের প্রয়োগকালে এমন চাতুর্য ও কল্পনা ব্যবহার করেন যে তাতে অংশ বা অঙ্গ আপাতস্বতন্ত্র (বা এমন-কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিপরীত) রসও সৃষ্টি করে এবং তার ফলে দর্শক বা পাঠকমনে পরিণাম সম্পর্কে সাসপেন্স জাগ্রত হয়।

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত কাব্যে, যেখানে অলঙ্কারের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে সেখানেও রসৌচিত্যের প্রাধান্য মেনে' অলঙ্কারের প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয় করা উচিত। অন্তত উচ্চাঙ্গের শিল্পী তা'ই করে থাকেন। অত্যধিক অলঙ্কারের জন্য সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য থেকে দর্শকের দৃষ্টি অত্যাধিক অলঙ্কারের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন অলঙ্কারের মধ্যে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য থাকা দরকার। তাদের আয়তন, রূপ, রূপবিভঙ্গ, ব্যবহৃত মণিমাণিক্যের বর্ণ ইত্যাদির মধ্যেও পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকা দরকার। মূল কথা, অলঙ্কার যদি সৌন্দর্য বিবর্ধক না হয়ে প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অলঙ্কার ব্যবহারে নিশ্চয়ই কোন না কোন অনৌচিত্য ঘটেছে। ইদানীংকালের বাঙ্গলা ও ইংরাজী কাব্যে অলঙ্কারের ব্যবহার খুব সীমিত ও সুচিন্তিত। অলঙ্কারের মাধুর্য ব্যতিরেকেই কাব্যকে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য ধ্বনির উপর, ভাব ও ভাষার সম্মিলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রসৌচিত্য ও অলঙ্কারৌচিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আনন্দবর্ধন, রুদ্রট, লোল্লট ও যশোবর্মণ বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন।

এক প্রসঙ্গে যা অনুচিত তা প্রসঙ্গান্তরে উচিত হতে পারে। দোষ গুণে পরিণত হতে পারে। গ্রাম্য বা অসভ্য— যা সাধারণত দোষ ব'লে বিবেচিত হয়— প্রসঙ্গানুরোধে, যেমন অনুকরণের প্রয়োজনে, গুণ ব'লে স্বীকৃত। উন্মাদ, প্রেমিক,

সাধু প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির জন্য তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে লেখক বা অভিনেতাকে যা দোষ তাকেও যথোচিত স্বীকৃতি দিতে হয় ও গুণ রূপে দেখানো হয়। কোন ব্যক্তিকে যদি রুচিহীন রূপে চিত্রিত করতে হয় তাহলে তার অনুভবে বা আবেগে অনুচিত বা বিকৃত কিছু দেখানো দরকার। যে-বাড়ীতে কারো মৃত্যু ঘটেছে সেখানে, সেই শোকের পরিবেশে, কেউ যদি কেবলি হাস্য-পরিহাসের প্রসঙ্গ বা বক্তব্য অবতারণা করে তাহলে সবাই বলবে "অমুকের রুচি বলে কিছু নেই।" কাণ্ডজ্ঞানহীন এই ব্যক্তির রসদোষ খুব সহজেই বোঝা যায়। কোন ব্যক্তিকে যদি মূর্খরূপে দেখাতে হয় তাহলে তার মুখে এমন সব কথা আরোপ করতে হয় যার ব্যবহার থেকে ঐ ব্যক্তি যে ঐসব ব্যবহৃত কথার অর্থ জানে না তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ম্যালাপ্রপিজ্‌ম্ (malapropism) ভাষাদোষের উদাহরণ,—অর্থদোষের নয়। অর্থদোষ মূলত ভুল চিন্তার চিহ্ন। ভাষার ভুল ব্যবহার সর্বদাই যে ভুল চিন্তার জন্য হয় তা নয়। ন্যূনোপমা ও অধিকোপমা উভয়ই উপমা হিসেবে দূষ্য ; কিন্তু অতিশয়োক্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উভয়ই উচিত।

রসের সঙ্গে ধ্বনির সম্বন্ধও উচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা না হলে ধ্বনি রস বিকাশের অনুকূল হয় না। শব্দ ব্যবহারে, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংস্থানে, পারম্পর্যে, স্বরবর্ণের আধিক্যে বা স্বল্পতায়, সম ও বিষম পারম্পর্যে রস কতটা প্রকাশিত হবে, কতটা আবৃত হবে তা নির্ভর করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আপেক্ষিকতার নিয়ম প্রযোজ্য। যে-ধ্বনি এক ক্ষেত্রে এক রসের বিবর্ধক অন্য ক্ষেত্রে সে ধ্বনিই সে রসের বিঘাতক। যে-ধ্বনি এক ক্ষেত্রে এক রসের সম্বন্ধে দোষ সে-ধ্বনিই অন্য ক্ষেত্রে অপর রসের সম্বন্ধে গুণ। একই রসকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ, বিকাশ, বিকৃত বা গুপ্ত করার জন্য ধ্বনির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ধ্বনি ও রসকে বিপ্রতীপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ক'রে কবি বা নাট্যকার অদ্ভুত, জটিল ও অনির্দিষ্ট প্রভাব-পরিবেশও সৃষ্টি করতে পারেন। অভিনব গুপ্তের মতে রসই কাব্যের প্রাণ এবং তার প্রকাশ ধ্বনির মাধ্যমে। আর, রসকে তার স্বরূপ প্রকাশের জন্য ঔচিত্য ধর্মানুসারী হতে হয়। শব্দ, লিঙ্গ, বিস্ময়-সূচক বা প্রশ্নসূচক বাক্য প্রভৃতির ব্যবহার উচিত হয়েছে কি না তা নির্ণয়ের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল কাঙ্ক্ষিত রস সৃষ্টি হল কি না তা দেখা এবং, সম্ভব হলে, দেখানো। কাব্য যখন তার উচিতধর্ম থেকে ভ্রষ্ট তখন তা কাব্যাভাস। তেমনি উচিতধর্মভ্রষ্ট অলঙ্কার হল অলঙ্কারাভাস।

রসের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধেও ঔচিত্যের প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। রস সৃষ্টির জন্য বিষয় সম্পর্কে শিল্পীকে সচেতন এবং তার প্রস্তাবনায় সতর্ক হতে হবে। উপজীব্য

বিষয়কে ঘিরে, তাকে অবলম্বন ক'রে, রস সৃষ্টি করা হয়। যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করেই যে-কোন রস সৃষ্টি করা যায় না—কিম্বা, করা গেলেও উত্তমভাবে করা যায় না। অদ্ভুত রসের বিষয়কে অবলম্বন ক'রে করুণ রস, অথবা রৌদ্র রসের বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ভক্তি রস সৃষ্টি করা খুব কঠিন। কঠিন,—তবে অসম্ভব নয়। কারণ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর জগতের তুলনায় শিল্পী-সাহিত্যিকের জগৎ অনেক বেশি বিচিত্র,—অনেক বেশি সম্ভাবনা ও পরিণাম সেখানে উৎপন্ন ও নিলয় হয়। এই একই কথাটিকে অন্যভাবেও বলা যায়। বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন ক'রে একই রস এবং একই বিষয়কে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন রসসৃষ্টি প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকেরা প্রায়ই করে থাকেন। এটা রসলোকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হিসেবেও দেখানো যায়। বলাবাহুল্য, এ স্বাতন্ত্র্য সীমিত। এ কথা অস্বীকার করলে বিষয়ৌচিত্যের আপেক্ষিকতা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। রস ও বিষয়ের মধ্যে শিথিল হলেও গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যেমন আছে রাগ ও প্রহরের মধ্যে। এই সম্বন্ধে ঔচিত্যের সুবোধ্য অনুরোধ আছে,—অনিবার্যতা নেই।

রসের আপেক্ষিকতা নানা নন্দনতাত্ত্বিক নানাভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্ব, অভিনব গুপ্তের বৈচিত্র্যতত্ত্ব, কুন্তকের বক্রতাতত্ত্ব, এবং ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যতত্ত্ব আসলে একই মূল কথার বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাবনা। মূল কথাটি খুব সহজ : ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কোন ভেদ নেই। শব্দের অর্থ যেমন বাক্যগত, বাক্যের অর্থ যেমন প্রস্থান (সিস্টেম) গত, প্রস্থানের অর্থ যেমন কতগুলো সংজ্ঞা, সিদ্ধান্ত বা পূর্বপ্রকল্পসাপেক্ষ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচারও তেমনি কোন না কোন পরিবেশ বা পরিমণ্ডলসাপেক্ষ। যেমন হাস্যপরিহাসের পরিবেশে অনৌচিত্যই—অনুচিত ধ্বনি, অলঙ্কার, ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি—উচিত ব'লে বিবেচিত হয়।

রসবিচার ॥

রসবিচার সত্যাসত্য বিচারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনেক জটিল। প্রথমত, সত্য ও অসত্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা যে কোন একটি মানদণ্ড দিয়ে নির্দিষ্টভাবে দেখানো যায়। সত্যাসত্য বিনিশ্চয়াত্মক তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্তত দুটি আছে—সঙ্গতিশীলতা ও ফলদায়কতা—যাদের মানদণ্ডে নির্ণীত সত্যাসত্যের মধ্যে স্তরভেদ থেকে যায়। রসবিচারে শুধু স্তরভেদই হয় না। নির্দিষ্ট কোনো "হাঁ/না" বা "ভালো/মন্দ" জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। বস্তুত রসবিচারের উদ্দেশ্যও বোধহয় তা নয়।

সত্যাসত্য বিচারে একটি নির্দিষ্ট বিষয় থাকে। এ-কথা নীতিধর্ম ও আইনের বিচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রসবিচারের ক্ষেত্রে কিন্তু এ-কথা সরাসরি প্রযোজ্য নয়। রসের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই ; রসই বিচারের বিষয়। নান্দনিক বিচার ও রসবিচারের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পার্থক্য আছে। কোন একটি বিষয়কে—তা সে বাহ্যত যে জাতীয়ই হোক না কেন—নান্দনিক বিচারের বিষয় যদি হতে হয় তাহলে তাকে সুন্দর, মধুর বা এইপ্রকার কতগুলি গুণের অধিকারী হতে হবে। এই অধিকার অর্জনকারী বিষয় কোন না-কোন রসের আশ্রয় হয়ে ওঠে। রস সৃষ্টির জন্য বিষয় একটি অন্যতম উপাদান। "বিষয়" শব্দটিকে অবজেক্ট হিসেবে গ্রহণ না ক'রে গ্রহণ করতে হবে উপজীব্য হিসেবে। রসকে অবজেক্ট হিসেবে যখন পাই তখন তারমধ্যে (কাব্যের ক্ষেত্রে) বিষয় ছাড়াও ধ্বনি, অলংকার, অর্থ ইত্যাদি উপস্থিত থাকে ও উপাদান হিসেবে কাজ করে। নাটক, সংগীত ও অন্যান্য প্রকার শিল্পের ক্ষেত্রেও রস যখন বিচারের বিষয় (অবজেক্ট) হয় তখন তা একটি সমগ্রসন্ধি—অনেক কিছুর সমাহার : কখনো তা রেখা, রঙ, তাদের বিভিন্ন সংস্থান (চিত্র) ; কখনো তা তান-লয়-মূর্ছনা, ধ্বনি, বাণী (সংগীত)। সকল ক্ষেত্রেই একটি বিষয় হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা রয়েছে। যখন (বাহ্যিক গুণতিতে) একাধিক বিষয়ও উপস্থিত থাকে তখনও তা সব একটি সমগ্রসন্ধিতে, একটি অখণ্ড বিষয়ে, উত্তীর্ণ হবার চেষ্টায় সমাহৃত, একত্র।

সত্যাসত্য বিচারে বুদ্ধির যা ভূমিকা রসবিচারে তা নয়। সত্যাসত্য বিচারের বিষয় বাক্য। রসবিচারের বিষয় হল শিল্পকর্ম। শিল্পকর্মের জন্য বাক্য কখনো প্রয়োজন (যেমন সাহিত্যে) কখনো নিষ্প্রয়োজন (যেমন চিত্রশিল্পে, নৃত্যে ও স্থাপত্যে)। বাক্যটি সত্য কি না তা নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধি কোন-না-কোন মানদণ্ড স্বীকার ক'রে নেয় ; স্বীকৃতির স্বপক্ষে কিছু যুক্তি যোগায় ; কোন বস্তু বা সম্বন্ধ বা গুণের (এক কথায়, "ঘটনা"র) সঙ্গে বাক্যে যা বলা হয় (উচ্চারিত হয়) তার সামঞ্জস্য সন্ধান করে— "দেখাতে" চায়। রসবিচারের ক্ষেত্রে বস্তুজগতে এমন কোন "ঘটনা" আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। রসবিচার শুরু হয় রসের অভিজ্ঞতা হবার পরে। রস অনুভবসিদ্ধ। নান্দনিক সন্তোষ পেয়েছি কি পাই নি ?—এ-জাতীয় জিজ্ঞাসা অর্থহীন, অবাস্তব। রস অনুভব করার পরে বুদ্ধিবৃত্তি বিচারে যা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে তা হল রসানুভূতির উপাদান, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, একক ও সামগ্রিক অবদান।

বাক্য সত্য হয় কিংবা হয় না। যদি বলা হয় "সত্য বা অসত্যেরও স্তরভেদ আছে" তবু স্বীকার করতে হয় যে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক বা ঘটনাশ্রিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যই সন্ধান করে। অবশ্য তার সাফল্যের তারতম্য ঘটে। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পী এই

অর্থে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানী নয়। কখনো সে শৃঙ্গার, কখনো করুণ, কখনো হাস্যরস ইত্যাদি সৃষ্টির চেষ্টা করে। এবং এই চেষ্টার সাফল্যও কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা মাপকাঠি দিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বেই বলেছি, একই "বিষয়" অনেক রস সৃষ্টি করতে পারে, আবার অনেক "বিষয়" একই রস সৃষ্টি করে। নানা উপাদানে এক "বিষয়" ও একই উপাদানে নানা "বিষয়" সৃষ্টি করার যে-ক্ষমতা শিল্পীর আছে তা বিজ্ঞানীর তো দূরে থাক ঐতিহাসিকেরও নেই।

ঔচিত্যতত্ত্বে সংস্কৃত নন্দনতাত্ত্বিকেরা নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন নানা উপাদান—সামাজিক আচার-বিচার, বেশ-ভূষা, শব্দ, অর্থ, পাত্র, অলংকার, ধ্বনি প্রভৃতি—কীভাবে একটি অখণ্ড শিল্পকর্মে সমুচিতভাবে এক হয়ে ওঠে,—একটি প্রধান রস সৃষ্টিতেই সার্থক হয়ে ওঠে। সে-ই মহৎ শিল্পী যিনি নানা চেনা উপাদানসমূহকে ও অ-ভাবিত, অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত উপায়ে একটি অখণ্ড শিল্পকর্মে, একটি রসসৃষ্টির হেতুরূপে, প্রতিবেদন করতে পারেন। উপাদানের আশ্চর্য রূপান্তরণে সার্থক সেই শিল্পীকে আমরা মহৎ বলে স্বীকার করে নিই। সত্য প্রমাণ করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা থেকে সার্থক রসসৃষ্টির চেষ্টা ভিন্ন—উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকেও ভিন্ন; ব্যবহৃত উপায়ের দিক থেকেও ভিন্ন।

ঔচিত্য তত্ত্বের অন্তরালে রয়েছে একটি জটিল রূপ তত্ত্ব। এ জটিলতার অন্ত নেই। অনন্ত এই জটিলতা আপেক্ষিকও বটে: দেশ-কাল সাপেক্ষ ও লোকধর্মী। এক কথায়: রসময় শিল্পকর্ম সমাজাশ্রিত। যে-সব বিভিন্ন, বিচিত্ররূপে একটি শিল্পকর্মের উপাদানসমূহ সমগ্রসন্ধিতে এক হয়ে উঠলে তা সুন্দর বা মধুর ব'লে স্বীকৃতি লাভ করে তা সর্বদেশে সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে সর্বপাত্রে একরকম হয় না। তবু, একথা বোধহয় সত্য যে, রসময় সমগ্রসন্ধির অন্তর্লীন অজস্র রূপ সম্বন্ধে যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট (অমূর্ত-উঁচু) স্তরে চিন্তা করা হয় তাহলে কতগুলি সাধারণ (জেনারেল) রূপ পাওয়া যেতে পারে। এই সাধারণ রূপগুলিকে অব্যতিক্রমী, অনতিক্রম্য ও সামান্যধর্মী (য়ুনিভার্সাল) ভাবলে ভুল হবে। চিন্তার এই দ্বিতীয় (অ্যাবস্ট্রাক্ট) স্তরের রূপের উপর নির্ভরশীল নান্দনিক বিচার, রস-বিচার, নিশ্চয়ই সম্ভব; কিন্তু, সে-বিচার অনেক শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শক্ত হবে। কারণ এই রূপগুলি বিচারের কাঠামোর বর্ণনামাত্র, বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোন শিল্পকর্ম বিচারের উপযুক্ত নয়। অতএব যে-সব ক্ষেত্রে এই রূপ বা নীতিগুলির প্রয়োগ করা সম্ভবও হবে সে-সব প্রয়োগ-ক্ষেত্রের শিল্পকর্ম ও রসবস্তুকে তাদের অনন্যতায়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, বিচার করা হবে না; তাদের "বিচার" হবে এক শ্রেণীর সুন্দর বা মধুর বিষয় হিসেবে। বিচার এবং বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় রূপ বা নীতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে

তা সর্বদা স্মর্তব্য। নান্দনিক বিষয়কে যখন তার বৈশিষ্ট্যে ও বিচিত্রতায় বিচার না ক'রে শ্রেণী বা জাতির পরিচয়ে "বিচার" করা হয় তখন একটা গুরুতর ভুল হয়ে যায়। বিচারের সঙ্গে অনুভব মেলে না। অব্যতিক্রমী শিল্পরূপের সঙ্গে নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের সংযোগসূত্র মেলে না। রসের অভিজ্ঞতার সঙ্গে রসের বিচারে বড় বেশি পার্থক্য থেকে যায়। কান্টের নান্দনিক বিচারতত্ত্বে এই ভুল উহ্য। সংস্কৃত নান্দনিক বিচার তত্ত্বের ঔচিত্যধর্মের সংবেদনশীল বিশ্লেষণ দিয়ে তা বহুলাংশে দূর করা সম্ভব।

রূপ

রূপের অর্থ, রূপক, প্রতীক ও প্রক্ষেপ ॥

"রূপ শব্দটির অর্থ কি?"—এই প্রশ্ন না তুলে বরং বোধহয় প্রশ্ন তোলা উচিত "রূপ শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহার করা হয়?" পরে দেখা যেতে পারে ঐ সব ব্যবহারের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক।

(ক) রামের উচিত হয় নি শ্যামের সঙ্গে ঐ রূপ ব্যবহার করা;

(খ) যদুর বক্তব্য প্রকাশের রূপটি যদি সরল হত তাহলে অনেকেই তা বুঝতে পারত;

(গ) দীর্ঘকাল রোগে ভোগার পরে সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল তার রূপ দেখে' আমি মনে-মনে ভয় পেলাম;

(ঘ) রূপে তোমায় ভোলাব না ভালোবাসায় ভোলাব;

(ঙ) তুমি তার একটি রূপ দেখেছ অন্য রূপটি ছাখোনি, আসলে সে বহুরূপী;

শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি আরো অনেক অর্থে রূপ শব্দের ব্যবহার রয়েছে। (ক) বাক্যে "রূপ" "প্রকার"/"রকম" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (খ) বাক্যে "ভঙ্গি" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "রূপ"-এর অর্থ (গ) বাক্যে "চেহারা," (ঘ) বাক্যে "সৌন্দর্য" এবং (ঙ) বাক্যে "প্রকাশ"/"সাজ"। বাংলা ভাষায় আর যে-সব অর্থে "রূপ" ব্যবহৃত হয় তা হল: আকার, আয়তন, অবস্থা, সামান্যধর্ম, পোষাক, পরিবেশন। ইত্যাদি। ইংরেজীতে রূপ-এর নিকটতম প্রতিশব্দ বোধহয় ফর্ম (Form) যেমন বাংলায় "রূপ" তেমনি ইংরেজীতে "ফর্ম" মূল্যায়নসূচক ও মূল্যায়নহীন দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। "রূপ" যখন প্রকাশ (ক) বা সাজ (ঙ) অর্থে ব্যবহৃত তখন সে ব্যবহার মূল্যায়নবর্জিত, মূলত বিবরণধর্মী। ঐ একই শব্দ সৌন্দর্য (ঘ) অর্থে স্পষ্টতই মূল্যায়নসূচক। কোন শব্দ মূল্যায়নসূচক কি না—তা তার ব্যবহার, পরিবেশ, প্রকাশ-ভঙ্গি,—প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নির্ণয় করা শক্ত। ইংরেজী ফর্ম (Form) শব্দটিও কখনো কখনো নর্ম (Norm) অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফর্ম-এর নানা প্রতিশব্দ আছে—যেমন, শেপ (Shape), স্ট্রাকচার (Structure), সারধর্ম (Essence), সামান্যধর্ম (Universal), রীতি-নীতি (Custom/Etiquette), ছাঁচ বা ছাঁদ (Mould), সাজানোর ভঙ্গি (Pattern), স্টাইল (Style), কিছু করবার দক্ষতা/নৈপুণ্য ("The musician was in the finest form") রূপ ও ফর্ম-এর কিছু কিছু ব্যবহার আছে যা মানসিক অনুষঙ্গবশত প্রথমে

উভধর্মী ব'লে মনে হয়—যেমন, ষ্টাইল। ষ্টাইল এখন বাঙ্গলা শব্দ হিসেবে বাস্তবিক ব্যবহারে স্বীকৃত।

রূপকে কি নিছক রূপ হিসেবেই বোঝা যায়? কোন কিছুর রূপ নয় অথচ রূপ—এ রকম কোন অভিজ্ঞতা হয় কি না? এই দুটি প্রশ্ন আসলে একটি প্রশ্নেরই রকমফের। আর সেই প্রশ্নটি হল: শুদ্ধ রূপের অভিজ্ঞতা সম্ভব কি না? এই প্রশ্নেরই সন্নিকটবর্তী আরেকটি প্রাসঙ্গিক (কিন্তু স্বতন্ত্র) প্রশ্ন হল: রূপ বস্তুভিন্ন সম্ভব কি না? বস্তুভিন্ন রূপ সম্ভব হলেও বস্তুত আছে কি না? শুদ্ধ রূপ আছে কি না এবং থাকলেও তার অভিজ্ঞতা হয় কি না,—এই প্রশ্ন দুটি ভিন্ন।

কিছু কিছু দার্শনিক আছেন, যেমন প্লাতো, যাঁরা মনে করেন, রূপের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। বস্তুভিন্ন রূপ আছে। শুধু নির্বস্তু রূপই নয় জ্ঞানের অতীত রূপও আছে। রূপের জ্ঞান বা অভিজ্ঞান হয় নি ব'লে, প্লাতোর মতে, রূপ নেই বলা ভুল হবে। প্লাতোর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তবে তার যুক্তি কতটা জোরালো সে বিষয়ে মতভেদ আছে। জ্ঞানের অতীত রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করলে স্বীকৃত রূপের স্বরূপ কি—এ' প্রশ্নের উত্তর মেলে না। এ প্রশ্নের উত্তর না মিললে সে বিষয়ে নানা জল্পনা হতে পারে। এবং ঐ সব জল্পনা নানারকম, এমন কি পরস্পর বিরোধীও, হতে পারে। জ্ঞানের বহির্ভূত রূপের স্বরূপ নিয়ে যে-বিতর্ক তা নিরসন করার উপায় নেই। ফলে যে-জল্পনা মিথ্যা/অমূলক তা প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। যে বস্তুভিন্ন রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক ও জল্পনা তা যদি মিথ্যা/অমূলক প্রতিষ্ঠা করা (জ্ঞানের প্রমাণাভাবে) অসম্ভব হয়, তাহলে তার সম্বন্ধে কোন বাক্য সত্য কি না তা প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। সেক্ষেত্রে রূপের স্বতন্ত্র (নির্বস্তু অস্তিত্ব) মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। অবশ্য জ্ঞানতত্ত্বে ও দার্শনিক মহলে প্রমাণসাপেক্ষ কিছু মেনে নেওয়া, ব্যাপারটি খুব একটা আপত্তিজনক কিছু নয়। বরং, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ওটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিবার্য। প্রশ্ন হল: নান্দনিক প্রসঙ্গে সত্যিই এই মেনে নেওয়া ব্যাপারটি অনিবার্য কি না?

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের অতীত, নির্বস্তু, স্বতন্ত্র রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করলে একটা অসুবিধা দেখা দেয় অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা নিয়ে। স্বতন্ত্র রূপটি এই রকম কিংবা ঐ রকম তা যদি আমি না জানি তাহলে সেই (জল্পিত) রূপের সঙ্গে কোন বিষয়বস্তুর আদৌ কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এবং থাকলেও তা নির্ণয় করা সম্ভব কি না—এই প্রশ্ন দুটি উঠবেই। সম্বন্ধ যদি থাকেও কিন্তু তা নির্ণয় করা যদি অসম্ভব হয় তাহলে কেউ নির্ণয়ে ভুল করলে তা নির্দেশ করা বা দেখানো যাবে না। আসলে এখানে আমি দুটি ভিন্ন সমস্যা একই সঙ্গে আলোচনা করছি। এক, আমার বাগানের একটি বিশেষ

গোলাপ ফুলের সঙ্গে কোন একটি অমূর্ত, নির্বস্তু ও স্বতন্ত্র রূপের কোন সম্বন্ধ আদৌ আছে কি না?—থাকলে তা কীভাবে বোঝা যেতে পারে? ফুলটি সেই রূপের অনুকরণ, প্রকাশ, না কি উদাহরণ? দুই, রূপটি যদি যথার্থ ই স্বতন্ত্র হয় তাহলে আমার বাগানের গোলাপ ফুলের সঙ্গে কেন তার সম্বন্ধ হল? কেন রামবাবুর বাগানের গোলাপ গাছের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হল না? রূপ যথার্থ ই যদি স্বতন্ত্র ও নির্বস্তু হয় তাহলে শুধু ফুল ও গাছ কেন নদী ও পর্বতের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ হতে বাধা কোথায়? এক কথায়, সকল বিষয়বস্তুরই পশ্চাদ্বর্তী বা অন্তর্নিহিত রূপ কেন এক নয়? সকল রূপের অন্তর্নিহিত যে-রূপটি আছে, আরিস্ততলের মতে, তার নামই ঈশ্বর; এবং একমাত্র সে-ই যথার্থ নির্বস্তু। অন্য সকল রূপই অল্পাধিক বস্তুআশ্রয়ী। জড়স্তর, উদ্ভিদস্তর, প্রাণীস্তর ও মানসস্তরে বস্তুভার ক্রমে ক্রমে কমে আসে এবং রূপের শুদ্ধতা পরিস্ফুট হতে থাকে। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করলে পরোক্ষে রূপের স্বতন্ত্র সত্তা (ঈশ্বর ব্যতীত) অন্য সকল ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়।

রূপ ও বস্তুর দ্বৈততা, মৌল পার্থক্য, স্বীকার করা খুব শক্ত। অন্তত নান্দনিক অভিজ্ঞতায় এই দ্বৈততা অনুপস্থিত। ঈশ্বর-অভিজ্ঞতা শুদ্ধ রূপের অনন্য উদাহরণ কি না,—এ বিষয়ে "হাঁ" বা "না" বলার ক্ষমতা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, আমার নেই। বরং আমার চেতনায় রূপ সর্বদাই কোন কিছুর রূপ ব'লে দেখা দেয়, ভেসে ওঠে। এমন-কি যখন সক্রিয় চিন্তায় অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে সাজাই, বিশ্লেষণ করি, তখনো শুদ্ধ রূপের সাক্ষাৎ পাই না। নান্দনিক অভিজ্ঞতার বিষয়কে যখন আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করি তখনি মনে হয় আমরা রূপ ব'লে যাকে বস্তু থেকে বিশ্লিষ্ট ভাবে, বিচ্ছিন্ন ক'রে, দেখতে চাই তা হয় কোন বস্তুর প্রতীক বা অনুভবের প্রক্ষেপ কিংবা ধ্যান-ধারণার রূপক।

প্রতীক, প্রক্ষেপ ও রূপক—এই কথাগুলি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এদের বিশ্লেষণ আবশ্যক। রূপকে প্রতীক হতে হলে রূপক যে বস্তুর প্রতীক তার সঙ্গে রূপকের ন্যূনতম একটা যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকা দরকার। কি কি শর্ত পালিত হলে একটি নির্দিষ্ট রূপ প্রতীক হতে পারে?

প্রতীকতা একটি স্বাভাবিক' ধর্ম নয়। আমরা বলি, "সবুজ রঙ যৌবনের প্রতীক", "গৈরিক রঙ ত্যাগের প্রতীক" এবং "শুভ্রতা পবিত্রতার প্রতীক।" শিবলিঙ্গকে কখনো কখনো শক্তি বা সৃষ্টির প্রতীক বলা হয়। ক যদি হয় প্রতীক এবং খ প্রতীকিত, ক ও খ-র সম্বন্ধ অন্তর্নিহিত, অনিবার্য নয়। কেউ কেউ মনে করেন, ক ও খ-র সম্বন্ধ বাহ্যিক, সামাজিক রীতি-নীতি উদ্ভূত। রূপ প্রতীক হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। রেড ক্রস "+" শুধু একটি লাল রঙের ক্রসই নয়,—একটি বিশেষ চরিত্রের

আন্তর্জাতিক (শান্তি সেবা) সংস্থা। লাল রঙের ঐ ক্রসটি (ঐ রূপটি) যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সেবার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছে তার একটি ইতিহাস আছে। লাল ত্রিকোণ ভারতবর্ষে জন্মনিরোধ বা পরিবার পরিকল্পনার প্রতীক। এরও একটি সামাজিক পশ্চাদপট আছে। সামাজিক ও ঐতিহাসিক রীতি-নীতি কখনো কখনো রূপকে প্রতীকে পরিণত করে। কখনো কখনো রূপকে প্রতীকে পরিণত করার জন্ম সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। "+" প্রতীকটি বীজগণিতে, গণিতশাস্ত্রে বা যুক্তিবিজ্ঞানে যোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ সংজ্ঞা-নিরূপিত। "–" "→", প্রভৃতি যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতীকগুলির অর্থ সংজ্ঞা-নিরূপিত ;—সমাজ বা ইতিহাসের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খুবই পরোক্ষ।

সব রূপই যে প্রতীক হবে এমন কোন কথা নেই। রূপকে প্রতীক হবার জন্ম একটি সিদ্ধান্তের উপস্থিতি প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত কখনো রীতি-নীতির মধ্যে, কখনো-বা সংজ্ঞার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। শুধু সিদ্ধান্ত থাকলেই রূপ প্রতীক হয় না, ঐ সিদ্ধান্তটি কি তা-ও জানা দরকার। অজানা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রূপ প্রতীক হতে পারে না।

সব রূপ প্রতীক হোক আর না-ই হোক সব প্রতীকেরই একটি না একটি রূপ আছে। প্রতীকের এই রূপধর্মিতা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। রূপের প্রতিকধর্মিতা-ই নন্দনতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতীক দু'রকম : সরল ও জটিল বা-যৌগিক। শিল্পকর্মে সরল প্রতীকের (যথা, "+", '–", ">") তাৎপর্য খুব সীমিত। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বা পশ্চাদপটে সরল প্রতীকও তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারে। তবে তা সচরাচর ঘটে না। এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রশিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যেমন মণ্ড্রিয়ান, হার্বিন ও হার্টুঙ্গ, যাদের ছবির প্রতীকধর্মিতা প্রথম দেখায় মনে হয় বেশ সরল। পরে সযত্নে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা নয়। অবশ্য সরলতা-জটিলতা সর্বদাই আপেক্ষিক। শিল্পকর্মে "প্রতীক" পদটি জ্যামিতি বা গণিতের অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। শিল্পকর্মকে প্রথমে শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে হবে। তা হতে গিয়ে শিল্পকর্মটি একটি সমগ্রসজ্ঞির রূপ নেয়। শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্রসজ্ঞিই প্রতীক।

প্রতীকের তুলনায় রূপক ব্যবহারে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতা বেশী। ক যদি খ-এর রূপক হয় তবে তাদের সাদৃশ্য খুব সীমিত হলেও অসুবিধা নেই। সংজ্ঞা বা রীতি-নীতি যা দিয়েই প্রতীক ও প্রতীকিতের সম্বন্ধ নির্ণীত হোক না কেন এ সম্বন্ধ রূপক ও রূপকায়িতের সম্বন্ধের তুলনায় অনেক বেশি স্থির ও নির্দিষ্ট। অনুকৃতির সীমানা রূপকের সম্ভাবনা ও সূচনা সৃষ্টি করে। যা রূপকায়িত তার যদি হুবহু অনুকরণ করা হয় তাহলে রূপক বাহুল্যমাত্র। অনুকরণ-অথচ-রূপান্তরণ রূপকের প্রাণধর্ম। দ্বিতীয়তঃ, রূপকের

মাধ্যমে যা প্রকাশ (রূপকায়িত) করার চেষ্টা হয় তা সৃজনধর্মে কিছুটা নতুন হতে বাধ্য। যা রূপক এবং যার রূপক তা যদি একই হয় তাহলে আক্ষরিক অর্থ/বাক্য ও রূপক অর্থ/বাক্যের পার্থক্য থাকে না। রূপক কি তাহলে রূপকায়িতের পরিবর্তে (বিকল্প হিসেবে) ব্যবহৃত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর অংশত "হাঁ" অংশত "না"। রূপক যদি রূপকের বিকল্প হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বা অচল হয় তাহলে রূপকায়িতের সঙ্গে তার সীমিত সাদৃশ্যও অস্বীকৃত হয়। পক্ষান্তরে, রূপক যদি রূপকায়িতের নিছক বিকল্প হয় তাহলে তার মধ্যে সৃষ্টিধর্ম, নতুনত্ব বলতে কিছুই থাকে না। আসলে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপক ও রূপকায়িতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে। কেউ যখন বলে "অমুকে কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে" তখন ফুলঝুরি যেমন কথার রূপক কথাও (রূপকায়িতও) তেমনি ফুলঝুরির সঙ্গে সাদৃশ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধবদ্ধ ও কতোগুলি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

প্রতীক ও রূপক থেকে প্রক্ষেপ পৃথক। প্রতীক প্রক্ষেপ হতে পারে যখন সে প্রতিবিম্ব বা অনুকরণ না হয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র অর্জন করে। প্রক্ষেপে একটি বিষয়ের একটি বিশেষ দিক বা গুণকে বড়ো করে, প্রাধান্য দিয়ে দেখানো হয়। ইতিপূর্বে আমি বলেছি, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতীক সাধারণত সরল হয় না,—তার সমগ্রসন্ধিতে একাধিক উপাদান, কখনো কখনো একই উপাদানের বিভিন্ন রকমফের, দেখা যায়। জটিল উপাদানের মধ্য থেকে যখন প্রতীকের একটি উপাদান প্রাধান্য—সমধিক গুরুত্ব—দিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন সেই প্রকাশকে আমি প্রক্ষেপ বলি। আমাদের চোখ, ক্যামেরার লেন্স, যা সব দেখতে পায় তার সবটাই ফোকাস-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যা ফোকাস-এর বহির্ভূত তা যদিচ দৃশ্য, বা এমন-কি দৃষ্ট, তা স্রষ্টার শিল্পদৃষ্টিতে সমধিক গুরুত্ব পায় না এবং তার ফলে সৃষ্টিকর্মেও গুরুত্ব পায় না। সৌন্দর্য অনুভবের বিস্তীর্ণ ও জটিল সংগ্রহ থেকে শিল্পী বিশেষ একটি বা কয়েকটি উপাদান (তা বর্ণ হতে পারে, ধ্বনি হতে পারে, বা কাহিনীর অংশবিশেষও হতে পারে) বেছে নেয় এবং তার উপর সে প্রযত্নের বা প্রয়াসের সমধিক আলোকসম্পাত করে। ব্যালে বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেক চরিত্রের মধ্যে একটি বিশেষ চরিত্রের উপর লেখক/পরিচালক সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং তার ফলে রসিক দ্রষ্টার দৃষ্টিও তাকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়; রসিকের রসবোধ ঘনীভূত হয়। সার্থক প্রক্ষেপণে রূপের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য। অনুভূতির সমতল ভূমি বা অভিজ্ঞতার নাতিঅসমতল ভূমি থেকে একটি/কয়েকটি উপাদানকে বিশেষভাবে শিল্পরসিকের কাছে তুলে ধরবার জন্য রূপকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। রূপ বিষয়বস্তুকে শুধু সংহতি প্রদান ও প্রকাশই করে না,—প্রাধান্য দিয়ে প্রক্ষেপও করে।

বিষয় রূপ ও প্রকাশ॥

কোন বিষয়ই—তা সে বস্তুজগতের, উদ্ভিদ্‌জগতের বা সমাজজগতের যে-স্তরেরই হোক না কেন—বিষয়রূপে শিল্পধর্মী ব'লে বিবেচিত হয় না।—"হতে পারে না",—আমি বলব না। শিল্পধর্মী হবার জন্যে বিষয়ের মধ্যে বাড়তি কিছু থাকা চাই। এক অর্থে, যা বাড়তি থাকে তা বিষয়েই অন্তর্নিহিত,—এবং সেজন্যে বাড়তি নয়। অন্য অর্থে, এবং এটা শিল্পকর্ম ব'লে বিবেচিত হবার অর্থে, যা বাড়তি তা বিষয়ের বহির্ভূত, বাইরে থেকে দেওয়া, চাপানো, সাজানো। দ্বিতীয় অর্থে শিল্পকর্মমাত্রই অল্পাধিক বিকৃত,—কৃত্রিমতার দোষে দুষ্য। অনেকেই হয়তো বলবেন এ দোষ প্রয়োজনীয়। তা না হলে সাধারণ বিষয় (বস্তু) শিল্পের (বস্তু) বিষয় হয়ে ওঠে না। "বাড়তি" যে "বহিরাগত" গুণের জন্য সাধারণ বিষয় শিল্পের বিষয় হয়ে উঠতে পারে মূলত তা রূপ।

রূপ সত্যিসত্যিই বাড়তি ও বহিরাগত কি না তা নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। রূপ যদি বিষয়ের বহির্ভূত এবং সেজন্য বিষয়-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বহিরাগত ব'লে ধরা হয় তাহলে কতগুলি অসুবিধা স্বীকার করতে হয়। এক, শিল্প প্রত্যক্ষের বিষয়টি রূপ-বিহীন অবস্থায় থাকতে পারে। দুই, রূপবিহীন বিষয়ের প্রত্যক্ষ, এক্ষেত্রে শিল্প প্রত্যক্ষ, সম্ভব। এই দুটি কথাই স্বীকার করা শক্ত। কারণ, রূপ-বিহীন বিষয়ের অস্তিত্ব ধারণা, এমনকি কল্পনা, করা শক্ত; প্রত্যক্ষ করা তো আরো শক্ত। তাছাড়া, আমি ভেবে পাই না কীভাবে একটি বিষয় (বস্তু) রূপ-বিহীন অবস্থায় শিল্পের বিষয় হতে পারে। তাহলে কি আমাদের এ'কথাই মেনে নিতে হবে যে, শিল্পের বিষয় সৃষ্টিতে ও প্রত্যক্ষে রূপ নিষ্প্রয়োজন? বলাবাহুল্য, এ কথা আমাদের কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গেই মেলে না।

পক্ষান্তরে, অভিজ্ঞতার—এমন কি কল্পনা ও চিন্তারও—বিষয়মাত্রই রূপময়, রূপমণ্ডিত বা রূপাশ্রিত। সমুদ্রে স্বর্ণরক্তিম সূর্যাস্ত, সবুজ ধানের ক্ষেতে হাওয়ার হিল্লোল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুর নির্মল হাসি, ছায়ানট বা জয়জয়ন্তীর মধুর সুরমূর্ছনা···নান্দনিক যে-কোন কথাই ভাবি বা প্রত্যক্ষ করি না কেন তার রূপ, একাধিক রূপের সমন্বয়ে গঠিত একটি রূপ সংগ্রহ অনস্বীকার্য। রূপ কখনো বিষয়ে অন্তঃস্থ বা অন্তর্নিহিত, যেমন গল্প সাহিত্যে, আধুনিক বাঙ্গালা গানে, কন্‌স্টেবল্‌-এর নিসর্গচিত্রে (*Salisbury Cathedral from the Meadows*, ১৮৩১); কখনো বা দেখা যায় বিষয়বস্তু গৌণ ও রূপ প্রধান, যেমন কাব্যে (রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী", টেনিসনের "Lady of Shalott"), ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতে, হেনরী মুর (*Recumbent figure*, ১৯৫৩-৫৪) ও পল্‌ ক্লী'র চিত্রে (*The Step*, ১৯২৩), এবং গথিক গির্জার স্থাপত্যশিল্পে। বিষয়বস্তু ও রূপের মধ্যে সম্বন্ধ, বলাবাহুল্য, নানারকম বা স্তরের হতে পারে। যদিচ সুবিধার জন্য আমরা এই বহুতর সম্বন্ধের মধ্যে

জিওট্টোর ফ্রেস্কো, পোসাঁ, পিয়েরো দেল্লা ফ্রান্সেস্কো ও সেজান্ প্রমুখ প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে কোন গুনটি সাধারণ? বেলের মতে এ প্রশ্নের মাত্র একটিই উত্তর আছে: অর্থময় রূপ ("significant form")। প্রতিটি শিল্পকর্মে, কতগুলি রূপ ও রূপনিচয়ের সম্বন্ধ বিশেষভাবে সংগ্রহিত ও ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে আমাদের নান্দনিক অনুভাবাদি জাগ্রত করে। কতগুলি রেখা ও রঙের সমন্বয় এবং রূপনিচয়ের সম্বন্ধ আমাদের নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে উদ্বুদ্ধ ও পরিবর্ধিত করে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা উদ্বোধনকারী এই রূপগুলিকেই বেলে অর্থময় রূপ ব'লে অভিহিত করেছেন। দৃশ্য সকল শিল্পকর্মের মধ্যে যে-গুণটি সাধারণ তার নাম অর্থময় রূপ।[৩]

তাঁর মতে, রূপের অভিজ্ঞতা মানসিক হলেও রূপ মানসিক নয়। রূপ যে মানসিক নয় তা প্রমাণ করবার জন্য তার স্বাতন্ত্র্য ও দেশ-কাল-নিরপেক্ষ চরিত্রের উল্লেখ করা হয়। অর্থময় রূপের অর্থময়তা কোন ব্যক্তিবিশেষের রুচি বা মানসিকতার উপর নির্ভর করে না। নান্দনিক অভিজ্ঞতায় শিল্পরসিকের যা থাকা দরকার, বেলের মতে, তা হল রূপবোধ, বর্ণবোধ, ত্রি-আয়তন দেশের জ্ঞান। রূপ, বর্ণ ও দেশ সম্পর্কে এই বোধ সুস্থ সবল প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থময় রূপ দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। রূপের অর্থময়তা শুধু ব্যক্তি-নিরপেক্ষই নয়, দেশ-কাল-নিরপেক্ষ ও বটে। রূপ বস্তুত স্বাধিষ্ঠিত, স্বতন্ত্র।

অর্থময় রূপমাত্রই যে সুন্দর রূপ হবে,—এমন কোন কথাই নে। এ দুই রূপের মধ্যে ক্লাইভ বেল যে পার্থক্য করেছেন তার তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। রঙীন প্রজাপতি, পাখি বা ফুলের সুন্দর রূপ স্বভাবতই যে অর্থময় রূপ তা নয়। নৈসর্গিক রূপমাত্রই নান্দনিক রূপ নয়। বেলের এই কথা মুর-কথিত ন্যাচারালিষ্টিক ফ্যালাসিকে [বা মূল্যায়ন-মূলক গুণকে প্রাকৃতিক/নৈসর্গিক গুণের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার ভুলকে] স্মরণ করিয়ে দেয়। তথাকথিত এই ভুলের যে কথা বলা হচ্ছে তার অন্তরালে রয়েছে প্লাতোর দ্বৈতবাদ: রূপ-জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাকৃতিক জগৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জগৎ; রূপ-জগৎ অতীন্দ্রিয়, বোধি-গ্রাহ্য। শুধু রূপ-জগৎ ও প্রাকৃতিক জগতের নয় বুদ্ধি/বোধির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের দ্বৈততাও নান্দনিক রূপবাদীদের বক্তব্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বা বস্তুজগতে যা কিছু সুন্দর আছে তার নান্দনিক মূল্য নির্ভর করে তাদের অর্থময় রূপের উপর। এই রূপবোধ যার নেই সে সৌন্দর্য উপভোগ করতে, এমন-কি উপকরণ মূল্য হিসেবে সৌন্দর্যকে ব্যবহারও করতে, পারে; কিন্তু নান্দনিক চেতনার সিংহদ্বার সে অতিক্রম করতে পারবে না। স্থানান্তরে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অনুকৃতির আধিক্য

পরিহার্য হলেও অনুকৃতি অনিবার্য। প্রশ্ন হল : অনুকৃতি কিসের? ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (প্রাকৃতিক, সামাজিক) জগতের, না কি অতীন্দ্রিয় রূপ-জগতের।

বলাবাহুল্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক জগতের রূপগুলি এক রকম নয়। সামাজিক জগতের রূপগুলি বিচিত্র, ভঙ্গুর এবং নির্ণয় করা খানিকটা বুদ্ধিবিচার সাপেক্ষ। তুলনায় প্রাকৃতিক রূপগুলি অধিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, স্থায়ী ও কম বিচিত্র। রূপবাদীরা বলেন, বিষয়াশ্রিত হয়ে যত বিচিত্রই প্রতিভাত হোক না কেন মূলত রূপসমূহ,—প্রাকৃতিক ও সামাজিক রূপসমূহ, একই রকম। বহু বিষয়ের আশ্রয়ে বা অধিকরণে একই রূপ অনেক রূপ, কেউ বলবেন রূপান্তর, পরিগ্রহ করে।

আসলে রূপ এক কিংবা অনেক? রূপ অনেক হলেও অনন্ত কি না? এই দুটি প্রশ্নকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখা যায়, আবার সম্পর্কিতভাবেও দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, রূপ মূলত এক, বাহ্যত অনেক। রূপের ঐক্য বোধি-গ্রাহ্য, বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। বৈচিত্র্য ঐক্যের প্রকাশ। ঐক্য বৈচিত্র্যের পরিণাম বা লক্ষ্য। মতান্তরে, ঐক্য বৈচিত্র্যের উৎস ও পরিণাম দুই-ই। রূপসমূহ বিস্তার বা ব্যাপকতায় স্তরে বিভক্ত এবং (সীমিত রূপক অর্থে) পিরামিডের মতো।

আবার অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, রূপ শুধু অনেক নয়, স্বতন্ত্র ও অনন্ত। রূপের স্বাতন্ত্র্য অসীম এবং বৈচিত্র্য অনন্ত। এ-কথা মানলে সৃষ্টি মাত্রই হয়ে দাঁড়ায় অনুকরণ অথবা রূপান্তর। সৃষ্টি-প্রতিভা বস্তুত হয়ে দাঁড়ায় রূপান্তরণের কৌশল কিংবা অনুকরণের নৈপুণ্য। তাছাড়া শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে-ধারণাটির উপর আমি খুব গুরুত্ব আরোপ করছি সেই ধারণাটি—সমগ্রসন্ধি,—সবকিছু মিলিয়ে এক-হয়ে-ওঠা,—অর্থহীন ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ আমরা জানি সমগ্রসন্ধি নান্দনিক অভিজ্ঞতার অন্যতম মূল কথা।

রূপের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রূপবাদীদের মধ্যে উগ্রপন্থীরা এমন একটা মতবাদের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ায় যার নাম দেওয়া যায় রূপসর্বস্ববাদ। ক্লাইভ বেল বিষয়বস্তুহীন রূপের কথা বলেছেন। যদিও এ রূপকে তিনি নান্দনিক না বলে পরাতাত্ত্বিক বলার পক্ষপাতী। রোজার ফ্রাই রূপের দৈশিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ও নাট্যধর্মী বিষয়বস্তুর একটি সজ্ঘাতের কথা প্রায়ই বলেন। তাঁর মতে, রূপ ও বিষয়ের মিলন কখনো সম্পূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ হয় না। শিল্পীর শিল্পকর্ম শুদ্ধ রূপকে কখনো নিখুঁত ভাবে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারে না। মানুষের সৃষ্ট সকল শিল্পকর্মই শুদ্ধ রূপের অসম্পূর্ণ অনুকরণ। এ-প্রসঙ্গে প্লাতোর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মর্তব্য : মানুষের সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুচ্চ আকৃতি কিংবা অস্পষ্ট অনুকৃতি মাত্র।

নান্দনিক অভিজ্ঞতা মূলত বুদ্ধির ব্যাপার নয়। বুদ্ধির ভূমিকা নিশ্চয়ই এতে আছে কিন্তু মূল ভূমিকা বুদ্ধি-আশ্রিত ইন্দ্রিয়াদির (মন, কল্পনাসহ)। নান্দনিক অভিজ্ঞতা পরোক্ষত বিষয়ের, প্রত্যক্ষত বিষয়-উদ্ভূত মনের অনুভব, চিত্রকল্প অথবা অন্য কোন প্রতিনিধিত্বসূচক "প্রতীক"-এর। বিষয়ের যে "প্রতীক" মনে ধরা পড়ে তা এক অর্থে বিশুদ্ধ ও মুক্ত। বিচার বিষয়ীমুখী ব'লেই এই বিশুদ্ধতা ও মুক্তি সম্ভব। বিষয় যদি বিষয় হিসেবেই অর্থাৎ কোন প্রতীক-প্রতিনিধির মাধ্যমে না এসে মনের কাছে উপস্থাপিত হত তাহলে নান্দনিক বিষয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়ের পার্থক্য করা সম্ভব হত না। বিষয় যেমন বস্তু নয় বিষয় তেমনি একান্তই বিষয়ী-সৃষ্ট কিছু নয়। নান্দনিক বিষয়ের অস্তিত্ব বিষয়ী-নির্ভর হলেও তার বিচার নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। মানবিক বিচার-বুদ্ধির কতকগুলি আদর্শ আছে। কান্ট মনে করেন এই আদর্শগুলির সঙ্গে অ-পরিকল্পিত বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন বিষয়-প্রতীক-প্রতিনিধিগুলির সম্মিলন ও সামঞ্জস্য ঘটে তার অনুভবই নান্দনিক। এই সামঞ্জস্য কারণবিহীন। এ একরকম উদ্দেশ্যহীন পরিণতি। মানসিক বিচার-বুদ্ধি-সৃষ্ট নান্দনিক বিষয়ে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বলোকের অস্পষ্ট আভাস (অনুকৃতি নয়) আছে। নন্দনলোকের আভাস থেকে তত্ত্বলোকের জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে, এ কথাও স্বীকার্য যে, নন্দন লোক প্রাকৃতিক জগৎ থেকেও পৃথক। নান্দনিক গুণগুলি ঠিক প্রাকৃতিক গুণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ঐ গুণগুলি রূপ-প্রধান এবং বুঝবার বিষয়। সীমিত অর্থে কান্টও রূপবাদী। তবে কান্টের রূপবাদ প্লাতো বা বমগার্টেনের মতো উগ্র নয়। নান্দনিক বিষয় কখনো শুদ্ধ রূপ-নির্ভর নয়,—তাতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়েরও অবদান আছে। কান্টের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে রূপবাদের প্রতি তার আস্থা সীমিত। তাছাড়া নান্দনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তি কল্পনা ও বুঝবার ক্ষমতা,—বুদ্ধিবৃত্তি নয়। বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জ্ঞানাত্মক বিচার সম্ভব। নান্দনিক বিচার মূলত জ্ঞানাত্মক নয়,—ধারণা বিধৃত নয়। তবু যে নান্দনিক বিচার যথার্থই বিচার এবং সঞ্চারণ করা যায়; তার কারণ (ক) যে-বিষয় ঘিরে নান্দনিক অভিজ্ঞতা দানা বাঁধে সেই বিষয় মানুষের মন দ্বারা নির্ণীত হলেও সৃষ্ট নয় এবং (খ) সেই বিষয়ের রূপের দিকটি অন্তত ব্যক্তিমানুষের খেয়াল-খুশি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সংস্কার এবং ইন্দ্রিয়াদির অস্থিরতা-চঞ্চলতা দ্বারা প্রভাবিত নয়। নান্দনিক বিষয়ের অভিজ্ঞতায় মানুষ মাত্রই আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দের মূলে রয়েছে বিচার-বুদ্ধির আদর্শের সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের বর্ণ-গন্ধাদিপূর্ণ প্রতীক-প্রতিনিধির মুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত সম্মিলন। বিচার বুদ্ধির আদর্শ (নর্ম) গুলি বস্তুত একপ্রকার রূপ (ফর্ম)। রূপ যখন পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে স্বীকৃত ও অনুসৃত হয় তখন তা আদর্শ হয়ে ওঠে।

বিষয়-বস্তুর সঙ্গে রূপের সামঞ্জস্য অন্তর্নিহিত না কি আরোপিত,—এ বিতর্ক বহুকালের। যাঁরা নন্দনতত্ত্বকে মূলত অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখার পক্ষপাতী তাঁরা রূপের আরোপিত চরিত্রের উপর জোর দেন। যেমন, ইংরেজ দার্শনিক ডেভিড হিউম। তাঁর মতে, রূপ হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নির্যাস। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের ফল। তবু যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়-বস্তু থেকে মানুষ সাধারণ কতগুলো রূপ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তার কারণ ব্যক্তিমনের সাধারণীকরণের অবরোহী (ইণ্ডাক্টিভ) সামর্থ্য। অভিজ্ঞতাবাদীরা রূপের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন না। রূপের অতীন্দ্রিয় ও জগদতিরিক্ত চরিত্রেরও তাঁরা বিরোধী। তাঁদের মতে, বিষয়বস্তু আরোহী প্রক্ষেপ থেকেই রূপগুলি উদ্ভূত। অবরোহী ক্ষমতা মনেরই ক্ষমতা। রূপগুলো সম্ভব হয় এই মানসিক ক্ষমতাবলেই। রূপ মন-নির্ভর, স্বতন্ত্র নয়। রূপ যদি বিষয়বস্তুর মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয় তার কারণ রূপ বিষয়-বস্তু থেকে আহরণ করা। আর রূপের সঙ্গে যে বিষয়-এর ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য সম্ভব হয় তার কারণও সহজ: বিষয়-বস্তু থেকে উদ্ভূত রূপ বিষয়বস্তুরই অনুরূপ। বিষয়বস্তু স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ তুলনায় অস্পষ্ট। স্পষ্ট বিষয়বস্তু ও অস্পষ্ট রূপের মধ্যবর্তী হল অর্ধ-অস্পষ্ট চিত্রকল্প। বিষয়-জগৎ ও রূপ-জগতের দ্বৈততা অভিজ্ঞতাবাদীরা স্বীকার করেন না। ফলে তাঁদের পক্ষে এই দু' জগতের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা করা কিছু কঠিন নয়।

নান্দনিক গুণগুলিকে তাঁরা অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় স্বীকার করতে রাজী নন। নান্দনিক গুণগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সুখপ্রদ। প্লাতোর প্রশ্ন "কেন বিভিন্ন সুন্দর বিষয় সুন্দর?" হিউমের কাছে গভীর অর্থবহ নয়। তাঁর উত্তর: "সুখপ্রদ রূপের অনুরূপ ব'লে।" "কতগুলি রূপ কেন সুখপ্রদ?" কিংবা "কতগুলি রূপ কেন বেদনাদায়ক?"—এ-জাতীয় প্রশ্নের কোন গূঢ় পরাতাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে ব'লেও হিউম বিশ্বাস করেন না। মানুষ যে-জাতীয় রূপের অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত, যে-জাতীয় রূপ ঐতিহ্য ও রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং, সর্বোপরি, সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়ের কাছে পীড়াদায়ক ও অসমঞ্জস নয় সে-জাতীয় রূপকেই মানুষ সুখপ্রদ ব'লে মনে করে। কোন রূপই অতীন্দ্রিয় লোকের উপমা বা অনুকরণ নয়। কোন রূপই চিরন্তন, সর্বগ্রাহ্য ও সার্বভৌম নয়। রূপমাত্রই দেশ-কালের সীমায় অল্পাধিক আবদ্ধ।

"বিষয়বস্তুতেই রূপ নিহিত" এবং "রূপেই বিষয়বস্তু নিহিত" এই দুটি চরমপন্থী মতবাদের একটিই সুবিধা: আর তা হল দ্বৈততার "অবসান।" এই "অবসান"কে অনেকেই, যেমন আরিস্ততল ও কান্ট, সমস্যার সমাধান ব'লে স্বীকার করতে অসম্মত। চরমপন্থীরা বিপরীত দিক থেকে রূপ ও বিষয়বস্তুর পর্যায়গত বিভিন্নতা ছাড়া অন্য কিছু,

বৈপরীত্য বা দ্বৈততা, স্বীকার করতেই রাজী নন। চরমপন্থী মতবাদের অসুবিধা অনেক। যদি বলা হয় "বিষয়বস্তুতেই রূপ নিহিত" তাহলে "রূপ সৃষ্টি" "রূপান্তর" এবং এ-জাতীয় ধারণাগুলি অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে রূপ সৃষ্টি মাত্রই সাধারণীকরণ—বিভিন্ন বিষয়বস্তুর তুলনীয় বা উপমেয় বৈশিষ্ট্যগুলির আরোহী সংগ্রহ মাত্র। অথচ আমরা জানি শিল্পকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য অনন্যতা, অ-সাধারণতা। ক্রোচে সর্বদা বলতেন, আর্ট যখনই সাধারণ গুণ অর্জনের চেষ্টা করবে তখনই আর্ট স্ব-চরিত্রভ্রষ্ট হবে এবং বিজ্ঞানধর্মী হতে থাকবে। আমি স্বীকার করি, প্রত্যেক বিষয়বস্তুর মধ্যেই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে বাধ্য, কিন্তু, মনে রাখা ভালো, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি—তা সে দৈশিক বিস্তার, বর্ণ বা যা'ই হোক না কেন—বিষয়বস্তুকে শিল্প করে তোলে না। আর, যদি বলা হয় "রূপেই বিষয়বস্তু নিহিত" তাহলে প্রশ্ন ওঠে : "নিহিত বিষয়বস্তু রূপ থেকে কিভাবে সমুৎপন্ন ও সম্ভব হয়?" এ-প্রশ্ন প্রসঙ্গে যাঁরা প্লাতোর মতো মনে করেন যে রূপ-জগৎ চিরন্তন নিশ্চল, ও নিষ্ক্রিয় তাঁদের খুব অসুবিধাজনক। কোন শক্তি বা ক্রিয়ার ফলে রূপ থেকে বিষয়বস্তুর উদ্ভব হয়? যদি বলা হয়, "মানসিক শক্তি" তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, রূপসমূহ মূলত মানসিক ; যা প্লাতোর মতো জগদতিরিক্তবাদীরা মানতে রাজী নন। যদি বলা হয় "ঈশ্বরের শক্তি" তাহলে স্বীকার করতে হয় শুধু বিষয়বস্তু নয় শিল্পবস্তুও মূলত ঈশ্বরের সৃষ্টি,—মানুষ অক্ষম অনুকরণকারী মাত্র।

রূপ ও বিষয়বস্তুর দ্বৈততা, অনেকের মতে, নিছক কল্পনা। তাঁরা মনে করেন, রূপ বিষয়বস্তুতে অনুস্যূত কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়, বিষয়বস্তু স্বভাবতই রূপময়। রূপ ও বিষয়বস্তুর ঐক্য জৈবিক। জীব যখন ভ্রূণাকারে থাকে তখন তার রূপ দৃশ্য বা বোধ্য না হতে পারে, কিন্তু তার নির্দিষ্ট রূপ আছে। জীবের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ বা আকার, গঠনভঙ্গি স্পষ্ট হতে থাকে। এই রূপ জীবদেহের বহির্ভূত কোন খোলস বা পোষাকের মতো নয় যে ইচ্ছামতো পরানো ও খোলা যাবে। রূপ জীবদেহেরই অন্তঃস্থ প্রকাশ ও বিকাশ ভঙ্গী। এই মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন ডিউইট হেনরী পার্কার[8]। তাঁর মতে, শিল্পকর্মের মূল নিয়ামক সূত্রটি হল রূপ। রূপের প্রকার বহু,—যথা, বক্তব্য বা যা প্রকাশিতব্য, বক্তব্যের বিভঙ্গ, ভারসাম্য, ছন্দ, তান-লয়, স্তরবিন্যাস, বিবর্তন, ক্রম-বিকাশ, পারম্পর্য, সমন্বয়, বিরোধ ইত্যাদি। জৈব ঐক্যের বৈশিষ্ট্য হল বাহুল্যবর্জিত পূর্ণতা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমন্বয়, বিচ্ছিন্ন না-হয়েও-স্বয়ন্তর, অন্তর্লীন পারস্পরিক সম্পর্ক, একের মধ্যে বহুর অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। বিধর্মী উপাদান নিয়ে জৈব ঐক্য হতে পারে, যেমন অর্থের দিক বাদ দিয়ে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের (ছবিতে), শব্দের সঙ্গে শব্দের (গানে বা বাদ্যযন্ত্রে)। ছবি হল না অথচ বর্ণের সঙ্গে বর্ণের বিমূর্ত ঐক্য হতে পারে,

সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সমুদ্র অথবা পর্বত। শব্দে শব্দে ঐক্য সৃষ্টি হল অথচ সঙ্গীত হল না এমন উদাহরণ তো হামেশাই মেলে, যেমন পর্বতের গা'-বেয়ে-ঝরা ঝর্ণাধারায়, শব্দতত্ত্বের গ্রন্থে। ঐক্য স্তর ভেদে কমবেশি মূর্ত, বিচিত্র ও জটিল হতে পারে। গানের বাণী-রূপ ও রাগ-রূপের ঐক্য শিল্পধর্মী, মূর্ত এবং অল্পাধিক বিচিত্র ও জটিল। যখন বাণী-রূপের উচ্চারণ ও অর্থ এবং রাগ-রূপের ধ্বনি ও তাৎপর্য যুগপৎভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে পরিবেশন করা হয় তখন যে সামগ্রিক ঐক্যটি (সমগ্রসন্ধি) গড়ে ওঠে তার রূপটি শুধু মূর্ত নয় খুব বিচিত্র ও জটিলও বটে। পার্কার ফ্রয়েডকে অনুসরণ ক'রে বলেন, শিল্পকর্ম ইচ্ছা পূরণের একটি অভিব্যক্তি। ইচ্ছার জটিলতা ও বিচিত্রতা শিল্পকর্মে সম্পূর্ণভাবে না হলেও আভাসে-ইঙ্গিতে উপস্থিত। মনে, বা নির্জ্ঞান মনে, ইচ্ছার যে-রূপে উদ্ভব হয় বিকাশের মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তন হয় এবং, পরিণামে, প্রকাশ স্তরে তার রূপান্তর প্রায় অবশ্যম্ভাবী। প্রকাশিত রূপ থেকে বিকাশের ও উদ্ভবের রূপ অনুমান করা হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের রূপ পরবর্তী বিকাশ ও প্রকাশের রূপ ও রূপান্তরকে প্রভাবিত করে। একটি শিল্পকর্ম বোঝা আর একটি মানুষের জীবন বোঝার মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। একটি ভালো জীবনের কাঠামো ও একটি সুন্দর শিল্পকর্মের রূপ মূলত একরকম। প্রকাশিতব্যের আকৃতি জীবনকে ও শিল্পকর্মকে একটি বিশিষ্ট চরিত্র, স্টাইল ও স্পষ্টতা প্রদান করে। নান্দনিক রূপ, পার্কারের মতে, সন্তোষজনকভাবে সংহত জীবনের বাহ্যিক প্রতিনিধি,—প্রতিধ্বনি বা প্রকাশ।

পার্কারের এই মতের একটি বড় গুণ হল, এই মত অনুসারে, শিল্পীজীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের আত্মীয়তার দিকটি যথোচিত গুরুত্বলাভ করেছে। তাছাড়া এই আত্মীয়তাটি নিছক মনস্তাত্ত্বিক উপমা হিসেবে উল্লেখ ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। রূপের সন্ধি-সূত্র দিয়ে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, মানসিক উদ্ভবের সঙ্গে বিকাশ ও প্রকাশের, সামগ্রিক ঐক্য সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবু পার্কারের মত আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। কারণ, কোন-না-কোন অর্থে শিল্পকর্মকে, শিল্পবস্তুকে, যদি শিল্পীর জীবন থেকে আমরা পৃথক করতে না পারি, স্বতন্ত্রভাবে দেখতে না পারি, তাহলে শিল্পবিচার অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস, মানসিক ও সামাজিক ইতিহাস, শিল্পবিচার থেকে পৃথক। "কীভাবে অমুক শিল্পবস্তুটি সৃষ্টি হয়েছে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কোন ফ্রয়েড বা পার্কার যদি কোন শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের শোনান তা নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হবে; কিন্তু তা থেকে ঐ শিল্পবস্তুটি বিচার করার পথ-নির্দেশ পাব না। বুঝতে পারা আর বিচার করা এক কথা নয়। বিচার করার জন্য বুঝতে পারা প্রয়োজন কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। বিচার্য শিল্পবস্তুর একটি ন্যূনতম ব্যক্তি-নিরপেক্ষ,

নৈর্ব্যক্তিক, অস্তিত্ব থাকা দরকার যার ভিত্তিতে দেশান্তরে, কালান্তরে রসিকজন শিল্পীর মন ও পরিবেশ না জেনেও শিল্পবস্তুর নান্দনিক বিচার করতে সক্ষম হবে। পার্কারের মত অনুসারে এই নৈর্ব্যক্তিক বিচারের অবকাশ নেই। নান্দনিক বিচার মানুষ হামেশাই করে থাকে। অতএব, স্বীকার করতে হয়, পার্কারের রূপ সম্পর্কিত এই মত ভ্রান্ত।

রূপ, কিংবা রূপে, কোন কিছুর প্রকাশ,—এমন একটি বক্তব্য অনেকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই "কোন কিছু"র চরিত্র নিয়ে বহুমত, ব্যাখ্যা ও যুক্তির অবতারণা করা যায় এবং হয়েছেও।

নান্দনিক রূপ মানসিক হলেও নিছকই মানসিক নয়। যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন বা নির্ভর ক'রে অভিজ্ঞতালব্ধ,—কখনো তা মানসিক ঘটনারই অভিজ্ঞতা, কখনো-বা তা বাহ্যিক দৈশিক বস্তুর। শিল্পের বিষয়বস্তু যে আমাদের দেহ-মনের বহির্ভূত বস্তুজগতেরই হতে হবে, বলাবাহুল্য, তেমন কোন নিয়ম নেই। শিল্পের বিষয়বস্তু বাহ্যবস্তু না হয়ে মনের "বস্তু"ও হতে পারে,—অনুভূতি, আবেগ, কল্পনা, চিন্তা বা এদের বিভিন্ন সমবায়ও হতে পারে। রোজার ফ্রাই-এর মতে নান্দনিক অভিজ্ঞতার দুটি দিক,—মানসিক "বস্তু"র দিক ও নমনীয় রূপের দিক। নান্দনিক অভিজ্ঞতায় চৈতন্য একটি বিশিষ্ট প্রবণতা বা চরিত্র অর্জন করে। চৈতন্য প্রধানত নিষ্ক্রিয় থাকলেও সংবেদনার প্রতিক্রিয়াগুলির দিকে, তাদের বিচিত্র সম্বন্ধ/সম্মিলনের দিকে, মনঃসংযোগ করে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা চৈতন্যের একটি বিশিষ্ট উদ্ভাস ("a special focussing of the attention... orientation of the consciousness")। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র, গূঢ় মানসিক বৃত্তি আছে বলে বিশ্বাস করবার দরকার নেই। যে-সব মানসিক বৃত্তি ও সামর্থ্য দিয়ে আমরা অন্য সকল বিষয় জেনে থাকি সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাতে সে-সবই ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের প্রকারটি স্বতন্ত্র। পথ চলতে গিয়ে চোখ, যা দেখে যেদিকে মনোযোগ দিই আর্ট-গ্যালারীতে ঢুকে নিশ্চয়ই তা দেখি না, তার দিকে মনোযোগ দিই না। শুদ্ধ গণিত শাস্ত্রের অমূর্ত কতগুলি মানস সৃষ্টিকে, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সমন্বয়কে, যখন জানি তখন নিঃসন্দেহে মনে একপ্রকার আনন্দ হয়। স্পিনোজা ও আইনস্টাইন বারবার শুদ্ধ বুদ্ধির সূক্ষ্ম থেকে বিশাল সামঞ্জস্য, পারম্পর্য ইত্যাদি জ্ঞান-সঞ্জাত আনন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু এ আনন্দকে কি নানন্দিক বলা ঠিক হবে? রোজার ফ্রাই বলেন, "না।" গণিতজ্ঞের আনন্দের কারণ তার উপলব্ধ নীতিগুলির সার্বভৌম ব্যতিক্রমহীন যাথার্থ্য। শিল্পী বা শিল্পরসিকের মূল অন্বিষ্ট হল বিষয়বস্তুর রূপ-সমন্বয়,—সামঞ্জস্য বা পারম্পর্য-এর অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত যে আনন্দানুভব শুধু সেই গুণটি। যাথার্থ্য বা সত্য তার মূল অন্বিষ্ট নয়। আবেগোদ্দীপক বা কল্পনার পাখা-বিস্তার-করা বিষয়বস্তু থেকে, তার

নাটকীয়তা থেকে, দৈশিক সামঞ্জস্য সৌন্দর্য সৃষ্টিতে, নান্দনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারে, অনেক বেশি সার্থক সহায়ক প্রভাব বিস্তার করে।

রূপের গুরুত্ব স্বীকার করলেও তার এতোটা প্রাধান্য মানতে অনেক রূপবাদীও প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন, রূপের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্যকে প্রধান্য দেওয়া ঠিক হবে না। এই প্রসঙ্গে কর্বু্যসিয়ের ও মোহোলি-নজের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, সুন্দরের যা সগোত্র তা হল প্রয়োজনীয়। যাঁরা মনে করেন ভালো জীবনের প্রকাশই সুন্দর এবং সুন্দরের সগোত্র হল ভালো তাঁরা ভ্রান্ত। যা প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা' সুন্দর। শহর বা বাসগৃহ যা'ই আমরা তৈরী করি না কেন তার বহিরঙ্গ বা বাইরের রূপ যদি হয় প্রয়োজনানুরূপ তবে তা সুন্দর ব'লে স্বীকার্য। শুধু স্থাপত্যশিল্পে নয় তাঁর চিত্রশিল্পেও কর্বু্যসিয়ের এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। একটি বাসগৃহের রূপ এবং অফিসের রূপ সুন্দর হতে হলে আলাদা হতে হবে। কারণ তারা আলাদা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তৈরী হচ্ছে। একই কারণে শহরের শিল্পাঞ্চল, অফিস পাড়া এবং বাসগৃহের অঞ্চলসমূহের সুন্দর ডিজাইন একরকম হয় না। কর্বু্যসিয়েরের মূল কথাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না: সোজা পথ সুন্দর পথ, কারণ সোজা পথে গন্তব্যস্থলে পৌছতে সময় কম লাগে এবং শ্রমও কম হয়। বিজ্ঞান ও গণিতাদি শাস্ত্রেও কল্পনালাঘব, অল্প ও সরল ক'টি ধারণা দিয়ে বহু ও জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য, অভ্যর্থিত নীতি হিসেবে স্বীকৃত। সরলতা (সিম্প্লিসিটি) সেক্ষেত্রে নান্দনিক অর্থে ব্যবহৃত নয়। এই "নান্দনিক" নীতি যন্ত্র, বাড়ী-ঘর ও নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সীমিতভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তা বলে সুন্দরকে প্রয়োজন দিয়ে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কিছুই সুন্দর ব'লে স্বীকার করতে হবে যা পরিশীলিত শিল্পরসিকেরা সুন্দর স্বীকার করতে প্রস্তুত হবেন না। পক্ষান্তরে, অনেক কিছু সুন্দর দেখা যাবে যাদের সাধারণ অর্থে কোন প্রয়োজনে লাগে না। প্রয়োজন সিদ্ধির ফলে আমরা যে সন্তোষ অনুভব করি তাকে নান্দনিক অর্থে সুন্দর বলা বিপজ্জনক।

রূপ ও বিষয়বস্তুর গভীর ঐক্যের দিকটি অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু তার ভিত্তি হিসেবে প্রয়োজন/উপযোগিতাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। প্রথমত মনে রাখা ভালো বিষয়বস্তু (সাবস্টান্স/কন্টেন্ট/ম্যাটার) ও রূপের (ফর্ম/স্ট্রাকচার/অর্গানাইজেশন/স্টাইল) ঐক্য যথার্থ হবার জন্য দুয়েরি সক্রিয় ঐক্য হওয়া দরকার। যে ঐক্যে শুধু বিষয়বস্তুপ্রধান এবং রূপ গৌণ ও নিষ্ক্রিয় সে-ঐক্য প্রকাশ হিসেবে সার্থক নয়;—বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মূল্য যতোই থাকুক না কেন এ-কথা বিপরীত, রূপের দিক, থেকেও সত্য। শুধু রূপের চাতুর্য বা কারিকুরি দিয়ে বিষয়বস্তুর দৈন্য গোপন করা যায় না। রূপ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য

রাখার স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য যুক্তি ও উদাহরণ দেখিয়েছেন এ্যণ্ড্রু সিসিল ব্র্যাড্‌লে।[৫] বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন কবিতা প্রসঙ্গে। গোলাপ ফুল ও চাতক পাখী নিয়ে অনেক কবিই কবিতা লিখেছেন কিন্তু কবিতার চরিত্র, স্বাদ ও সার্থকতা কবিতার নাম, বিষয়বস্তুর নাম-ধাম, থেকে বোঝা অসম্ভব।

বস্তুত কবিতায় প্রকাশ এবং বিষয়-বস্তু, প্রকাশ-রূপ এবং প্রকাশিত বিষয়-বস্তু, অভিন্ন বা অবিচ্ছেদী। ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি কাব্যে একাত্ম। নিছক রূপ ব'লে কিছু নেই। রূপ আসলে প্রকাশ,—প্রকাশিতের রূপ। রূপ বাদ দিলে প্রকাশিতের স্বরূপ আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব। ব্র্যাড্‌লের মতে, প্রকাশিত বিষয় থেকে (স্টাইল) ভঙ্গিমাকে যদিও-বা খানিকটা ভিন্ন বা বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখা যায়, রূপকে নয়। অর্থাৎ ভঙ্গিমার তুলনায় রূপ প্রকাশিত বিষয়-বস্তুর সঙ্গে অনেক গভীর ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভঙ্গিমা অর্থের অংশ-মাত্র। রূপ ও অর্থ (প্রায়) একাত্ম। অর্থময় রূপের কথা ক্লাইভ বেলের (১৯১৩) আগেই বলেছিলেন ব্র্যাড্‌লে (১৯০৯)। এ-বিষয়ে তিনি বিখ্যাত রূপবাদী ম্যাথু আর্নল্ড ও ওয়াল্টার পেটারের উত্তরসাধক। অন্তত তিনি নিজে তা দাবি করেন। প্রতীক ও প্রতীকিত, ধ্বনির সঙ্গীত ও অর্থে সার্থক শিল্পকর্মে সম্পূর্ণ অভিন্ন। শেলীর

"Our noisy years seem moments in the being
Of the eternal silence" কিংবা

রবীন্দ্রনাথের—

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ॥"

এ-সব কবিতায় ধ্বনির সঙ্গীত ও অর্থের সুষমা একাকার হয়ে গেছে। ভাষা ও ভাব নিঃসন্দেহে একসঙ্গে মনে জাগে, তবু বোধহয় স্বীকার করা ভালো যে ভাবকে ভাষান্তরেও প্রকাশ করা যায়। "ভাষা ভাবানুরূপ হয়" আর "ভাষান্তরে ভাব প্রকাশই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়" এক জাতীয় কথা নয়। প্রচেষ্টার ফলে, সাধনার ফলে এক ভাবকে যে সার্থকতর, সুন্দরতরভাবে প্রকাশ করা যায়, তা অনস্বীকার্য। শুধু স্টাইল বা ভঙ্গিমা নয় প্রচেষ্টা ও যত্নের ফলে রূপেরও পরিবর্তন করা সম্ভব। রূপেরও ইতিহাস আছে, রূপ দেশ-কাল-উত্তীর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ নয়। ব্র্যাড্‌লে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, হাসি বলতে আমরা মুখের পেশী সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ বুঝি না ; আবার মুখাবয়বের পেশী সংস্থানের পরিবর্তন ব্যতীত হাসি সম্ভব নয়। ব্র্যাড্‌লেকে শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে, হাসি

ও পেশীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও একাত্ম নয় ; নানাভাবে পেশী সংকোচন-সম্প্রসারণ ক'রে নানারকম হাসি হাসা যায়।

রূপ ও বিষয়-বস্তুকে যদি পরস্পর সম্পূরক শিল্পকর্মের দুটি সীমান্ত, দুটি ভিন্ন উপাদান, মনে করা হয় তাহলে এদের মধ্যবর্তী বস্তুময় রূপের বা রূপময় বস্তুর স্তর নির্দেশ করা যায়, —যেমন, ভঙ্গিমা (স্টাইল), ছক (প্যাটার্ন) ও নক্সা (ডিজাইন)। রূপসর্বস্ব যেমন রূপ হয় না বস্তুসর্বস্ব তেমনি বস্তু হয় না। অর্থাৎ শুদ্ধ রূপ ও শুদ্ধ বস্তু দুই-ই বুদ্ধির কল্পনা,— বাস্তব সত্য নয়। এই সাধারণ সত্য নানা স্তরে নানাভাবে প্রকাশ করা যায়।

একাধিক বিষয়বস্তুকে একই ছকে বাঁধা যায়। আবার একাধিক ছক একই বিষয়বস্তুতে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা যায়। এ-কথা থেকে মনে হতে পারে যে ছক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা যায়। তা বোধহয় ঠিক নয়। আমরা জানি, সনেটের একটি ছক আছে। আমরা এ-ও জানি, একই ছকের সনেটে নানা বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। সনেটের ছকও ঠিক এক কি না তা প্রশ্নাতীত নয়। খ্যাতনামা বহু কবিই সনেটের ছকে হের-ফের ক'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সনেটের নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ রূপ আছে ব'লে মনে করা ঠিক হবে না।

নক্সা কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ছবি আঁকার আগে অনেকেই সেই ছবির নক্সা (রূপ-রেখায়) এঁকে নেয়। যে-কোনো শিল্প-কর্মে যেমন একটি সৃষ্টির দিক আছে তেমনি রয়েছে সেই সৃষ্টির প্রাক্কালীন সূচনা-সঙ্কেত। সূচনা-সঙ্কেত কখনো থাকে শিল্পীর মনে (যেমন কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে), কখনো-বা কাগজে-কলমে (যেমন চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য শিল্পাদির ক্ষেত্রে ড্রয়িং-স্কেচে)। ছবি আঁকার সূচনায় অনেক শিল্পীই রেখা, আলো-ছায়ার সংস্থান ও সম্বন্ধ ক্যান্‌ভাসে এঁকে নেয় (বা অল্পাধিক ঠিক করে নেয়) এবং পরে রঙের তুলি দিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ, প্রাণবন্ত করেন। কখনো-কখনো নক্সা কথাটি (বিশ্ব) সৃষ্টির (দার্শনিক) পরিকল্পনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ স্রষ্টার মনে পরিকল্পনা হিসেবে ছিল। কিংবা বলা যেতে পারে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে বিশ্বসৃষ্টির পরিকল্পনা স্রষ্টার মনে ছিল। বিশ্বসৃষ্টির প্রসঙ্গে পূর্বপর সম্বন্ধটি কি কালিক নাকি নিছক ধারণাগত এবং স্রষ্টা কি পরিকল্পনা ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ;—এ-জাতীয় বহু দার্শনিক প্রশ্ন আছে যা নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে তেমন বিস্তারিত আলোচনা না-করলেও চলে। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে নক্সার অর্থ মোটামুটি স্পষ্ট। একটি নির্দিষ্ট শিল্পলক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য এবং অবাঞ্ছিত ধারণা বা ভাব পরিহার করবার জন্য শিল্পী তার শিল্পকর্ম করার আগে তার একটি রূপ-রেখা, কাঠামো দাঁড় করাতে চান। অর্থাৎ শিল্পী তাঁর শিল্পে যা প্রকাশ করতে চান এবং যা চান না সেই দুটি লক্ষ্যই যাতে

সিদ্ধ হতে পারে তার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় নক্সা তৈরী করেন। কতগুলি সামগ্রীকে (বিষয়বস্তু, রেখা, রং প্রভৃতিকে) একটি প্রস্থানে (সিস্টেমে) সংস্থিত করার উদ্যোগ-চিত্রের নাম নক্সা। নক্সার সামগ্রীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক (কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিক থেকে) সঠিক হওয়া প্রয়োজন। সঠিক সম্পর্কের একটি সম্ভাব্য জ্যামিতিক রূপ থাকাও প্রয়োজন। কারণ তাহলে শিল্পের উপাদানসমূহ বাহুল্য বর্জন করতে পারে, রসিকের মনে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টিতে এবং অ-বাঞ্ছিত রস পরিহার করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া নক্সায় উপস্থিত উপাদানসমূহের মধ্যে রসিক মন যাতে অনায়াসে "আনন্দবিহার" করতে পারে তারও ভাবসূত্র শিল্পীকে যোগাতে হবে। উপাদানগুলির নিজস্ব চরিত্রে এবং পারস্পরিক সম্বন্ধে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যাতে রসিকমনের পক্ষে তা অগ্রহণযোগ্য, পীড়াদায়ক বা আঘাতের কারণ হয়ে উঠবে। এ-ক্ষেত্রে আবার সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমির কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

নক্সা বা ভঙ্গিমা তাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর তুলনায় স্থায়ী হলেও তাদের চিরস্থির ভাবা ভুল হবে। এমন কি নক্সা বা ভঙ্গিমাকে বিনা বিচারে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পকর্মকে একটি সামগ্রিক ছকের—সেই ছক সামাজিক, ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় যে-ভাবেই উত্থাপিত করা হোক না কেন—সাধারণ নিয়ম-কানুনের উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। আমরা যখন য়ুরোপীয় স্থাপত্যশিল্পকে গথিক, ব্যারোক বা জর্জিয়ান বলি, কিংবা ভারতীয় চিত্রশিল্পকে কাংড়া, রাজস্থানী বা মধুবনী ভঙ্গিমা দিয়ে ভাগ করি তখন নিতান্তই সাধারণ শ্রেণী নির্দেশ করি। এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, ভঙ্গিমার কোনো সাধারণ নির্দিষ্ট চরিত্র বা আত্মা আছে। ভঙ্গিমাকে বরং ব্যষ্টিগত, ব্যক্তির অনন্য, সৃষ্টির প্রমাণ এবং বহু দিনের বহু ব্যক্তির সৃষ্টির সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা উচিত। যদি এক কবির লেখা অন্য আরেক কবির লেখা থেকে, পৃথক করা না যায়, যদি বহু চিত্র-শিল্পীর ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি একই ভঙ্গিমার উদাহরণমাত্র হয়ে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট কবি ও শিল্পীরা প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা নন মানুষের শিল্পকর্ম তার ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সত্তার যুগপৎ প্রকাশ। তবু স্বীকার করতে হবে, তার ব্যক্তি সত্তার আত্মিক অনুভূতি, উদ্বোধন ও প্রকাশ যদি তৎকালীন ও তৎদেশীয় শিল্পধারা বা ভঙ্গিমা দিয়ে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তাহলে তার সৃষ্টি যুগধর্মী হলেও যুগোত্তীর্ণ হবে না। যুগধর্মী হয়েও যুগোত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং তা' ই বাঞ্ছনীয়। তার জন্য প্রয়োজন শিল্পসত্তার অনন্যতার সংরক্ষণ। যুগের আকৃতিকে বুঝে তা অতিক্রম করা।

সমাজ পরিবর্তন করার জন্য আমরা চাই এমন মানুষ যে সমাজকে বুঝবে অথচ তার নিয়ম-কানুনে বন্দী বা আচ্ছন্ন থাকবে না। সমাজ সংস্কার করতে হলে সমাজকে আগে

বোঝা চাই। বাইরে থেকে ফতোয়া দিয়ে শিল্পের রূপধারা ও রূপভঙ্গিমার পরিবর্তন করা যায় না। স্রষ্টা পরিবর্তন আনে সৃষ্টির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে। নক্সা নিছক অনুকরণ নয়, উদ্ভাবনও বটে। সুন্দর একটি মানুষ আঁকবার জন্য শুধু শারীরবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যা জানলেই চলবে না; বাড়তি কিছু জানা চাই। শুধু অভিধান ও ব্যাকরণের উপর দখল থাকলেই সুলেখক হওয়া যায় না।

এক কথায়, রূপ এবং রূপানুগত ছক, নক্সা, ভঙ্গিমাদির মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা পূর্ব-নির্দিষ্ট, স্থির-স্থানু ও অনতিক্রম্য কিছু নয়; এবং কমবেশী একই কারণে ছক, নক্সা ও ভঙ্গিমাদির অন্তর্ভুক্ত বিষয়-বস্তুর সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ গতিশীল, বিভিন্ন ও বিচিত্র। রূপ ও রূপানুগত ভঙ্গিমাদি রূপ-প্রাধান্য দিয়ে বিষয়-বস্তুকে রূপ-সর্বস্ব "সৌন্দর্য" দিতে পারে না;—দিতে পারে না এইজন্য যে শুদ্ধ রূপ, যেমন নিখুঁত-জটিল জ্যামিতিক রূপ, দেখে যে আমরা আনন্দ অনুভব করি তা মূলত নান্দনিক নয়। দ্বিতীয়ত, মনে রাখা ভালো, শুদ্ধ রূপের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে নান্দনিক চেতনার বিকাশ ঘটে। তবু যে রঙ বা শব্দ-সঙ্গীতাদি দিয়ে রূপকে "প্রাণবন্ত" না করলে শুদ্ধ রূপের অভিজ্ঞতা নান্দনিক চরিত্র অর্জন করতে পারে না তা থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুদ্ধ রূপ বিষয়-বস্তুর সাহায্য ব্যতীত নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না। রূপ বিষয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। বিষয় রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা বিষয়-প্রধানও হতে পারে, রূপ প্রধানও হতে পারে। রূপ ও বিষয়ের মধ্যে কোন্ দিকটি প্রাধান্য পাবে?—এ প্রশ্নের কোন সাধারণভাবে সত্য, সকলের পক্ষে সকল সময়ের জন্য গ্রাহ্য, উত্তর নেই। উত্তরটি দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ, রসিকের পারিপার্শ্বিকতা ও মানসিকতা সাপেক্ষ। এ-যুগের রচনাশৈলী ও-যুগে অচল। এ-দেশের মডেল ও-দেশে অনাদৃত। যে-রাগ-রূপ জীবনের একসময়ে খুব ভালো লাগে সেই রাগ-রূপই আরেক সময়ে, এমন-কি একই সময়ের ভিন্ন মানসিকতায় (মুডে) অনাকর্ষণীয় মনে হয়। তবু, রূপবাদীরা বলেন, নান্দনিক বিচারের ও অনুভূতির রকমফের হতে পারে কিন্তু অন্তঃস্থ রূপ-নির্ভরতা থেকে নিষ্কৃতি নেই। সীমিত অর্থে, আমার মনে হয়, এ কথা সাধারণত সত্য।

রূপ অনুভব ও মূল্যবোধ ॥

রূপ-জগৎ ও বিষয়বস্তুর জগৎ নিশ্চয়ই পৃথক। এ পার্থক্য দুস্তর কি না, এ দ্বৈতবাদ অনিবার্য কি না,—এ-জাতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে।

এই প্রশ্নের একটি উত্তর আমরা আমাদের নান্দনিক অভিজ্ঞতাগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ

করলে পেতে পারি। কিন্তু বিশ্লেষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণাগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি ব'লে আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হতে বাধ্য। বস্তুজগৎ, মনোজগৎ এ দুয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কে বহু ভিন্ন, এবং এমনকি বিপরীত, দার্শনিক মতবাদ আছে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে সেই সব মতবাদের পরোক্ষ ছায়াপাত অনিবার্য।

রূপবাদীদের বক্তব্য, "রূপের নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে", এবং বস্তুবাদীদের বক্তব্য, "রূপ বস্তুর নিজস্ব ধর্ম, তার স্বাতন্ত্র্য নেই", আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। তখন দেখাবার চেষ্টা করেছি, বস্তু থেকে কল্পনায় রূপকে স্বতন্ত্র করে যে "দেখা" যায় না তা নয়। যায়। অনুরূপ বিচারধর্মী ও অমূর্ত কল্পনায়, কষ্টকল্পনায়, রূপকেও বস্তুর অন্তর্নিহিত ধর্মরূপে "দেখা" যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল : কষ্টকল্পনাসৃষ্ট এই দ্বৈতবাদের দার্শনিক বিশ্লেষণী মূল্য থাকলেও নান্দনিক অভিজ্ঞতা বুঝবার ও বোঝাবার পক্ষে অনুকূল কি? বোধহয় না।

বিকৃতি না ঘটিয়ে, বিশ্লেষণের দিকে প্রধানত না ঝুঁকে' আমরা যখন রসিকের মন নিয়ে শিল্পের রূপানুভব করি তখন বস্তুত কী কী দৈহিক-মানসিক প্রক্রিয়া-ঘটনা ঘটে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত মনে রাখা ভালো, রূপানুভূতি হলেই যে শিল্পানুভূতি হবে,-এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে, না-ও হতে পারে। স্পিনোজা ও আইনস্টাইন প্রমুখ কিছু দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ছিলেন যারা মনে করতেন যে, শুদ্ধ রূপ-জ্ঞান অনুধ্যানে অনুভবের বিষয় হয়ে ওঠে এবং গভীরতর অনুধ্যানে তাদের সামঞ্জস্য, সমন্বয়, সম্পূরক, বিপ্রতীপ প্রভৃতি গুণগুলি আনন্দের, এমন কি ভালোবাসার, বিষয় হয়ে ওঠে। রূপ অনুধ্যান ক'রে, ভেবে' ভেবে', বুদ্ধি তাকে অনুভাবনার স্তরে প্রগাঢ়-প্রবল করতে পারে। বুদ্ধি সেক্ষেত্রে কিছু ইন্দ্রিয়-আভাস ও কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করে। দেহ থেকে মনের, মন থেকে দেহের, আসলে বোধহয় দেহ-মন সমগ্রের স্তর থেকে স্তরান্তরে ওঠানোর ও নামানোর স্বাধীনতা-শক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি। তেমনি বুদ্ধির বিচার থেকে কল্পনায়, আবার কল্পনা থেকে বিচারে চৈতন্যের গতায়াতের শক্তি অনস্বীকার্য। রূপ-রেখাকে প্রত্যক্ষের বিষয় দিয়ে পূর্ণ না ক'রে কল্পনার বিষয় দিয়েও পূর্ণ করা যায়। বিপরীতক্রমে, প্রত্যক্ষের বিষয়কে কল্পনার রূপে সংস্থিত করা যায়। এক কথায়, রূপ ও বিষয়ের সম্বন্ধ নির্ণয়ে মানুষের মন সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ-নির্ভর ও নিষ্ক্রিয় নয়। তাছাড়া আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার : কী যে আমরা প্রত্যক্ষ করব তা-ও অনেকাংশে নির্ভর করে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা সংস্কার ও প্রত্যাশার ওপর।

প্রত্যক্ষ নানারকম হয় : স্পর্শন, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি। তলিয়ে যদি দেখি তাহলে দেখব স্পর্শন, দর্শন প্রভৃতি প্রত্যক্ষের মধ্যেও রূপ আছে। এই অভিজ্ঞতাগুলি নিছক নিষ্ক্রিয় প্রতিক্রিয়া নয়। হাত দিয়ে আমরা যখন কিছু ছুঁই তখন ঠাণ্ডা-গরম, শক্ত-নরম,

দূরে-কাছে প্রভৃতি কতগুলি নির্দিষ্ট গুণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট বস্তুর পরিচয় লাভ করি। ছুঁয়ে বস্তুর কতগুলি গুণই শুধু জানতে পারি, অন্য কতগুলি, যেমন রঙ, জানা যায় না। তারজন্য চাই চোখ। স্পর্শ-প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বস্তুর যে-গুণগুলি আমরা জানতে পারি তা বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট এবং পরস্পরের থেকে পৃথক। অবশ্য কয়েকটি গুণের ক্ষেত্রে, যেমন দৈশিক বা দূরত্বের ক্ষেত্রে, চক্ষু ও স্পর্শ দুই-ই অল্পাধিক সহায়ক হতে পারে।

আমরা চোখে বিভিন্ন রঙ দেখতে পাই। বিভিন্ন রঙ দেখা এক অর্থে চোখের উপর নির্ভর করে। চোখের অসুখ থাকলে কেউ কেউ কতগুলি রঙ আদৌ দেখতে পায় না। কেউ-বা আবার সময় বিশেষে, যেমন রাতে, কতগুলো রঙ দেখতে পায় না। সুতরাং রঙ দেখা এক অর্থে চোখের উপর নির্ভর করে না;—নির্ভর করে আলোক-তরঙ্গের উপর,—আলোক তরঙ্গের কম্পন-পারম্পর্যের উপর। রঙ কি আলোকের, না কি চোখের?—এ প্রশ্নের উত্তর যুগপৎ "হাঁ" ও "না"। আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম্পন-পারম্পর্য ও তাদের জ্যামিতিক রূপ নিশ্চয়ই চোখের সৃষ্টি নয়। মানুষের চোখের পরিবর্তে যদি উপযুক্ত যন্ত্রের চোখ ও ব্যবহার করা হয় তাহলেও রঙ-এর ছবি তোলা যায়। চোখ (রেটিনা) ও ক্যামেরার (লেন্সের) মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। দৃশ্য বিষয়বস্তু যখন দৃষ্ট হয় তখন চোখের কাজ-এর সঙ্গে ব্যাখ্যাদায়ক (ইন্টারপ্রেটিভ) মনের কাজও হয়। তবে মনের কাজের অবদানটুকু মোটামুটি (ঠিক মেপে-ঝুপে বা নিক্তিতে ওজন করে নয়) বাদ দিলেও চোখের দেখাকে সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দেয়া সম্ভব হয়। কারণ, দৃষ্ট ও দৃশ্যের সম্বন্ধ (উচ্চ সীমা ও নিম্ন সীমার মধ্যে) নির্দিষ্ট।

শোনার ক্ষেত্রেও এ-জাতীয় কথা প্রযোজ্য। শ্রুত ও শ্রাব্যের মধ্যে সম্বন্ধ যদি নির্দিষ্ট হয় তারও কারণ এ দুয়ের মধ্যে রূপগত সাদৃশ্য আছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের আঙ্গিক কোন ত্রুটি যদি না থাকে তাহলে শ্রাব্য শব্দ-তরঙ্গ-সমষ্টি "ক"-এর সঙ্গে শ্রুত ধ্বনি "ক"-এর সাদৃশ্য থাকার কথা। শব্দ-তরঙ্গ-সমষ্টি "ক" স্বাভাবিক কানে "ক"-জাতীয় ধ্বনি হয়ে বাজে। ধ্বনি "ক"-জাতির হলেও শব্দ-তরঙ্গ-"ক"-র সঙ্গে তার সম্বন্ধ বস্তুধর্মী কার্য-কারণের অনন্য ও সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ নয়। শব্দ-তরঙ্গ-"ক" ও শ্রুত-ধ্বনি-"ক"র সাদৃশ্য সম্বন্ধ নির্ণয়ে অন্য যে-সব উপাদানের প্রভাব রয়েছে তা হল: জৈব প্রফুল্লতা, প্রত্যাশা, প্রস্তুতি ও মনোযোগ। তাছাড়া পূর্ব-সংস্কারও উল্লেখযোগ্য। এ-সব উপাদানের উপস্থিতি ও অভাবের শব্দ ও ধ্বনির সাদৃশ্যেও অল্পাধিক পার্থক্য হয়।

রূপ প্রত্যক্ষে মনের ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে। তবে সে ভূমিকা ব্যাখ্যাকারীর,—স্রষ্টার নয়। বস্তুর রূপ বস্তুধর্ম হিসেবেই নান্দনিক হয়ে ওঠে না। তারজন্য "অন্য কিছু" চাই। ভালো ফটোগ্রাফারও যে-সব বস্তু, ব্যক্তি বা নিসর্গদৃশ্যের ছবি তোলে সে-সব

ক্ষেত্রেও বিষয়ের (অবজেক্ট-এর) স্বরূপকে সাজানোর (কম্পোজিশন-এর) কৌশলে নান্দনিক রূপ ও চরিত্র দেয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে সাজানোর কৌশলটিই হল "অন্য কিছু"র প্রধান অঙ্গ।

মানুষ শিল্পীর স্পর্শ ব্যতিরেকেই যে-সব বিষয় সুন্দর (যেমন নিসর্গ, নর-নারী, পশু-পাখী ও কীট-পতঙ্গ), তা দেখিয়ে অনেক রূপবাদী বলেন ও প্রমাণ করতে চান যে, মূল স্রষ্টা হলেন ঈশ্বর। এবং সংশ্লিষ্ট সুন্দর বিষয়ের রূপ ঈশ্বরেরই স্বরূপ অথবা কল্পনা। মনে রাখা ভালো, সুন্দর হলেই যে তা নান্দনিক অর্থে সুন্দর হতে বাধ্য,—এমন কোন কথা নেই। কোন-কোন যন্ত্র-পাতি, মেশিন, অঙ্কের ও জ্যামিতিক কাঠামো বা নক্সাকেও কেউ কেউ সুন্দর দেখেন। "সুন্দর হওয়া" যে-অর্থে রূপ নির্ভর "সুন্দর দেখা" সে-অর্থে রূপ-নির্ভর নয়। অথচ এই দুটি অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক নয় ; একে অন্যের সঙ্গে জড়িত ; একই সত্যের দুটি দিক।

জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক রূপের সামঞ্জস্যের জন্য যা সুন্দর তা অনেকটাই রসিকের রস-প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ। "অনেকটাই" বলছি এজন্য যে, এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করছে যে-মানুষটি তার প্রত্যক্ষের কাঠামো (স্ট্রাকচার) ও চরিত্রের (ওরিয়েন্টেশনের) উপর "সৌন্দর্য" খানিকটা নির্ভর করছে। এই জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাহীন মানুষও আছে। সেই মানুষের মনে সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সামগ্রিক চেতনা দরকার তা নেই। সমগ্রের একটি অংশ দেখতে গিয়ে সে অপর অংশটি দেখতে পারে না। দুটি বা তিনটি অংশও যখন সে দেখতে পারে তখনো হয়তো সে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে যে-সমগ্রটি "সৃষ্টি" হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছে না। এমনও হয় যে, সে সমগ্রটি দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার অন্তর্ভুক্ত অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকে "উৎসারিত" যে চরিত্র তা প্রত্যক্ষ করতে পারছে না। ফলে, নিছক রূপের দিক থেকে বিচার করলে যে-সৌন্দর্য "রয়েছে" বা "হয়ে আছে" তা সুন্দর ব'লে দেখা যাচ্ছে না।

"সুন্দর হওয়া" ও "সুন্দর দেখা"র সম্বন্ধটি বোঝা দরকার। শব্দ-তরঙ্গ বা আলোক-তরঙ্গের কতগুলি সমষ্টি ইন্দ্রিয়-শরীরে সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করার মতো প্রভাব সঞ্চার করে। সঞ্চারিত প্রভাব সংস্কার, মনোযোগ, অনুধ্যান, কল্পনা প্রভৃতির আনুকূল্যে তার প্রচ্ছন্ন কাঠামো (কখনো আস্তে, কখনো দ্রুত) প্রকট হতে থাকে। সংস্কার, অনুধ্যান প্রভৃতির অভাবে শব্দ-তরঙ্গ-জাত ধ্বনি ও আলোক-তরঙ্গ-জাত রঙ (বা দৃষ্ট বিষয়) তাদের সমষ্টি চরিত্র ও কাঠামো প্রকট বা স্পষ্ট করতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে মানসিক ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশীলতা ও সমগ্রকে অনুধাবন করার ক্ষমতা ও ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয়ের

কাঠামো থেকে শরীর-চেতনার কাঠামো ও শরীর চেতনার কাঠামো থেকে মানসিক (সৌন্দর্য) চেতনার কাঠামোয় উত্তরণের পথ পরিশীলিত ইচ্ছা-শক্তি-সাপেক্ষ,—স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয় নয়।

যে রূপ আমার প্রত্যক্ষ করি, দেখি বা শুনি, তার প্রতি আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি স্বাধীনতার দিক,—যার জন্য আমি বলি, বিষয়ের কাঠামো ঠিক অনুরূপভাবে চেতনায় ভেসে ওঠে না। দ্বিতীয় দিকটি বিচার, সংস্কার বা কল্পনার দিক। বিষয় ও চেতনার মধ্যে রূপের যে পার্থক্য দেখা দেয়, বা দিতে পারে, তা বিচার-ব্যাখ্যার জন্য হতে পারে, তা কল্পনার জন্য হতে পারে, তা সংস্কারের জন্যও হতে পারে। অধিকাংশ সময়েই এইসব বিভিন্ন ব্যাপারের সমন্বয়েই বিষয়-রূপ ও নান্দনিক রূপের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়ের রূপ বিষয়গত ভাবেই "সুন্দর" বা "মধুর" হতে পারে কি না,—এই প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ আছে। মতভেদের ভিত্তি প্রায়শঃই অন্যত্র—মৌলিক দার্শনিক প্রশ্নে (ভাববাদ বনাম বাস্তববাদ এবং বুদ্ধিবাদ বনাম অভিজ্ঞতাবাদ প্রভৃতি প্রসঙ্গে)—নিহিত। মতবাদের কথা বাদ দিয়েও নিছক অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ ক'রেও এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে।

যখন আমি একটি গাছকে ফুলে-ফলে-পাতায় সুন্দর দেখি তখন এই "সুন্দর দেখার" দুটি পৃথক (ভিন্ন নয়) দিক আছে। একটি দিকের উপর জোর দিলে এক রকম ব্যাখ্যা দাঁড়ায় ; অন্য দিকের উপর জোর দিলে অন্য রকম। গাছের, শাখা-প্রশাখার বিস্তার ও সামঞ্জস্য, ফুলের রঙ, পাতার রঙ—সবকিছু মিলিয়ে গাছটি সুন্দর। "গাছটি সুন্দর" আর "গাছটি (দেখতে) সুন্দর (লাগে)" ঠিক এক কথা নয়। দেখতে সুন্দর লাগার পূর্বশর্ত হিসেবে গাছটির (কোন না কোন ভাবে) সুন্দর হওয়া দরকার। যা সুন্দর নয় তা-ও যদি সুন্দর লাগে তাহলে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার বাইরে সুন্দর ও অ-সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য অল্পাধিক নিশ্চয়ই ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তির সমাজ-পরিবেশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। তার জন্য চাই ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা বহির্ভূত "সুন্দর" বিষয়টির বিষয়গত কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণ নির্দেশ করা। বিষয়গত বৈশিষ্ট্য বা গুণের মধ্যে আমি প্রধানত উল্লেখ করতে চাই রূপের দিকটি। "সুন্দর" বিষয়ের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ; আবার বিষয়ের যে অভিজ্ঞতা তার বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে—হয়েও থাকে। বিষয়ের আভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করতে গেলে রসের দিকটি প্রবলতর, কখনো কখনো প্রাধান্য, পেতে থাকে। দৃশ্য গাছের "সৌন্দর্য"বর্ধনে গাছের

ফুলের ঘ্রাণ, (পরোক্ষত ফলের স্বাদ ও তার স্মৃতি এবং) কল্পনাও সাহায্য করতে পারে। আমি স্বীকার করি, সুন্দর বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে বা তা অনুসরণ না ক'রে সরাসরি বিষয়টিকে বুঝতে যাওয়া (অন্তত নান্দনিক অর্থে) ভুল হবে। উদ্ভিদবিদ্যা ও নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্বভাবতই ভিন্ন হওয়া দরকার। বিষয়গত সৌন্দর্য বিচারে রূপের দিকটিই প্রাধান্য লাভ করে। গাছের (সুন্দর) রূপটি একটি সমগ্রসন্ধি : তার মধ্যে গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, ফুল-লতা-পাতা সবকিছুর রূপ, বিভিন্ন রূপের সামঞ্জস্য, সমন্বয়, বিন্যাস সকলকিছুই রয়েছে।

রূপ ও বিভিন্ন রূপের সমগ্রসন্ধির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভুল। শুধু রসিক মনের মাধুরী দিয়ে সব রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে কল্পনা করলে ভুল হবে। তা যদি সম্ভব হত তাহলে যে-কোন অবস্থাতেই—গাছের রূপ, রূপের সমগ্রসন্ধি যেমনই হোক না কেন—যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন গাছকেই সুন্দর দেখতে পারত। ইচ্ছা করলেই যে-কোনো বিষয়কে সুন্দর দেখা যায় না। সুন্দর দেখা অনেকাংশে সুন্দর হওয়ার উপর নির্ভর করে। সুন্দর ও অসুন্দর দেখার পার্থক্য সবটা দ্রষ্টার উপর নির্ভর করে না। তা যদি করত তাহলে সৌন্দর্য পিপাসু ব্যক্তি যে-কোন অসুন্দর বস্তুর মুখোমুখি হয়েও সৌন্দর্য আস্বাদ করতে পারত। তা পারে না। এই একই যুক্তির অন্য একটি দিক আছে। ফুলে-পাতায় ভরা একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখে প্রায় সকল লোকই যে বলে "সুন্দর" তা কিছু আকস্মিক ব্যাপার ও অকারণ নয়। সাধারণ মনের উপর রূপের প্রভাব মোটামুটি একই রকম হয়ে থাকে। "মোটামুটি" বলছি এই জন্য যে বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ কারণে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। রূপ প্রসঙ্গে যে-কথা সত্য রস প্রসঙ্গে সে কথা তেমন ভাবে সত্য নয়। রস প্রসঙ্গে আপেক্ষিকতার বিস্তার সীমা বেশি।

সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপের প্রাধান্য আরেকভাবেও বোঝানো যেতে পারে। সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্প—সকল ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যসৃষ্টিতে রূপের ভূমিকা রয়েছে। এই অবদান কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকাশিত, কখনো প্রধানত রসবিচারসাপেক্ষ, কখনো প্রত্যক্ষসাপেক্ষ—শ্রবণ বা চাক্ষুষ। বিচারে রূপ প্রাধান্য পায়,—প্রত্যক্ষে তা নয়; সেক্ষেত্রে রূপ অন্তর্নিহিত। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে রূপের প্রাধান্য অনিবার্য এবং বোধহয় সর্বাধিক। সেজন্যই হয়তো স্থাপত্য শিল্পবিচারে মতপার্থক্যের অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণ-ভাবে এ-কথা দৈশিক আর্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাজমহল বা রোমের সেন্ট পিটার গির্জার রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে ততোটা মতভেদের অবকাশ নেই যতটা আছে (উদাহরণ স্বরূপ) গঁগার "দিবাস্বপ্ন" (১৮৯৭) বা পিকাসোর "বীণা ও আঙুর" নিয়ে। "বীণা ও আঙুর" রূপ-প্রধান (কিউবিস্ট-ধাঁচের) হলেও তাতে স্থাপত্যশিল্পের জ্যামিতিক নির্দিষ্টতা

নেই। রূপে রঙ দিয়ে, বিন্যাস দিয়ে, এবং সর্বোপরি বুদ্ধিগম্য ভাব দিয়ে রূপের প্রাধান্য বা প্রাবল্য অল্পাধিক সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে বোধহয় একটা বিষয়ে সাবধান হবার ও করার দরকার কাছে। রূপের প্রাধান্য ও নির্দিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে আমি যা বলছি তা থেকে এ কথা ভাবা ভুল হবে যে রসিকের রসবোধ, কল্পনা, সংস্কার, প্রত্যাশা, প্রত্যক্ষ, বা বিচারে দেশকাল ইত্যাদির কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। আছে। যা মনে রাখা দরকার তা হল এইসব সহকারী বা আনুষঙ্গিক (রূপ ছাড়া অন্যান্য) বিষয়গুলির ভূমিকা/অবদান সম্পর্কে যতটা মতপার্থক্য হতে পারে ও বস্তুত পরিলক্ষিত হয় রূপ নিয়ে তা হয় না। "হয় না" বলছি বলে এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, একেবারে হতে পারে না। রূপ ও তার প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা শক্ত। রূপকে সমগ্র (গেসটাল্ট) ভাবে দেখা, খণ্ড ভাবে দেখা, সমগ্র বা খণ্ডকেও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা—এসবের ফলে রূপ শুধু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নয় বিচারের ক্ষেত্রেও খানিকটা আপেক্ষিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

রূপের ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা ও আপেক্ষিকতার মধ্যে কেনো বিরোধ নেই। একটি নির্দিষ্ট রূপের সুন্দর গাছকে নানা দিক থেকে নানাভাবেই সুন্দর দেখা যায়। নানা দিক থেকে শুধু নয় একই দিক থেকে নানা ব্যক্তি গাছটিকে ভিন্নভাবে দেখতে পারে। শুধু তাই নয়—একই ব্যক্তি একই দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গাছটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখতে পারে। দ্রষ্টার মানসিকতা, রসবোধ, পটভূমি—পারিপার্শ্বিকতা এবং অন্য অসংখ্য নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কারণের সমাবেশ একটি বিশেষ রূপে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়।

অনেক ক্ষেত্রে ভাব রূপকে প্রভাবিত করে। ভাবই রূপে প্রক্ষিপ্ত হয়। গাছটি কখনো যৌবনের প্রতীক হয় ; কখনো দাক্ষিণ্যময় ছায়াদাতা ; কখনো বা ফল দেয় ব'লে বাণিজ্যিক অর্থে মূল্যবান। গাছটি বিষয় (অবজেক্ট) হতে পারে, প্রতীক (সিম্বল) হতে পারে, চিত্রকল্প (ইমেজ) হতে পারে, কিংবা নিছক একটি ধারণা (আইডিয়া) ও হতে পারে। প্রথম (অবজেক্ট) এবং চতুর্থ (আইডিয়ার) ক্ষেত্রে গাছটির নান্দনিক মূল্য প্রায় শূন্য। মনে রাখা ভালো "প্রায় শূন্য" হলেও ঠিক শূন্য নয়। বিষয় এবং ধারণাকে ভিত্তি বা আশ্রয় করেই সৌন্দর্যের মূল্যবোধ প্রাণ পায়, পরিণতি লাভ করে।

নান্দনিক রূপ প্রসঙ্গে অনুভবই রূপকে প্রধানত প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য শুধু রূপের বিন্যাস বা সামঞ্জস্য-উদ্ভূত নয় ; সৌন্দর্য শুধু আন্তর প্রত্যক্ষ বা অনুভবেরও প্রকাশ। সৌন্দর্যের দুটি দিকই আছে ঃ রূপ-সামঞ্জস্য এবং আন্তর রসানুভূতি। বিষয়ের রূপকে আশ্রয় ক'রে অন্তরে রসানুভূতি জাগে ঃ রসানুভূতি বিষয়মুখী হয়ে স্থায়ী রূপ লাভ করে

ও প্রকাশিত হয়। রূপ ও অনুভবের দিক দুটি শুধু বিশ্লেষণেই পৃথক করা যায়;—নান্দনিক অভিজ্ঞতায় তারা কিন্তু অভিন্ন।

রূপ সুন্দর বা অসুন্দর হয়ে ওঠে যখন রসিক তাতে তার অন্তরের মিল, প্রতিধ্বনি বা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করে। অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রিয়ে ছায়া ফেলে, প্রত্যাশা জাগায়। সেই অন্তরের ছায়ার সঙ্গে বাহিরের রূপের, ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা রূপের, মিলন হলে, পরিপূরণ হলে, অভিজ্ঞতা নান্দনিক মূল্য ও তাৎপর্য অর্জন করে। এক অর্থে অন্তরের আকাঙ্ক্ষারও রূপ আছে—আকাঙ্ক্ষা অন্ধ নয়—আকাঙ্ক্ষায় কাঙ্ক্ষিত-বোধ, কাঙ্ক্ষিতের চেতনা অস্ফুট হলেও, আছে। বলা বাহুল্য, আকাঙ্ক্ষার রূপ ও বিষয়ের রূপ একরকম নয়। আকাঙ্ক্ষার রূপ আকাঙ্ক্ষাকে চরিত্র দেয়, চিহ্নিত করে, অন্বিষ্ট বা কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে চেতন করে এবং তার প্রতি তাকে জাগ্রত ও গতিশীল করে। বিষয়ের রূপও বিষয়কে চরিত্র, চিহ্ন, বা বিশিষ্ট পরিচয়, দেয় ; উপরন্তু যা দেয় তা হল আন্তর প্রত্যাশা পরিপূরণের যোগ্যতা। তা না হলে বিষয় সান্নিধ্যেও রসিকমন নান্দনিক আনন্দ অনুভব করতে পারত না। রসিক মনে সৌন্দর্য-সন্ধানী আকৃতি জাগে। এই আকৃতি আনন্দ-সন্ধানী হলেও এই আকৃতির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ নিহিত। এই বেদনা হয়তো অ-পূর্ণতার, পূর্ণতা সন্ধানের, বা বিষয়-বিরহজনিত। কখনো ইন্দ্রিয়-সাক্ষাৎকারে, কখনো উপযুক্ত প্রকাশে—ভাষায়, রঙে বা সুরে—এই নান্দনিক বিষয়-বিরহ সৃষ্টির পূর্ণতা ও আনন্দ লাভ করে।

রূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণও হতে পারে, আবার অন্তরায়ও হতে পারে। অন্তরের আকৃতি সৃষ্টির জন্য নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। কিন্তু তা যদি উদ্বেল হয়ে ওঠে, রূপের নিষেধ, সৌন্দর্য সৃষ্টির নিয়ম, না মানে তাহলে সৃষ্টি সার্থক হয় না। রূপ শুধু নিষেধ নয়, প্রচ্ছন্ন নির্দেশও বটে। রূপের নিষেধ না মানলে উদ্বেল আকৃতি সৃষ্টির নির্দেশ পালনে, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে, ব্যর্থ। সৃষ্টির পদ্ধতিতে রূপের (নিয়ম) নিষেধ ও নির্দেশ পালন করাটাই মূল কথা নয়। মূল কথা হল সেই নিয়ম (নিষেধ-নির্দেশাদি সহ) পালন করার প্রয়োগ-কৌশল। একই নিয়ম অনুসরণ ক'রে অনেক রকম সৃষ্টি সম্ভব। রূপের বিস্তৃত (কিন্তু এক অর্থে নিশ্চয়ই সান্ত) প্রাঙ্গনে সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভাবনার কারয়িত্রী হল প্রয়োগ প্রতিভা। "রূপ কি ?" প্রশ্নের তুলনায় নান্দনিক সৃষ্টি প্রসঙ্গে "রূপ প্রয়োগ কেমন ক'রে হল" প্রশ্ন অধিকতর মৌলিক।

এই "কেমন ক'রে হল" প্রশ্নের মধ্যে (প্রয়োগ-কৌশলে) বহু প্রশ্ন ও তাদের সম্ভাব্য বিভিন্ন উত্তর লুক্কায়িত। রূপ তো শুধু স্থিতির নয়, গতিরও বটে। তাছাড়া রঙ, রঙের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতার স্তরভেদ, রেখা (বাঁকা, ভাঙা ইত্যাদি), সমতল (উঁচু,

নীচু ইত্যাদি), দেশ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি) এবং প্রসার, ঘনত্ব ও বিস্তার প্রভৃতিরও রূপভেদ আছে। এতো গেল চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গে। কাব্যের ক্ষেত্রে রূপের ভূমিকা বিশ্লেষণ আরো কঠিন। তুলনায় বোধহয় আরো কঠিন গদ্য সাহিত্যে (উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে) রূপের ভূমিকা নির্দেশ।

রূপ নিছক আঙ্গিক (টেকনিক) নয়। রূপ নিছক ধাঁচ বা নক্সা নয়। রূপ নিছক স্টাইলও নয়। আঙ্গিক, ধাঁচ ও স্টাইল—সবই অল্পাধিক রূপ—নির্ভর। রূপের বিভিন্ন সমন্বয় ও প্রয়োগে আঙ্গিক, ধাঁচ, ও স্টাইলের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আঙ্গিক ও ধাঁচে রূপের স্থিতির দিকটাই অপেক্ষাকৃত প্রবল। স্টাইলে রূপের সামগ্রিক—স্থিতি ও গতি উভয়ের—প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একই আঙ্গিক ও ধাঁচ অনুসরণ ক'রেও শিল্পকর্ম যে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারে তা শিল্পীর কৃতিত্ব,—তার শিল্প চরিত্রের সার্থক প্রক্ষেপণের প্রমাণ। কবিতা লেখায় ও ছবি আঁকায় এক সমাজের এক কালের অনেকেই এক রকম টেকনিক ও প্যাটার্ণ অনুসরণ করে ; তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে তাদের সৃষ্টিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফোটাতে পারে। পটশিল্পের টেকনিক ও প্যাটার্ণ অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় দু'জনই ব্যবহার করেছেন। তবু তাঁদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। কারণ তাঁদের স্টাইল (সৃষ্টির চরিত্রই) ভিন্ন। স্টাইলের বা সৃষ্টির চরিত্রগত ভিন্নতা বুঝবার জন্য স্রষ্টাকে বোঝা দরকার। এর অর্থ এই নয় যে স্রষ্টার জীবনী বা মনোজগতের ইতিহাস ও ভূগোল না জানলে তার শিল্পকর্মকে বোঝা যাবে না। শিল্পীর অনুভবকে অনুভব হিসেবে জানা সম্ভব নয়। অনুভব সৃষ্টি-কল্পনায় কোনো প্রতীক বা চিত্রকল্পকে আশ্রয় ক'রে দৃশ্য বা শ্রাব্যরূপ পরিগ্রহণ করে। এই দৃশ্য বা শ্রাব্যরূপের সঙ্গে অনুভবের একটি প্রচ্ছন্ন কাঠামোগত সাদৃশ্য আছে। অনুভবের প্রক্ষেপণ—আকৃতি কল্পনার সাহায্যে দৈশিক, কালিক ও কাব্যিক কাঠামো পরিগ্রহণ করে। কল্পনা এ-ক্ষেত্রে চিন্তাধর্মী। অনুভব চিত্রকল্পের রূপে জ্ঞান-বিচারের বিষয় হিসেবে উন্নীত হয়ে ওঠে। শিল্পের রূপ—টেকনিক, প্যাটার্ণ ও স্টাইল—অন্য সকল প্রকার প্রতীকের তুলনায় অধিকতর জটিল এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্ম থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা ও দেখানো অসম্ভব। একটি বিষয় থেকে তার আকৃতি (শেপ) বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখানো সম্ভব, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহলে ঐ বিষয়টির রঙ, ওজন, গঠন ও আয়তন প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে বা ভুলে যেতে হয়। শিল্পকর্ম যখন একটি রসভোগের বিষয় তখন তার সমগ্রসন্ধিতে রঙের অবদান গঠনের কাঠামো, রেখাসমূহের পরিসর ও ঘনত্ব প্রভৃতি সবই অচ্ছেদ্য।[৬]

এ প্রসঙ্গে কান্টের বক্তব্য স্মর্তব্য ঃ শিল্প হল আবেগ অনুভূতির খেলা। শিল্পীর অনুভূতি বুদ্ধির শাসন-নিগড়ের বহির্ভূত। শিল্পীর মনে আবেগ-অনুভূতির খেলায় বুদ্ধির

ভূমিকা আছে—কিন্তু সে ভূমিকা প্রশাসক-অভিভাবকের নয় ; সে ভূমিকা রূপ প্রদায়কের, রূপবিচারকের ও রূপসঞ্চারকের। বুদ্ধিপ্রধান রূপের সাহায্যে অনুভবলব্ধ চিত্রকল্প স্পষ্টতা লাভ করে,—সংশ্লিষ্ট মানসিক ও বাহ্যিক পটভূমির মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যধর্মে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শিল্পকর্মের গতিধর্মী উপাদানগুলির সামঞ্জস্য এবং চিত্রকল্পের স্পষ্টতা হল শিল্পরূপের সার।

রূপ দিয়ে শিল্পী প্রকাশ করে। "রূপ দিয়ে" বললে মনে হতে পারে রূপের মূল্য নিছক উপকরণগত বা অধিকরণ হিসেবে। তাই অনেকে বলতে চাইবেন, "রূপে শিল্পী প্রকাশ করে।" শিল্পী রূপে কি প্রকাশ করে? স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে শিল্পী কি রূপে বিষয় প্রকাশ করে? নাকি, তার মনের অনুভব-আবেগ প্রকাশ করে? পূর্বে লক্ষ্য করেছি কোনো বিষয় নিছক বিষয় হিসেবে শিল্পকর্মের মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। বিষয় শিল্পীর মনে কি অনুভব বা আবেগ সঞ্চার করল তা-ও প্রাসঙ্গিক। বিষয়-সঞ্চারিত অনুভব বা আবেগ শিল্পীর মনে কী ভাব, কী ভাবনা, বা কী চিত্রকল্পের উদয় ঘটাল তা-ও প্রাসঙ্গিক। শিল্পকর্মে শিল্পী কোনো বিষয়ের কথা বললেও শিল্পকর্মে তা তার নিজের কথা হয়েই উপস্থাপিত। সার্থকভাবে উপস্থাপিত বা পরিবেশিত শিল্পকর্ম শিল্পীর কথা হয়েও সকল রসিকের উপভোগ্য ও অন্তরের কথা হতে পারে। "সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে/বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।" এখানে রবীন্দ্রনাথ কারু নিছক সাগর-কূলে সজল এলোচুলে বসে থাকার বিষয়টি বর্ণনা করছেন না। তার অতিরিক্ত কিছু তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন। বিষয় দেখে যা তাঁর ভালো লেগেছে, যা তাকে উদ্দীপ্ত করেছে, তা'ই তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন। প্রকাশপর্বে বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর শুধু অনুভূতি-আবেগেই নয় তার কামনা-সংস্কার ইত্যাদিও একাকার হয়ে যায়। এ সব কিছুই মূল্যময়, মূল্যবোধ দ্বারা অভিসিঞ্চিত। শিল্পীমনের কামনা বিষয় দেখে' (বা শুনে') যে আনন্দ অনুভব করে এবং যে আনন্দবশত সৃষ্টির জন্য জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত তা মূল্যেরই প্রতীক, প্রতিধ্বনি, বা প্রমাণ।[৭]

মূল্য নিশ্চয়ই মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত। সেই অর্থে মূল্য নিশ্চয়ই মনের ব্যাপার। কিন্তু মূল্যের সেটাই একমাত্র অর্থ নয়। মন থেকে, না মনের বোধ থেকে, মূল্য স্বতঃ-উৎসারিত নয় ;—মূল্যবোধ কোনো না কোনো বিষয়-সংশ্লিষ্টও বটে। সেই বিষয় বহির্জাগতিক হতে পারে আবার মনের ভাব বা ধারণাও হতে পারে। কোন একটি সুন্দর গাছ যেমন নান্দনিক বিষয় হতে পারে তেমনি নান্দনিক বিষয় হতে পারে একটি ধারণা বা মনের ভাব।

গাছের রূপ (কন্‌স্টেব্‌ল্‌-এর একাধিক ল্যাণ্ডস্কেপ) দেখে কিংবা নিছক রূপ দেখেও

(হেন্‌রী মূরের *Carving in three Positions*) শিল্পীমনে আনন্দানুভূতি, সৃষ্টির প্রেরণা, জাগতে পারে। রূপ মূল্যের উপকরণও হতে পারে, অধিকরণও হতে পারে। রূপ যেখানে উপকরণ বিষয়ের উপস্থিতি সেখানে প্রবল (যথা, রেম্‌ব্রাণ্টের *The Storm on the Sea of Galilee* বা *Landscape with an Obelisk*)। রূপ যেখানে অধিকরণ বিষয় সেখানে দুর্বল বা গৌণ (যথা, আলেকসণ্ডার কলডারের *Mobile*)।[৮] অনেক শিল্পকর্ম আছে যেখানে বিষয় খুব প্রবলও নয় আবার নিছক গৌণও নয় (যথা, রোলাণ্ড পেনরোজের *The Jockey* এবং পিকাসোর *The Women with the Golden Breasts*)। দুর্লভ ক্ষেত্রে রূপই যখন বিষয় হয়ে ওঠে (যথা, অনেক কিউবিস্টদের ছবিতে) তখন রূপের মধ্যেই রূপ ভিন্ন অন্য কিছু সঞ্চার করতে সার্থক হয়।

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, কল্পনায় ও বিচারে রূপ ॥

বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ে কতগুলি শক্তির কাঠামো ধরা পড়ে বা প্রত্যক্ষ হয়। তারপর শরীর ও মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং মানসিক ব্যাখ্যা-বিচারে-সংস্কারে যা আমরা দেখি তা বিষয়,—শক্তির কাঠামো নয়। কাঠামো কতগুলি চিহ্নের সমাহার ; এই চিহ্নের মধ্যে কতগুলি অর্থপূর্ণ সঙ্কেত, কতগুলি প্রায় নিরর্থক চিহ্নই মাত্র। "প্রায়-নিরর্থক" বলছি এবং "সম্পূর্ণ নিরর্থক" বলছি না এইজন্য যে কালক্রমে ব্যাখ্যা, বিচার ও সংস্কারের সাহায্যে ঐ চিহ্নগুলো সঙ্কেত বা প্রতীক ও অর্থপূর্ণ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে। বিষয় শুধু কতগুলো ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-লভ্য গুণের সমষ্টি নয় ; তার অধিক কিছু। বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও রূপ আছে ; অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে ; সংগুপ্ত দিক আছে যা বিভিন্ন অবস্থায় কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বিষয়-জগতের যা আমরা দেখি, যা আমরা স্পর্শ করি বা গন্ধে পাই তা এক নয়, এক জাতের গুণ নয় ; কিন্তু অস্বীকার করা শক্ত যে তা একই বিষয়-জগতের। বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও রূপ স্বীকার করলে সেই সঙ্গে এ-ও স্বীকার্য, আমাদের বিষয়-জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সীমান্তেই সীমাবদ্ধ নয়। চুম্বকশক্তি বা পরমাণু কি তা আমরা জানি কিন্তু সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যা সব আমরা জানি এবং জানি ব'লে বিশ্বাস করি তা সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মনুষ্যেতর জীব-জন্তুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় সীমিত ও দুর্বল, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও প্রবল। কিন্তু মানুষ, যেমন তার মস্তিষ্কক্ষমতা, ব্যাখ্যা-বিচার-সংস্কার, ব্যবহার ক'রে ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা অল্পাধিক দূর করতে পারে মনুষ্যেতর জীব-জন্তু তা পারে না।[৯] মানুষের বিষয়-জগৎ তাই অনেক বড়, কেবলি

বড় হচ্ছে। ব্যাঙের চোখে (রেটিনায়) খুব অল্প সংখ্যক ইন্দ্রিয় সঙ্কেত ধরা পড়ে, মূলত কোনা-খামচির উপস্থিতি ও পরিবর্তন-গতি, পোকা-মাকড়-মাছির উপস্থিতি-গতি প্রভৃতি। মাছ তার চারপাশের একটি সীমিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে তার পক্ষে অনুকূল এবং প্রতিকূল জীব ও বিষয়ের উপস্থিতি ও গতি প্রত্যক্ষ করতে পারে। মাছ ও ব্যাঙের তুলনায় তো বটেই অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদের তুলনায়ও মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অনেক বেশী। সীমিত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে, বুঝতে পারে। পারে এইজন্য যে, মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের ইন্দ্রিয় সঙ্কেতের সঙ্গে সঞ্চিত-স্মৃত বহু অভিজ্ঞতাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করতে পারে, অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমান অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করে নিতে পারে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্নভাবে যাচাই করা যায় না,—যাচাই করতে হয় কোন একটি সাধারণ মতকে ঃ অভিজ্ঞতা তার অনুকূল বা বিরুদ্ধ উদাহরণ/সাক্ষ্য। মানুষের মনে যে সাধারণ মত বা প্রত্যাশা থাকে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন কিংবা সে প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ কোন অভিজ্ঞতা যে হতে পারে না তা নয়। হতে পারে। কিন্তু সচরাচর তা হয় না। তার কারণ মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কোনো না কোনো সাধারণ (অল্পাধিক) পরীক্ষিত মতামতকে আশ্রয় করে এগোয়-পিছোয়, প্রত্যাশা করে, প্রমাণ-অপ্রমাণ করার চেষ্টা করে।

আমরা যা দেখি বা শুনি তা তার পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের বিষয়সমূহের গুণ-পরিমাণ ইত্যাদি দ্বারা অল্পাধিক প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব আমাদের দর্শন ও শ্রবনেন্দ্রিয়কে মূল দৃশ্য (চিত্রশিল্প, সিনেমা, ভাস্করমূর্তি প্রভৃতি) ও শ্রাব্য (গান, যন্ত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি) বিষয়ের সঙ্গে একটি বৃহত্তর ও জটিলতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করে। পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি দৃশ্য বিষয়কে একটি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে "পারিপার্শ্বিক" বলতে দৈশিক ও কালিক উভয় শ্রেণীর বিষয়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এ জন্যই নাটকে বা চলচ্চিত্রে পটভূমি ও কখনো কখনো আবহসঙ্গীতের উপর জোর দেওয়া হয়। দৈশিক পারিপার্শ্বিকতা বলতে বোঝায় পটভূমি, পরিমণ্ডল। কালিক পারিপার্শ্বিকতা আসলে পৌর্বাপর্য সম্বন্ধকে বোঝায়। বিষয় প্রত্যক্ষে (দৈশিক) পরিমণ্ডল ও (কালিক) পৌর্বাপর্য যুগ্মভাবেই আমাদের প্রভাবিত করে। বিষয় যখন শিল্পকর্ম হয় তখন এই সাধারণ নিয়মটি আরো বেশী প্রস্ফুট ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার কারণ শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বস্তুধর্ম ছাড়া (অথবা, বলা উচিত, বস্তুধর্মের তুলনায়) শিল্পধর্মও, বিশেষত ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যের দিকটি রসিকের দেহ-মনকে প্রভাবিত করে।

শিল্প-বিষয় শুধু নিজস্ব রূপকেই প্রকাশ করে না—একটি সঙ্কলিত (শিল্পরস সৃষ্টির অনুরোধে সঙ্কলিত) বিষয়সমগ্রের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে ঐ বিষয়সমগ্রের বিভিন্ন রূপ এবং

সামগ্রিক রূপও প্রকাশ করে। শিল্প-বিষয়ের পরিমণ্ডলে বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিকতা ছাড়াও অন্য কতগুলো নিয়ম অনুসৃত হয় এবং যার ফলে শিল্পজগতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্প-বিষয়ের অনুকৃতি-বিকৃতির নান্দনিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শিল্পী কীভাবে শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (কীভাবে, কখন কোনদিক থেকে সে শিল্প-বিষয়কে প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করছে) তা-ও বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টির জন্য শিল্পী বস্তু-জগতের, বিষয়ের, জ্যামিতিক ও পারিপার্শ্বিক, সম্বন্ধ ও রূপসমূহকে ভিন্নভাবে, অল্পাধিক বিকৃত ক'রে, ভেঙেচুরে, শিল্পকর্মে উপস্থাপন করে। শিল্পানুরোধে এই প্রক্ষেপণ (প্রজেকশন) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রি-মাত্রিক বস্তুজগৎ যখন দ্বি-মাত্রিক শিল্পজগতে (চিত্রশিল্প ও চলচ্চিত্রে) উপস্থাপিত হয় তখন কিছু প্রক্ষেপণ, শিল্পীর পরিকল্পনানুরূপ সংযোজন ও বর্জন, অনিবার্য। তাছাড়া অন্য যে-সব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা-ও উল্লেখযোগ্য, যেমন, ছোটবড় ক'রে দেখান, একের উপরে বা আগে-পিছে অপর বিষয়কে দেখান, সমতল ও গভীরতার পারস্পরিক খেলা, স্বচ্ছতা ও ঘনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি, সান্নিধ্য ও দূরত্বের ক্রমান্বয়, (ইউক্লিডীয়) জ্যামিতিক নীতি অনুসরণ করা ও ভাঙা, সরলতা ও জটিলতার সমন্বয় ও হ্রাসবৃদ্ধি, অলঙ্করণ প্রভৃতি। এই নিয়মগুলির বিশদ আলোচনা প্রত্যক্ষের স্তরে রূপের ভূমিকা স্পষ্ট করে তোলে।[১০]

একই বিষয়ের, গাছ, মানুষ বা দালানের, নানারূপ প্রক্ষেপণ সম্ভব। তবু যে শিল্পী কয়েকটি বিশেষ রূপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান এবং অন্য কতগুলি রূপ পরিহার ক'রে চলেন তার কারণ আছে। এক, দ্বি-মাত্রিক বিষয়কে ত্রি-মাত্রিকরূপে দেখাতে হলে ছবি আঁকার অনিবার্য অনুরোধে বিষয়ের বিশেষ ক'টি রূপকেই নির্বাচন করতে হয় ; ভিন্ন রূপ নির্বাচন করলে ছবিআঁকার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে ; সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দুই নির্বাচিত রূপ যা'ই হোক না কেন তার মধ্যে একটি গুণ অন্তত থাকা চাই ঃ বিষয়ের সামগ্রিক রূপটিকে—যা অনিবার্য কারণে দ্বি-মাত্রিক ক্যানভাসে, দেয়ালে বা সেলুলয়েডে দেখানো যায় না—যেন আভাসে-ইঙ্গিতে নির্বাচিত রূপের মধ্যে ফোটানো হয়। এইজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কখনো ছোট, কখনো-বা শিল্পসৃষ্টির অনুরোধে বড়, কখনো আবার পাশ থেকে, কোণাকুণিভাবে, নানাভাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। মূল কথা হল, বাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টির জন্য শিল্পী বহির্জগতের বিষয়কে আকারগতভাবে সরল ক'রে এবং মূলের চরিত্রকে অল্পাধিক ক্ষুণ্ণ ক'রে শিল্পজগতে ঈষৎ ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেন।

দুটি মানুষকে পাশাপাশি দেখানো যায়, আবার একজনকে আড়াল ক'রে আরেক-জনকেও দেখানো যায়। ঘনিষ্ঠতা দেখানোর জন্য মানুষ দুটিকে হয়তো আগে-পিছে

কিংবা একে অপরকে অল্প বিস্তর আড়াল-করা অবস্থায় দেখানো দরকার। এর ফলে, প্রথমত, শিল্প-বিষয়ের পটভূমিকায় মানুষ দুটির ভিন্নতা স্পষ্ট করে দেখানো যায়; এবং, দ্বিতীয়ত, এককে প্রাধান্য দিয়ে অপরের গৌণতা স্পর্শ করা যায়। কখনো কখনো, যেমন মল্লরত দুটি মল্লবীরের চিত্র, প্রধান-অপ্রধানের প্রভাব ছাপিয়ে একে-অপরকে-আড়াল করার নিয়মের ফলে একটি সামগ্রিক প্রভাবই দর্শক মনে প্রধান হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে রূপের ভূমিকা কী হবে তা সাধারণভাবে অবশ্যই আলোচনা করা যায়। কিন্তু আলোচনা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি তা দেশ-কালের, সমাজ ও যুগের, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে দেখানো যায়। এক যুগ ছিল যখন সহজ সরল ক'রে বিষয়কে পরিবেশন করাই ছিল রীতি। মিশরীয় ও বাইজান্টাইন শিল্পরীতির মধ্যে বাস্তবধর্মী বা জীবন-যেমন-তেমনটি হবার প্রচেষ্টা ও প্রমাণ নেই। মিশরীয় শিল্পরীতিতে মানুষকে হয় এক দিক থেকে অথবা সামনাসামনি দেখানো হচ্ছে। কোণাকুনি বা সামনে-পিছনে দেখানোর জটিলতা সেখানে যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। কেশবিন্যাসেও গ্রীসীয় বা রোমাক রীতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতা অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে কেশবিন্যাস না দেখিয়ে শুধু মুণ্ডিত শির বা কারুকার্যবর্জিত শিরস্ত্রাণ দেখা যায়। মিশরীয় ভাস্করের মূর্তিতে আছে গাম্ভীর্য, জ্যামিতিক অনড় দৃঢ়তা, বাহুল্যবর্জিত সৌন্দর্য। ঐ একই কথা পিরামিড সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মিশরীয় ভাষায় ভাস্কর শব্দটির একটি অর্থ "যে জীবন্ত রাখে।" বাহুল্যবর্জিত জ্যামিতিক শুদ্ধ রূপের মুক্তিতে মিশরীয় ভাস্কর ও স্থপতি যে-সব শিল্পকর্ম করে গেছেন তাতে, গম্ব্রিথের ভাষায়, আছে "solemnity and simplicity" এবং "concerned with essentials।" আর সে-জন্যই বোধহয় এইসব শিল্পকর্মে একটা "চিরন্তনী আবেদন" ("art for eternity") আছে ব'লে কথিত হয়।[১১] শুদ্ধ রূপের প্রয়োগে শিল্পকর্ম এক অর্থে নিঃসন্দেহে সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, বাহুল্যবর্জিত নিরলঙ্কার শিল্পরীতিও কয়েকটি বিশেষ সমাজ ও যুগের লক্ষণাক্রান্ত। রোম ও বাইজান্টিয়ামে যখন প্রথম দিকে খ্রীষ্টান চার্চের প্রতিষ্ঠা হল (৩৪১ খৃষ্টাব্দ) তখন পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব ছিল প্রবল এবং তৎকালীন গির্জায় (ব্যাসিলিকাগুলিতে) সাধুপুরুষ, দেবদূত প্রভৃতির মূর্তি ছিল না বললেই চলে; এবং গির্জার গঠন-পদ্ধতিও ছিল সরল, নিরলঙ্কার, বাহুল্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্যবর্জিত। সেই আমলের গির্জার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ র‍্যাভেন্নার ব্যাসিলিকা (৫১৩ খৃষ্টাব্দ)। রাভেন্নার ব্যাসিলিকার সঙ্গে সূক্ষ্ম, জটিল-কঠিন কারুকার্যময়, অলঙ্করণ সমৃদ্ধ আমিয়েন্স (১২১৮-৪৭ খৃষ্টাব্দ) কোলোনের (১২৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরু) গথিক ক্যাথিড্রালের তুলনা করলে দু যুগের শিল্পীদের রূপানুরাগের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক কালে আবার একাধিক শিল্প-ঘরাণা দেখা দিয়েছে যারা বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বাদ দিয়ে তাদের বিশেষ ভঙ্গিমাময় রূপের স্টাইলাইজ্‌ড্‌ ফর্ম-এর উপর জোর দিচ্ছে। সাধারণভাবে এই প্রবণতাকে বলা যেতে পারে এ্যাব্‌স্ট্রাক্ট বা ভাবপ্রধান। বিষয়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের উপর ঝোঁকটা কমে এলে স্বভাবতই বিষয়ীর মনোভাবই শিল্পকর্মে মুখ্য হয়ে ওঠে। ক্যাণ্ডিন্‌স্কি ("Accent in Rose," ১৯২১), মণ্ড্রিয়ান ("Composition in grey, blue and rose", ১৯১৩; "Victory Boogie-Woogie", ১৯৪৩-৪৪), হারবিন ("Vein", ১৯৫৩), ম্যাগ্‌নেলী ("Staccato rhythm", ১৯৩৮), ম্যাক্স বিল ("Two Accents", ১৯৪৯) এবং পিকাসোর ("The three musicians", ১৯২১ ; "The sleeping Atlantid", ১৯৪৬) অনেক ছবিতেই অ-মূর্তমুখিতার ঝোঁক স্পষ্ট।[১২] রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছবিতেও (Chitrali, Visva-Bharati, ১৯৬২, প্লেট নং ৫, ৬, ১১, ১৩) বিষয়ের বৈশিষ্ট্যবর্জিত, রূপ-প্রধান, রেখার সামঞ্জস্য-নির্ভর অ-মূর্তমুখিতা লক্ষনীয়। এগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ছন্দিত বিগ্রহ ("rhythmic incarnation") ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতা ("harmonious wholeness")।

বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রেও শিল্পী নতুন বা ভিন্নরূপে তাকে শিল্পকর্মে পরিবেশন করতে পারেন। বস্তুত শিল্পী তা'ই ক'রে বিষয়কে নান্দনিক মূল্যমণ্ডিত করার জন্য তাঁর রূপান্তর ঘটান। এই রূপান্তরণ প্রসঙ্গে কল্পনার ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য। বস্তুজগতে একটি বিষয়—মানুষ বা গাছ যাই হোক না কেন—যে-রূপে আছে ঠিক সেইরূপেই যদি তাঁকে বর্ণনা করা হয় বা আঁকা হয় তাহলে সৃষ্টি কোথায় হল? শিল্পকর্ম কেমনভাবে হল? ফোটোগ্রাফারকেও শিল্পী বলার আগে তার সৃষ্টি (কম্পোজিশন) ক্ষমতা দেখা হয়; যদি তার ক্যামেরার চোখ আমাদের স্থূল চোখ যা দেখে নিছক তা'ই দেখায় তা হলে তার কর্মটিকে আর যাই বলা হোক শিল্পকর্ম বলা চলে না। শিল্পকর্মের রূপে কিছু স্বকীয়তা, রূপের স্বাতন্ত্র্য—যা ঠিক বিষয়ে নেই—দেখতে পাওয়া চাই।

ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে যখন কোন কবি বা নাট্যকার কবিতা বা নাটক লেখেন তখন তিনি হুবহু ঐ চরিত্রের বিষয় সত্য-প্রকাশ করার জন্যই ব্যস্ত নন। অন্য কিছু, ভিন্ন কিছুও তিনি প্রকাশ করতে চান। তার জন্য তিনি নেন কল্পনার সাহায্য। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক শকুন্তলা আর কালিদাসের শকুন্তলা ঠিক এক নয়। "আসল" শকুন্তলার সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলার মিল কোথায় ও অমিল কোথায় তা দেখানো বা প্রমাণ করা অসম্ভব। তার প্রয়োজনও নেই। কারণ এই (মিল-অমিলের) অর্থে বিষয়গত সাদৃশ্য প্রমাণের দায় কবি, নাট্যকার বা অন্য কোন শিল্পীর নয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী শকুন্তলা চরিত্র বিভিন্নভাবে কল্পনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেকে কালিদাস কল্পনা ক'রে থাকেন তবে তিনি কালিদাস হন না, হতে পারেন না। তিনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একটি রত্ন, কাব্যপ্রতিভার অধিকারী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন পুরুষ হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু তাতে—সেই কল্পনা দ্বারা কালিদাস হওয়া হয় না। কালিদাস হওয়া আর কালিদাসের মতো গুণের অধিকারী হওয়া এক কথা নয়।

ব্যক্তির সম্বন্ধে যা বলা হল তা শিল্পকর্মের অন্য কোন বিষয়—গাছ, মাঠ, আকাশ, সমুদ্র—সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শিল্পকর্মের রস আস্বাদনের অভিজ্ঞতায় যা ঘটে তা বোধহয় এইরকম। ব্যক্তি বা গাছের দৃশ্য রূপ (চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে) দেখে' বা কল্পনা ক'রে—নিছক ধারণা থেকে নয়—তাদের নান্দনিক (রসদায়ক বা রসোদ্দীপক) চরিত্র আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষের কথা আগেই বলেছি। কল্পনা যে বিষয়কে সৃষ্টির উপজীব্য বা রসিক মনের উপভোগ্য ক'রে তোলে তা উক্ত বিষয়ের কয়েকটি চাক্ষুষ (বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। বৈশিষ্ট্য যদি কল্পনা করা না যায়—প্রতীক বা রূপক কোনভাবেই করা না যায়—তাহলে আমরা না-পারি তার রূপান্তর ঘটাতে না-পারি ঐ বৈশিষ্ট্য-নিহিত বিষয়কে নান্দনিকভাবে জানতে। গাছ, মাঠ, বা রবীন্দ্রনাথের শিল্পের জগতে ঠিক গাছ, মাঠ, বা রবীন্দ্রনাথরূপে পাই না,—তাদের পাই "যেন—গাছ", "যেন—মাঠ", বা "যেন—রবীন্দ্রনাথ" রূপে।[১৩]

কল্পনা সাহায্য করে শিল্পকর্মের বিষয়কে জানতে বা বুঝতে। বিষয়টি যদি নিছক বিষয়রূপেই জানি বা বুঝি, অর্থাৎ কল্পনার রূপান্তরণ ব্যতীতই যদি বিষয়টি তার বস্তুশরীর নিয়ে জ্ঞানের জগতে উপস্থিত হয় তবে সে-জ্ঞান বৈজ্ঞানিক,—নান্দনিক নয়। কোন বিষয়বস্তুকে শিল্পবস্তু রূপে যখন জানি বা বুঝি তার মধ্যে স্বভাবতই একটি রূপকধর্মিতা বা প্রতীকধর্মিতা মেনে নিতে হয়। জ্ঞানজগতের প্রতীকধর্মিতার সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হল : এর অর্থ, তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনার উপলব্ধি তাৎক্ষণিক, বিশদ ব্যাখ্যা বা ভাষ্যসাপেক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথের "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পে প্রত্যাবর্তিত যে-খোকাবাবুকে চেনা গেল সে বস্তুত আসল খোকাবাবু কি না—এই প্রশ্ন ঐতিহাসিকের ও বিজ্ঞানীর, শিল্পী-সাহিত্যিকের নয়। আর এই প্রত্যাবর্তিত খোকাবাবুকে চিনতে সাহায্য করেছে কল্পনা। কল্পনার প্রভাব এক্ষেত্রে এতই প্রবল যে ঐতিহাসিক সত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর কিংবা, মতান্তরে, খুব গৌণ। এই সীমিত অর্থে শিল্পজগতের স্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বীকার্য।

কল্পনা শুধু শিল্পবিষয়কে বুঝতেই সাহায্য করে না তাকে স্বাতন্ত্র্যও দেয়। বিষয়কে রূপান্তরিত ক'রে স্বাতন্ত্র্য দেয়। আমাদের দেশে রাধা-কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্টান জগতে ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি নিয়ে কতো কাব্য, কতো শিল্পকর্মই না করা হয়েছে! বিষয় একই :

অথচ শিল্পীর কল্পনায় তা কতো বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন কিছু সৃষ্টির আগ্রহে কবি বা শিল্পী উদ্বুদ্ধ হন না বা সৃষ্টি করেন না। তিনি যেমনভাবে বিষয়টিকে কল্পনা করেন তেমনভাবে প্রকাশ করেন ; করার পরে আমরা বুঝি নতুন কিছু, বিশিষ্ট কিছু, পেলাম। একই মানুষের ছবি শিশুরা কতো বিভিন্নভাবে যে আঁকে তার ইয়ত্তা নেই।[১৪] শুধু শিশু শিল্পীদের ক্ষেত্রেই নয় পরিণত বয়স্ক শিল্পীদের ক্ষেত্রেও কল্পনা অন্তহীন বৈচিত্র্যপ্রদায়িকা শক্তি। বেলিনী, মিকেলেঞ্জেলো থেকে সুরু ক'রে অসংখ্য শিল্পী "Pieta" এঁকেছেন বা খোদাই করেছেন ; যেমন আমাদের দেশে দেখি অজস্র মন্দির গাত্রে, রাজস্থানী ও কাংড়া ঘরানার, রবি বর্মা, অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিল্পীদের রাধাকৃষ্ণ। একই বিষয় ; তবু কল্পনার বৈভবে বহুবিচিত্র।

কল্পনা দিয়ে শিল্পী শুধু যা আছে তারই পরিবর্তন ঘটান যা নেই তা-ও সৃষ্টি করেন। পরিবর্তন ও সৃষ্টি শিল্পক্ষেত্রে অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্ম নয়। একের উপর অপরটি নির্ভর করে। পরিবর্তন ছাড়া সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির প্রেরণা পরিবর্তনের কখনো জনক, কখনো সহায়ক।

কল্পনায় রূপের যে বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব বিচারের পর্যায়ে তা সম্ভব নয়। রূপের বৈচিত্র্য কতোটা নান্দনিক রসসৃষ্টির সহায়ক আর কতোটা প্রতিবন্ধক তা নির্ণয় করার জন্য বিচারের রূপ, অপেক্ষাকৃত অমূর্ত ও প্রয়োগে বিস্তৃততর রূপ, প্রয়োজন। এক অর্থে বিচারের রূপ কল্পনার রূপের আদর্শস্বরূপ এবং নিয়ামক। আরেক অর্থে বিচারের রূপ কল্পনার রূপকে শক্তি দেয়, সমগ্রকে চেতনায় রেখে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সামর্থ্য জোগায়। ভারতীয় চিত্রশিল্পকে যেমন কাংড়া, রাজস্থানী, মোগল এবং য়ুরোপীয় স্থাপত্যশিল্পকে তেমন ডোরিক, আইওনিয়ান, করিন্থিয়ান, রেনেশাঁস, গথিক, ব্যারোক প্রভৃতি রূপের আদর্শে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রূপ নিছক রূপ, অর্থাৎ মূল্যনিরপেক্ষ কাঠামো, হিসেবে পরিগণিত নয়। রূপ এক্ষেত্রে সৌন্দর্য বিচারের আদর্শ মাপকাঠি হিসেবেও স্বীকৃত। রূপ না ব'লে কেউ কেউ হয়তো গথিক, ব্যারোক ইত্যাদি পদ্ধতিগুলিকে স্টাইল বা বিশেষ ভঙ্গিমা বলতে চাইবে। রূপের বৈশিষ্ট্যভেদেই স্টাইলের পার্থক্য ও স্বকীয়তা নির্দেশ করা সম্ভব হয়।

শিল্পকর্মের গোত্রবিচারে রাজস্থানী, কাংড়া, মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি পদগুলি নিছক কাঠামোগত চিহ্ন (মর্ফোলজিকাল ডেজিগনেশন) না কি অনুসৃত আদর্শের ইঙ্গিত,— এই প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক। প্রথমত স্বীকার করা ভালো যে এই পদগুলির সঠিক ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় খুব কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশুদ্ধ নয়, সঙ্কর বা মিশ্রগুণধর্মী। তাছাড়া সৃষ্টির এই ভঙ্গিমাগুলি বিশেষ দেশ-কালে সীমাবদ্ধ

থাকে না। দ্বিতীয়ত, এই পদগুলি দিয়ে যে শিল্পের গোত্রবিচার হয় তা ঐতিহাসিক, অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির অনেক পরে শিল্পের ঐতিহাসিকেরা এইসব ব্যাপক ও সাধারণ পদ ব্যবহার ক'রে শিল্পের গোত্র নির্দেশ করেন। এবং এইজন্যই ক্রোচের মতো অনেক নন্দনতাত্ত্বিক মনে করেন যে, শিল্প শিল্পকর্ম হিসেবেই সার্থক কিংবা অসার্থক ; গোত্রনির্ণয় ক'রে তার সার্থকতা বিচার অসম্ভব ; কারণ, সেক্ষেত্রে শিল্পজগতের বহির্ভূত (এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক) কোন মাপকাঠি দিয়ে শিল্পবিচারের অপচেষ্টা হয়। শিল্পের ইতিহাস হয় শিল্পের অঙ্গ হবে নয়তো শিল্পবিচারে তার অবদান অগ্রহনীয়। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে যেমন, ধ্রুপদী (ক্ল্যাসিকাল), আধুনিক (বা রোমান্টিক), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল, প্রভৃতি। ধ্রুপদী শ্রেণীর শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে, ক্রোচের মতে, রোমান্টিক শ্রেণীর শিল্প-সাহিত্যের রূপগত পার্থক্য (বিশ্লেষণ ক'রে) দেখান যেতে পারে ; কিন্তু রূপের সেই দিকটিকে নান্দনিক বলা উচিত হবে না। শিল্পকর্মের রূপকে নান্দনিক, জ্যামিতিক এবং অন্যভাবেও ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু মূল কথা হল, রূপকে নান্দনিক অভিজ্ঞতা কিংবা অন্য দিক থেকে বললে, শিল্পকর্মের মূর্ত সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখায় ও দেখানোয় নান্দনিক তাৎপর্য আছে কি না ? ক্রোচে বলবেন, নান্দনিক তাৎপর্য নেই,— বাস্তবিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

মৌলিক যে-তত্ত্বটির উপর নির্ভর ক'রে ক্রোচে বা অন্যান্য ভাববাদী লেখকেরা এই কথাটি বারবার বলেন তাহল শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, শিল্পের জন্য শিল্প ; শিল্পলোকের বহির্ভূত কোন প্রেরণা, উদ্দেশ্য বা রূপকে যেন শিল্পসৃষ্টিতে ও শিল্পবিচারে স্বীকৃতি দেওয়া না হয়। সমস্যা হল প্রেরণা বা রূপ শিল্পের অন্তর্গত নাকি বহির্ভূত তা নির্ণয় করা। আসলে এই প্রশ্ন রূপ ও বিষয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নেরই প্রকারান্তর। রূপকে তার বিশুদ্ধতায় জানা যে দুষ্কর তা অবশ্যই স্বীকার্য। তবু মানব মনের এই ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, অল্পাধিক আছে। বিষয় থেকে সম্পূর্ণভাবে রূপকে পৃথক করতে না পারলেও বুদ্ধি তার অমূর্তকরণ ক্ষমতার অনুধ্যানে ও প্রয়োগে শুদ্ধ রূপ মনশ্চক্ষে দেখতে পায়। এই ক্ষমতাকে যেমন অমূর্তকরণের দিকে প্রয়োগ করা যায় তেমনি আবার চেষ্টা ক'রে চিন্তায়, কল্পনায় ও প্রত্যক্ষে মূর্তকরণের দিকেও নিয়ে যাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধি, কল্পনা ও প্রত্যক্ষের মধ্যে অনতিক্রম্য ভেদরেখা টানা শক্ত। রূপকে শুদ্ধতা-বস্তুধর্মিতা (বা বিষয়া-শ্রিততার) স্কেলে ক্রমান্বয়ে সাজানো যায়। যা সম্ভব, যা করা যায় এবং করা হয়েও থাকে—রূপকে স্বতন্ত্র ও শুদ্ধভাবে দেখা—তার বিরুদ্ধে ক্রোচের আপত্তি বোঝা যায় কিন্তু মানা শক্ত। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায়, শিল্পকর্মে, বিষয়ের মধ্যে রূপ অনুস্যূত। রূপ সৃষ্টির অন্তরে

থেকে তাকে শুধু শরীর দেয় না সম্পূর্ণতার পথ নির্দেশেও দেয়। সে শুধু কাঠামো (ফর্ম) দেয় না আদর্শ (নর্ম) কী তা-ও বুঝিয়ে দেয়। সম্পূর্ণতার আদর্শ কী তা মনশ্চক্ষে ভাসলেও লেখায়, তুলিতে, ইট-কাঠ-পাথরে তা অনুরূপভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ফলে, সর্বদাই শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ঐতিহাসিক অগ্রগতির/পশ্চাৎগতির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বিচার করতে গেলেই কোন-না-কোন মাপকাঠি বা মানদণ্ডের প্রয়োজন। এবং তাকে কোন-না-কোনভাবে ব্যবহার/প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য যদি ঐ মাপকাঠিকে—তা শুদ্ধ রূপই হোক কিংবা সম্পূর্ণতার আদর্শ ই হোক—বাস্তব প্রয়োজনের দাস বা যন্ত্র ব'লে বরবাদ করে দেওয়া হয় তাহলে ভুল হবে। তাছাড়া বরবাদ করার অন্য যুক্তিটিও, বিচারের ঐ জাতীয় মাপকাঠিগুলি শিল্পের বহির্ভূত, সযত্নে ভেবে দেখা দরকার। এক অর্থে, যা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, রূপ বা আদর্শমাত্রই শিল্পের বহির্ভূত ; কারণ, বিষয় (কনটেন্ট) রূপ নয় ; বিষয় রূপময়, রূপাশ্রিত, বা রূপগ্রহিষ্ণু, রূপানুসন্ধী। রূপ ও বিষয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে ভাবেই ভাবি না কেন এতদুভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য, এবং সে-পার্থক্য বিষয়গত, শুধু ধারণাগত নয়, মানতেই হবে। সেই সীমিত অর্থে রূপ অল্পবিস্তর বিষয়ের বহির্ভূত হতে বাধ্য। "শিশুর পিতা শিশুর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে" বা "মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিড কোন একটি শ্বেত পাথরের মধ্যে ঘুমিয়েছিল" যা'ই বলি না কেন বিচার করলে স্বীকার করতে হবে, পিতা শিশুর অধিক এবং সে অর্থে বহির্ভূত—আর যেহেতু শিশু ব্যতীত পিতা হওয়া অসম্ভব সেই হেতু পিতা এক অর্থে শিশুর মধ্যেই আছে। অনুরূপভাবে, জড়বস্তু ব'লে কিছুটা পৃথকভাবে, ডেভিড পাথরের মধ্যে ছিলও বটে আবার ছিল না-ও বটে। কার্যের বিষয়গত উপাদান, কিছুটা রূপের কাঠামোও, কারণের মধ্যে থাকে ব'লে এ কথা বলা ভুল হবে যে, কার্যের সকল পরিণাম ও সম্ভাবনাও কারণের মধ্যেই থাকে। যে-শিল্পরূপ শিল্পীর মনে থাকে তা একসঙ্গে বা নিঃশেষ সার্থকতায় প্রকাশ হয় না, হতে পারে না। বিষয়বস্তু, উপাদান-উপকরণ, শিল্পরূপকে বাস্তবে রূপদানের ব্যাপারে শিল্পীর মানবিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি এর জন্য দায়ী।

বিচারের মাপকাঠিকে চিরন্তন বা কতো সামান্য (জেনারেল) করব তার উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রূপকে নিছক রূপ বলা হবে না কি আদর্শ বলা হবে ; আদর্শ বলা হলেও তাকে শাশ্বত না কি ঐতিহাসিক-সামাজিক বলা হবে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে রূপ প্রাথমিক গুণসূচক শব্দের মতো,—যার অর্থ বুঝতে হয়, মেনে নিতে হয়, চর্মচক্ষে দেখা যায় না বা দেখানোও যায় না। "রঙ" এবং "লাল রঙ"—এর মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায় না,—বুঝতে হবে। রঙ একটি ধারণামাত্র ; এর

বিবরণ দেওয়া যায় না ; যে জন্মান্ধ তাকে রঙ কী তা বোঝানো অসম্ভব। কিন্তু লাল রঙ বা সবুজ রঙ কী তার বিবরণাত্মক পরিচয় দেওয়া যায় আলোক-তরঙ্গ রেখার ঘনত্ব (Frequency) দিয়ে। প্রাথমিক গুণ বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত—যেমন, বস্তুর বিস্তার। যা বিস্তৃত তা বিস্তার নয়। বিস্তার বিষয়ের স্বরূপ ; এর বিবরণ দেওয়া যায় না ; যখনি এর বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হয় তখনি যা বিস্তৃত তার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন না কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে হয়। "লাল রঙ" "রঙ" নয়,—"রঙ"-এর উদাহরণ। প্রাথমিক গুণগুলি একটি বিশেষ অর্থে রূপ,—অমূর্ত ধারণা এই অর্থে। মূর্তরূপে এই গুণগুলি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। বিচার করার জন্য অমূর্ত রূপের প্রয়োজন আছে। মূর্ত রূপগুলির সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সমগ্রসন্ধি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থক হল কি না তা বুঝবার ও বোঝাবার জন্য অমূর্ত রূপকে কাঠামো ও মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। যা মূর্ত তাকে মূর্ত অন্যকিছুর সঙ্গে তুলনা করার জন্য কোন কোন অমূর্ত রূপের সাহায্য আবশ্যক।

শিল্পকর্মে রূপ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন দিকটি কীভাবে এবং কতোটা বাড়াতে-কমাতে হবে তা সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করার জন্যও রূপের সাহায্য আবশ্যক। অমূর্ত প্রকাশবাদী (Abstract Expressionism) আর্টের বিভিন্ন শাখায় (যথা, Kinetic Art, Optical Art এবং Minimal Art-এ) রূপের ভূমিকা প্রধান ও স্পষ্ট। Kinetic Art-এ রূপের বিক্ষেপ ও প্রক্ষেপের বিশিষ্ট সমন্বয়ে গতির অধ্যাস সৃষ্টি করা হয়,—যা স্থিতি তাতেই গতির বেগধর্ম দেখানোর চেষ্টা করা হয়। Optical Art-এ বহু সূক্ষ্ম-রেখার সরল, বক্র ও কম্পিত রেখার সামঞ্জস্যে এমন একটি কাঠামোর প্রকাশ ঘটে যাতে মনশ্চক্ষুর আনন্দ মেলে, যদিচ চর্মচক্ষু রৈখিক বিন্যাসের অস্বাভাবিকতায় কখনো কখনো পীড়িত (strained) হয়। Minimal Art-এ জ্যামিতিক রূপের কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ ; তার নন্দন চরিত্র মূলত বিন্যাসের (Composition-এর) বৈচিত্র্যজনিত এবং সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত।[১৫] রূপের সার্থক বিন্যাসে রূপ শুধু জ্যামিতিক সৌন্দর্যই সৃষ্টি করে না নান্দনিক সৌন্দর্যও সৃষ্টি করতে পারে। রূপের জ্যামিতিক ব্যবহারের বিন্যাস ও বৈচিত্র্য রূপকে বিষয়ের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য দেয়। আবার, জ্যামিতিক রূপের কৌলীন্য ভেঙেও শিল্পী নান্দনিক সৃষ্টি প্রয়াসে সার্থক হয়। রূপের সামঞ্জস্য বিষমও হতে পারে ; নিয়ম ভাঙারও নিয়ম আছে। হতে পারে যে সে নিয়মকে অব্যর্থ সূত্রাকারে সাজানো যায় না।

গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বস্তুর সামগ্রিক আকারের উপর বেশি জোর দিয়ে থাকেন। তারা রূপ বলতে সাধারণত বস্তুর বাহ্যিক আকারের দিকটাই বড় করে দেখান। এখানে আকার বলতে দৃশ্য বা শ্রাব্য রূপটি বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে উগ্র প্রত্যক্ষবাদীর বক্তব্য

থেকে গেস্টাল্টবাদীর বক্তব্য পৃথক। যা দৃশ্য—যথা, ভ্রূকুঞ্চিত মুখ—তা দেখে অদৃশ্য কিছুও—রাগ—বোঝা যায়। মুখের রূপ দেখে বোঝা যায় তাতে রাগ, চিন্তার বা অন্য কোন ভাব বা আবেগের চিহ্ন আছে কি নেই। শিল্প রূপের অভিজ্ঞতা। রূপ শুধু বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি নয়, তাতে প্রকাশিত ভাব বা আবেগের দিকটিও বটে। রূপ ও রূপানুগত ভাবের সম্বন্ধ কি? প্রত্যক্ষবাদী মনে করেন, রূপানুগত ভাব রূপেরই বৈশিষ্ট্য ভিন্ন কিছু নয়। গেস্টাল্টবাদীর মতে, রূপ ভাবের বহির্প্রকাশ-ক্রুদ্ধ মুখে ক্রোধের প্রকাশ ঘটে। শিল্পে শারীরিক বা বস্তুগত কোন জিনিষ নিছক শরীর বা বস্তু-রূপে স্বীকৃত নয়। যদি তা কোন কিছুর প্রকাশ, চিহ্নবাহী, বা প্রতীক হয় তবেই তার রূপ শিল্পের জগতে স্থান পেতে পারে। কোন একটি ছবির আয়তন, আকার, সংস্থাপনা, গতিধর্ম, উজ্জ্বলতা ও রঙ ভিন্ন ভিন্ন ক'রে চেষ্টা করলে দেখা যেতে পারে বটে কিন্তু তাতে শিল্পের রূপ প্রকাশিত হবে না। এই সবকিছু মিলে-মিশে যে শিল্প-রূপ লাভ করতে পারে, সংগঠিত হতে পারে, তা দ্রষ্টার অতীত অভিজ্ঞতা ও সহমর্মিতার পরিণাম নয়। একক বিচারে আয়তন, আকার, সংস্থাপনা, গতিধর্ম ইত্যাদি দিকগুলি স্থাণু ও কোন সংগঠনেরই অংশ বা উপাদান নয়। তবু যে এক সময়ে তারা সমবেতভাবে একটি শিল্প রূপের অবিভাজ্য (উপাদানের অধিক) উপজীব্য হয়ে ওঠে তার কারণ চক্ষু, মস্তিষ্ক এবং শরীরের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশের সমবেত রূপময় ক্রিয়াশীলতা। জ্যামিতিক যে-সব রূপ আমরা কোন শিল্পকর্মে দেখতে পাই তা (গেস্টাল্ট) স্ট্র্যাকচার অভিজ্ঞতার (বা প্রত্যক্ষের) ফল,—কারণ নয়। অর্থাৎ, শিল্পরূপের ভিত্তি দেহ-মনের রূপময় ক্রিয়াশীলতার মধ্যেই খুঁজতে হবে;—জ্যামিতি বা বস্তুজগতের জ্যামিতিক রূপ-বিভঙ্গ থেকে তা ধার ক'রে আনার জিনিষ নয়। দেহ-প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অন্ধ বা এলোমেলো নয়: তার মধ্যেই রূপের প্রতিশ্রুতি অনুস্যূত। গেস্টাল্টবাদীর মতে, রূপসৃষ্টির সক্রিয় প্রবণতা ও সামর্থ্য শুধু মনেই নয় দেহেও আছে। এক কথায়, দেহ-মনের রূপসৃষ্টির সামর্থ্য ও প্রবণতা মূলত একাত্ম।

রূপ প্রসঙ্গ গেস্টাল্টবাদীর এই মূল বক্তব্যের তাৎপর্য অনেক ও সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এ বক্তব্য সঠিক হলে মেনে নিতে হয় রূপ সৃষ্টি নিছকই মানসিক প্রচেষ্টা ও সিদ্ধি নয়; এতে শরীরের ইন্দ্রিয়াদির অবদানও আছে: এবং মনোময় শরীর বা শারীরিক মনের কাজ একই লক্ষ্যাভিমুখী। দ্বিতীয়ত, রূপসৃষ্টি প্রয়াস-সাপেক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বস্তু থেকে আলোক-বা শব্দ-তরঙ্গ যে-রূপ শরীর-মনের কাছে নিয়ে আসে তা সংবাদ বা উপকরণমাত্র,—রূপ নয়। উপকরণগুলিকে শরীরের স্নায়ু-স্মৃতি-সংস্কার-ইচ্ছাদি রূপান্তরিত করে ফেলে। বহিরাগত ঐ উপকরণ বা সংবাদসমূহের সঙ্গে রূপসৃষ্টিকারী শারীরিক

সামর্থ্য ও প্রবণতার একটি নিঃশব্দ ও অনিবার্য "সঙ্ঘাত" ঘটে। এরই ফলে বস্তুরূপ দেহ-মনের পটে ক্যামেরাধর্মী প্রতিবিম্ব হয় না,—শিল্পীর সৃষ্টির মতো নতুন কিছু হয়ে ওঠে।

চক্ষু শুধু প্রতিবিম্বের ধারক ও বাহক নয়। যদি তা'ই হত তাহলে শিল্পসৃষ্টিতে দৃষ্টিশক্তির ভূমিকা হত খুবই সীমিত, শুধু প্রতিবিম্ব বা ইমেজের হেরফের ঘটানো। কিন্তু আসলে শুধু শিল্পসৃষ্টিতে নয় দৈনন্দিন জীবনেও চক্ষু সমগ্র মনের অবিচ্ছেদ্য আত্মীয় হিসেবে কাজ করে। শারীরিক প্রয়োজন মেটাতে দৃষ্টিশক্তি কাজ করে। ব্যক্তির গোটা মানস-সত্তাও দৃষ্টিতে প্রতীকিত হয়। আগ্রহ, কামনা, ক্লান্তি, উৎসাহ, অপমান, সন্ধান, জিজ্ঞাসা, বিচলিত হওয়া প্রভৃতি নানা ভাব চোখে ফোটে। চাক্ষুষ শিল্পরূপ নানাভাবে নির্ণীত হয় : চক্ষুতে প্রক্ষিপ্ত হয় বস্তুর চিত্রপ্রতিমা ; চক্ষু ইন্দ্রিয়ের রূপান্তরণ ক্ষমতা। দেহ-মনের পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন ও উপলব্ধি করবার ক্ষমতা, মনোভাব, মানসিক উত্তেজনা, সঙ্ঘাত ইত্যাদি চক্ষুতে ফোটে।

চক্ষুতে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর চিত্রপ্রতিমা দৃষ্টিশক্তিকে স্বেচ্ছাচারী হতে দেয় না, তার স্বাধীন সৃষ্টি ক্ষমতাকে বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সে নিয়ন্ত্রণ সামগ্রিক নয়। কারণ, নির্বাচন ও বর্জনের সমন্বয়ে চক্ষু যা দেখে তাকে নতুন ভাবে সাজাতে পারে। তাছাড়া দেহ-মনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি শিল্পীকে তার পরিবেশের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধে আবদ্ধ করে।

প্রক্ষিপ্ত চিত্রপ্রতিমা বা চিত্রকল্প শিল্পীর (সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু সম্পর্কে) ভাবনার সঙ্গে মিলতে পারে, না-ও মিলতে পারে। শিল্পীর ইচ্ছা নির্বাচন ও পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে ঐ দুয়ের মিলন ঘটুক, শিল্পসাধনা সার্থক হোক। সার্থক শিল্পকর্মে গভীর শিল্পানুভূতি প্রতীকিত হয় আয়তন, আকার, দূরত্ব, সংস্থাপন ও রঙ-এর বিভিন্ন গুণের ও সম্বন্ধের পারস্পরিক সাহায্যে। চাক্ষুষ এই ভাষার, প্রত্যক্ষ প্রতীকতার, শক্তি নিহিত এর স্বতঃস্ফূর্তিতে, অনায়াস ভাব-প্রকাশে, পরিবেশ সৃষ্টিতে। কালো রঙ দিয়ে অন্ধকার, লাল রঙ দিয়ে আগুন, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, দহন ; সাদা দিয়ে আলো, রোদ, উদ্ভাস, পবিত্রতা ; সবুজ দিয়ে যৌবন দেখানো ; যার সঙ্গে যা থাকে বা থাকতে পারে—যেমন, গাছ-ফুল-লতা-পাতা—তা তেমনভাবে দেখানো ; পারস্পরিক সম্বন্ধে যে বস্তু যতটা বড়-ছোট, সামনে-পিছনে, উঁচু-নীচু তা তেমনভাবে সাজানো চাক্ষুষ ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত সার্থকতার অন্তর্নিহিত হেতু।

একথা থেকে মনে হতে পরে, শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর চোখে যা প্রক্ষিপ্ত হয় তা তার সৃষ্টিকর্মের মূল নিয়ামক এবং তার ফলে সৃষ্টির স্বাধীনতার—সংস্থাপনার হেরফের ঘটানোর—তাৎপর্য খুবই সীমিত। কিন্তু বস্তুত মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। সে তার দেখা

(বা শোনা) বস্তুর শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে শুধু বস্তুর চিত্রপ্রতিমা দ্বারাই প্রভাবিত হয় না তার নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তা, পরিবেশ-সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ও ভাবনা দ্বারাও প্রভাবিত। একটি চিত্র বা সঙ্গীত শুধু বস্তুজগতের (দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু বা বস্তুসমাহারের) প্রতীক নয় শিল্পী-সত্তার প্রতীকও বটে। তাই (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) একই উপজীব্য বা উপকরণ বিভিন্ন শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ষ্টাইল, সংস্থাপনা ও চরিত্র অর্জন করে।

গেস্টাল্টবাদীর মতে, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য চাই অর্থ/ব্যঞ্জনা/তাৎপর্যের সঙ্গে রূপের মিলন। একটি অর্থ কয়েকটি রূপে (সকল রূপে নয়) প্রতীকিত হতে পারে ; সকল রূপ সকল অর্থ বহন, ধারণ, সঞ্চারণ ও প্রকাশ করতে পারে না। শিল্পবিচারে তাই সমালোচক প্রধানত লক্ষ্য করেন রূপ ও অর্থের মিলন কতোটা সার্থক, সহজ, (সমাজ-বিচারে) কতোটা গ্রহণযোগ্য এবং অকৃত্রিম হল। রূপ ও অর্থের মিলন কষ্টকল্পিত বা কৃত্রিম হলে রসিক আনন্দলাভে বঞ্চিত হয়।

গেস্টাল্টবাদীর নান্দনিক বিচারতত্ত্বে রূপের ভূমিকা সম্পর্কিত বক্তব্য সুচিন্তিত এবং কিছু পরিমাণে পরীক্ষিতও বটে। শিল্পরূপ যে বিষয়বস্তুর অবিকল প্রতিফলন নয় এবং কেন নয়—এ বিষয়ে তার বক্তব্য আমার কাছে অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। বস্তুত শিল্পকর্মে শুধু বস্তুরূপ নয় শিল্পীমনের ভাব (এমনকি অনুভব, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির) রূপও প্রকাশিত। বলাবাহুল্য, শিল্পীর বিচার—নির্বাচন, গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন—বস্তুরূপের প্রকাশকেও নতুনত্ব, বৈচিত্র্য প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার কথা স্বভাবতই ওঠে। কী সে গ্রহণ করবে, কী সে বর্জন করবে, ক'রে কী সে শেষপর্যন্ত সৃষ্টি করবে তা তার স্বাধীন সিদ্ধান্ত, আনন্দের সিদ্ধান্ত ও প্রকাশ। সংক্ষেপে বলা যায়, শিল্পকর্মে বস্তুরূপ এবং শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার নির্বাচিত রূপ পারস্পরিক প্রভাব-পরিবর্তনে প্রভাবিত-পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

এটুকু বলায় আমার আপত্তি নেই। বরং সম্মতি আছে। সমালোচনা এড়াবার জন্য যে-কথাটি আগে বলে রাখা ভালো তা হলো এই। শিল্পীর নির্বাচিত রূপের প্রাধান্য কোন কোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, যেমন এ্যাবস্ট্র্যাক্ট, ইম্প্রেশনিস্ট ও কিউবিস্ট চিত্রশিল্পে, এতোই প্রবল যে সেসব ক্ষেত্রে বস্তুরূপ খুবই গৌণ, প্রায় অনুপস্থিত। এতে শিল্পীর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু তাতে শিল্পকর্মের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার জন্য অন্য কিছু চাই।

আরেকটি কথা, যা অধিকাংশ গেস্টাল্টপন্থীরাই কমবেশি অবহেলা করেন তাহল শিল্প-রূপ নির্বাচনে শিল্পীর সমাজ পরিবেশের গুরুত্ব। বস্তু-প্রক্ষিপ্ত কোন রূপ, কতটা, কীভাবে শিল্পী গ্রহণ ও বর্জন করবেন তা, বলাবাহুল্য, শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার উপর, এক অর্থে

নির্ভর করে। এই অর্থ প্রাথমিকও হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অর্থই প্রাথমিক। কিন্তু এই অর্থ একমাত্র অর্থ এবং প্রধান না-ও হতে পারে। ব্যক্তি-সত্তা নিরালম্ব নয়,—সমাজায়ত। সাহিত্য, শিল্প, এবং এমনকি নৈসর্গিক রূপের যে-সব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে শিল্পী আশৈশব বা দীর্ঘকাল পরিচিত তা তার চেতনা, মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষাকে স্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করবেই। যদি তা না করে তবে তা-ই অস্বাভাবিক। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, স্বাধীনতা-চেতনার গভীরতা ও প্রবলতা, অ-সাধারণ সৃষ্টিশীলতা কিছুই ব্যক্তি-সত্তাকে তার সমাজায়ত চরিত্র থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। চিন্তার মুক্তি ও কল্পনার বিস্তার শিল্পীকে দেশান্তরী, কালান্তরী বিষয়সৃষ্টিতে সাহায্য নিশ্চয়ই করে; কিন্তু তবুও তাতে ব্যক্তি-সত্তায় সমাজ-প্রভাব অস্বীকৃত হয় না।

গেস্টাল্টবাদীর মতবাদ, আমার মতে, একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা খুব শক্ত। যা মহান, বিশাল, বৈচিত্র্য বা ব্যাপকতায় মধুর, সুন্দর বা বিস্ময়োদ্দীপক—ইংরাজীতে মোটা-মুটি যা "সাব্লাইম" শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়—তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় গেস্টাল্টবাদীর মতবাদ ঠিক খাটে না। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, তারকাখচিত বিশাল আকাশ বা এই জাতীয় শিল্পবস্তুর কাঙ্ক্ষিত স্বাদ কোন বিশেষ রূপ বা কাঠামোর উপর নির্ভর করে না। এর ঐক্য, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সম ঐক্য বা বিষম ঐক্য, মূলত ভাবধর্মী,—রূপধর্মী নয়। যে-রূপের দেশ-কালগত ভিত্তি ও পরিধি আছে মহান (সাব্লাইম) শিল্পবস্তুর সে-রকম কোন রূপ ও সে-রকম রূপনির্ভর কোন ঐক্য নেই। তবে ঐক্য ঠিকই আছে। সে ঐক্য ভাবনির্ভর।

এ কথাটি প্রসঙ্গান্তরে কান্ট উল্লেখ করেছেন। যা সুন্দর—চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে—তা মূলত নির্ভর করে রূপের উপর,—সুখদায়ক ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উপর নয়। রূপ বলতে কান্ট আকৃতি ও শরীর দুই-ই বোঝান। শিল্পকর্মে শিল্পবস্তুর জ্যামিতিক বা জ্যামিতির ভাঙা-চোরা রূপের (আকারের) যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আবার প্রয়োজন আছে সুন্দর শরীরের,—সে শরীর বস্তুরও (পর্বত, বন, ফুল ইত্যাদিরও) হতে পারে, জীব-জন্তুরও হতে পারে। সুন্দর ও সাব্লাইমের মধ্যে সীমারেখাও কান্ট টানেন আকার ও শরীরধর্ম দিয়ে। আকার ও শরীর সান্ত অর্থাৎ সুন্দরের রূপ সান্ত; কিন্তু যা সাব্লাইম তা রূপের বাধাবন্ধহারা, তার সীমান্ত নেই। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র বা তারকাখচিত বিশাল আকাশ শিল্পবস্তু হতে পারে না। এদের শিল্পধর্ম মূলত ভাবনির্ভর এবং এদের ঐক্য চিন্তাগ্রাহ্য,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রকে দৈশিক-রৈখিক সম্বন্ধে দেখানোটা যে একটা সমস্যা তা নয়, —বরং হামেশাই তাই দেখানো হচ্ছে। কথা হল, ঐ দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের ব্যাপকতা ও

বিস্ময়মিশ্রিত শিল্পানুভূতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন রূপ নেই : দেশ-কালের ছাপ নেই। যে ঐক্যে এ-জাতীয় শিল্পবস্তুর উপাদান বিধৃত তা ভাবনার, অনুভাবনার, ইন্দ্রিয়ের নয়, দেশ-কালের সম্বন্ধে ও সীমারেখায় ধারণ ও প্রদর্শন করবার মতো নয়। কান্টের মতে সাব্লাইমের শরীর বা দেহাকার নেই, সীমাবদ্ধ রূপ নেই ("ungestalt")।[১৬]

রূপের মধ্যে অরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রকাশ করবার কথা যখন শিল্পপ্রসঙ্গে বলা হয় তখন মূলত রূপ ও ভাবের সম্পর্কের কথাই ওঠে। অরূপ রূপেরই ভাব-ব্যঞ্জনা ; অসীম সীমারই আকৃতি। ভাব-ব্যঞ্জনা বা আকৃতি অনির্দিষ্ট হলেও অস্পষ্ট নয়। শিল্পবস্তুর বস্তুরূপকে ব্যঞ্জনার বাহক বা আকৃতির সঙ্কেত/প্রতীক করা সহজ কাজ নয়, বিশেষত চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তো নয়ই। বরং তুলনায় কাব্যে, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, নাটকে, নৃত্যে ও অভিনয়ে ব্যঞ্জনা ও আকৃতির প্রকাশ সহজ। কারণ, সময়ের ব্যাপ্ত পটভূমিতে, একই শিল্পবক্তব্য প্রকাশের জন্য একাধিক দৃশ্য বা শ্রাব্য প্রতীক ও তাদের পারম্পর্য ব্যবহারের সুবিধা ও সুযোগ আছে। একটি পাথর-খোদিত মূর্তির ভাব-ব্যঞ্জনা যে-অর্থে "স্থির", গতির মূর্তি হলেও "স্থির", সে-অর্থে সঙ্গীত, সাহিত্য বা নৃত্যের ব্যঞ্জনা "স্থির" নয়। এ-কথা ঠিক, পাথর-খোদিত মূর্তি (ডেভিড বা মোজেস বা কোণারকের সূর্যমন্দির) "স্থির" হয়েও গতিময়, "গভীর" এবং (অবশ্যই) ভাবব্যঞ্জক হতে পারে। শিল্পকর্মে তাই একই সঙ্গে কৃত্রিমতা ও অধ্যাস (ইলিউশন) সৃষ্টি প্রায় অনিবার্য। সার্থক অধ্যাসের সাহায্যে কৃত্রিমকে যতই অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক দেখানোর/শোনানোর চেষ্টা করা হোক না কেন শিল্পকর্মে ব্যবহৃত বাহক/মাধ্যম ও তার দৈশিক-কালিক সীমাবদ্ধতার ফলে রূপের মধ্যে অরূপের, বস্তুর মধ্যে ভাবের প্রকাশ-পদ্ধতি ও পরিধিও অল্পাধিক সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

রূপের গুরুত্ব শিল্প বিচার প্রসঙ্গে অত্যন্ত গভীর। রূপ যদি হয় প্রকাশের শরীর এবং, কোন কোন ক্ষেত্রে, স্পন্দিত প্রাণ, তাহলে রূপকে বলা যায় বিচারের মূল মানদণ্ড। রূপে প্রকাশ, প্রকাশে সঞ্চারণ এবং সঞ্চারণকে ঘিরে সম্ভব হয় বিচার। রূপ-প্রকাশ-সঞ্চারণ-বিচারকে ব্যাপ্ত ও সংযুক্ত ক'রে রয়েছে একটি সাধারণ ধর্ম : মনের জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া। কল্পনাই করি আর রসোপলব্ধিই করি জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে শিল্পবস্তুর অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আলোচনা, রসোপলব্ধির তুলনা এবং পরিণামে বিচার অসম্ভব হয়ে ওঠে।

জ্ঞান চৈতন্যের একটি সক্রিয় রূপ। চৈতন্যের অন্য রূপও আছে : যেমন, ইচ্ছা, অনুভব। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যায় আরো অনেক রূপ আছে এবং জ্ঞান-ইচ্ছা-অনুভব প্রভৃতি সাধারণ রূপগুলি একটি অপরগুলি থেকে (বিশ্লেষণে বিভিন্ন দেখানো

গেলেও) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আমি যা অনুভব করি তা আমি ইচ্ছাও করতে পারি, জানতেও পারি। অনুভবের রূপ যে ইচ্ছার রূপ থেকে ভিন্ন তা আমি জানি,—অন্য কারো বলে দেবার অপেক্ষা রাখি না। ইচ্ছার রূপের তুলনায় অনুভবের রূপ সাধারণত অস্পষ্ট ; তার আকার-সীমান্তও অনির্দিষ্ট : মহান ও বিশাল সুন্দর/মনোমোহনকারী কিছুর অভিজ্ঞতার মুহূর্তে যা আমরা অনুভব করি। অনুভবের তীব্রতায় কখনো কখনো আমরা অভিভূতও বোধ করি। অভিভূত বোধ করি আর না-করি অনুভবের রূপ অভিব্যক্ত করা, সঞ্চার করা তুলনায় কঠিন। কঠিন হলেও এই সঞ্চারণ যে সম্ভব তার কারণ জ্ঞানের রূপ অনুভবের অস্পষ্টতাকে কমিয়ে আনে, তার অভিব্যক্তিকে সাহায্য করে।

আমি যত সহজে একটি ফুলের বা প্রজাপতির জ্ঞান অন্যকে বোঝাতে পারি, অন্যের মনে সঞ্চার করতে পারি, তত সহজে আমার মনের একটি বিশেষ ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে অন্যকে বোঝাতে পারব না। ঢের বেশি বোঝানো কঠিন পর্বতে সূর্যোদয় বা সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখে' আমি কী অনুভব করি। রূপের গুণে বা সাহায্যে যেহেতু বিষয় (অবজেক্ট), তা সে জ্ঞানের, ইচ্ছার বা অনুভূতির যারই হোক না কেন, একটি সাধারণ ধর্ম অর্জন করে (এবং নিজস্ব সাধারণ ধর্ম প্রকাশ করে) তাই বিভিন্ন মানুষ তাদের ব্যক্তিগত রুচি ও মূল্যবোধের পার্থক্য সত্ত্বেও বিষয়জ্ঞান পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ক'রে বোঝে যে তারা একই বিষয় সম্পর্কে বিচার ও আলোচনা করছে। অনুভবের স্তরে চেতনা অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ও গ্রহিষ্ণু থাকে, আর তাই বিষয়ের বিষয়গত (অবজেক্‌টিভ) রূপটিই পরিস্ফুট হয় বেশি। কিন্তু রূপপ্রদায়ক মানসিক ক্রিয়ার দুর্বলতা বস্তুকে মনে ধরে রাখার ব্যাপারে ও অন্যের মনে সঞ্চার করার ব্যাপারে তেমন কোন সাহায্য করতে পারে না। বিষয় যত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় মনের অনুভব, ইচ্ছাদিকে (বিষয়ের উল্লেখ না ক'রে) তত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না। তাছাড়া, যা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, অনুভবের বস্তু যদি হয় ভাবপ্রধান এবং স্পষ্ট আকার-বিরহিত, তাহলে তা অন্যকে বোঝানো হয় আরো কঠিন। সে-সব ক্ষেত্রে অনুভবের সাধারণধর্মিতাকে, সঞ্চারণ-সম্ভাব্যতাকে, ব্যাখ্যা করার জন্য বিশ্বাস করে নিতে হয় যে, সকল মানুষের মানসিক কাঠামো ও তার ক্রিয়াভঙ্গিতে একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। শুধু রসিকচিত্তই নয় সাধারণ মানবচিত্তের মধ্যেও একটি কাঠামোগত সাদৃশ্য আছে যা ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যেতে পারে।

নান্দনিক অভিজ্ঞতা স্বভাবতই আনন্দদায়ক ; এমন কি বেদনামথিত বা অশ্রুসিক্ত হলেও আনন্দদায়ক। আনন্দের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব বা ইন্দ্রিয়প্রধান হলেও তা

ব্যক্তিগত, কখনো কখনো নিতান্তই ব্যক্তিগত, হতে বাধ্য। যে-অভিজ্ঞতা নিতান্তই ব্যক্তিগত তা অন্যান্য মানুষের মনে সঞ্চার করা অসম্ভব। সকল মানুষের মনে কাঠামো-গত সাদৃশ্য আছে বিশ্বাস করলেও নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঞ্চারণসম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, অভিজ্ঞতা যদি হয় ইন্দ্রিয়প্রধান তবে সে সুখানুভূতি—মানবমনের কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকলেও—ব্যক্তিমনের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু বস্তুত আমরা দেখি একের নান্দনিক অভিজ্ঞতায় অন্যেরা অংশ গ্রহণ করতে পারছে; রসিক সমাজে সঞ্চারণসম্ভাব্যতা সহজ। এই বাস্তব সম্ভাব্যতার মূল ভিত্তি হল মানব-মনের কাঠামোগত সাদৃশ্য এবং কতোগুলি গভীর ধারণা। কাঠামোগত সাদৃশ্য ও ধারণা-গুলির প্রস্ফুট ও মুক্ত প্রভাবে নান্দনিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিমনের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে তার সাধারণ ধর্ম প্রকাশ করে এবং সার্বজনীন আবেদন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

শিল্পবস্তু যদি জ্ঞানের বিষয় না হয়ে ওঠে তবে তা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সর্বজনের পক্ষে নান্দনিক অর্থে উপভোগ্য হতে পারে না। বস্তু—তা সে ফুল, সূর্যাস্তের আকাশ বা অন্য যাই হোক না কেন—শিল্পবস্তু হতে পারে না, বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছবি সার্বজনীন হতে পারে না, যদি সে শিল্পবস্তু বা মানসিক প্রতিচ্ছবি জ্ঞানের বিষয় হবার মতো রূপ না অর্জন করতে পারে। কিন্তু কোন বস্তুই সরাসরি শিল্পবস্তুর রূপ অর্জন করতে পারে না। কান্টের মতে তার জন্য প্রয়োজন কল্পনা ও উপলব্ধি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবিগুলিকে সংবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন কল্পনা। প্রতিচ্ছবিগুলিকে ধারণার ঐক্যে আবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন উপলব্ধি। নান্দনিক অভিজ্ঞতায় ও বিচারে ব্যবহৃত ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির মতো নির্দিষ্ট ও বস্তুনিবদ্ধ নয়। কল্পনা ও উপলব্ধির মুক্ত ডানায় তারা বিষয়বস্তুর প্রতিচ্ছবিকে দেশান্তরী, কালান্তরী রূপ দিতে পারে,—পারে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে।

শিল্পবস্তু সৃষ্টিতে স্বভাবতই সৃষ্টিশীল কল্পনার ভূমিকা মুখ্য এবং প্রত্যক্ষলব্ধ বস্তুর প্রতিচ্ছবি স্মৃতিতে ধরে রাখবার বা কল্পনায় জাগিয়ে তুলবার ভূমিকা গৌণ। সৃষ্টিশীল কল্পনা বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশগুলিকে সংবদ্ধ ক'রে শিল্পবস্তুর রূপ দেয়। এই শিল্পরূপ (ফুল, প্রজাপতি, নারী, ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট, যুগলবন্দী রাধাকৃষ্ণ যা-ই হোক না কেন) ধারণানুগ হলেও ঠিক (জ্ঞানাত্মক) ধারণা নয়। তাই শিল্পীর সৃষ্টিতে শিল্পবস্তু এক অর্থে বস্তুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র, ঐতিহাসিক সত্য থেকেও মুক্ত; আর সেজন্য তার বৈচিত্র্যও অসীম। যতই বিচিত্র হোক না কেন শিল্পবস্তুর সামগ্রিক ঐক্য—ঐক্যের রূপটিও—একান্ত প্রয়োজন। নইলে অনুচিন্তা বা অনুধ্যান আর সম্ভব হয় না। শুধু চিন্তার বিষয়, চিন্তার ধারণা, দিয়ে শিল্পবস্তু সৃষ্টি হয় না। বস্তুচিন্তা নান্দনিক অভিজ্ঞতা ও অনুচিন্তার

আনন্দ দিতে পারে না। তার জন্য চাই কল্পনা, উপলব্ধি ও অনুচিন্তা—যা সব মিলে বস্তুর বস্তুসত্তাকে অস্বীকার না করেও তার শিল্পসত্তাকে প্রকাশ করে এবং সেই প্রকাশিত রূপটি জ্ঞানের বিষয় হয়ে ওঠে।[১৭] জ্ঞানের বিষয়রূপটি এক থেকে অনেকের মনে সঞ্চারিত হতে পারে। তবে, বোধহয় স্বীকার করা ভালো, শিল্পবস্তুর সামগ্রিক ঐক্য বৈচিত্র্যে যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তার সঞ্চারণসম্ভাব্যতার সীমান্ত আছে। হতে পারে যে সে সীমান্ত স্থির নয় এবং তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। রূপে বিষয়বস্তু সংবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ এবং বিচিত্র হয় ; রূপেই বিষয়বস্তুর বস্তুসত্তা ছাপিয়ে শিল্পসত্তার প্রকাশ ঘটে ; আবার রূপ দিয়েই শিল্পবস্তুর বিচার হয়। নান্দনিক বিচার আনন্দ দেয়, শিল্পবস্তু সম্পর্কে জ্ঞান-বৃদ্ধি ঘটায় না।

শিল্পবস্তু যে বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন তা আমি একাধিকবার একাধিক প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তার বস্তুধর্মের বন্দী নিগড় থেকে সে যে শিল্প-বস্তুর স্তরে মুক্ত হতে পারে তা-ও রূপেরই অবদান। বিভিন্ন বস্তুর অংশ বা অঙ্গ, একই বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ যে শিল্পবস্তু হিসেবে এক হয়ে উঠতে পারে তা-ও রূপের প্রাঙ্গণে কল্পনা ও উপলব্ধির (একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির) মুক্ত লীলার ফলশ্রুতি। শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার রূপ হল সিদ্ধিদাতা। এই উদ্দেশ্য বস্তুর ধর্ম নয়। এই উদ্দেশ্য বিষয়ীগত, চিন্ময়, সৃষ্টির সাধনায় কল্পনাক্ষম ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসন্ধী মনের অবদান, উপলব্ধির প্রকাশ। অজস্র, বিচিত্র নিয়মে সজ্জিত ও রঞ্জিত, এক অর্থে বন্দী ও আরেক অর্থে মুক্ত নিসর্গলোক যেমন সুন্দর শিল্পলোকের সৌন্দর্য ঠিক তেমনটি নয়। নিসর্গজ্ঞান সত্য হয়েও সুন্দর ও আনন্দদায়ক হতে পারে। কিন্তু শিল্পবস্তুর সৌন্দর্য ও আনন্দদান সত্য-জ্ঞান থেকে উদ্ভূত নয়। বস্তুসত্যের আভাস নিশ্চয়ই পরোক্ষভাবে শিল্পবস্তুতে থাকে ; তবে তার (শিল্পবস্তুর) প্রাণ কল্পনা ও উপলব্ধির মুক্ত রঙ্গের সৃষ্টি। সৃষ্টির-মুক্তির প্রাবল্য বস্তুর বস্তুরূপকে রূপান্তরিত করে ফেলে। রূপান্তরণ যতই ব্যাপক ও বিচিত্র হোক না কেন তার মধ্যে একটি ধারণার প্রকাশ, প্রতীক বা প্রক্ষেপ চাই। আর সে-প্রকাশটি হওয়া চাই জ্ঞানের বিষয়। শুধু কোন শিল্পীর অনুভূতির বা ইচ্ছার বিষয় হলে চলবে না। কারণ তাহলে তা সঞ্চারণযোগ্য হবে না ; অনেকের কাছে এক বা (অন্তত) একরকমও হবে না। আর তা না হলে শিল্প সমালোচনা ও বিচার হবে কেমন করে ? কেমন করে তাহলে ব্যক্তিমনের খেয়ালখুশির ঘোষণা থেকে সমালোচনা ও বিচারকে পৃথক করা যাবে ?

কিন্তু পৃথক করা যায়। পৃথক করা হয়ও বটে। সমালোচনা ও বিচার সম্ভব হয় সঞ্চারণযোগ্য রূপের ভিত্তিতে। বিচার করার জন্য রূপ নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু রূপ বলতে এক্ষেত্রে শুধু আকার, প্রকার, অনুপাত বা সামঞ্জস্য বোঝায় না, আদর্শ, উদ্দেশ্য বা

মানদণ্ড ও বুঝতে হবে। আকারাদির উপর নির্ভর করে যে-জাতীয় বিচার তার ফলাফল বিবরণ দিয়ে বোঝানো যায়। মতানৈক্য ও বিসংবাদের অবকাশও সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু শিল্পকর্মে অনুপাত ও সামঞ্জস্য বা এ-জাতীয় ধারণাগুলি ব্যবহৃত হয় ভাব, অনুভব, আবেগ ইত্যাদি প্রকাশের উপকরণ বা সহায়ক হিসেবে। সুতরাং তাদের জ্যামিতি ও পরিমাণগত পরিচয় এক্ষেত্রে গৌণ। শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতায় বিচারের পূর্ব পর্যায় উপভোগ ও উপলব্ধি। সেই পর্যায়েও যে বিচার এক অর্থে সুপ্ত, অনুস্যূত থাকে তা পরবর্তী বিশ্লেষণে, অনুধ্যানে স্বীকার্য। শিল্পরসের উপভোগে রূপের আদর্শের দিকটিই মুখ্য। যদিও যুগে-যুগে, দেশে-দেশে আদর্শও পরিবর্তনশীল। তবু সেই পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও একটি বা কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল ও অধিক গ্রহণযোগ্য আদর্শ ও অন্বিষ্ট থেকেই যায়। সেই-সবকে নিক্তি ধ'রে রসিক শিল্পকর্ম উপভোগ করে, সমালোচক বিচার করে।

আদর্শ, অনুপাত, সামঞ্জস্য প্রভৃতিতে রূপের যে-দিকটি প্রকাশিত হয় তা মূলত বিষয়গত—কাব্যের শরীরে, চিত্রের পটে, সঙ্গীতের সুরে লগ্ন, লীন বা লভ্য "মূলত বিষয়গত" হলেও শিল্পের রূপ কখনোই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক, পরিমাণগতভাবে বিষয়গত হতে পারে না। এর কারণ দু রকম। এক, চোখ যে-রূপ দেখে, কান যে রূপ শোনে মনে তা ঠিক অনুরূপভাবে প্রতিচ্ছবি ফেলে না ; এই দুয়ের "মধ্যে" (ঠিক মধ্যে নয়, বোধহয় সঙ্গে) আরো অনেক কিছু—সংস্কার, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা—মিলে-মিশে যায়। দুই, যা চোখ, কান ও মনের "মধ্য" ও সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করে তা স্বতন্ত্রভাবেও (মূলত বিষয়ীগতভাবে) অবদান যোগায়। রসের উপভোগ ও উপলব্ধিতে রসিক সমালোচক স্রষ্টার সহকারীও বটে। শিল্পীর সঞ্চারিত রূপকে সে রূপান্তরে, দেখে ও বোঝে, অন্তত তা পারে। একটি ভাবে অনেক উপাদান, ইন্দ্রিয়-প্রতিচ্ছবি, সংবদ্ধ হলেও তাকে নানাভাবে দেখা যায়, দেখানো যায়, বোঝা যায়, বোঝানো যায়। একটি ভাবকে একাধিক রূপে প্রকাশ করা যায়। রূপ যখন মানদণ্ড, নিক্তি, বা নির্ণায়ক তখনো রূপ ভাবের সঙ্গে সম্পর্কে অনন্য, অপরিহার্য নয়। তাকে পরিবর্তন করা যায়, রূপান্তরিত ক'রে ব্যবহার করা যায়।

শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে, শিল্পবস্তুকে সঞ্চারণযোগ্য করার জন্য রূপের ভূমিকা যে মৌলিক তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তার জন্য শিল্পবস্তুকে যে জ্ঞানাত্মক হতেই হবে কান্টের এ বক্তব্য আমি গ্রহণ করি না। অন্তত কান্ট জ্ঞানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এ-কথা যখন বলেন তখন আমার মনে হয় তিনি জ্ঞান ও নীতিধর্ম কীভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয় সে ধাঁচেই তার নন্দনতত্ত্ব বিচারের সূত্রগুলি "আবিষ্কার" ও ব্যাখ্যা করতে অত্যুৎসাহী ও

বদ্ধপরিকর। এবং এর ফলে জ্ঞানভিন্ন অন্যান্য মানবিক অভিজ্ঞতাগুলিও—যেমন ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতি—যে আমরা অন্যকে বোঝাতে পারি সে বিষয়টির তাৎপর্য তিনি গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন নি।

আমরা যখন বলি "সহানুভূতি বা সহমর্মিতা থাকলে একের মনের কথা অন্যের পক্ষে বোঝা সহজ হয়", কিংবা যখন কবি বলেন "হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব" তখন এ-সব কথাকে নিছক কথার কথা বা "কাব্যিক" ব'লে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। মুখের কথা, লিখিত বাক্য, মনের ভাব, মনের অনুভব বা আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই বোঝান যায়, সঞ্চার করা যায়। এ-সত্য আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। প্রশ্ন হল : মুখের কথা, লিখিত বাক্য, মনের ভাব ও অনুভব প্রভৃতি সঞ্চার করার জন্য আবশ্যিক শর্তাদি একইরকম, না কি নানারকম। আমার মতে, একটি সাধারণ অর্থে শর্তাদি একই রকম : আর তা হল রূপ-নির্ভরতা ; সকল প্রকার সঞ্চারই—তা ধ্বনিরই হোক, বা আকারেরই হোক বা অর্থেরই হোক—রূপের উপর নির্ভর করে। রূপহীন সঞ্চার অসম্ভব। একটু এগিয়ে বোধহয় এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, যা সঞ্চার করতে চাই তার সৃষ্টি ও সত্তাও রূপের অভাবে অসম্ভব। দ্বিতীয় যে কথাটি আমার স্বীকার্য ব'লে মনে হয় তা হল এই : উচ্চারিত কথা, লিখিত বাক্য ইত্যাদির সঞ্চারের শর্ত অল্পাধিক ভিন্ন। যে কথা বলে তার হাব-ভাব, অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার পরিবেশ··· সকল কিছুই সঞ্চারের সহায়ক, এবং অবস্থান্তরে প্রতিবন্ধকও, হতে পারে। লিখিত বাক্যের অংশগুলির সংস্থান, ব্যবহৃত শব্দের সমন্বয় বা বিরুদ্ধ ধ্বনি, পংক্তির মধ্যে অবস্থান, পূর্বাপরের সঙ্গে সম্পর্ক, সংশ্লিষ্ট সমাজে ভাষা ব্যবহারের রীতি-নীতি···প্রভৃতি সবকিছুই লিখিত বাক্যের সঞ্চার শর্তের অন্তর্ভুক্ত।

সঞ্চারকে দু ভাগে ভিন্ন করা যেতে পারে—সাধারণ এবং বিচারমূলক বা সমালোচনা-মূলক। সাধারণ সঞ্চারের ক্ষেত্রে আমি যা বলতে চাই, বোঝাতে চাই, বা দেখাতে চাই শ্রোতা বা দ্রষ্টা তা তেমনভাবে বুঝুক বা দেখুক এই আমার ইচ্ছা। ইচ্ছাকে সার্থক করার জন্য আমি আমার (বিচারে যা উপযুক্ত সেইরকম কতগুলি) প্রতীক—শব্দ, লেখা, রেখা, রঙ প্রভৃতি—ব্যবহার করি। প্রতীক ব্যবহার করে, তার ফলাফল দেখে', অনুমান বা অনুভব বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়/অতীন্দ্রিয় প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে যদি আমার মনে হয় যা প্রকাশ করতে চেয়েছি দ্রষ্টা/শ্রোতা তা বুঝতে পেরেছে তাহলে আমি মনে করি আমার সঞ্চার-প্রয়াস সার্থক হয়েছে। সঞ্চার কখনো-কখনো হয় সমালোচনা বা বিচারমূলক। কবিতা, গান, ছবি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিল্পী যা প্রকাশ ও সঞ্চার করতে চায় কখনো তা আমরা বুঝি বটে তবে গ্রহণ করতে গিয়ে ত্রুটি লক্ষ্য করি, সমালোচনা করি, শিল্পবিচারে

সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ মনে করি না। সমালোচনার ভিত্তি হতে পারে নানারকম,—ঐক্যের অসম্পূর্ণতা, বৈচিত্র্যের অভাব, রসের বিকৃতি, ভাবের দৈন্য, অনুভব বা উপলব্ধির অ-গভীরতা, সঞ্চারণ-প্রতীক ব্যবহারে ব্যর্থতা বা নৈপুণ্যের অভাব প্রভৃতি। ঐক্যের অসম্পূর্ণতা ও বৈচিত্র্যের অভাব বিচার প্রসঙ্গে রূপের দিকটি প্রাধান্য পেতে বাধ্য। ঐক্য ও বৈচিত্র্য—সমগ্রসন্ধি সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে রঙের, ধ্বনির, রেখার রূপগত গুণের সমাহারে, সমবেত আবেদনে। এমনকি রসের বিকার, ভাবের দৈন্য, বা অনুভবের অগভীরতা প্রভৃতি বিচার-প্রসঙ্গেও রূপের পরোক্ষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ ও সঞ্চারের মাধ্যম—তা সে দৃশ্য, শ্রাব্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য যা'ই হোক না কেন—কোন না কোন প্রতীক ব্যবহার করতে বাধ্য। প্রতীক একপ্রকার রূপ। প্রতীক ব্যবহারের সার্থকতা নির্ভর করে রূপ সম্পর্কে সুসমঞ্জস, সামগ্রিক চেতনার উপর। রূপের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতীক ব্যবহারের সার্থকতা অংশত নির্ভর করে সামাজিক, ঐতিহাসিক রুচি-রীতির উপর। রূপানুমোদিত যে-ঐক্য,-বৈচিত্র্য,-রস এক যুগে এক দেশে সার্থক রসময় সে-ঐক্য,-বৈচিত্র্য, বা-রসই হয়তো অন্য যুগে, অন্য দেশে, কিংবা একই দেশে অন্য যুগে অসহ্য রসবিকৃতি ব'লে ধিকৃত, সমালোচিত। আসলে রূপের ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে শিল্প রীতি-নীতি-রুচি বড় পরিবর্তনশীল।

রূপ ছাড়া প্রকাশও সম্ভব নয়, সঞ্চারও সম্ভব নয়। নির্বিশেষ চেতনাকে বিশিষ্ট করার জন্য, প্রকাশ ও সঞ্চার করার জন্য রূপ চাই। নান্দনিক যে-অভিজ্ঞতাকে শিল্পী অন্যের মনে সঞ্চার করতে চায় তাকে উপযুক্ত রূপ দিতে হবে। রূপই পারে একের অভিজ্ঞতাকে অপরের অভিজ্ঞতা করতে। রূপের সামান্য ধর্মই হল যা উৎপত্তিতে ব্যক্তিগত বিকাশে তাকে সমষ্টিগত ক'রে তোলা। অন্য অভিজ্ঞতার মতো নান্দনিক অভিজ্ঞতাও উৎপত্তির পর্যায়ে এতো অন্তর্লীন থাকে যে যার অভিজ্ঞতা সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তার নান্দনিক চরিত্র নির্দেশ করাও সম্ভব নয়। রূপহীন যে অভিজ্ঞতা তার চরিত্র নির্দেশ করা যায় না। রূপকে ঘিরেই অভিজ্ঞতা কখনো নান্দনিক, কখনো নৈতিক, কখনো-বা বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে। যে-রূপগুলি কোনো অভিজ্ঞতাকে শিল্পীর অন্তরে নান্দনিক গুণ-মণ্ডিত করে তোলে সে-রূপগুলি বাইরের থেকে আমদানী করা নয়। নির্বের অভিজ্ঞতা-মাত্রই শিল্পীর অন্তরে রূপময় হয়ে ভেসে ওঠে,—প্রথমে অস্ফুটভাবে এবং পরে নান্দনিক অনুধ্যানে ক্রমে প্রস্ফুটভাবে। তবু বোধহয় একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। কোন নান্দনিক অভিজ্ঞতাই কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ বা রূপসমগ্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। তাই "একই" বিষয় বা উপজীব্যকে বহু শিল্পী, এমন-কি একই শিল্পী বিভিন্ন সময়ে, বহুরূপে প্রকাশ করে। রূপ দিয়েই যখন অভিজ্ঞতার চরিত্র নির্ণয় করা হয় তখন

শিল্পের বিষয়টি "একই" কি না তা রূপ বাদ দিয়ে ভাবা যায় না, অন্যকেও বোঝানো যায় না। কিন্তু যেহেতু বিষয়ভেদে রূপভেদের কথা আমরা বলে থাকি ও বুঝে থাকি, বিষয় থেকে রূপের এবং সেইজন্য রূপ থেকে বিষয়ের ন্যূনতম স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হয়।

রূপ আদি, অনন্ত ও সহজাত নয়। রূপ ব্যক্তিসাপেক্ষ, এবং সে-জন্য দেশ-কাল সাপেক্ষও বটে। শুদ্ধ রূপের জগৎ কল্পনা করা যায় না তা নয়। কিন্তু বস্তু জগৎ থেকে তা কল্পনায় অমূর্ত করা। জ্যামিতি, বীজগণিত ও গণিতশাস্ত্রের রূপও মানুষের সৃষ্টি। বস্তুজগৎ ও ভাব-জগৎও রূপময়। এক অর্থে নিশ্চয়ই এইসব রূপ ব্যক্তির ব্যাখ্যা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ ; কারণ, এদের সার্বজনীন ব্যবহার এবং একই অর্থে ব্যবহার সম্ভব। তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার হয় যে এদের সার্বজনীন ব্যবহার এবং একই অর্থে ব্যবহারের মূলে রয়েছে সামাজিক চলতি ভাষা, ভাষার নিয়ম-কানুন ও শব্দভাণ্ডার—যা যুগে-যুগে পাল্টায়। এই একই কারণে শুদ্ধ রূপের শাস্ত্রেও যুগে যুগে নতুন নতুন সংযোজন, বিযোজন ও পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, শুদ্ধ রূপের সৃষ্টিতেও তাদের রূপান্তরের ব্যাপারে ব্যক্তির ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শুদ্ধ রূপ শুদ্ধ রূপ হিসেবে নান্দনিক মূল্যমণ্ডিত ব'লে বিবেচিত হবে না। তারজন্য চাই তাদের বিশেষ সংস্থাপনা, বিন্যাস, সমন্বয়—যার ফলে ঐ সব শুদ্ধ রূপ কোন নান্দনিক বাণীবহ বা সঙ্কেত-ধর্মী হয়ে ওঠে। মাতিসের *The Snail*এ রূপের বিচিত্র বিন্যাস ও বিবিধ রঙের ব্যবহারে একটি নান্দনিক বাণী প্রকাশিত। রূপ (ফর্ম)-এর আকার ও আয়তন, রঙের বৈচিত্র্য ও সমতলে অ-সমতলীয় প্রভাব সৃষ্টি ক'রে একটি আশ্চর্য শিল্পকর্ম (*Sinjerli Variation* IV, Fluorescent acrylic on canvas) রচনা করেছেন ফ্রাঙ্ক স্টেলা। রূপের জ্যামিতিক কৌলীন্যকে ক্ষুণ্ণ করে রূপের বিচিত্র ব্যবহার ক'রে বিশালাকার যে শিল্পকর্ম রচনা করা যায় তার নয়নাভিরাম প্রমাণ রয়েছে স্থাপত্যে (ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইট, পিয়ের লুইজি নার্ভি, বাক্‌-মিনিষ্টার ফুলার প্রভৃতির কাজে)। শুদ্ধ রূপের অনুধ্যানে যে একটি বিশেষ আনন্দলাভ করা যায় তা আমরা অনেকেই অনুভব করেছি। এই অনুধ্যান যদি অনুভবে না প্রবল হয়, প্রকাশ পায়, আমরা তাকে নান্দনিক বলব না। রূপের নান্দনিক ধর্ম শুধু রূপে নেই,—আছে রূপের বিন্যাসের সঙ্গে রসিক মনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে। রূপ সম্পর্কে শিল্পী ও সমালোচক সর্বদাই উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার প্রশ্ন তুলতে পারে ; বলতে পারে "এই বিষয়টি এইরূপে (এই রঙে) না প্রকাশ ক'রে ঐ রূপে (ঐ রঙে) প্রকাশ করলে প্রকাশ আরো সুন্দর ও ঈপ্সিত অর্থবহ হত।"

ছড়ানো-ছিটানো অনুভব-আবেগ-স্মৃতিকে রূপ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ নানাপ্রকারে করা যায়। সংগ্রহের উদ্দেশ্য অনুসারে, সংগ্রহের মধ্য দিয়ে শিল্পী কী প্রকাশ করতে চায় সেই

অনুসারে, সংগ্রহের প্রকারটি পাল্টে দেওয়া যায়। সংগ্রহের প্রকার, এবং প্রকাশ সেইমতো হল কি হল না, হলেও আরো সার্থক করা যেত কি না, তা আলোচনা ও বিচারের বিষয় হয়। আলোচনা ও বিচার সম্ভবই হয় না যদি না সঞ্চার তার পূর্বগামী হত।

ছোট বড় সকল শিল্পকর্মের অংশগুলিকে যে ভারসাম্য বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ করা যায় তা-ও রূপের আরেক কাজ। এঁগ্রেসের *The Turkish Bath* চিত্রের অনেক নগ্ন নারীদেহের প্রত্যেকটিই এমনরূপে চিত্রিত যে সমগ্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তা আবশ্যিক। একটি চিত্রের বা সঙ্গীতের সামগ্রিক রূপটি যাতে তার অংশগুলির রূপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় তারজন্য অস্পষ্ট হলেও প্রকাশ-প্রকরণপর্বেই শিল্পীর অনুভব ও কল্পনা উপযুক্তভাবে দানা বাঁধতে থাকে। অংশের সঙ্গে সমগ্রের আপাত সাদৃশ্য না থাকলেও রূপের দাক্ষিণ্যে সামঞ্জস্য থাকবেই। বিপরীতধর্মী অংশের সমাহারেও পরিণামে নান্দনিক সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। বরং তাতে রসিকের শিল্পবোধে অনেক সময়ে গভীরতর, সূক্ষ্মতর সাড়া জাগে।

রূপের বৈচিত্র্য ও অরূপ ॥

প্রত্যক্ষ, কল্পনা ও বিচারে, মানসিক সকল ক্রিয়াকর্মে, এমন-কি নিষ্ক্রিয় অনুভবে বা সংবেদনায়ও, রূপের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বিশেষ, নির্বিকল্প বা নিশ্ছিদ্র অন্ধ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে ; কিন্তু তা প্রকাশযোগ্যও নয়, সঞ্চারণযোগ্যও নয়। রূপময় হবার আগেও যে অভিজ্ঞতা থাকে তা স্বীকার করতেই হয়। কারণ, এক, যে-সব বিষয়বস্তু আমরা জানি বা অনুভব করি রূপ তার একটি দিক মাত্র ; তার অপর একটি দিককে পেতে গিয়ে যদিও রূপকে প্রয়োজন কিন্তু সেটি রূপ নয়,—তাকে নানা নামে, বস্তু (ম্যাটার), বিষয় (কনটেন্ট বা অবজেক্ট), অন্ধ অভিজ্ঞানপুঞ্জ ইত্যাদি ব'লে চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, রূপময় ক'রে তোলার আগে, অর্থাৎ রূপে প্রকাশ করার আগে, বস্তু ব'লে কিছু অন্তত থাকে ; রূপে প্রকাশ হওয়া মানে বস্তুর পুনর্জন্ম ; কিন্তু অপ্রকাশিত তার পূর্বজন্ম অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট রূপকেই তার একমাত্র জন্মদাতা ব'লে স্বীকার করতে হয়। বলাবাহুল্য, এমন স্বীকৃতি খুব অযৌক্তিক।

রূপ ও অরূপের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। অরূপ ব'লে একটি চেতন সত্তা বা স্বতন্ত্র জগৎ আছে কি না তা দার্শনিক ও ধর্মবিশ্বাসীদের বিচার্য ; এ বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট মত নেই। আমি যেখানে রূপ দেখি না অন্য ব্যক্তি সেখানে দেখতে পারে। আমি একটি বস্তুতে যে-রূপ দেখি অন্য ব্যক্তি সে বস্তুতেই হয়তো ভিন্ন রূপ দেখে। রূপ বস্তুর পরিচয়হীনতা ও অন্ধত্ব ঘোচায়। রূপমাত্রই নান্দনিক রূপ নয়। নান্দনিক রূপে

পুনর্জন্ম হবার আগে বস্তুর নিজস্ব কোন-না-কোন রূপ থাকে। সে রূপ কখনো বস্তুকে জানার সঙ্গেই জানা হয়ে যায়; আবার সে রূপ কখনো-বা অনির্ণেয় থেকে যায়; আর রূপ-অনির্ণীত বস্তুর অভিজ্ঞতাকে বলি নির্বিশেষ চেতনা বা অন্ধ অভিজ্ঞতাপুঞ্জ।

কোনো শিল্পী যখন আঁধারের রূপ দেখতে পান বা সীমার মধ্যে অসীমের সুর শুনতে পান কিংবা রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন আশা করেন তখন তাঁর ভাষা ও বক্তব্য দুই-ই অ-সাধারণ এবং নান্দনিক। বলাবাহুল্য, আঁধারের রূপ নেই, রঙ আছে। আঁধারের রূপ শিল্পীর কল্পনা; আঁধার রাতে শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে কল্পনার রঙে-ও-তুলিতে ভাষায় আঁকা। রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা দুটির (গান ও বটে) প্রধান মূল্য দার্শনিক নয়,—নান্দনিক। রূপের মধ্যে কীভাবে অরূপকে, সীমার মধ্যে অসীমকে কবি কীভাবে দেখেন তার প্রকাশ ভাষায়-ছন্দে-চিত্রকল্পে শ্রাব্য, কল্পচক্ষে দৃশ্য ও অন্তরস্পর্শী। বলাবাহুল্য, শ্রাব্য করার জন্য তো বটেই শিল্পের বিষয়কে কল্পচক্ষে দৃশ্য ও অন্তরস্পর্শী করার জন্য রূপময় ক'রে তুলতে হয়। আগেই বলেছি, রূপ তো আর এক রকম নয়, বৈচিত্র্য তার অজস্র। সাধারণ ভাবে যখন "রূপ" শব্দটি ব্যবহার করি তখন তা "রূপসমূহের রূপ" অর্থে ব্যবহার করি। রেখা, কোণ, ব্যাস, ব্যাসার্ধ প্রভৃতি দিয়ে যেমন রূপ সৃষ্টি করা যায় তেমনি শব্দের, শব্দের সঙ্গীত, তাল ও ছন্দ দিয়েও রূপ সৃষ্টি করা যায়। রঙ ও রেখার বিচিত্র সমন্বয়ে, রঙের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতাভেদে, বৈপরীত্যে, মিলনে, তুলির সরু বা মোটা টানে, স্বাভাবিক বস্তুর অস্বাভাবিক চিত্রণে, প্রতীক ব্যবহারে, চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায়, দূরত্ব ও শূন্যতার ভাব সৃষ্টি ক'রে এবং আরো অনেক রূপের সম ও বিষম অন্বয়ে সমগ্রসন্ধির ঐক্যরূপ সৃষ্টি করা হয়। সুরের তানে, লয়ে, মীড়ে, গমকেও রূপই—শ্রাব্য রূপ—সৃষ্টি হয়।

শব্দের অর্থে স্তরভেদ, ব্যাপ্তিভেদ আছে। "ফুল"-এর অর্থ ফুল দ্রব্যটি (বাচ্যার্থ) হতে পারে, প্রফুল্লতা (লক্ষ্যার্থ) হতে পারে, আবার প্রেমের উপহার বা পূজার অঞ্জলি (ব্যঞ্জনা)ও হতে পারে। শব্দের লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নানাভাবেই বাচ্যার্থ বা অভিধাকে অতিক্রম করতে পারে। অন্য শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ ও পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে, ব্যবহারের পরিমণ্ডল (উচ্চারক ও শ্রোতার সম্বন্ধ) অনুসারে, উচ্চারণভেদে এবং অন্যান্য আরো অনেকভাবে শব্দের অর্থ "সীমা"য় থেকেও "অসীম"কে, রূপময়" হয়েও "অরূপ"কে প্রকাশ করতে পারে। "অসীম", "অরূপ" ও এ-জাতীয় অমূর্ত সাধারণ পদের অভিধা অনির্ণেয়, স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। তবু তাদের লক্ষ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থের সফল ব্যবহারে শ্রোতার মন অমূর্ত, অতীন্দ্রিয় ও নান্দনিক ভাবলোকের অধিকার ও আস্বাদ পায়। শব্দের অর্থ ঘিরে যেমন কাব্যের প্রকাশ বস্তুজগতের দৃশ্যসীমা অতিক্রম করতে পারে,

সঙ্গীতের ধ্বনিকে কেন্দ্র করেও তেমনি বর্ধমান ও বিচিত্র রসলোকের উৎপত্তি ও বিকাশ ; শ্রুত যেন অশ্রুতের কর্ণপটাহ হয়ে ওঠে ; আলো যেন আঁধারের ছায়াঘন আমন্ত্রণকুঞ্জ হয়ে ওঠে, আর আঁধার হয়ে ওঠে আনন্দে আলোর অধিক। জানি, এই কথাগুলি রূপক-ভারাক্রান্ত, বাক্যের বিবরণাত্মক বা অভিধাগত সীমানা-ভাঙা ; কিন্তু ভাষার উচ্চতর প্রকাশ-ক্ষমতা তো পঙ্গু ও নির্বীর্য হয়ে যায় যদি রূপকধর্মী শক্তি ও ঐশ্বর্য ভাষায়, ভাষার ব্যবহারে, না থাকে।

গানেও ছবিতেও তো রূপ দিয়ে অরূপকে প্রকাশের এই শিল্পলীলাই চলছে। স্বরলিপি থেকে সুর এবং সুরের গান ; স্কেচ থেকে ছবি···সবই রূপ-সাদৃশ্যে গ্রথিত। স্বরলিপি গান নয় ঠিকই ; কিন্তু এর প্রতীক-প্রণালী রূপের দিক থেকে গানের প্রতিশ্রুতি। প্রতিশ্রুতি যখন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়—যন্ত্রের বা কণ্ঠের সঙ্গীতে—তখন তার কতগুলি বাড়তি গুণ প্রস্ফুট হয়। গানের রূপ শুধু স্বরলিপির প্রতীক-প্রণালীতেই নেই। তার রাগরূপটিই এক মাত্র রূপ নয় ; তার বাণীরূপও আছে ; আছে তার ভাবরূপও। গাইলেই কেবল তার সকল রূপের সম্মিলনে একটি সামগ্রিক রূপ প্রধান হয়ে প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রেও শিল্পীর দরদ ও মেজাজ সামগ্রিক রূপ প্রকাশের সহায়ক বা অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। রূপ দিয়ে বা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রকাশের কোন নির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য পন্থা বা নিয়ম নেই। অরূপ অনেক ক্ষেত্রেই রূপের অতিক্রান্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অমূর্ত বোধিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা। অনেক দিনের চেনা-জানা, দু হাত দিয়ে অনায়াসে ছোঁয়া যায়, দু চোখ ভরে দেখা যায় এমনই সব রূপময় বস্তুর আশ্চর্য সমন্বয়ে শিল্পীর প্রতিভা একটি অরূপলোককে মনশ্চক্ষের সামনে উন্মোচিত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে আকৈশোর আমি বারবার রবীন্দ্রনাথের "খেয়া"র 'অনাবশ্যক' কবিতাটিকে, বিশেষ করে তার শেষ অংশটি, মনে করে আসছি।

অমাবস্যা আঁধার দুই-পহরে
শুধাই আমি তাহার কাছে গিয়ে,
"ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে ?
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো, বালা।"
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,

সে কহিল, "এনেছি এই আলো,
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি, লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে॥

কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে (অবশ্যই এর রস নষ্ট ক'রে).তিনটি জিনিষ মেলে (১) উপজীব্য বিষয়ের বস্তু ও ব্যক্তি (২) তাদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য এবং (৩) কোন্ ভাবটি তারা প্রকাশ করছে। উল্লিখিত কাব্যাংশের চিত্রকল্পে যে-মিস্টিক সৌন্দর্য তা চিত্রকল্পের আক্ষরিক গুণ (২) ও বটে অন্তর্নিহিত ভাবের (৩) আহ্বানে রসিকমনের সাড়াও বটে।

শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যই বোধহয় সর্বাধিক দেশধর্মী, স্থানু, গতির রূপের সঙ্গে সহজে মিতালী করতে পারে না। তবু স্থপতির কল্পনায়ও নৈসর্গিক আনুকূল্যে স্থাপত্যকর্মও জ্যামিতির "নিষেধ" ভেঙে (আসলে "উৎসাহ" পেয়ে) অরূপের সন্ধানে উর্ধ্বমুখ, উৎসুক হয়ে ওঠে। মিলান, সল্‌স্‌বেরি ও কোলোনের ক্যাথিড্রাল দেখে মনে হয় যেন অরূপের আহ্বান শুনে তারা উৎকণ্ঠ, আগ্রহী, আস্পৃহায় অধীর। জান্‌সন্ যদিও মিলানের ক্যাথিড্রাল (১৩৮৬ খৃঃ) সম্পর্কে বলেছেন "devoid of any unity of feeling"১৮, আমার বরং মনে হয়েছে এতো বিস্তৃত ও বিশাল অলঙ্করণ সত্ত্বেও এর সমগ্রসন্ধি কেমন করে এমন ঐক্যধর্মী, সুকুমার ও অর্থবহ হল! মিলানের ক্যাথিড্রাল ঘিরে অবশ্য সেই অনুকূল নিসর্গ পরিমণ্ডল নেই যা স্থপতির কাঙ্ক্ষিত রূপকে প্রকাশে সাহায্য করেছে সল্‌স্‌বেরি ক্যাথিড্রালে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কনস্টেব্‌ল্-এর *Salisbury Cathedral from the Bishop's Garden* (১৮২৬ খৃঃ)। আমার বারবারই মনে হয়েছে নিসর্গ দৃশ্য, সমুদ্র দৃশ্য, পর্বত দৃশ্য যখন তার কম্পোজিশনে আকাশকে বেশ বড় একটা অংশ ছেড়ে দেয়, ইন্দ্রিয়কে বেশী বস্তুর ভীড়ে বারবার বাধা না দেয় তখন রসিকের কল্পনা রূপকধর্মী অরূপ আস্বাদের অধিকতর স্বাধীনতা পায়। সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে ক্যামেরার কাজ দেখেও কখনো কখনো আমার এ কথা মনে হয়েছে।

রূপকে ছুঁয়ে অরূপের দিকে রসিকের মনকে মুক্তি দিতে ভাব তার অর্থ দিয়ে, বিশেষত ব্যঞ্জনা দিয়ে, এবং অনুভব তার বিচিত্র বিকাশ দিয়ে প্রভূত সাহায্য করে। অরূপলোক ব'লে ভিন্ন কোনো জগৎ বা লোক নেই। চেনা রূপ, অভ্যস্ত ও প্রত্যাশিত রূপের সমন্বয়ে যখন জীবনের চেনামহলেই অপ্রত্যাশিত, অচেনা অথচ নন্দনানুভবের নির্বচনীয় আস্বাদ পাই তখনি মন বলতে চায় "এই তো অরূপলোক পেলাম।" জানা রাগ, শোনা বাণী···অথচ হঠাৎ একদিন এক শিল্পীর কণ্ঠে তাদের এক নতুন সুররূপ (রেণ্ডারিং) শুনে মন বলে "এমনটি আর কখনো শুনিনি।" একই রূপ—বাহ্যত এক রূপ—অসংখ্য

রূপের আধার বা ঐক্যসূত্র হতে পারে। যেহেতু সামগ্রিক রূপের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত রূপের সম্বন্ধ জৈবধর্মী ও অন্তর্লীন, অন্তর্ভুক্ত রূপের চরিত্র, চিত্রণ, বিচিত্র সমন্বয় সামগ্রি কররূপকে নিঃশব্দে রূপান্তরিত করে দেয়। মাগ্রিতের *La Bonne Aventure* এবং *Nuit de Pise* দুটি ছবিতেই চেনা বিষয়গুলিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে মন চলে যায় অসম্ভবের কল্পনা জগতে; রঙের কাজও রূপকে স্বপ্নালু ও নির্বস্তু-রূপ দিতে সাহায্য করেছে। অরূপ রূপ-রসেরই ব্যঞ্জনা।

ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ইতিকথা জানতে গেলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর সমাজ-চেতনারও ঠিকানা চাই। উপমা, রূপক ও অন্যান্য অলঙ্কার এবং শিল্পের উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োগফল, প্রত্যাশিত প্রভাব, সংশ্লিষ্ট শিল্পীর সমাজচেতনার (এ-ক্ষেত্রে বিশেষত শিল্পচেতনার) উপর (সূক্ষ্ম-ভাবে হলেও) প্রভূতভাবে নির্ভর করে। রসিকের রসবোধ ও শিল্পীর সৃষ্টি-প্রয়াস, "অরূপ" সৃষ্টির প্রয়াসও, সমাজের ভাব-পরিমণ্ডল, ভাষার অনুষঙ্গ, ইতিহাস-রূপকথা-কাহিনী এবং আরো অনেক উপাদানে নিঃশব্দে নিষিক্ত। অরূপলোকে "উত্তীর্ণ" হবার জন্য রূপলোক তাই এতো প্রয়োজনীয়। অরূপলোকেরও তাই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নেই। শিল্পের সাধারণ ভাগ্যচরিত্র তাকেও মেনে নিতে হয়। এতে তার শিল্পমূল্য হ্রাস পায় না। বরং "অবাস্তব" হয়েও তা কেন এত অর্থবহ ও রসভোগ্য হতে পারল তার পশ্চাদ্‌পট জানা গেল।

প্রকাশ অপ্রকাশ ও শিল্পকর্ম

"প্রকাশ" কথার অর্থভেদ ॥

শিল্পকর্ম[১] প্রসঙ্গে প্রকাশের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার কারণ: শিল্পকর্মমাত্রই অল্পাধিক প্রতীকধর্মী; শিল্পকর্মে যা প্রকাশিত হয়—যা প্রতীকিত হয়—তা কখনো সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না; প্রকাশ সম্পূর্ণ হলে প্রতীক হবার প্রশ্ন ওঠে না; অসম্পূর্ণ প্রকাশ ঘিরেই শিল্পকর্মের অর্থ, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যের সৃষ্টি-লয়। যা প্রকাশ করতে চাই তা যদি ভাষায়, স্বরে, সুরে, রঙে-তুলিতে, এমন-কি পাথরে, মাটিতে বা ব্রোঞ্জে সম্পূর্ণ নিঃশেষে প্রকাশ করতে পারি তাহলে অনুকরণ, প্রতিমূর্তন বা অন্য যা কিছু হোক না কেন শিল্পকর্ম হবে না। শিল্পকর্মে প্রকাশ-অপ্রকাশের সার্থক বিবাহ আবশ্যিক। শিল্পকর্মের সৌন্দর্য অংশত নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; অংশত অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় অংশের কিছুটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, কিছুটা বোধিগ্রাহ্য। যা শিল্পস্রষ্টার পক্ষে সত্য তা অনেকাংশে শিল্পরসিকের পক্ষেও সত্য। শুধু শিল্পীকেই শিল্পসৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বোধির সমন্বয় ঘটাতে হয় না শিল্পরসিকও এই সমন্বয় সাধনায় লিপ্ত। ইন্দ্রিয় যদি বুদ্ধি থেকে এবং বুদ্ধি যদি বোধি থেকে গ্রহণ ও সৃষ্টিক্ষমতায় সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত তাহলে একটি শিল্পকর্ম একটি অখণ্ড সমগ্রসন্ধি হয়ে উঠতে পারত না। একটি শিল্পকর্মে অনেক কিছু—রূপ, রস, বিষয়বস্তু, প্রকাশ-মাধ্যম প্রভৃতি—এক হয়, একত্র নয়। এক হওয়া নিছক একত্র হওয়া নয়। এই ঐক্য কিসের? শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, বিষয়বস্তু ও ব্যবহৃত মাধ্যমের? শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ, রস, অর্থ প্রভৃতির? নাকি, প্রকাশের বোধিগ্রাহ্য আশ্চর্য বন্ধনে সকল কিছুর মুক্তি-ঐক্য?

"প্রকাশ"—এই শব্দটি নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। "প্রকাশ"—এর অর্থ (১) হতে পারে "যার প্রকাশ": হাসিতে খুশির প্রকাশ; ভাষায় ভাবের প্রকাশ। "প্রকাশ"—এর অর্থ (২) হতে পারে "যাতে প্রকাশ": হাসিতে খুশির; ভাষায় ভাবের। "প্রকাশ"—এর অর্থ (৩) হতে পারে "প্রকাশ-পদ্ধতি" এবং (৪) "প্রকাশের পরিণাম।" "প্রকাশ-পদ্ধতি"র (৩-এর) সঙ্গে "প্রকাশ কর্ম" (৩-ক)-এর পার্থক্য ও মিল আছে। প্রকাশের পদ্ধতি ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট: পদ্ধতি হতে পারে বিলম্বিত, কঠিন শ্রম-সাপেক্ষ; অথচ প্রকাশ-কর্মটি হতে পারে সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত। কেউ কেউ এ পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাদের মতে: আপাত বিচারে যা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় তার পিছনে সাধারণত থাকে বহু প্রয়াস, প্রস্তুতি, বিন্যস্ত অভিজ্ঞতা—এক কথায়,

শিল্প-সাধনা। সাধনা বা নিরলস প্রয়াসে যে-প্রকাশ অনায়াস হয়ে ওঠে তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে স্বীকার করতে অনেকের আপত্তি আছে। আপত্তি অংশত স্বীকার করেও বোধহয় এ সত্য স্বীকার্য যে, শিল্পসৃষ্টি প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও কর্মের পার্থক্য মৌল নয়,—কখনো উদ্দেশ্যসাপেক্ষ, কখনো উপকরণসাপেক্ষ, এবং প্রায় সকল সময়েই শিল্পীর সাধনালব্ধ প্রতিভার স্তর-সাপেক্ষ।

"প্রকাশ"—এর যে-সব বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করলাম

(১) "যার প্রকাশ"

(২) "যাতে প্রকাশ"

(৩) "প্রকাশ-পদ্ধতি"

(৪) "প্রকাশ-পরিণাম"—তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

"যার প্রকাশ" তা ভাব, অনুভব, ইচ্ছা (মানসিক কিছু) হতে পারে ; তা' বস্তুজগতের কোন দ্রব্য, গুণ বা কর্মও হতে পারে। ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার প্রয়োজন—এটাই সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস যে সর্বদা ঠিক নয় তা একটু বিচার করলেই বোঝা যায়। শরীরের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে, আকার-ইঙ্গিত দিয়েও ভাব প্রকাশ করা যায়। শব্দ, স্বর (রাগ) প্রভৃতি দিয়েও ভাব, অনুভব, ইচ্ছাদি প্রকাশ করা যায়। একটি বস্তু (যেমন, বুড়ো ও বিশাল বট গাছ) দিয়েও একটি বিশেষ ভাব (যেমন, আশ্রয়) প্রকাশ করা যায়। রঙ দিয়েও ভাব-অনুভব-আবেগ ইত্যাদি বোঝানো যেতে পারে। যেমন আমরা বলে থাকি সবুজ যৌবনের প্রতীক ; সাদা পবিত্রতার ; এবং গৈরিক বৈরাগ্যের। রঙের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতার ভেদের মধ্য দিয়েও ভাব-অনুভবের বিভিন্নতা বোঝানো যেতে পারে।

যাতে কিছু প্রকাশিত হয় তার রূপ ও রকম যা প্রকাশিত হয় তার যথেষ্ট তারতম্য ঘটায়। একটি দুঃখের বা বিষাদের ভাব একটি-গানের (বাণীরূপের) মধ্য দিয়ে—সুরারোপ না ক'রে—প্রকাশ করা যায় ; আবার শুধু সুরের মধ্য দিয়ে, বাণীরূপ বাদ দিয়েও, ঐ ভাবটি প্রকাশ করা যায়। একটি শ্রমিকের কর্মক্লান্ত ও প্রত্যয়দৃপ্ত ভাবমূর্তি ভাষায় প্রকাশ করা যায়, দ্বি-মাত্রিক ক্যানভাসে—তুলিতে-রঙে আঁকা যায়, আবার ত্রি-মাত্রিক ব্রোঞ্জে ঢালাই ও পাথরে খোদাই করাও যায়। কোন্ রকম তুলি ও রঙ, কোন্ রকম ও রঙের পাথর ব্যবহৃত হবে (অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা বাদ দিলেও) তার উপর ভাব-মূর্তিটি প্রকাশের সার্থকতা-অসার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে।

ভাষা, ক্যান্‌ভাস, ধাতু বা পাথরে (যাতে ভাবমূর্তিটি প্রকাশিত হয়) প্রকাশিত হবার আগে ভাবমূর্তিটির স্বরূপ বা পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব কি ? যদি সম্ভব হয় তবে তা কীভাবে সম্ভব হয় ? প্রশ্নটি অন্যভাবেও, হয়তো আরো একটু কঠিনভাবেই, করা যায়।

ভাবমূর্তিটির বদলে একটি ভাবকে নিয়েই প্রশ্নটি তোলা যায়। কোন কিছুতে, উপকরণে বা অধিকরণে, প্রকাশিত করার/হবার আগে একটি ভাবের আত্মপরিচয় কি ? ভাবের আত্মপরিচয় কি কোন উপকরণের মাধ্যমে কোন অধিকরণে তার প্রকাশের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্ণয় করা যায় ? "যাতে প্রকাশ" হয় তার চরিত্র বাদ দিয়ে "যার প্রকাশ" তা কি বোঝা যায়, বোঝানো যায় ? যদি স্বীকার করা হয় "হ্যাঁ, নির্ণয় করা যায়, বোঝা যায়", তবু প্রশ্ন থেকে যায় : এইভাবে যা নির্ণয় করা যায়, বোঝা যায় তা কি সঠিক, সম্পূর্ণ কিংবা বিকৃত অসম্পূর্ণ ?

প্রকাশ হঠাৎ হয় না। শিল্পপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে, কিন্তু অকস্মাৎ হয় না। এর একটা প্রক্রিয়া আছে, পদ্ধতি আছে। এই প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে দৃশ্য নয় ; অন্যকে বোঝানোও কঠিন হতে পারে। তবু স্বীকার করতে হয় যে, প্রকাশের প্রস্তুতিপর্ব আছে ; প্রারম্ভ, বিকাশ ও পরিণাম আছে। অস্পষ্ট রূপ থেকে স্পষ্ট রূপে উত্তীর্ণ হওয়া, পরিণত হওয়া ; প্রারম্ভ থেকে পরিণামের দিকে অগ্রসর হওয়া সময়-সাপেক্ষ। "প্রকাশ" কথাটি "শিল্পকর্ম" কথাটির মতো স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : "প্রকাশ-পদ্ধতি" ও "প্রকাশ-পরিণাম" ; "শিল্পকর্মের পদ্ধতি" ও "শিল্পকর্মের পরিণাম"। পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে, প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পী তার ভাব (বিষয়)কে প্রকাশ করে ; ভাষায় বা সুরে বা তুলিতে মূর্ত করে। শিল্পীর মনে প্রথমে সৃষ্টির ভাব উদয় হয়, নাকি ভাবমূর্তি জাগে ? অনুভব ও আবেগ অনুধ্যান ক'রে শিল্পী তা থেকে ভাব নিষ্কাশিত ক'রে সৃষ্টির দিকে এগোয় ? নাকি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে পাওয়া চিত্রকল্প (ইমেজ) আসলে কোন অন্তর্নিহিত ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ? মূল কথা হল, সৃষ্টির গতি কোন্ দিকে—ভাব থেকে মূর্তি ? চৈতন্যের তরঙ্গ-নির্দিষ্ট, উদ্দেশ্য-মুখর গতিপথে ইন্দ্রিয়ের অবদানকে ঘিরে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি ?—নাকি ইন্দ্রিয়-লব্ধ বস্তুজগৎকে কল্পনায় রূপান্তরিত ক'রে চৈতন্যের সাহায্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা ? শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে বোধহয় এই দুটি প্রবাহই, বিপ্রতীপ অথচ সম্পূরক, দুটি ধারাই, সক্রিয় ও অনুস্যূত।

শিল্প-পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যদি (বুদ্ধির কৃত্রিম কল্পনা না হয়ে) বাস্তব সত্য হয়ে থাকে, তাহলে শিল্পসৃষ্টির সূচনা ও পরিণামের মধ্যে পার্থক্য অনস্বীকার্য। অর্থাৎ, একটি শিল্প-কর্মের সূচনার মধ্যেই তার পরিণাম নেই। একটি উপন্যাস, নাটক, এমনকি একটি ছবি বা গল্পের, সূচনাতেই তার পরিণাম শিল্পীর মনে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত (উদ্ভাসিত) নয়। পরিণাম-প্রকাশকে প্রমাণ করার জন্য প্রকাশ-পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার উপর এই যে গুরুত্ব আমি দিচ্ছি তার বিরুদ্ধ যুক্তিও অনায়াসে কল্পনা করা যায়। যদি শিল্প-সূচনাতেই শিল্প-পরিণাম প্রচ্ছন্ন না থাকত তাহলে যে-কোনো সূচনা থেকে যে-কোনো পরিণামে উপনীত,

উত্তীর্ণ হওয়া যেত। কিন্তু আমরা জানি তা সম্ভব নয়। ক সৃষ্টির কল্পনা (সূচনা) থেকে ক শিল্পকর্মেই (পরিণামেই) শুধু উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পদ্মফুলের কুঁড়ি থেকে পদ্মফুলই ফুটতে পারে,—গোলাপফুল নয়। আমার মতে সেই উপমা-যুক্তি কিছুটা শিক্ষাপ্রদ হলেও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে মূলত ভ্রান্ত। "শিক্ষাপ্রদ" এই সীমিত অর্থে যে কোন শিল্পকর্মের সূচনা ও পরিণামের মধ্যে একজাতীয় অভিন্নতা বা ঐক্য থাকবেই। "ভ্রান্ত" এইজন্য যে শিল্পকর্ম শুধু তো সূচনাপর্ব নয় ; যে-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই সূচনা একটি নির্দিষ্ট পরিণামে উত্তীর্ণ হয় সে-প্রক্রিয়াও শিল্পকর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সূচনাতেই পরিণাম নির্দিষ্ট হয় না ; প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট হতে থাকে। সূচনা+প্রক্রিয়া=শিল্পকর্ম। যে-কোন সূত্রের মতোই মূল সূত্র ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। তা না হলে একে ভুল বোঝা স্বাভাবিক। মনে হতে পারে যে, শিল্পসৃষ্টির জটিল ব্যাপারকে অতি সরল করে দেখানো হচ্ছে।

সূচনা থেকে পরিণামে উত্তীর্ণ হবার জন্য শিল্প-কর্ম কোন-না-কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমার মতে এই প্রক্রিয়ার দুটি দিক আছে—একটি শ্রাব্য বা দৃশ্য, সহজেই অন্যকে শোনানো বা দেখানো যায়, অপরটি অন্তর্লীন,—সহৃদয় রসিককে বোঝানো যায়। শিল্প-প্রক্রিয়া অন্তর্লীন হলেও একান্তই ব্যক্তিগত নয় ; রসিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বোধ্য ও উপভোগ্য। ক্রোচে ও কলিংউডের মতো প্রকাশবাদীদের মতে প্রকাশ মূলত অন্তর্লীন, অদৃশ্য ও আত্মিক প্রক্রিয়া। এর যে দিকটি দেখা ও দেখানো যায় তা শিল্পের বস্তুগত প্রমাণমাত্র। এই প্রমাণ কথিত বা লিখিত ভাষায় থাকতে পারে ; তুলি, রঙে, রেখায় ক্যানভাসে থাকতে পারে ; মাটিতে, পাথরে বা কোন ধাতুতেও থাকতে পারে। শিল্পের প্রমাণ শিল্পের প্রকাশ নয়। প্রমাণ (externalisation) ও প্রকাশের (expression-এর) মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তা অনিবার্য বা আবশ্যিক নয়। অপ্রমাণিত প্রকাশ শিল্পের ক্ষেত্রে শুধু সম্ভব নয় বস্তুত তা'ই হয়। যে-শিল্পকর্মের শিল্পত্ব প্রমাণসাপেক্ষ তা শিল্পই নয়,—কারুকর্ম (craft) মাত্র। প্রমাণের বাহ্যিক প্রয়োজন থেকে শিল্প-প্রকাশ মুক্ত। শিল্প হল আন্তর প্রকাশ। শিল্প শিল্পীর অন্তরেই প্রকাশিত। তার প্রকাশ-পদ্ধতি এক অদৃশ্য অন্তর্লীন যাত্রা, এক আন্তর পথ-পরিক্রমা। শিল্পসৃষ্টির পথের কোন প্রদর্শনীয় মানচিত্র নেই।

শিল্পের যে-দিকটি প্রমাণের, দেখা যায় বা শোনা যায়, তাকে আন্তর প্রকাশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, বোঝায় অনেক সমস্যা আছে ঠিকই। কিন্তু তার থেকেও বোধহয় বেশী সমস্যা আছে বাহ্য প্রমাণ-নিরপেক্ষ অন্তর্লীন প্রকাশতত্ত্ব বোঝার। একটি কবিতা শুধু কৌশলে চয়িত কটি মধুর শব্দের সংগ্রহ নয়। তার অর্থ, তার ছন্দ প্রভৃতি

কবিতার অন্যান্য দিকও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ-সব ছাড়াও কবিতার একটি অন্তঃস্থ গভীরতা আছে ; সে যেন ভিন্ন কিছুর বার্তাবহ, সঙ্কেত। যা বলা হল তার অতিরিক্ত কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে। এই "অব্যক্ত" অংশটুকু কবিতারই অঙ্গ। কবিতা সম্বন্ধে আমার এই উক্তিগুলিতে কোন কোন উগ্র অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচক হয়ত "অকারণ দার্শনিকতার," "হেঁয়ালি পরাতত্ত্বের" দুর্বোধ্য পরিবেশ সৃষ্টির অপপ্রয়াস লক্ষ্য করবেন ও আপত্তি জানাবেন। কিন্তু সহানুভূতিশীল পাঠক তার নিজের কাব্য আস্বাদের অভিজ্ঞতা যদি গভীরে গিয়ে অনুধ্যান করেন তাহলে আমার বক্তব্যের তাৎপর্য বোধহয় বুঝবেন। একটি কথা বা পদ যেমন শুধু ধ্বনি বা শব্দতরঙ্গ নয়, একটি কবিতাও তেমনি শুধু কটি পদ-সংগ্রহ নয় ; তার অতিরিক্ত কিছুও বটে। যা অতিরিক্ত, তা শব্দ-তরঙ্গ বা পদ বাদ দিয়ে নয়। ওদের ঘিরে, ওদের ছুঁয়েই : তবু অতিরিক্ত কিছু। পদ বাদ দিয়ে রসময় বাক্য হয় না, কাব্য হয় না। অথচ কাব্যের বাক্য ব্যাকরণের অনেক অনুশাসনই মানে না। ভাঙা, টুকরো, অসম্পূর্ণ কথা সাজিয়ে, দৃশ্য ও অদৃশ্য ছন্দ ব্যবহার ক'রে কান ও মনের দরবারে, কবি এমন কিছু পেশ করে যা রসিক পাঠক বা শ্রোতাকে আনন্দ দেয়। ব্যাকরণের অনুশাসন না-মানলেও কবি কাব্যের অনুশাসন মানে। বাক্যের যেমন বাহ্যিক কাঠামো (surface structure) ও গভীর কাঠামো (deep structure) থাকে, ভাষাও তেমনি একাধিক কাঠামোয় অনুশাসিত। এক স্তরের নিয়ম ভাঙলেই অন্য স্তরের নিয়ম ভাঙা হয় না। কারণ দু-স্তরের মধ্যে সকল পর্বে, সকল বিধি-নিষেধে, সামঞ্জস্য নেই। ভাষাতাত্ত্বিক চম্স্কির উগ্র অনুবর্তীরা হয়তো আমার এই মত অগ্রাহ্য করবেন। কাঠামোর নিয়ম দিয়ে একতরফাভাবে ভাষার অর্থ নির্ণয় অসম্ভব : সম্ভব হলেও তা অসম্পূর্ণ। কবিতার ভাষা যে-সব গভীর অনুশাসনে আবদ্ধ তাদের ব্যাপ্তি, সূক্ষ্ম ভাববাহিতার, সূক্ষ্মতর অনুভববাহিতার এবং সঞ্চারণের ক্ষমতা বেশী। শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্প উপভোগ প্রক্রিয়ার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ও উপভোগ প্রক্রিয়ার অনুশাসনের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। স্রষ্টার মন যেমন সক্রিয় রসিক উপভোক্তার মনও তেমনি। সৃষ্টির (প্রকাশের) মাধ্যমে শিল্পী তার আকৃতিকে মুক্তি দিতে চায় ; শিল্পরস উপভোগের মাধ্যমে রসিক তার রস তৃষ্ণার তৃপ্তি চায়। দুক্ষেত্রেই সক্রিয় মানসিক পদ্ধতি রয়েছে ; সেই পদ্ধতি কতগুলো নিয়ম-কানুনে বাঁধা। ভাষা, বিশেষত শিল্পের ভাষা, বুঝতে হলে চম্স্কিপন্থীদের অনুধাবন করতে হবে বৈয়াকরণিক কাঠামোর সঙ্গে ভাষা-ব্যবহারের সামাজিক-ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব। শিল্পসৃষ্টির আকূতি থেকে মুক্ত হবার জন্য শিল্পীকে কতগুলো বন্ধন, পথ-পরিক্রমার রীতি-নীতি, মানতে হয়। রসিক ব্যক্তিকেও সম্যকভাবে রস উপলব্ধির জন্য সৃষ্টির অন্তরে যাবার পথ জানতে হবে, জানতে হবে স্রষ্টার

অন্তর্লীন সৃষ্টির উদ্দীপনা, তার বিকাশ, বিবর্তন এবং বিশেষত, সংশ্লিষ্ট অনুশাসনগুলো। প্রমাণের বাহ্যিক কাঠামো থেকে রসিককে যেতে হবে প্রকাশের গভীর কাঠামোয়। দুই স্তরেই কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে কতোগুলো রীতি-নীতি বা অনুশাসনের উপর। ঐ রীতি-নীতিগুলো বাইরের দিক থেকে বন্ধন, কিন্তু যারা ঐ সমস্ত আয়ত্ত করার মতো ব্যবহার করবার মতো, নিয়ম-নৈপুণ্য জানে তারা সহজেই অতিক্রম করতে পারে। বাইরের দিক থেকে যা বন্ধন অন্তরের দিক থেকে তা মুক্তির পথ।

ছবির অনুকরণ করা আর ছবি আঁকা—এক কথা নয়। অথচ এক অর্থে, নিছক বাইরের দিক থেকে দেখলে, তাদের এক রকমই মনে হবে। অনুকরণ করা ছবিতে আসল ছবির প্রায় সকল কিছুই আছে ; শুধু নেই স্রষ্টার আকূতি, কল্পনা ও প্রকাশের প্রয়াস। অতি সীমিত অর্থে অনুকরণ করতেও বেশ খানিকটা শিল্প-নৈপুণ্য প্রয়োজন। যা সে অনুকরণ করতে চায় তা করার জন্য শিল্পীকে ন্যূনতম কল্পনা ও প্রয়াস করতে হবে। তবে, বলাবাহুল্য, সৃষ্টি ও অনুকরণ কর্মের গভীরতায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। এ কথা অভিনয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অভিনেতা দু রকমের হতে পারেন : যিনি কোন চরিত্র প্রকাশ করতে গিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করেন ; যিনি কোন চরিত্র প্রকাশ করতে গিয়ে সেই চরিত্র সম্পর্কে তার ধারণা অনুসারে তা অনুকরণ করেন মাত্র। চরিত্র সৃষ্টি করা ও চরিত্র অনুকরণ করা—এক কথা নয়। ভাব-আবেগ-আবেশ ইত্যাদিতে অভিভূত হওয়া আর অভিভূত হয়েছি ব'লে দেখানো—এক কথা নয়। চরিত্র অভিনয় করতে গিয়ে সার্থক অনুকরণের মধ্য দিয়ে হাবে-ভাবে, কলা-কৌশলে চরিত্রের থেকে অভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব ; কিন্তু সেটা উচ্চাঙ্গের সৃজনধর্মী অভিনয় কি না সে বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে।

বাহ্যিক প্রমাণ ও আন্তর প্রকাশ যে ভিন্ন জিনিষ তা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার "বাহ্যিক" ও "আন্তর" পদ দুটি আক্ষরিক অর্থে নিলে ভুল হবে। কারণ, "বাহ্যিক" প্রমাণ কোন-কিছুর বাহ্যিক প্রমাণ ; স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বয়ং-শাসিত অর্থে তা বাহ্যিক নয়। যা কোন-কিছুর বাহ্যিক তার একটি আন্তর দিক, অপর দিক, আছে। যা কোন-কিছুর আন্তর দিক তার একটি বাহ্যিক দিকও আছে। "বাহ্যিক"-"আন্তর"-এর আপেক্ষিকতা নিছক ভাষাগত নয়, বস্তুগতও বটে। ক্রোচে-কলিংউডের প্রকাশতত্ত্বে "আন্তর" প্রকাশকেই যথার্থ প্রকাশ ব'লে স্বীকার করা হয় এবং সে-প্রকাশকেই বোধির সমার্থক ব'লে ধরা হয় ; উপরন্তু দাবি করা হয় : শিল্প বোধিও বটে, প্রকাশও বটে। সংক্ষেপে : বোধি=প্রকাশ=শিল্প। যে-কোন সংক্ষিপ্ত সূত্রের মতোই এই সূত্রের কাঙ্ক্ষিত অর্থ উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বোধি যে একটি আন্তর

প্রক্রিয়া তা মানতে অনেকের আপত্তি থাকলেও আমার কোন আপত্তি নেই। বোধি অঙ্গ সঞ্চালনের মতো একটি ক্রিয়া নয়। বোধির প্রক্রিয়া বুদ্ধির মতো বিশ্লেষণাত্মক নয়, বৈবিধ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধান্য দেয় ঐক্যকে। বোধি শুধু সংগ্রহাত্মক নয়; বিবিধ যে-সব বস্তুকে সে সংগ্রহ করে তার মধ্যে সে অন্তর্লীন ঐক্য, রূপের বা রূপাবলীর ঐক্য, দেখে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দেখা সৃষ্টি ক'রে দেখা; ঐক্য সৃষ্টির অভ্যস্ত ও অনায়াস ইতিহাস সম্পর্কে শিল্পী নিজেও সর্বদা সচেতন নয়। বোধির সংগ্রহাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক বা ঐক্যবিধায়ক সৃষ্টিমাত্রকে প্রকাশ বলায় আমার আপত্তি আছে। বোধি যা-সব সংগ্রহ করে, ঐক্যবদ্ধ করে, তা সংক্ষেপে এবং মুহূর্তেই, স্বল্পক্ষণের পরিসরেই, করে। এই সংগ্রহ শিল্প-সৃষ্টির বীজ বা সূচনা-সঙ্কেত হতে পারে; কিন্তু একে শিল্প বলা ভুল হবে। একটি শিল্প-কর্ম শুধু বোধি নয়, সঙ্গে রয়েছে সাধনালব্ধ শ্রম, যত্ননিপুণ দক্ষতা। বোধিতে একটি শিল্পকর্মের রূপরেখা ভেসে উঠলেই তা শিল্প হয়ে ওঠে না। তাছাড়া সকল শিল্পকর্ম তো একরকম নয়। ছোট একটি গীতি-কবিতা এবং বহু চরিত্র-বিশিষ্ট, জটিল ঘটনা-সন্নিবিষ্ট একটি পঞ্চমাঙ্ক নাটক একরকম শিল্পকর্ম নয়। একটি ছোট বাসগৃহের স্থাপত্য এবং বড় একটি নগরের স্থাপত্য পরিকল্পনা একরকম শিল্পকর্ম নয়। অবশ্য ক্রোচে-কলিংউডদের মতে, শিল্পকর্মের মধ্যে রকমভেদ করা ভুল,—কারণ এটা সম্পূর্ণ বাহ্যিক বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগের ফল। শিল্পকর্ম হয় শিল্পকর্ম, নয়তো নয়; এরমধ্যে এ-রকম ও-রকম শ্রেণীকরণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক প্রথা বা সিদ্ধান্ত।

প্রকাশবাদের গোড়ার কথা ॥

বলাবাহুল্য সকল প্রকাশবাদ একরকম নয়। ক্রোচে-কলিংউড যে-প্রকাশবাদের প্রবক্তা তার মূল উৎপত্তি হেগেলের ভাববাদে। চেতনার ভাব-রূপই প্রকাশ। অভাবের প্রকাশ নেই। অন্ধের যেমন দৃষ্টিশক্তি নেই। বহু কিছুকেই, একাধিক বস্তু-গতি-প্রকৃতিকেই, একটি রূপের মধ্যে প্রকাশ করা যায়। রূপটি হওয়া চাই ভাবের, চেতনার। বস্তু, বস্তুর গতি-প্রকৃতি, ভাবের রূপ প্রকাশে সহায়ক হতে পারে, প্রেরণা যোগাতে পারে মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে প্রকাশ-শক্তি নিহিত নেই। আবেগে, অনুভাবনায় ভাব-রূপ উদ্দীপ্ত, প্রকাশিত হতে পারে, কিন্তু তার মূল শক্তি অন্তর্নিহিত।

ভাববাদীদের কথা মানতে হলে দু'রকম প্রকাশ আছে ব'লে মানতে হয়,—অন্তঃ-প্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশ; অন্তঃপ্রকাশই মূল প্রকাশ। বহিঃপ্রকাশ যদি অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গে একই রূপের মধ্যে বিধৃত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তবেই তার প্রকাশধর্ম স্বীকার্য। তা না হলে বহিঃপ্রকাশ নিছকই কৃত্রিম কারুকলা, শিল্পের উপমা—প্রকৃত শিল্প নয়।

প্রকাশের চরিত্র সম্বন্ধে এই বক্তব্য মানা শক্ত। অনেক সময়েই ভাব ও প্রকাশের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা অমিল থাকে। প্রেমিককে দেখে' প্রেমিকার মনের ভাব হতে পারে আনন্দের, অথচ সে মুখভাব দেখাতে পারে ক্রোধের বা অবহেলার। অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যে অমিল না থাকলে অভিনয় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়ে ওঠে। অভিনয় নিঃসন্দেহে শিল্পকর্ম। বলা হয়: যে-চরিত্রের অভিনয় করতে হয় সে-চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতাকে (শুধু একরকম নয়, ভাবে-অনুভবে) তাদাত্ম্য স্থাপন করতে হয়। "তাদাত্ম্য" কথাটি এ-প্রসঙ্গে রূপকমাত্র: তাদাত্ম্য স্থাপন হয় না। অভিনয় অভিনয়ই থেকে যায়: মূল চরিত্রের প্রকাশ অনুকরণের অধিক আর কিছু হয়ে ওঠে না। অথচ অভিনেতাকে তবু শিল্পী ও অভিনয়কে শিল্প-কর্ম ব'লে স্বীকার করতে হয়।: তাছাড়া মূল চরিত্র সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন ওঠে। রাম বা সীতার অভিনয়ে মূল বা আদি রাম ও সীতা চরিত্র ব'লে যা কল্পনা করা হয় তা কবি বা নাট্যকারের কল্পনার অধিক কি হতে পারে? মূল চরিত্র কি কল্পনা দিয়ে আবিষ্কার করা যায়, নাকি সৃষ্টি করা হয়? আবিষ্কারের কথা বললেও ধরে নিতে হয় মূল চরিত্র ব'লে স্থির চরিত্র কিছু আছে বা ছিল। কিন্তু এমনটি ধরে নেবার মতো পর্যাপ্ত যুক্তি কি আছে? বরং, বোধহয় ধরে নেওয়া ভালো যে, মূল চরিত্র কল্পনার সৃষ্টি এবং অভিনীত চরিত্র তো বটেই। আর, মূল চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ সময়ে বিশেষ সমাজে একটি প্রচলিত সাধারণ ধারণা থাকে। অবিশ্যি কখনো কখনো একই সময়ে একই সমাজে (সমাজের বিবিধ ধ্যান-ধারণার জন্য) একাধিক ধারণাও প্রচলিত থাকে।

"অন্তঃপ্রকাশ" কথার অর্থ কি? শিল্পী তার অন্তরের ভাব, অনুভব, আবেগ, ইচ্ছা বা অন্য কোনরকম অভিজ্ঞতাকে বাইরে—শরীর দিয়ে, ভাষায়, রঙে-রেখায় বা অন্য কোন প্রকরণের সাহায্যে—প্রকাশ না ক'রে অন্তরেই বারবার কল্পনায়, চিন্তায় তাকে আন্দোলন, আবর্তন ক'রে স্পষ্টতর করা, অস্ফুট থেকে প্রস্ফুট করা? নাকি কোন শিল্প-অভিজ্ঞতাকে বাইরে প্রকাশ করার আগে তার চূড়ান্ত ভাব-রূপটিকে মনশ্চক্ষের সামনে তুলে ধরা? দ্বিতীয় সম্ভাবনা স্বীকৃতিতে ক্রোচে-কলিংউডদের অসুবিধা ঢের। কারণ, সেক্ষেত্রে "চূড়ান্ত ভাব-রূপটি" বাইরে প্রকাশিত রূপ থেকে বিপরীত অনুমানে পাওয়া; "অন্তঃপ্রকাশ" অন্তরেই সম্পূর্ণ, সিদ্ধ নয়,—বাইরের কোন আশ্রয়, মাপকাঠি বা প্রমাণ ছাড়া তার পরিচয় অসম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

অন্তর (মন) ও বাহিরের (শরীর ও শারীরিক ক্রিয়াকর্মের) দ্বৈততা যারা অস্বীকার করেন এবং বলেন "শারীরিক প্রকাশ থেকে সত্তাগতভাবে ভিন্ন মানসিক বা আন্তরিক প্রকাশ ব'লে কিছু নেই" তাদের পক্ষে ক্রোচে-কলিংউডের প্রকাশবাদ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

শিল্প-প্রকাশের পক্ষে শুধু অনুভব করা যথেষ্ট নয় কোন-কিছু (বিষয়) অনুভব করা প্রয়োজন। "কেমন অনুভব করছ (বা লাগছে) ?" প্রশ্নের উত্তরে যখন আরোগ্য লাভ করছে এমন কোন ব্যক্তি বলে "একটু ভালো অনুভব করছি (বা লাগছে)" আর প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে এসে যখন কোন ব্যক্তি বলে "ভীষণ তেষ্টা অনুভব করছি (বা লাগছে)" তখন "অনুভব" (বা "লাগছে") বলতে এরা এক জাতীয় কথা বলছে না। কোন কোন অনুভব কম দেহাশ্রয়ী, আবার কোন কোন অনুভব বেশী দেহাশ্রয়ী। ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভব বেশী দেহাশ্রয়ী ; সুখ-দুঃখের অনুভব কম দেহাশ্রয়ী। যে-অনুভবগুলি কম দেহাশ্রয়ী—যেমন, সুখ, দুঃখ, প্রসন্নতা, শান্তি, লজ্জা—সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগরূপে পরিচিত। অনুভবের তুলনায় আবেগ সাধারণত কম দেহ-মগ্ন ব'লে প্রকাশের দিকে ঝোঁক তার বেশী। দেহ-মগ্নতার সঙ্গে আবেগের ভাব-ময়তা গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হলে তা শিল্পের উপজীব্য হবার অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করে। শরীরের উপর বাইরের প্রভাব যখন দুর্বল প্রকাশ-ধর্ম তখন অনুকূল। শরীরকে কেন্দ্র ক'রে অন্তর-বাহির কথার অর্থ আছে। কিন্তু মনকে কেন্দ্র ক'রে যখন এ-জাতীয় কথা বলা হয় তখন সে কথার অর্থ, অন্য অনেক রকম শরীরাশ্রয়ী কথার সঙ্গে মিলিয়ে-সাজিয়ে না দেখলে, বোঝা বড় কঠিন। বস্তুত অনেকে মনে করেন, শরীর-বিষয়ক কথা ও মন-বিষয়ক কথা ব'লে দুটি ভিন্ন জাতের কথা নেই ; শরীর-বিষয়ক কথারই একটি উপজাতকে আমরা বিচার-বিশ্লেষণ না ক'রে মনের কথা ব'লে ভুল করি।

অনুভব কখনো বিষয়-মুখী, আবার কোন কোন অনুভব স্বতন্ত্র-ধর্মী বা একটু স্ব-মুখী। "অন্ধকারে দেয়াল হাতড়াতে-হাতড়াতে হঠাৎ অনুভব করলাম দরজার খিলটি"—এ কথার "অনুভব" বিষয়-মুখী ; এক্ষেত্রে বিষয়টি হল দরজার খিল। "অনুভব" শব্দটি না ব্যবহার ক'রে কেউ বলতে পারে "হাত দিয়ে টের পেলাম।"—অনুভবের প্রসঙ্গে "প্রকাশ" কথার অর্থ মেলে। কিন্তু "টের পাওয়া" পাওয়া প্রসঙ্গে "প্রকাশ" কথার অর্থ মেলে না। হাত দিয়ে টের পাওয়া ব্যাপারটি—শরীর দিয়ে কোন কিছুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা—প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এরমধ্যে মনোগত বা অন্তর্লীন কিছু নেই। অথচ, তবু "অনুভব" শব্দ ব্যবহার দেখেই কেউ ভাবতে পারে এই প্রকট ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যেও বোধহয় প্রকাশ করবার কিছু আছে। যখন কেউ বলে "মনে অস্বস্তি অনুভব করছি" তখন অনুভবের ব্যবহার স্ব-মুখী। এই অনুভবও অন্তরসিদ্ধ নয় ; এর স্ব-মুখিতা বোঝবার জন্যও ঐ কথা বলার পরিবেশ বা অন্তত পক্ষে ঐ কথাগুলির অর্থ জানা দরকার। "বাইরের" মাপ-কাঠি, প্রমাণ বা ঐ জাতীয় সকল কিছু বাদ দিয়ে "অন্তরসিদ্ধ প্রকাশ" বলতে প্রকাশবাদীরা যে কী বলতে চান তা বোঝা বড় শক্ত।

প্রমাণ বা মাপকাঠির উপর অত্যধিক ঝোঁক দিতে গিয়ে সাধারণ ভাষা বিশ্লেষণকারী দার্শনিকেরা "মানসিক" বলে ভিন্ন জাতের কিছু আছে বলতেই নারাজ। এই বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। "অনুভব", "আবেগ" ইত্যাদির অ-মানসিক প্রয়োগ নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু তার জন্য "অনুভবের" কোন ব্যবহারই মানসিক নয়—একথা ভাবা ভুল ; আর এই ভাবনার পশ্চাদ্বর্তী ধারণাও ("মানসিক ভাষাকে সামাজিক প্রমাণে বা মাপকাঠির বিচারে উত্তীর্ণ হতে হবে") ভুল। সমাজ-স্বীকৃত প্রমাণ না দিতে পারলে মানসিক শব্দগুলিকে বিশেষভাবে মানসিক বলবার কোন হেতু নেই—এ দাবিও আমার কাছে অগ্রাহ্য। যে পরীক্ষায় যার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব তার অনুত্তীর্ণ হওয়াটা কখনো সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। সম্ভব-অসম্ভবের শেষ সীমারেখা ও বিরোধও অনুভব-সিদ্ধ,—প্রমাণ-নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে, প্রমাণই নির্ভরশীল সম্ভাব্যতার অনুভব-সিদ্ধ নিয়মের উপর।

কিসের প্রকাশ ?—এই জিজ্ঞাসার উত্তর ঠিক করতে না পারলে প্রকাশ-অপ্রকাশের আলোচনা স্পষ্ট হতে পারে না। এই জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর আছে। যেমন, "ভাবের প্রকাশ" ; "অনুভব ও আবেগের প্রকাশ" ; "বস্তুর প্রকাশ" প্রভৃতি। এই উত্তরগুলি যে একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তা নয়। এই উত্তরগুলি যে বিনা ব্যাখ্যায় খুব স্পষ্ট তা-ও নয়। যে-প্রকাশ শুধু ভাবের, যে-প্রকাশ মূলত বৌদ্ধিক, তা খুব অল্পক্ষেত্রেই শিল্পরস-সঞ্চারক। বৌদ্ধিক ভাবের যে-সব প্রকাশ শিল্পরস সঞ্চার করতে সক্ষম তার প্রেরণায়, বিন্যাসে, আবেদনে এমন কিছু থাকে যা রসিক চিত্তের সংবেদনায় সাড়া জাগায়। বুদ্ধি-প্রধান উপন্যাস, নাটক, কাব্য এবং চিত্রশিল্পও আছে ; কিন্তু বুদ্ধির প্রাধান্য সত্ত্বেও প্রকাশিত ভাবের মধ্য দিয়ে এমন কিছু অনুভব ও আবেগেরও প্রকাশ ঘটে যে রসিকচিত্ত তাতে আন্দোলিত হয়। বৌদ্ধিক ভাবের দীপ্তিতে রঙ থাকে ; রসিকের চোখে তা ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে : "শিল্প-প্রকাশ কি স্ব-সিদ্ধ, নাকি তার সিদ্ধি ঘটে রসিকচিত্তে ?" শিল্প সেক্ষেত্রে প্রকাশ নয়,—রসিকচিত্তে প্রকাশের প্রতিক্রিয়ামাত্র। প্রতিক্রিয়া নানারকম হতে বাধ্য। বুদ্ধি-প্রধান ভাবের প্রকাশ অধিকাংশ সময়ে রসিকচিত্তেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগায়। অনুভব-আবেগের ভাষায় মন যত সহজে সাড়া দেয় বুদ্ধির ভাষায় তত সহজে মন সাড়া দেয় না। স্বীকার করা ভালো, বুদ্ধি-প্রধান শিল্প এবং আবেগ-প্রধান শিল্প ব'লে দুটি ভিন্ন ধরনের শিল্পের অস্তিত্ব নেই। রসোত্তীর্ণ শিল্প কখনো বুদ্ধি-প্রধান, কখনো আবেগ-প্রধান, কখনো-বা "অবাস্তব" কল্পনা-প্রধান।

যখন বলা হয়, শিল্প হল "বস্তুর প্রকাশ" তখন বুদ্ধি-প্রধান/আবেগ-প্রধান ব'লে বা

ঐভাবে যে শিল্পের শ্রেণীভাগ করা হয় তার দুর্বলতা আরো প্রকট হয়ে পড়ে। বস্তুত নানা রকম হতে পারে। প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, গাছ-পালা, শিল্পের উপজীব্য হতে পারে ; আবার সামাজিক বস্তুও, যেমন, দারিদ্র্য, শ্রেণী-সংগ্রাম, যুদ্ধ, শান্তি, শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। "বস্তু"ও সব এক ধরণের নয় : কোন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ; কোন কোন বস্তু মূলত বুদ্ধি-গ্রাহ্য। শিল্পের উপজীব্যরূপে "বস্তু"কে "বিষয়"ও বলা যেতে পারে। যখন "শিল্পবস্তু" শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন বস্তুর বস্তুগত পরিচয় মূলত অগ্রাহ্য এবং তার শিল্পসত্তাই প্রাধান্যসহ স্বীকৃত। মূলকথা, শিল্পলোকে বস্তুর রূপান্তর ঘটে। শিল্পবস্তুতে বস্তুর প্রাগ্‌রূপ,—প্রাকৃতিক, সামাজিক বা তা সে যাই হোক না কেন—, চেষ্টা ক'রে খুঁজে পাওয়া গেলেও সে-রূপের পরিচয়-প্রভাব-প্রকাশ গৌণ। তবু যে বস্তু-রূপ শিল্প-রূপকে অল্পাধিক প্রভাবিত করে তা স্বীকার করতেই হয়। এই স্বীকৃতির একটি তাৎপর্য হল : শিল্প-প্রকাশে ভাব সার্বভৌম নয় ; বোধি তাকে যতই স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করুক না সার্বভৌমত্ব দিতে পারে না। বস্তুজগৎ শিল্পজগতে রূপান্তরিত হয় বটে, উধাও হয়ে যায় না। এই স্বীকৃতির অপর একটি তাৎপর্যও আছে : সকল বস্তু সমান প্রকাশ-ধর্মী নয় ; প্রকাশ-অপ্রকাশের মানদণ্ডে সকল বস্তুর স্তর এক নয়। শব্দের প্রকাশধর্মিতার তুলনায় সুরের প্রকাশধর্মিতা অধিক। রেখার থেকে রঙের প্রকাশধর্মিতা অধিক। সামাজিক বস্তু প্রাকৃতিক বস্তুর তুলনায় অধিক প্রকাশধর্মী।

"কিসের প্রকাশ ?" প্রশ্নের সঙ্গে "কতোটা প্রকাশ, কতোটা অপ্রকাশ ?" প্রশ্ন জড়িত। বস্তুর তুলনায় বিষয় যে বেশী প্রকাশধর্মী তার কারণ মানব-চৈতন্যের সঙ্গে সক্রিয় দ্বন্দ্বে বস্তুর তুলনায় বিষয় বেশী রূপান্তরিত, মানব মনের ধর্ম তাতে বেশি প্রকট। শব্দের তুলনায় সুর যে বেশী প্রকাশধর্মী তার প্রধান কারণ শব্দের রূপের তুলনায় সুরের রূপ বেশী জটিল, সমন্বিত কারুকার্যময়, ভাবময়, অনুভবগর্ভ। অল্পাধিক এইসব কারণেই জ্যামিতিক রেখার তুলনায় শিল্পীর তুলির টান, প্রাকৃতিক বস্তুর তুলনায় সামাজিক বস্তু বেশী অর্থবহ। বস্তু স্বধর্মে নির্দিষ্ট কিছু প্রকাশ করে না,—প্রকাশ করলেও তার শিল্পমূল্য নেই। বস্তুর প্রকাশধর্মিতা ও অর্থবহতা মানব-চেতনার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ-জাত। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই মানব-চেতনা পরোক্ষ-অপরোক্ষ নানাভাবে সমাজায়ত। সুরের বা তুলির টানের অর্থ সকলেই সাধারণ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেও বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারে একটি বিশেষ সমাজের, একটি বিশেষ ঐতিহ্যে লালিত মানুষেরা। মানব-চেতনার ক্ষমতা, আকাঙ্ক্ষা ও আশার রূপগুলিও সমাজ ও ইতিহাস দিয়ে অভিষিক্ত।

সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পকর্মের মধ্যে

প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা ও দ্বন্দ্ব চলছে। সাহিত্য, সঙ্গীত বা যে-কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা ও দ্বন্দ্ব একরকমভাবে চলছে না। প্রকাশের-অপ্রকাশের একটি লীলাচঞ্চল ও দ্বন্দ্বমুখর সীমারেখা টানেন শিল্পী নিজে, তাঁর মানস-চেতনায় এবং অন্যের গোচরযোগ্য বা সঞ্চারণযোগ্য প্রকাশে। প্রকাশ-অপ্রকাশের অপর একটি সীমারেখা টানেন রসিক ব্যক্তি বা সমাজ। রসিকের রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও তার সক্রিয় প্রয়োগের ফলে এই সীমারেখার চিত্র-চরিত্র পরিবর্তিত হয়। শিল্পকর্মের তাদাত্ম্যস্বরূপ বলতে কিছু হয়ত নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু তা যে কি তা রসিকের উপভোগ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক'রে বোঝা ও বোঝানো সম্ভব নয়। অ-রসিকের কাছে নিবেদিত স্বল্পকথার অনুভবগর্ভ কবিতা বা স্বল্পকথার রাগ-রাগিণীপ্রধান ধ্রুপদী সঙ্গীত হয়তো মনে হবে অপ্রকাশের ভারে মন্থর, মনোহরণে অক্ষম। ঐ একই কবিতা ও সঙ্গীত রসিকের কাছে নিবেদন করলে তিনি হয়তো তার মধ্যে অনুভব করবেন অনুভবের গভীরতা, প্রকাশের পল্লব-প্রাচুর্য।

প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা-দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে : প্রকাশ কি রসিকের প্রতিক্রিয়া-সাপেক্ষ ? বিভিন্ন রসিক-মনের প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না। সুতরাং রসিক-মনের প্রতিক্রিয়া-সাপেক্ষ প্রকাশ একই সঙ্গে একরকম ও বহুরকম হতে বাধ্য। কিন্তু তা কী করে হয়! রসিকভেদে প্রতিক্রিয়াভেদ হ'লে শিল্পপ্রকাশের, একটি ছবি বা কবিতার, আত্মপরিচয় বা স্বধর্ম কি ভাবে ঠিক করা যেতে পারে ? আর তা যদি ঠিক করা না যায় তাহলে প্রতিক্রিয়া থেকে বিচার কি ভাবে পৃথক করা যাবে?—শুধু তা'ই নয়, সেক্ষেত্রে রসিকের বিচার থেকে সাধারণ ব্যক্তি বা অ-রসিকের প্রতিক্রিয়াকে কি ভাবে পৃথক করা যাবে ?

হয়তো কেউ বলবেন, শিল্পপ্রকাশের স্বধর্ম নির্ণীত হবে রসিকসমাজের প্রতিক্রিয়া বা বিচার দিয়ে, ব্যক্তি রসিকের প্রতিক্রিয়া বা বিচার দিয়ে নয়। কিন্তু তাতেও সমস্যা থেকেই যায়। বিভিন্ন রসিকসমাজের প্রতিক্রিয়া এক হয় না। এমনকি বিভিন্ন রসিক-সমাজের বিচারও এক হয় না। অ-রসিকদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, রসিক ব্যক্তিদের ও সমাজসমূহের প্রতিক্রিয়া ও বিচার যদি এতো বিভিন্ন হয় তাহলে শিল্পের (আর্ট অবজেক্টের) আত্মপরিচয় বা স্বধর্ম (আইডেন্টিটি) কিভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আবার আমরা ফিরে আসি প্রকাশতত্ত্বের গোড়ার কথায়। প্রকাশ কি যা প্রকাশিত তাই ? নাকি যার প্রকাশ তাই ? নাকি ক্রমে-ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি ? শিল্প-প্রকাশ কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণসম্পন্ন বিষয় ? নাকি, যেমন ক্রোচে-কলিংউড দাবী করেন, ভাবময় এবং বোধি (বা ভাব) গ্রাহ্য ?

প্রকাশ বলতে যদি বুঝি যা প্রকাশিত হয় তা'ই তাহলে তার স্বধর্ম মোটামুটি স্থির, সকলের কাছে একরকম, ভাবতে খুব একটা অসুবিধা নেই। কিন্তু এ কথাও কি ঠিক? প্রকাশিত বিষয়টি, উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি গোলাপ ফুল, কিংবা একটি বর্ষামুখর রাত, অথবা একটি বিরহ-মিলন কাহিনী। বস্তু হিসেবে গোলাপ ফুলটি "একই" হতে পারে, কিন্তু শিল্পবস্তু হিসেবে শিল্পীর কাছে, শিল্পরসিকের কাছে, গোলাপ ফুলটি নানা রূপ, নানা চিত্রধর্মী, হয়ে উঠতে পারে,—প্রফুল্লতার প্রতীক, ঝরে যাওয়ার বিষণ্ণ ভূমিকা, রূপ-রস-রঙের বৈচিত্র্যে মনোহরণকারী এবং আরো কতো কী। বর্ষামুখর রাত কোন কবির কাছে অভিসারের সময়, কারো কাছে বা ঈশ্বরকে পাবার জন্য আকূতি প্রকাশের সময়; রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোন কবি হয়তো-বা তাঁর শ্যামলী প্রেমিকার ছবি আঁকছেন। এম্‌নি করেই নানা শিল্পীর সৃষ্টিতে চির পুরাতন বিরহ-মিলন কথা চির নতুন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আসল কথা, কোন একটি বস্তু যখন শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে তখন "তার" সঙ্গে শিল্পী-মনের একটি বিচিত্র লীলা-দ্বন্দ্ব চলে। এই লীলা-দ্বন্দ্ব এত যে বিচিত্র হয় তার কারণ শিল্পী-মনের গতি-প্রকৃতি সমাজ-প্রভাব সত্ত্বেও সৃষ্টির কল্পনায় মুক্তচ্ছন্দ। প্রকাশিত বস্তু "এক" হলেও শিল্পবস্তু যে কেন এক না হয়ে বহুরকম হতে পারে তা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। বস্তুকে অবলম্বন ক'রে, অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ ক'রে, তার সৃষ্টির ইচ্ছাকে শিল্পী কল্পনা-ভাবনার সাহায্যে প্রকাশ করে।

বস্তু থেকে স্বতন্ত্র ক'রে, বা স্বতন্ত্রভাবে ভেবে', শিল্পপ্রকাশকে যে গ্রহণ করা যায় না তা নয়। যায়। কিন্তু শিল্পবস্তু তো নিরালম্ব, নিরধিকরণ কিছু নয়। শিল্পকর্ম তো "কিছু"কে ঘিরে "অন্য কিছু" সৃষ্টি করা। "কিছু" (বস্তু বা গুণ) যা'ই হোক,না কেন তাকে "অন্য-কিছু"তে (শিল্পবস্তুতে) রূপান্তরিত করার পরে "কিছু"র স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় নির্ণয় করা শক্ত। তা নিয়ে জল্পনা করা যায়; তার অধিক কিছু করা প্রায় অসম্ভব। যা প্রকাশিত হয় সেই বস্তু, প্রকাশিত হবার মাধ্যম, প্রকাশিত হবার পরে যা প্রকাশ হল তা (শিল্পবস্তু) প্রভৃতি শিল্পবস্তুর চূড়ান্তরূপে এতই একাকার ও অভিন্ন যে তা থেকে প্রকাশিত বস্তুর স্বতন্ত্র পরিচয় জল্পনা করা যায় মাত্র, নির্ণয় করা যায় না। এই জল্পনার অন্য (তত্ত্বপদার্থগত) মূল্য থাকতে পারে, নান্দনিক মূল্য নেই বললেই চলে। শিল্পবস্তুর বস্তুস্বরূপ নির্ণয় করা না গেলেও নান্দনিক দিক থেকে তাতে বড় একটা কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

শিল্পবস্তুতে অনেক কিছু একাকার হলেও তার এমন একটা কিছু আত্মপরিচয় আছে যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা যায়। বিচার্য বিষয়ের, এক্ষেত্রে শিল্পবস্তুর, যদি আত্মপরিচয় বলতে কিছুই না থাকে তাহলে বিচার কথাটিই নিরর্থক হয়ে পড়ে। শিল্পীর সৃষ্টিকল্পনা, সমসাময়িক যুগের—বিশেষত রসিক সমাজের—প্রভাব ও প্রত্যাশা, সৃষ্টির পদ্ধতি ও

প্রকাশের মাধ্যম, ব্যক্তি রসিকের গ্রহিষ্ণুতা ও গ্রহণ···শিল্পপ্রকাশে এইসব উপাদান, উপকরণ, প্রকরণ, ভাব-অনুভব মিলে-মিশে গেলেও শিল্পবিচার সম্ভব এবং বস্তুত তা ঘটছেও। প্রথমে মনে রাখা দরকার, শিল্পবিচার সত্যাসত্যবিনিশ্চয়ের মতো নয়। এখানে যুক্তিও আছে সিদ্ধান্তও আছে; কিন্তু সকল রসিক সমাজ বা ব্যক্তির পক্ষে তা একই নির্দিষ্ট উপায়ে তা গ্রহণ বা বর্জন করা যায় না। একটি ছবি বা কবিতা কী ও কতোটা সার্থক তার বিচারে শিল্পী বা কবির বক্তব্য নিঃসন্দেহে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রসিক বিচারকের মতামতও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এক অর্থে সে-ও স্রষ্টা। উঁচুদরের শিল্পী অনেক ক্ষেত্রেই তার শিল্পকর্মের উত্তম বিচারক নয়। প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা-দ্বন্দ্বে সে তার শিল্পকর্মে কতো দিক, গুণ বা তাৎপর্য প্রকাশে যে সার্থক হয়েছে অনেক সময়ে সে নিজে তা সম্যকভাবে অবহিত নয়। শিল্পপ্রকাশের ক্ষেত্রে যা সত্য সীমিত অর্থে তা দর্শন, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। একই তত্ত্বকে বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে, অর্থমণ্ডিত করে; এবং সকলেই তার বক্তব্যের স্বপক্ষে অল্পাধিক যুক্তি প্রদর্শন করে। শিল্পবিচারক যখন তার বিচার প্রকাশ করে তখন সে কতোগুলি প্রচ্ছন্ন রীতি-নীতি অনুসরণ করে, বিচার প্রসঙ্গে সে ঐগুলি বিশ্লেষণ করে, প্রয়োগ করে এবং প্রয়োগের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করে।

প্রকাশ-অপ্রকাশের লীলা-দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে: কিসের প্রকাশ? এরই সঙ্গে, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে, অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক এবং প্রশ্নটি হল: কেমনভাবে প্রকাশ?

কিসের প্রকাশ?—প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ক্রোচে-কলিংউডেরা জোর দিয়েছিলেন ভাবের উপর, শুদ্ধ ভাব,—বৈচিত্র্যের মধ্যেও যার সামান্য (য়ুনিভার্সাল) ধর্ম অক্ষুণ্ণ। প্রকাশ একরকম আন্তর উদ্ভাস—বিভিন্ন সংবেদন, চিত্রকল্প, স্মৃতি প্রভৃতির গ্রন্থিবদ্ধ উদ্ভাস। আবার কখনো বলা হয়েছে, প্রকাশ একপ্রকার চৈতন্য-সংহতি,—সংবেদন, অনুভব, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির ঐক্যবদ্ধ সংহতি। ক্রোচে-কলিংউডের এই মত বুদ্ধিবাদী এবং মূলত তাদের দার্শনিক মতেরই নান্দনিক অভিব্যক্তি। ভ্যান গগ্ ও গগাঁ প্রমুখ শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবাদী বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। প্রকাশ মূলত বুদ্ধি-বিচার-নিঃসৃত ভাবগত ঐক্য নয়; শিল্পের প্রকাশ অনুভব-আবেগ-সিদ্ধ ঐক্য। একটি শিল্পকর্মের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন খুঁটি-নাটি, যে-সূত্রে ঐক্যবদ্ধ তা মূলত অনুভব, আবেগ, সংবেদন ও কল্পনা-প্রসূত, ভাবনা-ধারণা-প্রসূত নয়। বস্তুজগৎ, নিসর্গদৃশ্য, মানুষ···সবকিছুই প্রকাশবাদী শিল্পীর সৃষ্টিতে তাদের বিষয়গত আত্ম-পরিচয় অল্পাধিক হারিয়ে ফেলে। বরং শিল্পীর মনে তাদের আবেগ-অনুভব-প্রসূত

প্রতিক্রিয়াই প্রধান হয়ে ওঠে। ভ্যান গগের "তারকাখচিত রাত" (১৮৮৯) চিত্রে আকাশের তারা, বাঁকা চাঁদ, জনপদের ঘর-বাড়ী-গির্জা, গাছ-পালা সবকিছুই যেন অন্যরকম, স্বরূপভ্রষ্ট, রূপান্তরিত, স্থিতিধর্মী বস্তুগুলিও শিল্পীর মানসিক আবেগ-অনুভবের আয়নায় গতিধর্মী হয়ে উঠেছে। ছবিতে রাতের স্তব্ধতা বা শান্তি নেই। আছে শিল্পী-মনের তরঙ্গ, বেগ ও উৎক্ষেপণের প্রকাশ। রেখার বক্রতা, অসমান্তরালতা এবং উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার শিল্পীমনের আয়না যে বস্তুজগৎ প্রকাশে ব্যস্ত নয় তা খুব স্পষ্ট করে তোলে। বরং শিল্পী যে তার মনের আবেগ-মথিত আন্দোলন প্রকাশেই ব্যস্ত তা স্পষ্ট।

গ্যয়টে বলতেন, শিল্পের প্রাণ অনুভব। অনুভবই মূল কথা। ফ্রয়েড বললেন, মানুষ, সমাজ বা জগৎ কিছুই আমরা সম্যক বুঝব না যদি না অবচেতনার গভীরে প্রবেশ করি, অনুসরণ করতে না পারি অস্থির আকাঙ্ক্ষা, অমূলক শঙ্কা, অস্পষ্ট অভীপ্সার রহস্যময় এক ভিন্ন জগৎ। যে-জগৎ সাধারণভাবে দৃশ্য, শ্রাব্য বা অন্যভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সে-জগৎকে অনুকরণ করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন প্রকাশবাদী শিল্পীরা। স্পষ্টতই এরা "শিল্প-সৃষ্টির প্রাণ অনুকরণ" এই ধ্রুপদী ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নতুন এক শিল্পশৈলীর সূত্রপাত ঘটালেন। যা দেখা যায় বা শোনা যায় তা অনুকরণ করার পরিবর্তে ঐ সব দেখা-শোনার ফলে শিল্পীমনে যে-সব ভাব, কল্পনা বা ইচ্ছার উদয় হয় সেই সবকিছুর প্রকাশই শিল্প। অনুকরণের দিকটি অত্যন্ত গৌণ হওয়ায় প্রকাশবাদী শিল্পকর্মে অপ্রকাশের ভূমিকা হয়ে ওঠে উল্লেখযোগ্য। স্বল্প-প্রকাশের মধ্য দিয়ে অধিক অপ্রকাশকে পরিবেশন করতে শিল্পী উদ্যোগী-উদ্বুদ্ধ। বলাবাহুল্য, এ-কথা ছবি বা কবিতার ক্ষেত্রে যতোটা প্রযোজ্য ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ততোটা প্রযোজ্য নয়। তবে অপ্রকাশিত (অথচ প্রকাশের প্রতিশ্রুতিময়) প্রকাশ অল্পাধিক সকল শিল্পকর্মকে প্রাণময় করে, সানন্দ জিজ্ঞাসায় জাগ্রত করে। ইচ্ছা, আদর্শ ও অনুভূতির সঙ্ঘাতে শিল্পীর মনে একই সময়ে একাধিক জগৎ প্রকাশিত হতে চায়, প্রকাশিত হতে গিয়ে ব্যাহত-বিকৃত হয়ে যায়। শিল্পী যে-সব জগৎ প্রকাশ করতে চায় তারা পারস্পরিক সঙ্ঘাতে শুধু যে দীর্ণ-বিকৃত তা নয়, যেহেতু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুজগতে তাদের কোন প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ নেই তাদের "অবাস্তবতা" অপছন্দ করা যেতে পারে কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। শিল্পকর্মে যখন বাস্তবধর্মিতার দাবী নেই তখন "অবাস্তবতা" সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। তাছাড়া প্রকাশবাদী যে-সব শিল্পকর্মের উৎস হল ইচ্ছা, আদর্শ ও অনুভূতি, এবং বিচার-বিচিন্তার ভূমিকা যেখানে গৌণ, সেখানে দীর্ণ-বিকৃত-ব্যাহত শিল্পলোকের "যুক্তিহীনতা"ও কোন সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। কারণ, এক্ষেত্রেও শিল্পীমনের মূল সৃষ্টি-প্রেরণা যুক্তি-তর্ক নয়।

শিল্পীমনের যে-প্রকাশকে "অবাস্তব" "অযৌক্তিক" ব'লে সমালোচনা করা হয় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ব্যর্থ। শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ-অনুভূতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব প্রতিরূপ ও সামাজিক অনুমোদন নেই ব'লে তাদের সমালোচনার পিছনে যুক্তি নেই। শিল্পীমনের আকৃতি অনন্য ও অসামাজিক হলেও বা তাতে দোষ কী। সে তো মূলত সমাজের কথা, বস্তুজগতের কথা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্যভাবে প্রকাশের দায়িত্ব নেয় নি। বস্তুজগৎ, সমাজ ও ইতিহাস তার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সে শুধু তারই নান্দনিক প্রকাশে নিরত। যেহেতু এই প্রকাশের প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ প্রেরণা যোগায় বস্তু-জগৎ, সমাজ ও ইতিহাস তাই শিল্পলোক বস্তুলোকের প্রতিরূপ না হলেও অল্পাধিক অনুরূপ হতে বাধ্য। স্থানান্তরে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি শিল্পসৃষ্টিতে অনুকৃতি ও বিকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পসৃষ্টির আকৃতি, প্রকাশবাদীর মতে, মূলত অনুকরণের আকৃতি নয়। সে বস্তুকে প্রকাশ করতে গিয়ে ভাবকে, অনুভবকে, ইচ্ছাকে, এবং কখনো তাদের প্রতীককে প্রকাশ ক'রে ফেলে। প্রকাশ তখন তার বস্তুপরিচয়কে গুপ্ত রেখে নতুন পরিচয়ে, রূপান্তরে, সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ড মুঙ্ক-এর *The Scream* (১৮৯৩) ছবিটা চীৎকারের ছবি নয়, তার প্রতিক্রিয়ার শিল্পপ্রকাশ। পিকাসোর "গীটার" (১৯১১-১২) ঠিক গীটার নয়। মোদিগলিয়ানির পাথরে খোদাই-করা *Head* (১৯১৩) মানুষের মাথার বিকৃত রূপ, আফ্রিকান মানুষের মুখের ছাপ, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্য "অবাস্তবভাবে" অনেক বেশী, কোথায় একটা যেন আদিম যুগের ছোঁয়া। ব্রাকুসির *Bird in space* (১৯২৫) আদৌ ব্রোঞ্জের পাখী নয়, শূন্যে উড্ডীয়মান বিস্তৃতপক্ষ পাখীর প্রতীকমাত্র ; অথচ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে অব্যর্থ।

সৃষ্টি যেখানে বস্তুর প্রতিরূপ নয় এবং অল্পাধিক বিকৃতি যেখানে অনিবার্য, পরিগ্রহণ, পরিবর্জন ও অমূর্তন সেখানে অবশ্যম্ভাবী। জ্যামিতিক আকৃতি, রেখা, তরঙ্গায়িত রেখা, ব্যাস, ব্যাসার্ধ, রঙের ভঙ্গিমার বিচিত্র ও জটিল ব্যবহারে চেনা-জানা-শোনা বস্তুগুলি ও অমূর্ত (এ্যাবষ্ট্রাক্ট) প্রকাশে নতুন রূপ ও অর্থ পরিগ্রহণ করে, পরিবর্জন করে তাদের পুরানো আত্মপরিচয়। এমনি ক'রেই তারা প্রকৃতির প্রতিরূপ না হয়ে শিল্পীমনের প্রতিধ্বনি, চিত্রকল্প বা প্রকাশ হয়ে ওঠে। কিউবিস্ট আর্টে বিকৃতি সত্ত্বেও বস্তুকে চেনা যায় কিন্তু অমূর্তধর্মী শিল্পে বস্তুকে চেনা দায়। এক্ষেত্রে শিল্পবস্তু স্বয়ং সম্পূর্ণতার দাবিতে প্রবল এবং অটল। এ-দাবি কতোটা গ্রাহ্য সে-কথা স্বতন্ত্র। আমি মনে করি, কিউবিস্ট বা এ্যাবস্ট্রাক্ট যে-রকম শিল্প-প্রকাশের উদাহরণই আমরা নিই না কেন শিল্পবস্তু বস্তুর সঙ্গে সকল সম্পর্ক-বর্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব ব'লে দেখানো খুব শক্ত। লিপশিৎজের *Man with Man-dolin* (পাথরের ভাস্কর্য, ১৯১৭) বা বোচ্চিওনির ব্রোঞ্জমূর্তি *Unique Forms of*

Continuity in space (১৯১৩) প্রভৃতি কিউবিস্ট শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত বস্তুগুলিকে তো চেনা যায়ই ; এমন-কি ক্যাণ্ডিনিস্কির *Warlike Theme* জাতীয় ছবিতেও বস্তুজগৎ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। অবশ্য বলা যেতে পারে, শিল্পবস্তুর শিল্পপরিচয় না খুঁজে তার বস্তুপরিচয় খোঁজার গভীর কি অর্থ থাকতে পারে ? এ প্রশ্ন নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শিল্পলোকে প্রকাশ কতো বিচিত্র শিল্প কিসের প্রকাশ এবং এ-সব প্রকাশ কতোটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কতোটা বিষয়-নির্ভর, কতোটা বিষয়ী-নির্ভর···প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি আমরা।

শিল্পলোকের মধ্যে যে এক বা একাধিক বস্তুলোক, ভাবলোক, অনুভব-আবেগ প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বা প্রকটভাবে, সংমিশ্রিতভাবে উপস্থিত থাকে তা আমরা একাধিক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। উদ্বাস্তু কল্পনা এবং কামনাও শিল্পের উপাদান যোগায়, চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বস্তুলোক থেকে শিল্পলোকের বিচ্ছেদ শিল্পীর ইচ্ছাকৃত, কামনা-কল্পিত, ফ্রয়েডের ভাষায়, বাঁকা ও গোপন পথে কামনা তৃপ্তির মনোরম উপায় বিশেষ। বস্তুলোক ও শিল্প-লোকের বিচ্ছেদ আসলে একরকম বিরহ,—ঠিক বিচ্ছেদ নয়। শব্দ ও সুরের মধ্যে, শিল্পের উপাদান বা উপজীব্য ও শিল্পপ্রকাশের মধ্যে যে বিরহ তা শিল্পীর সৃষ্টি, তার ইচ্ছার প্রকাশ, সঞ্চারের আকৃতি। বস্তু ও শিল্পের মধ্যে এই যে নান্দনিক বিরহ, শিল্পের মধ্যে বস্তুর অন্তর্লীন উপস্থিতি, বস্তুর প্রতি শিল্পের প্রত্যাগমন-আকাঙ্ক্ষা, শিল্পলোকে রূপান্তরিত বস্তুর পুনর্জন্ম···এইসবের মধ্যেই কল্পনা, ইচ্ছাদীপ্ত কল্পনার ভূমিকা মুখ্য। এখানে আমি স্মৃতি-কল্পনার কথা বলছি না ; বলছি সৃষ্টি-কল্পনার কথা। স্মৃতি-কল্পনায় জাগে বস্তুর, ঘটনার, ভাবনার মোটামুটি অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। সৃষ্টির কল্পনায় বিকৃতি, রূপান্তর, যা নেই তার সৃষ্টি আবশ্যিক। কাঙ্ক্ষিত বস্তুর বা বিষয়ের অভাব শিল্পীমনকে সৃষ্টিগর্ভ ক'রে তোলে। স্বভাবতই এই অভাব-বোধ কামনা-প্রণোদিত। কামনার উদ্দেশ্য কোন-কিছু পাওয়া, এমন কিছু সৃষ্টি করা যা তার অভাব-বোধকে দূর করতে না পারলেও আংশিক তৃপ্তি দেবে। নান্দনিক সৃষ্টি আনন্দ-কামনা-উদ্ভূত। উদ্ভূত কামনার তৃপ্তি নিহিত চরিতার্থ প্রকাশে ও সার্থক সঞ্চারে। প্রকাশ চরিতার্থ হলো কি না তার প্রথম বিচারক শিল্পী নিজে : সে-ই জানে কী সে প্রকাশ করতে চায়। সঞ্চার সার্থক হলো কি না সে বিষয়ে দ্রষ্টা বা শ্রোতার বক্তব্যের বড় একটা গুরুত্ব থেকেই যায়। এসব কথার অর্থ এই নয় যে, সমালোচকের ভূমিকার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই কিংবা ব্যক্তি স্রষ্টার মনের কথা ও জীবনী না জেনে সমালোচক সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি সমালোচনায় অনধিকারী বা অক্ষম।

প্রকাশবাদী (এক্সপ্রেশনিস্ট) শিল্পী নিরত তার মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশে। বস্তুলোককে সে জানে, কিন্তু সে প্রকাশ করছে বস্তুলোক তার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করছে তা। বাস্তবধর্মিতা তার দাবি নয়। পক্ষান্তরে, প্রভাববাদী (ইম্প্রেশনিস্ট) বস্তুজগৎকে নিয়েই মুখ্যত ব্যস্ত। কিন্তু সে-ও বস্তুকে বস্তুরূপে দেখতে রাজী নয়। স্বরূপে অধিষ্ঠিত বস্তুজগৎ কালপ্রবাহে ভাসতে-ভাসতে একটি বিশেষ মুহূর্তে তার মনে কী প্রভাব ফেলছে আলো-ছায়ার, রঙের উজ্জ্বলতার তীব্রতাভেদে, তুলির বিন্দুতে-আঁচড়ে, সম্পূরক রঙের বিচিত্র বিন্যাসে, কিংবা চেতনার প্রবাহ অনুসরণ করতে গিয়ে খেই-হারানো ভাষার সূত্র ধ'রে, অসম্পূর্ণ বাক্যের ব্যবহারে, আপাত-অসংলগ্ন অনুভবাতুর, আবেগস্পন্দিত ভাষার সমাহারে সে তা প্রকাশ করতে চাইছে। তার দার্শনিক প্রেরণা আঁরি বের্গসঁ : গতিই যার মতে পরম তত্ত্ব। ভাষা তার স্তেফান মালার্মের মতো। রঙ ও তুলি তার স্মরণ করিয়ে দেয় মোনের বিখ্যাত ছবিগুলি : *Train in the Snow* ; *The House of Parliament—The Sun Coming Through Fog*; *Impression of Sunset*। বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সে ব্যস্ত নয় ; বস্তুলোক তার ইন্দ্রিয়ের স্ফটিকের মধ্য দিয়ে কী প্রভাব-প্রভা বিচ্ছুরণ করছে তা প্রকাশেই সে নিমগ্ন। ক্লাইভ বেলের ভাষায় ঃ

> Well, what is *really* there ? Light ; or, to be subjective, sensations caused by light. So, to render reality, all a painter has to do is to record accurately his visual sensations. Let him take his canvas out of doors and paint what he sees...he will find that colour merges into colour ; that bounding lines, like perspective, are mere intellectual makeshifts ; that shadows are neither black nor brown but full of a variety of colours...only let him be true to his sensations and he cannot then be false to visual reality.[১]

যদিচ মুখ্যত সে তার মনের প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যরূপ (বা বাণীরূপ) প্রকাশেই ব্যস্ত তবু যেহেতু সে বাস্তবধর্মী সে তার ঈপ্সিত বস্তু প্রকাশে সার্থক হলো কি না তা নির্ণয়ের জন্য দ্রষ্টা, পাঠক বা সমালোচকের উপর অংশত নির্ভরশীল। "Beauty, like colour, they felt was in the eye of the beholder, not in the picture itself"।[২]

শিল্পের বিষয়বস্তু যা'ই হোক না কেন শিল্প যে তার অন্ধ অনুকৃতি, অবিকল প্রতিচ্ছবি, হতে পারে না তা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। মুশকিল হল শিল্পের সেই দিকটিকে নিয়ে যা শিল্পীর সৃষ্টি, বস্তু-বিরহিত হয়েও যে-দিকটি শিল্পীর কল্পনা-শক্তিতে বস্তুজগৎকে শিল্পজগতে রূপান্তরিত করে দেয়। বাস্তব চেতনা কল্পনার স্বাধীনতা ও শিল্পীর ইচ্ছার মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব—চেতনায় ও অবচেতনায় দ্বন্দ্ব—চলছে। শিল্পের সৃষ্টির দিকটিকে তার বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করা যায় না। শিল্পের সমগ্রসন্ধিতে শিল্পের বিভিন্ন দিক—বস্তুগত,

রূপগত—অবিচ্ছেদ্য। বিচার-বিশ্লেষণে "ছেদ" করার পরে যা পাই তা', শিল্পের উপাদান, উপকরণ, প্রকরণ,—শিল্প নয়। শিল্পের মধ্যে যেটি যথার্থ সৃষ্টির দিক, শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ-প্রয়াস, সেই সম্পর্কে রয়েছে বহু-বিতর্কিত দু'টি মত। এক, শিল্প প্রকাশের মধ্যে শিল্পের অপ্রকাশ দিকটিকে, শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার দিকটিকে, বুঝতে হবে; নইলে শিল্প-বোধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দুই, শিল্প-প্রকাশের "মধ্যে" অপ্রকাশ কিছু নেই; সুতরাং শিল্প-বোধের অবাস্তব ও অলস্ত আহ্বানে তথাকথিত শিল্পের অপ্রকাশ দিকটিকে বুঝবার চেষ্টা করার কোন কথাই ওঠে না; যারা এ-জাতীয় কথা বলেন তারা অর্থহীন কিছু বলছেন।

যা অপ্রকাশিত তা কি বোঝা যায়? যদি তা বোঝা যায় তবে তা কেমন করে? আমরা অনেক সময়ে শুনি, "যা প্রকাশিত তা থেকে অপ্রকাশিতকে সাধারণ কতোগুলি নিয়ম অনুসারে অনুমান করা যায়।" যেমন, চোখের জল থেকে মনের ব্যথা; অথবা হাসি থেকে আনন্দ। কিন্তু, আমরা জানি, মনের ব্যথা ছাড়া ভিন্ন কিছুর জন্যও চোখে জল দেখা যেতে পারে। মনের ব্যথা চেপে হাসিও সম্ভব। অভিনয়ে তো এ-জাতীয় (সাধারণ নিয়ম-বিরোধী) বিপ্রতীপ সত্য হামেশাই দেখছি। কেউ কেউ তাই বলেন, "প্রকাশিত থেকে অপ্রকাশিতকে কোন সাধারণ নিয়ম অনুসারে অনুমান বা আবিষ্কার করা যাবে না। তার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সূত্র বা নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়ন) ব্যবহার করতে হবে।" প্রশ্ন হল, কখন চোখের জল দুঃখজনিত, কখন চোখের জল আনন্দজনিত, আবার কখন তা ধুলোর জন্য, অথবা নিছক অভিনয়, তা বুঝবার জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন সূত্র উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে অসংখ্য সূত্রের প্রয়োজন। অসংখ্য সূত্রের মধ্যে যদি কিছু সংখ্যক সূত্রের প্রয়োজন হয় অনন্ত তাহলে সমস্যা আরো বাড়ে। সূত্রের সংখ্যা যত বাড়ে সাধারণ নিয়মের প্রয়োজন ও প্রয়োগ তত কমে; প্রয়োগের কৌশলগত জটিলতাও তত বাড়ে এবং ফলত তা প্রয়োগ করবার ক্ষেত্র চেনা, চিনলেও তার যথাযথ প্রয়োগ, কঠিন, প্রায় অসম্ভব, হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে কেউ কেউ তাই সিদ্ধান্ত টানেন: শিল্প-রসবোধে, এমনকি বিচারেও, বিজ্ঞানসুলভ বা ব্যবহারিক নিয়মের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ, প্রায় নেই বললেই চলে।

ভিন্ন মতাবলম্বীরা বলেন, "প্রকাশিতের সঙ্গে সহানুভব ও সহমর্মিতা দিয়ে, অপ্রকাশিতকে অন্তরে দিয়ে বোঝা যেতে পারে এবং বস্তুত আমরা অমনি করেই বুঝে থাকি।" এই মতের পূর্বপ্রকল্প হল: শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ভাব, আবেগ, ইচ্ছা, অনুভব প্রভৃতি, এক কথায়, তার মন, প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত। মন দিয়ে মন বুঝতে হবে। এক্ষেত্রেও সমস্যা অনেক। "শিল্পের মধ্যে শিল্পীর মন" বা এ-জাতীয় কথা তো নিছক

রূপক। কিংবা, বলা যেতে পারে, এ-জাতীয় কথা স্বীকার করলে "যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী" "বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞানী" ও এই জাতীয় অনেক সাদা-মাঠা কথাও স্বীকার করতে হয়। বিজ্ঞানের মধ্যে যে-বিজ্ঞানী থাকে না যন্ত্রের মধ্যে যে-যন্ত্রী থাকে তাদের আবিষ্কার করবার বা বোঝবার জন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির "মনের গভীরে" যাবার প্রয়োজন নেই ; কারণ বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রে যন্ত্রী সম্পূর্ণ "প্রকাশিত" ; "অপ্রকাশিত"কে সাধারণ নিয়মের কিংবা সহধর্মী কল্পনার সাহায্যে বোঝবার চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে ; আছে এই জন্ত যে শিল্প স্বধর্মবশতই প্রকাশ-অপ্রকাশের যুগ্মনিকেতন। শিল্প যদি বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ বা অন্ধ অনুকৃতি হত তবে তা শিল্প হত না। যে-শিল্পে অপ্রকাশের কোন আকৃতিই নেই সেই "শিল্প" আসলে কাঠ-খড়-কেরাসিনের মতো বস্তু মাত্র। প্রশ্ন হল : অপ্রকাশের সেই শিল্প-আকৃতিকে বুঝব কেমন করে?—বস্তুত বুঝি কেমন করে?

প্রথমেই বোধহয় স্বীকার করা ভালো যে শিল্প না বুঝে তার বিচার বা ভাষ্য সম্ভব নয়, কিংবা, সম্ভব হলেও সঙ্গত নয়। শিল্পী তার শিল্পকর্মে যা প্রকাশ করতে চায়, প্রকাশের মধ্যে যা অপ্রকাশ রাখে—শিল্পের অনুরোধে রাখতে বাধ্য হয়, তা যদি সমালোচক না বোঝে তবে তার সমালোচনা একটি বিশেষ অর্থে ব্যর্থ। তবে, কেউ বলতে পারে, সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক সৃষ্টিও করতে পারে ; নির্দিষ্ট শিল্পকর্মে যা নেই, যা শিল্পীর সৃষ্টি-ইচ্ছার পশ্চাৎপটেও যা ছিল না, সমালোচক দ্রষ্টার ভূমিকায় তা "আবিষ্কার" করতে পারে। এ-কথা স্বীকার করতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, এ-কথা স্বীকার করলে অন্য একটি কথা, যা এ-প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ, মেনে নিতে হয় : শিল্পে শুধু যা শিল্পী ইচ্ছা করে তা'ই প্রকাশিত হয় না, যা সে ইচ্ছা করেনি তাও প্রকাশিত হতে পারে। শিল্পী যা ইচ্ছা করেনি তা-ও তার শিল্পকর্মে প্রকাশিত হতে পারে,—এমন কথা শুনলে অনেকের মনেই খটকা লাগবে। খটকা দূর করার জন্ত বলা যেতে পারে : শিল্পীর নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সকল অলি-গলির কথা তার নিজেরও জানা নেই ; সুতরাং তার কথাকেই এ-ক্ষেত্রে শেষ কথা ব'লে গ্রহণ করার জোরালো যুক্তি নেই। কিংবা, বলা যেতে পারে : শিল্পীর ইচ্ছা-বহির্ভূত যা শিল্পকর্মে "প্রকাশিত" বস্তুত তা সমালোচকের "আরোপিত",—সমালোচনাস্থলে সৃষ্টি। কিন্তু, প্রশ্ন ওঠে, যে-আরোপণ সৃষ্টির কৌলীন্য পায়, শিল্পীর ইচ্ছা-বহির্ভূত যে-প্রকাশের জন্ত সমালোচক দ্রষ্টার স্বীকৃতি পায়, তা কি ঐ নির্দিষ্ট শিল্পের আধার বা অধিকরণ বাদ দিয়েও, অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টি ব'লে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? বোধহয় না। সমগ্রদৃষ্টিতে শিল্পকর্ম এক ও অবিভাজ্য ; তার এক আংশিক শিল্পীর সৃষ্টি, অপর এক আংশিক

সমালোচকের সৃষ্টি,—এমনটি হতে পারে না। অর্কেস্ট্রা বা কোরাসের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে সকলেই এক শিল্পকর্মের প্রকাশক। সেখানে শিল্পী ও সমালোচকের দ্বৈত ভূমিকার প্রশ্ন নেই। সমালোচক সীমিত অর্থে স্রষ্টা : মূল শিল্পীর আধার তার বোঝবার, বোঝাবার— ভাষ্য ও সমালোচনার—অপরিহার্য ভিত্তি। স্বগুণে সে সম্পূর্ণ বা সিদ্ধ নয়। শিল্পীর "অনিচ্ছাসত্ত্বেও" তারই নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার শিল্পকর্মে প্রকাশিত হতে পারে ব'লে ফ্রয়েডীয় প্রেরণার যে-কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা-ও খুব সীমিত একটি অর্থেই মাত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। বস্তুলোকই শুধু শিল্পলোকে রূপান্তরিত হয় না,—চৈতন্যের স্তরভেদেও রূপভেদ, রূপান্তর, ঘটে। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, অনুভব, আবেগ, বিচার-বিচিন্তা, অনুমান···এক অর্থে সকলকিছুই দেহ-নির্ভর ; কিন্তু এই নির্ভরশীলতার স্তরভেদের পরিধি এত বিস্তৃত যে প্রতিটি স্তরের সঙ্গে অন্য সকল স্তরের সম্বন্ধ দেখানো ত দূরে থাক অনুমানের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি যোগানো প্রায় অসম্ভব। শিল্পীর যে ইচ্ছার কথা শিল্পী নিজে জানে না তা তার শিল্পকর্মে যখন সমালোচক "আবিষ্কার" করে বা "প্রকাশিত" দেখতে পায় তখন সমালোচকের বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নেবার কোন কারণ নেই। এটা ঠিক যে অনেক সময়ে শিল্পী তার বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্র ও স্টাইলের পূর্ণ ব্যাখ্যা নিজে দিতে পারে না এবং সমালোচকের দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যে সে নিজেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তা থেকে এ-কথা ভাবা বা বলা ঠিক হবে না যে, শিল্পীর নির্জ্ঞানের নিষেধ-নিবদ্ধ মণিকোঠায় প্রবেশ ক'রে সমালোচক তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার আশ্চর্য মনভ্রমরার সকল গুঞ্জন, সকল গুঞ্জনের সকল তাৎপর্য, বুঝে ফেলেছেন। সৃষ্টিশীল সমালোচক আসলে প্রতিভাবান ভাষ্যকার, শিল্পীর অতলান্ত নির্জ্ঞান সমুদ্রের ডুবুরী নন।

শিল্প শুধু বস্তু, ভাব বা অনুভবের প্রকাশ নয়, শিল্পীর আত্মপ্রকাশও বটে। আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি, শুধু বস্তু নয়—বস্তুর সঙ্গে অবাস্তব, ভাব ও অনুভবের সঙ্গে বিপরীতধর্মী কিছুর সম্মিলন শিল্পলোকেই সহজে সম্ভব। বিজ্ঞানে বা ইতিহাসে এই সম্মিলন নিষিদ্ধ। শিল্প যখন বস্তুলোকের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিধ্বনি নয়, রূপান্তর যেখানে আবশ্যিক ধর্ম, শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সেখানে স্বভাবতই অনিবার্য। শিল্পীসত্তা সমাজায়ত ; অতএব শিল্পীর আত্মপ্রকাশ এক অর্থে, শিল্পীর দীক্ষাভেদে কখনো তা পরোক্ষ, কখনো-বা অপরোক্ষ, সমাজের প্রকাশও বটে। একই সমাজ একই যুগে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর সৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পী যখন আত্মপ্রকাশের তুলনায় একটি বিশেষ আদর্শে বা উদ্দেশ্যসাধনে বেশী উৎসাহী তখনও তার নৈর্ব্যক্তিকতা সীমাবদ্ধ ; নিজ কর্মে নিজেকে অনুপস্থিত করার ক্ষমতা শিল্পীর সীমিত। শিল্পীর আত্মপ্রকাশের স্তরভেদ আছে।

ক্রোচে-কলিংউডদের মতে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ আত্মচেতনার মধ্যেই সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ ; তার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বহিঃপ্রকাশের, প্রমাণের, প্রয়োজন নেই। চেতনার বোধিরূপ প্রকরণও বটে, পূর্ণতাও বটে। এইরূপ সক্রিয়, সলীল ; নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় নয়। বস্তুলোকের অন্ধত্ব ও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার অস্বচ্ছতা থেকে বোধিরূপ মুক্ত। এই মুক্তিই শিল্পের সমগ্রসন্ধিকে অবিভাজ্য ক'রে রাখে, দীপ্ত ক'রে তোলে তার ঐক্যকে। কিন্তু, লক্ষ্য করবার বিষয় হল প্রকাশবাদীদের দাবি : আত্মচেতনাতেই সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ শিল্পপ্রকাশ স্বতই সঞ্চারযোগ্য (কমিউনিকেব্‌ল্)। এবং এটা সম্ভব হয় প্রকাশ ও ভাষার একাত্মতার জন্য। ক্রোচের মতে নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব মূলত এক ও অভিন্ন। তাঁর বইএর নামটি অনুধাবনীয় *Aesthetic as science of expression and general linguistic*।

ভাষাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের মৌল একাত্ম দেখাতে গিয়ে উনি যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

> "...the much-sought-for science of language, general linguistic, *in so far as what it contains is reducible to philosophy*, is nothing but Aesthetic. Whoever studies general Linguistic, that is to say, philosophical Linguistic, studies aesthetic problems and *vice versa. Philosophy of language and philosophy of art are the same thing.*
>
> Were Linguistic really a *different* science from Aesthetic it would not have for its object expression, which is the essencially aesthetic fact; that is to say, we must deny that language is expression. But an emission of sounds which expresses nothing is not language. Language is sound articulated, circumscribed and organised for the purposes of expression."[৩]

ভাষাতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্বের একাত্মতার মূল ভিত্তি হল তাদের আলোচ্য বিষয়ের একাত্মতা : আলোচ্য বিষয় হল প্রকাশ। মনে রাখা ভালো, প্রকাশ অর্থ ই ভাষাগত প্রকাশ নয়। রঙে-তুলিতে-পটে, পাথরে, মাটিতে, কাঠে, সুরে ও স্বরেও প্রকাশ হয়। ক্রোচে এক্ষেত্রে প্রকাশ বলতে প্রকাশের ব্যাপক ও সাধারণ অর্থ ই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং অনুরূপভাবে ভাষাকেও তিনি সাধারণ অর্থে ই গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ করতে হলে যে কেবলমাত্র ভাষাতেই প্রকাশ করতে হবে তা নয়। অন্যভাবেও প্রকাশ সম্ভব। শিল্প-প্রকাশ অন্তঃপ্রকাশ। তার বহিঃপ্রকাশ—ভাষায় বা অন্য কিছুতে—হতে পারে, না-ও হতে পারে : হওয়া না-হওয়া শিল্প-প্রকাশের আবশ্যিক পূর্বশর্ত নয়। এই অর্থে

শিল্প আন্তর সিদ্ধ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ভাষা শিল্পের অন্যতম প্রকাশ-উপায় : তবে এই উপায়ের শরণ না নিয়েও, অর্থাৎ এই উপায় ব্যবহার না করেও, শিল্প শিল্প হতে পারে—হ'য়ে স্বধর্মভ্রষ্ট না হ'য়ে থাকতেও পারে। শিল্পের কোন আত্মাতিগ অন্বিষ্ট বা লক্ষ্য নেই ; আর তাই তার পক্ষে উপায়ের শরণাপন্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। গন্তব্য লক্ষ্য না থাকলে পথের প্রয়োজন কী ! একেই প্রসঙ্গান্তরে বলা হয়েছে "শিল্পের জন্যই শিল্প" : শিল্প-প্রকাশ কোন লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় নয় : শিল্পের সাধ্য, সাধনা ও সিদ্ধি সবই অন্তর্লীন মুক্ত পথ-পরিক্রমা। প্রকাশেই মুক্তি,—সৃষ্টির আকৃতির মুক্তি : আবার আকৃতির এই প্রকাশ, উপায়ের দাসত্বহীন প্রকাশ, মুক্তির জন্যই সম্ভব। মুক্তিলোক আন্তরলোক ; আন্তরলোক আনন্দলোক ; সক্রিয় আত্মাই (এ্যাক্টিভ স্পিরিট) মুক্তচ্ছন্দে শিল্পলোক সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টিকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ; ব্যবহারের (প্র্যাক্টিস) নানা কৌশল (টেকনিক)ও আছে ; কিন্তু মূলত শিল্পসৃষ্টি—প্রকাশ—আত্মার তাত্ত্বিক (থিওরেটিক্যাল) ক্রিয়া,—এর ব্যবহারিক কৌশলের (প্র্যাক্টিকাল টেকনিকের-এর) দিক, বহিঃপ্রকাশের (এক্সটারনালাইজেশনের) দিক স্বতন্ত্র ও গৌণ। ভাষায় বা রঙে-তুলিতে-পটে শিল্পের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে, হচ্ছেও—সংরক্ষণের জন্য হচ্ছে, রসিক সমাজে সঞ্চারের জন্য হচ্ছে ; কিন্তু এই বহিঃপ্রকাশ ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়বিশেষ,—শিল্পের প্রাণ নয়। শিল্পের প্রাণ প্রকাশ, সে-প্রকাশ আত্মার তত্ত্ব-ক্রিয়া, আন্তরলোকেই সাধিত ও সিদ্ধ। যখন সেই আন্তর প্রকাশ ইচ্ছাবশত, প্রয়োজনের তাগিদে বস্তুরূপ,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সঞ্চারযোগ্য বস্তুরূপ, পরিগ্রহণ করে তখন সেই প্রকাশ শিল্প থেকে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

> "We cannot will or not will our aesthetic vision: we can however will or not will to externalize it, or rather, to preserve and communicate to others, or not, the externalization produced. (পৃঃ ১১১)···The possibility of ... technical knowledge, at the service of artistic reproduction, is what has led minds astray to imagine the existence of an aesthetic technique of internal expression, which is tantamount to saying, a doctrine of the *means of internal expression*, a thing that is altogether inconceivable. And we know well the reason of its inconceivability; expression, considered in itself, is a primary theoretic activity, and as such precedes practice and intellectual knowledge which illumines practice and is independent alike of both... Expression does not possess means, because it has not an *end*;

it has intuitions of things, but it does not will and is therefore unanalysable into the abstract components of volition, means and end."[8]

ক্রোচের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর বিরুদ্ধে যে-জাতীয় সমালোচনা হতে পারে, এবং ইদানীং হচ্ছে,[৫] সে সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আন্তর সিদ্ধ শিল্প, প্রকাশের ক্ষেত্রেও শিল্প যে কোন লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় (কৌশল) নয় এবং সে-জন্যই, তাঁর মতে, কারুশিল্প (ক্র্যাফ্‌ট) নয় তা দেখাতেই তিনি মূলত ব্যস্ত। এ-প্রসংগে কলিংউডও সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন: শিল্পের কোন আত্মাতিগ লক্ষ্য নেই এবং শিল্পসৃষ্টিতে কোন কৌশল বা দক্ষতাকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করার প্রশ্নও নেই; শিল্পীর ভাষা, রঙ বা সুর প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,—উপায় (বা মাধ্যম) নয়; রসিক তার প্রকাশ বুঝতে পারে, তবে তাঁকে বোঝানোই শিল্পীর মূল সৃষ্টি-প্রেরণা নয়, কারণ তাহলে রসিকের প্রত্যাশা-প্রয়োজন জেনে-বুঝে তা পূরণের উপযুক্ত উপায় ব্যবহার করতে হবে।

শিল্পকে কারুশিল্প থেকে, প্রকাশকে বহিঃপ্রকাশ থেকে পৃথক করার স্বপক্ষে যত যুক্তিই ক্রোচে-কলিংউডেরা দেখান না কেন একটা মৌল প্রশ্ন থেকেই যায়: বহিঃপ্রকাশ বা ব্যবহারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যে আন্তর সিদ্ধ ও সঞ্চারযোগ্য শিল্পের কথা তাঁরা বলেছেন তার আলোচনা আদৌ সম্ভব কি না? বলা বাহুল্য তাঁদের উত্তর হবে "হাঁ।" কিন্তু এই উত্তরকে তাঁদের সামগ্রিক শিল্প-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিশীল করার জন্য তাঁরা একটি ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য জুড়ে দেন: শিল্প-প্রকাশের পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তির ব্যবহার ও কৌশল ক'রে বোধির সৃষ্টিকে সামাজিক-রসিকের দরবারে সার্থকভাবে নিঃসন্দেহে পরিবেশন করা যায়, তবে তা শিল্প-প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়,—তার অন্যতম ব্যবহারমাত্র। শিল্পকে স্বয়ং-সিদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়ার মধ্যে যে-পার্থক্যের কথা বারবার বলা হচ্ছে তাকে কি মৌল ব'লে মানা যায়? যদি মানা হয় তাহলে শিল্পলোক বস্তুলোক থেকে শুধু উদ্বাস্তুই হয় না, শিল্পলোকের আধার, অধিবাসী ও স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ শুধু শিল্প ও বস্তুর দ্বৈততা নয়। এ বক্তব্যের অন্যতম তাৎপর্য হল: শিল্প শিল্পরূপে বস্তুজগতে নির্ণেয় নয় এবং সম অর্থে সঞ্চারযোগ্যও নয়। অথচ বস্তুত আমরা কি দেখি? শিল্প-প্রকাশ শুধু নয় শিল্পীকেও, অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য বা স্টাইলও, আমরা বুঝি। আমাদের বোঝানোর জন্য শিল্পকে সৃষ্টি-প্রতিভার ব্যবহারিক ব'লে স্বতন্ত্র কোন উপায় প্রয়োগ করতে হয় না। আত্মার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পরাতাত্ত্বিক মতবাদকে বাঁচাবার জন্য ক্রোচে-কলিংউড মুখে শিল্পের অনন্যতার কথা বললেও বস্তুত শিল্পকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ক'রে ফেলেছেন। শিল্পের মুক্তির নামে শিল্পীকে

অ-সামাজিক মুক্তির পরোয়ানা দিয়েছেন। শিল্পপ্রকাশকে তাঁরা পূর্ণতার অলভ্য শিরোপা দিয়েছেন; অপ্রকাশকে নির্বাসিত করেছেন শিল্পলোক থেকে বস্তুলোকে, তত্ত্ব থেকে ব্যবহারে।

ক্রোচে-পন্থী কলিংউডের মতে শিল্প আবেগের প্রকাশ। প্রকাশ সম্ভব হয় ভাষায়। ভাষাকে তিনি ব্যাপক অর্থে ধরেছেন: "We have been using the word "language" to signify any controlled and expressive bodily activity, no matter what part of the body involved"[৬] কথা তো ভাষা বটেই, নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতিও ভাষা। ভাষায় আবেগ প্রকাশ হলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে—একরকম ক্যাথারসিস হয়: "mind is somehow lightened and eased"[৭]। শিল্প-প্রকাশ মুখ্যত নিজের জন্য, নিজের কাছে—একপ্রকার আত্ম-সম্বোধন, স্বগতোক্তির মতো, অথচ ঠিক স্বগতোক্তি নয়: অন্যের জন্য, অন্যের কাছে, অন্যকে সম্বোধন ক'রে যে শিল্প-প্রকাশ তা মূলত আত্মসম্বোধিত প্রকাশই। "...speech is a function of self-consciousness ..a speaker is conscious of himself as speaking, and is thus a listener to himself. The experience of speaking is also an experience of listening."[৮] প্রকাশ প্রকাশই—নিজেকে সম্বোধন ক'রে যে-প্রকাশ শিল্প হয়ে ওঠে, উঠতে পারে, চরিত্র ও ধর্মে তা অন্যকে সম্বোধন করা প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র নয়। "...the expression of emotion, simply as expression, is not addressed to any particular audience. It is addressed primarily to the speaker himself, and secondarily to anyone who can understand."[৯] আবেগের জন্ম অনুভব থেকে। অনুভবের একটি দিক ঐন্দ্রিয়, অপরটি আবেগ। অনুভব যখন চেতনাকে আবৃত, আচ্ছন্ন ক'রে রাখে তখন আবেগ প্রকাশযোগ্য নয়, শিল্পের প্রাণ নয়। চেতনার ক্রিয়াশীলতা যখন অনুভবকে সংযত, সংহত করতে পারে তখন অনুভবের ঐন্দ্রিয় দিকটি গৌণ হয়ে যায়, যা মুখ্য হয়ে ওঠে তাকে কলিংউড বলেন কল্পনা[১০]। অভিজ্ঞতার চেতন স্তরে কল্পনার সঙ্গে সৃষ্টি হয় ভাষার। অনুভব থেকে উদ্ভূত আবেগ প্রকাশের জন্য ভাষা চাই; কিন্তু ঠিক এই চাহিদা থেকে ভাষার উদ্ভব নয়। আবেগের প্রকাশই ভাষা। "In its original or native state, language is imaginative or expressive: to call it imaginative is to describe what it is, to call it expressive is to describe what it does."[১১] চেতনার প্রাধান্য থেকে অনুভবের মুক্তিই, অনুভব-উদ্ভূত আবেগের মুক্তির নামই, প্রকাশ। "...emotion... cannot be felt without being expressed."[১২] অন্তরে অনুভূত আবেগও,

কলিংউডের ভাষায়, প্রকাশ। আর এই প্রকাশই শিল্প। আত্ম-উদ্ভূত ও আত্ম-সম্বোধিত আবেগের এই প্রকাশ, ভাষায় প্রকাশ, শিল্প।

শিল্পকে আত্ম-উদ্ভূত ও আত্ম-সম্বোধিত বলার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। শিল্পের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই তাত্ত্বিক উদ্যোগ-আয়োজন। কিন্তু মুশকিল হল, এই তত্ত্ব তত্ত্বহিসেবে নির্ভুল নয়, আর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার নিকষে তো বোধহয় টেঁকেই না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার নিকষ ব্যবহার, ক্রোচে-কলিংউডদের মতে, একেবারে নিষিদ্ধ। এবং এর স্বপক্ষে তত্ত্ব হিসেবে তাঁরা যা বলেন, "তত্ত্ব ও ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক", তা তত্ত্ব হিসেবে ভুল, ব্যবহারেও অপ্রমাণিত। এক, বহিঃপ্রকাশের কথা বাদ দিলেও অন্তঃপ্রকাশের ক্ষেত্রেও যা প্রকাশ, অর্থাৎ যা শিল্প, তার উদ্ভব ও সম্পূর্ণ হওয়া একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। চেতনা স্বধর্মেই শৈল্পিক (আর্টিস্টিক),—এ কথা মানা খুব শক্ত। শিল্প-সৃষ্টির পশ্চাতে তাই ইচ্ছার, ইচ্ছা-পূরণকারী কল্পনার, ন্যূনতম পরিকল্পনার, অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে আবেগের প্রকাশেও ইচ্ছার লক্ষ্য ও তা পূরণের উপায় সম্পর্কে ন্যূনতম একটি ধারণা শিল্পীর চেতনায় থাকা দরকার। এই সীমিত অর্থে শিল্প-চেতনাও যে ব্যবহারিক তা স্বীকার করতে হয়। দুই, ব্যবহারিক প্রমাণ ও যুক্তি থেকে দেখানো যায় (ক) শৈল্পিক প্রকাশ নিছক আত্ম-উদ্ভূত নয়; শিল্প-সত্তারূপে শিল্পীর এমন কোন সত্তা নেই যা তার পূর্ণ সমাজায়ত মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন; গজদন্ত মিনার-বিলাসী, "অ-সামাজিক" শিল্পীও অনিবার্য বন্ধনে সমাজায়ত; (খ) শিল্প মূলত আত্ম-সম্বোধিত নয়,—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দু'ভাবেই শিল্প সমাজ-প্রবাহিত এবং সমাজের—রসিক বা অন্য কারণে কাঙ্ক্ষিত গোষ্ঠী বা শ্রেণীর—প্রতি সম্বোধিত।

তাছাড়া এই তত্ত্বের আরেকটি মূল দুর্বলতা হল, মানুষের অহং অথবা আত্ম সত্তা (সেল্ফ্) কে এঁরা ইন্দ্রিয়-দেহের স্পর্শ-বর্জিত সাক্ষী-পুরুষের মতো কল্পনা করেছেন। কান্টের নান্দনিক কল্পনার তত্ত্বে ইন্দ্রিয়ের অবদান স্বীকৃত। কিন্তু যেহেতু এই কল্পনা ইন্দ্রিয়-নির্ভর, স্মৃতির সহোদর-প্রতিম, এর স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিশীলতা সম্পর্কে ক্রোচে আস্থাহীন। কান্ট নিজেও শিল্প-সৃষ্টির মূল ভূমিকায় কল্পনাকে না বসিয়ে বসিয়েছেন প্রতিভাকে। নান্দনিক অভিজ্ঞতা, কান্টের মতে, একরকম শরীর-বিরহিত আনন্দানুভব। ইন্দ্রিয়-নির্ভর কল্পনার তুলনায় প্রতিভার প্রাধান্য স্বীকৃতি এবং শরীর-বিরহতার ছদ্মবেশে আনন্দানুভবকে প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক ও পরে সার্বজনীন করার চেষ্টা মূলত একই তাত্ত্বিক অভিপ্রায়ের প্রমাণ: ব্যক্তি শিল্পীর দেহ-মন-সামাজিক সত্তার গুরুত্বকে লঘু করা এবং, সম্ভব হলে, নিশ্চিহ্ন করা। এই প্রবণতা কান্টের তুলনায় হেগেলের নন্দন-তত্ত্বে আরো প্রকট। ক্রোচে কান্টের বিদুষী সমালোচক: কান্টের অভিজ্ঞতাবাদী কল্পনা-তত্ত্ব তার

পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ; তাঁর বুদ্ধিবাদও প্রত্যাখ্যাত। ঐ কল্পনা-তত্ত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি নেই ; ঐ বুদ্ধিবাদে ধারণার প্রাধান্যের এবং অদৃশ্য ও রহস্যময় এক অখণ্ড মানব-চেতনার[১৩] প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি রয়েছে।[১৪] কোন একটি বিশেষ বস্তু—নারী বা নিসর্গ দৃশ্য—যদি সুন্দর ও আনন্দদায়ক ব'লে মনে হয় তবে তা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐ বিশেষ বস্তুর সঙ্গে ঐ বিষয়ক (অতীন্দ্রিয়) সাধারণ ধারণার স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গতিপূর্ণতার চেতনা-উদ্ভূত ঃ সঙ্গতিপূর্ণতার এই চেতনা যেন পূর্ব-পরিকল্পিত। যৌক্তিক ধারণার (লজিক্যাল কনসেপ্টের) নির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা নান্দনিক ধারণায় (ঈস্থেটিক আইডিয়াতে) নেই,—থাকতে পারে না। নান্দনিক ধারণায় বস্তু বিধৃত নয়,—বিধৃত তার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রতিবেদন (রিপ্রেজেণ্টেশন)। নান্দনিক ধারণার ঐক্য ও (যেন) কোন পূর্ব-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নের আভাস (আভাসের অতিরিক্ত কিছু আছে ব'লে প্রমাণ করা অসম্ভব) শিল্পীর মনে যোগায় সৃষ্টির প্রেরণা এবং রসিকের মনে যোগায় শিল্পরস আস্বাদের আনন্দ। বিশেষ বস্তুর সঙ্গে (প্রচ্ছন্ন হলেও) সাধারণ ধারণার বা গোটা জগৎ-সংসারের কোন পূর্ব-পরিকল্পিত সঙ্গতি আছে ব'লে কাণ্টের যে ধারণা, ক্রোচের মতে, তা ভুল ; তাছাড়া শিল্পসৃষ্টি বা শিল্পবিচারের মধ্যে লক্ষ্য এবং উপায় সংক্রান্ত কোন ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মও নেই। কাণ্ট তাঁর ট্রান্সেনডেণ্টাল ঈস্থেটিক্স্ (ঠিক নান্দনিক অর্থে নয়) বিশ্লেষণে দেশ ও কালের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে বস্তুর নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিচয়কেই প্রধান ক'রে দেখিয়েছেন। এবং ঐ একই কারণে কল্পনাকেও মুক্তচ্ছন্দ সৃষ্টির উৎস রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। অথচ শিল্পবস্তুর অভিজ্ঞতা যে বস্তু অভিজ্ঞতা থেকে স্বতন্ত্র, দেশ-কালের পরিচয়ে, প্রতিবেদনে, আবদ্ধ (সাবজেক্টিভ) হলেও যে তার একটি সার্বজনীন (অবজেক্টিভ) আবেদন আছে তা তিনি স্বীকার করেন। শিল্পবস্তু সত্যসন্ধী ও ধারণালভ্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয় নয় ; অথবা প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যবহারিক উপায়ও নয়। এই রকম নানা "নিষেধের গণ্ডীর" মধ্যে থেকেও মানব-মন কীভাবে শিল্প-স্রষ্টা হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে কাণ্টকে স্বীকার করতে হল প্রতিভা নামক একটি অনুভব বৃত্তিকে, যা জ্ঞানাত্মক হয়েও ঠিক জ্ঞানাত্মক নয়, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের থেকে স্বতন্ত্র কিংবা, বলা যেতে পারে, মধ্যবর্তী, নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ হলেও নীতি-প্রণোদিত নয়, আনন্দদায়ক হলেও ইন্দ্রিয়সুখ থেকে স্বতন্ত্র। "For *judging* of beautiful objects as such, *taste* is requisite ; but for beautiful art, i.e. for the *production* of such objects, *genius* is requisite."[১৫]

বুদ্ধিবাদী হয়েও হেগেল শিল্পসৃষ্টির উৎসরূপে শুদ্ধ বুদ্ধিকে স্বীকার করতে গররাজী। শিল্পসৃষ্টি একপ্রকার বোধিদীপ্ত বুদ্ধির ক্রিয়া কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত বোধির ক্রিয়া। এই বৃত্তিটি

কাণ্টের ইন্দ্রিয়-নির্ভর কল্পনার মতো নয় ; আবার বম্‌গার্টেনের শুদ্ধ কল্পনাও নয়। এ যেন প্লতিনাস-কথিত একরকম মানসিক কল্পনা যা বুদ্ধি ও কল্পনা উভয়ের বৈশিষ্ট্যে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ বস্তুর, প্রতিবেদনের, মধ্যে অতীন্দ্রিয় সাধারণ (য়ুনিভার্সাল) কে "দেখতে" পায় এবং এই "দেখার" শিল্পসৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত ও অনায়াস নয়,—প্রয়াস ও পৌনঃপুনিক অনুধ্যান-সাপেক্ষ। হেগেলের সাধারণ (য়ুনিভার্সাল)-সন্ধানী বুদ্ধিকে ক্রোচে সন্দেহের চোখে দেখেন। ক্রোচের মূল বক্তব্য ঃ শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, প্রকাশের মুক্তচ্ছন্দ। যখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বিশেষের মধ্য দিয়ে তার ক্রান্তদৃষ্টি সম্প্রসারিত করে তখন মূল তত্ত্ব (য়ুনিভার্সাল আইডিয়া) তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিল্পবস্তুর বিশেষ ধর্ম ছায়ার মতো সরে যায় ;—শিল্প আর শিল্প থাকে না, সে হয়ে ওঠে সত্য তত্ত্বজ্ঞান। ধর্ম ও দর্শনের মতো তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টি লাভের তৃতীয় নয়ন শিল্প। ক্রোচের মতে, ধর্ম ও দর্শনের সগোত্র হয়ে নন্দনতত্ত্ব যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের উচ্চতম শিখরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল তখন সুন্দরকে দেখার দৃষ্টিপ্রদীপ তার নিভে এল। "The Aesthetic of Hegel is thus a funeral oration : he passes in review the successive forms of art, shows the progressive steps of internal consumption and lays the whole in its grave, leaving philosophy to write its epitaph !"[১৬]

হেগেল সম্পর্কে ক্রোচের কঠোর মন্তব্য শুনে' একথা ভাবা ভুল হবে যে, তিনি হেগেলীয় নন্দনতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মূল বিরোধিতা নন্দনতত্ত্বকে দর্শনের (এক্ষেত্রে মেটাফিজিক্স-এর) সগোত্রীয় (বস্তুত অনুগত) করায়। কারণ এর ফলে নন্দনতত্ত্ব তার স্বাতন্ত্র্য হারায়, শিল্পসৃষ্টি আর আত্মার মুক্ত ক্রিয়া রইল না। প্রকাশ যদি সৃষ্টিশীল কল্পনা বা বোধির ক্রিয়া না হয়ে বুদ্ধির ক্রিয়া হয় তবে তা সত্যসন্ধানের উপায় (ব্যবহারিক বিদ্যা) বিশেষে পরিণত হয়ে পড়ে ঃ বুদ্ধি যখন বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে তখন শিল্প তার সমগ্রসন্ধিরূপ হারায়, স্বধর্মভ্রষ্ট হয় ; আবার বুদ্ধি যখন সংশ্লেষণাত্মক রূপ ধারণ করে তখন তাতে শিল্পের বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য বিলীন। অতএব, বিচিত্র-বিশিষ্ট শিল্প-প্রকাশের উৎস-বৃত্তিরূপে ক্রোচে দেখতে চান সৃষ্টিশীল কল্পনাকে, বোধিকে। বোধিই প্রকাশ। প্রকাশই নন্দনতত্ত্বের মূল উপজীব্য। প্রকাশ ভাষাতত্ত্বেরও মূল উপজীব্য। আর তাই নন্দনতত্ত্ব ও সাধারণ ভাষাতত্ত্ব মূলত এক।

"প্রকাশ"-এর অর্থভেদ ও প্রকাশবাদের প্রকারভেদ ॥

প্রকাশবাদ নিয়ে আলোচনার অসুবিধা আমি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। "প্রকাশ" বলতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশবাদী বিভিন্ন কথা বুঝেছেন। শুধু ক্রোচে ও কলিংউড

নয় একটি ব্যাপক অর্থে টলস্টয়, ডিউই, সি. জে. ডুকাসে, ইউজিন ভেরঁা, জর্জ স্যান্টায়ানা এবং টি. এস. এলিঅট সকলেই প্রকাশবাদী।[১৭] বলাবাহুল্য, "প্রকাশ" বলতে এরা সকলে এক কথা বোঝেন না এবং সেজন্য তাদের বক্তব্যও এক নয়। (১) যার প্রকাশ, অর্থাৎ যা প্রকাশিত হয়, বা যা শিল্পের উপজীব্য, যেমন, জড় বস্তু, নিসর্গ দৃশ্য, মনের ভাব, অনুভব, আবেগ, তা-ও "প্রকাশ" বলতে বোঝানো হয় ; আবার (২) যাতে প্রকাশিত হয়, যেমন ভাষা, রঙ-তুলি-ক্যানভাস, স্বর, দেহের অঙ্গ-ভঙ্গি, পাথর, মাটি, কাঠ প্রভৃতি (মিডিয়া)। (৩) প্রকাশ-প্রকরণ বা-পদ্ধতি (প্রসেস), সৃষ্টিকর্মের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের তত্ত্ব ও বর্ণনাও "প্রকাশ" ব'লে স্বীকৃত। (৪) প্রকাশের পরিণাম, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রয়োজন তা-ও (প্রডাক্ট) কখনো কখনো "প্রকাশ" নামে প্রচলিত। কিন্তু যেহেতু প্রকাশের পরিণাম, কেউ কেউ মনে করেন, শিল্প সৃষ্টিতেই সমাপ্ত নয় এবং তার পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে রসিকচিত্তে তার কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাও পরিণামের অন্তর্গত ব'লে ধরতে হবে, তাই "প্রকাশ" শুধু সমাপ্ত শিল্পসৃষ্টি (প্রডাক্ট) অর্থে গ্রহণ করলেই চলবে না। (৫) সৃষ্ট শিল্প কীভাবে রসিকচিত্তে গৃহীত হচ্ছে (অবজেক্টরূপে) তা-ও প্রকাশের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নাস্তি থেকে অস্তির জন্ম অসম্ভব। বিষয়-বস্তু-বিরহিত সম্পূর্ণ শিল্পীর কল্পনা-নির্ভর সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির অংশ-বিশেষ (অবিভাজ্য হলেও) শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু প্রকাশ সৃজনধর্মী হলেও সৃষ্টি নয়,—সামগ্রিক অর্থে তো নয়ই। কোনো কোনো ধর্মে ঈশ্বরকে পৃথিবীর স্রষ্টা ব'লে কল্পনা করা হয় এবং এ-ও কল্পনা করা হয়েছে যে, তিনি নাস্তির নিখিল গর্ভ থেকে অস্তির সৃষ্টি সম্ভব করেছেন। ধর্মতত্ত্বের এই বক্তব্য সত্য হোক না-হোক এ-প্রসঙ্গে যা লক্ষ্যণীয় তা হল : ঈশ্বরকে স্রষ্টা কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকাশক বলা হয়নি। সৃষ্টিতে অভিনবত্বের দাবী মৌল। যা ছিল না এমন কিছুকে সম্ভব করা, অস্তিত্বশীল করা, সৃষ্টির প্রাণ-কেন্দ্র। প্রকাশে সৃষ্টির দাবী নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন কিন্তু তার প্রাণ-কেন্দ্র অভিনবতত্ত্ব নয়। স্রষ্টা যখন শিল্পী তখন যতই তিনি মৌলিকতার ও অভিনবত্বের দাবী করুন না কেন যা তিনি তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ করতে চান তার চরিত্র ও ধর্ম তা প্রকাশকে অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য। শিল্প উপজীব্য বস্তুর অনুকৃতি নয় ঠিকই, কিন্তু শিল্পে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ও অপ্রকাশিত—এমনটি ভাবাও ঠিক হবে না। "As Eric Gill once said, the artist does not create *de nihilo*, but he does create *de nóvo*।"[১৮] ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের মতোই সম্পূর্ণ সার্থক ও ভাবময়,—তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা, অসার্থকতা ও অভাবের লেশমাত্র নেই। যেহেতু তাঁর সর্বজ্ঞতাবশত সৃষ্টির এই সম্পূর্ণ চরিত্র ঈশ্বর জানেন, তাঁর দৃষ্টিতে নতুন কিছু হওয়া, মুক্ত কিছুর সৃষ্টি বা এ-জাতীয়

কোনো কথার অর্থ নেই। (প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো : এ-সব যুক্তি বিশেষ একপ্রকার ঈশ্বর তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল।) ঐশ্বরিক সৃষ্টির উপমা, বলাবাহুল্য, মানব শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু তিনি শান্ত ও ইন্দ্রিয় সীমাবদ্ধ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে কখনো ঈশ্বরতুল্য সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন না; তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা অভাব-আকূতি,—পূর্ণতার উদ্বেলতা নয়; তাঁর প্রকাশ-প্রকরণ অনিশ্চয়তায় উদ্ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যহীন নয় বটে, তবে তাঁর মুক্তচ্ছন্দে অপূর্ব-পরিকল্পিত নতুনের উন্মোচন, আবিষ্কার অসম্ভব কিছু নয়। আরো খানিকটা এগিয়ে কেউ-বা হয়তো বলবেন : শিল্পীর প্রকাশ বস্তুত উপজীব্য বস্তুনিচয়ের কৃত্রিম শিল্পলোকে কিঞ্চিৎ বিকৃত বিন্যাসে পুনর্মিলন ঘটানো মাত্র।

শিল্পে যদি সত্যের প্রভাব (তা সে সত্য বস্তুগত বা নৈসর্গিক, ভাবগত বা আধ্যাত্মিক যা'ই হোক না কেন) প্রবল হয় তাহলে, শিল্প-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে, শিল্পের নান্দনিক মূল্য হ্রাস পায়। ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি, শিল্পকে হেগেল পরমাত্মার প্রকাশ ও দর্শনের (বৌদ্ধিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার) সমগোত্রীয় কল্পনা করায় ক্রোচে কী জাতীয় সমালোচনা করেছেন। ক্রোচের সমালোচনায় অন্তত একটি কথা স্পষ্ট : শিল্প তত্ত্বের সন্ধান তার আবিষ্কার বা প্রকাশ নয়। অধ্যাত্মতত্ত্বের (এ্যাবসলিউট স্পিরিটের) কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুজগৎ বা নিসর্গলোকের মধ্যেই আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে দেখব, প্রকাশ যখন প্রকাশিতের ঠিক প্রতিবিম্ব বা অনুকৃতি না হয়ে অনুরূপ বা অনুগতধর্মী হয় তাতে সর্বদাই তার নান্দনিক মূল্য হ্রাস পায় না। বস্তুজগতে, নৈসর্গিক দৃশ্যে যে-নান্দনিক সৌন্দর্য আছে তার সৃষ্টির কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব ঈশ্বরে বা মানুষের শিল্প-রসভোগী চিত্তে আরোপ করার জোরালো যুক্তি নেই। কনস্টেবল-এর *Salisbury Cathedral from the Meadow* (১৮৩১), রুইসডেলের *The Forest* (১৬৬০), কোরোতের *View near Epernon* (১৮৫০?) প্রভৃতি চোখ-জুড়ানো নিসর্গ-দৃশ্য, ওঅর্ডস্বর্থের নিসর্গ-দৃশ্যের হৃদয়-জুড়ানো কবিতার কৃতিত্ব সবটাই কি সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের? বিশ্বজগৎ কি বিষয়রূপেই, অর্থাৎ স্বধর্মেই, বহুক্ষেত্রে শিল্পকর্মেরও অধিক সুন্দর নয়? পাহাড়ে উঠে' দূরের পর্বত-মেঘ-বন, মধ্যরাতে অন্ধকারে তারকা-খচিত নিঃসীম আকাশ, সমুদ্রের বিশাল বিস্তার আর ফেনোচ্ছ্বসিত তরঙ্গ, প্লেন থেকে একদিকে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার ও অন্যদিকে অপরাহ্ণের রোদ-মাখা মেঘমালা দেখতে-দেখতে আমি যে গভীর আনন্দ পেয়েছি, আমার বিচারে, তা নান্দনিক, এবং নিসর্গ নিজেই সুন্দর ব'লে আমাকে সে ঐ নান্দনিক আনন্দ দিতে পেরেছে। অত্যাধুনিক শিল্পে-সাহিত্যে নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য আমাকে ব্যথিত করে। এবং আধুনিক নন্দনতত্ত্বে নৈসর্গিক আলোচনাও দুর্লভ। "Contemporary writings on aesthetics

attend almost exclusively to the arts and very rarely to natura beauty ।"[১৯]

এই বিশ্বজগৎ (নিসর্গসহ) কারো সৃষ্টি, এইকথা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করা শক্ত। বিনাপ্রমাণে ধর্মীয় বিশ্বাসে বা অন্য কারণে কেউ যদি এইকথা বিশ্বাস করেন সেকথা স্বতন্ত্র। যা কিছু আছে তা সবই জ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে আছে তা ভাববার পর্যাপ্ত যুক্তি নেই। বিশ্বাসের বিষয়রূপেও সমাজে-সংসারে অনেক কিছু আছে। এবং থাকবে। এই বিশ্বজগৎ যে কোনো এক বিবর্তনের ফল তা প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু তা থেকে এটা অনুমান করা ভুল হবে যে, বিশ্বজগৎ কা'রা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রেরণা নান্দনিক। বরং, সংশয়বাদী বলতে পারেন, "বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা, উপায় ও লক্ষ্যের আশ্চর্য অন্বয় দেখে স্রষ্টা-সৃষ্টির যে উপমা কল্পনা করা হয়েছে তার উৎস ঐতিহ্য বা ধর্মবিশ্বাস,—যুক্তি নয় ; এবং এই উপমা উপমাই মাত্র, কিছুই প্রমাণ করে না।" তর্কের খাতিরে কেউ যদি মেনেও নেন যে, বিশ্বজগৎ সুন্দর বা বিশ্বজগতের অনেক কিছু সুন্দর তা থেকে কি এ কথা বলা যাবে যে, এই সৌন্দর্য নান্দনিক প্রকাশ ? যদি "নান্দনিক প্রকাশ" কথার অর্থের মধ্যে নান্দনিক প্রকাশক বা স্রষ্টার ধারণাটি অনুস্যূত থাকে এবং সে-ধারণাটিকে উপমার অধিক (এক অনন্য সৃষ্টিধর্মী সচেতন সত্তার অস্তিত্ব) ব'লে মেনে নিতে হয় তা হলে অবিশ্যি বিশ্বজগতের সৌন্দর্যকে নান্দনিক প্রকাশরূপে গ্রহণ করায় আপত্তি থাকে না। অথচ অন্তরে আমরা অনেকেই আপত্তি অনুভব করি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : কেন ? শিল্পসৃষ্টিতে রূপান্তর ও বিকৃতি অনিবার্য। শিল্পের উপজীব্য বস্তু যা'ই হোক না কেন যখনি তা শিল্প হয়ে ওঠে তখন তা শিল্পীর ইচ্ছায়-কল্পনায় অন্য রূপ নেয়। বিশ্বজগৎ অন্য কিছুর রূপান্তর, অংশত ব্যর্থ অনুকৃতি এবং সেই অর্থে বিকৃত, একটি সম্পূর্ণ নিখুঁত তৃতীয় জগতের বস্তুবাধিত অসম্পূর্ণ উপমা বা এ-জাতীয় কোন তত্ত্ব মেনে নিতে হয়। এ-জাতীয় কোন তত্ত্ব মানলে মনোজগৎ, বস্তুজগৎ এবং এই তৃতীয় জগতের সম্বন্ধ কী তা-ও নান্দনিক সৃষ্টি প্রসঙ্গে নতুন ক'রে স্থির করতে হয়। সম্পূর্ণ নিখুঁত সৌন্দর্য উপভোগ না ক'রে মন কেন তার অক্ষম অনুকৃতিকে—বস্তুজগৎকে—উপভোগ করতে চায় ? তবে কি তৃতীয় জগৎ নিছক দার্শনিক বা কবি কল্পনা ? এই কল্পনার আদৌ প্রয়োজন কি ? মানুষের মন (প্রথম জগৎ) বিশ্বজগৎ (দ্বিতীয় জগৎ) দেখে' এর থেকে ঢের নিখুঁত ("সম্পূর্ণ নিখুঁত" যার সীমান্ত) এক তৃতীয় জগৎ কল্পনা করে ; কারো কারো মতে এই তৃতীয় জগৎ চর্মচক্ষে অদৃশ্য হলেও তৃতীয় নয়নে "দৃশ্য"। দ্বিতীয় জগৎ বস্তুধর্মের বাধায়-নিষেধে তৃতীয় জগতের নিখুঁত চরিত্র হারিয়েছে। শিল্পজগৎ মনের সৃষ্টি,—দ্বিতীয় জগতের মানবিক রূপান্তর। তৃতীয় জগৎ পূর্ণতা-সন্ধানী মানবিক কল্পনা ; তার রূপ বিষয়-বস্তুর বাধা-নিষেধমুক্ত,—মুক্তির

অনন্য নিকেতন। এর স্বীকৃতি দুটি তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটাতে পারে : এক, দ্বিতীয় জগৎ কোন জগতের ভ্রষ্ট রূপ ?—তার উত্তর যোগানো ; এবং দুই, বিবর্তমান জগতের লক্ষ্য কি ? তার উত্তর যোগানো। বস্তুজগতের এবং শিল্পজগতের ব্যবধানকে উগ্র দ্বৈতবাদীরা বিরোধ কল্পনা করতে ব্যগ্র। অনেক সময়ে আমরাও তাই নৈসর্গিক এবং কৃত্রিমতার উপমায় নিসর্গ ও শিল্পের ব্যবধানকে বিরোধ ব'লে মনে করি। ঐ উপমার দর্পণে তো তাহলে তৃতীয় জগৎকে চিরন্তন, অবিকার ও নিখুঁত মনে হবে এবং কালিক, বিকৃত ও খুঁতভরা দ্বিতীয় জগৎকে মনে হবে তার বিরোধধর্মী প্রকাশ। বস্তুজগৎ ও শিল্পজগতের ব্যবধান বা বিরোধের মূলে রয়েছে শিল্পীমন ; সাধারণ মন জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুজগতের সত্যরূপ খোঁজে ; শিল্পীমন কল্পনার সাহায্যে বস্তুজগতের রূপান্তর ঘটিয়ে সৃষ্টি করতে চায় নন্দনলোক।

ক্রোচে ও কলিংউডের মতো প্রকাশবাদীরা এবং ক্লাইভ বেল ও সুস্যান ল্যাঙ্গারের মতো রূপবাদীরা প্রকাশের অমূর্ত দিকের উপর জোর দিতে গিয়ে প্রকাশের মূর্তির দিকটা, মাধ্যমের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছেন ব'লে মনে হয় না। প্রথম গোষ্ঠী এই ভুল করেছেন তথাকথিত শিল্পের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর এই ভুলের মূলে রয়েছে অর্থপূর্ণ রূপের বিশ্লেষণে অত্যুৎসাহ এবং রূপময়ের আলোচনায় ঔদাসীন্য। রূপ যাতে প্রকাশিত হয়, যার অভাবে নান্দনিক প্রকাশ ও সঞ্চার অসম্ভব, তার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নন্দনতত্ত্বে নিতান্তই আবশ্যিক। প্রকাশের বস্তুধর্মিতা অনিবার্য অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে অনস্বীকার্য। কিন্তু এটাই তার একমাত্র গুরুত্ব বা তাৎপর্য নয়। বস্তুধর্মিতারও স্তরভেদ আছে। সকল স্তরগুলিই প্রকাশের স্তর। তাকে ব্যবহারিক ব'লে ক্রোচে-কলিংউডেরা তুচ্ছ মনে করতে পারেন, কিন্তু তার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেন নি। বোসাঙ্কের (১৮৪৮-১৯২৩) মতো ভাববাদী দার্শনিককেও বলতে হয়েছে যে, বহিঃপ্রকাশের সম্পর্কলেশহীন অন্তঃপ্রকাশ অবাস্তব কল্পনা, এবং এই দুই প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে একই অবিভাজ্য প্রকাশের দুটি দিক :

"Beauty, [Croce] says, is for the mind and in the mind. A physical thing, supposed unperceived and unfelt, cannot be said in the full sense to possess beauty. But he forgets throughout...that though feeling is necessary to its embodiment, yet also the embodiment is necessary to feeling. To say that because beauty implies a mind, therefore it is an internal state, and its physical embodiment is something secondary and incidental, and merely brought into being

for the sake of permanence and communication—this seems to me a profound error of principle, a false idealism.... The bodily thing adds immensely to the mere idea and fancy, in wealth of qualities and connections. If we try to cut out the bodily side of our world, we shall find that we have reduced the mental side to a mere nothing." (*Three Lectures on Aesthetics*, ১৯১৫)।

এ-জাতীয় কথা ভাববাদী আমেরিকান দার্শনিক জসিয়া রয়েসও (১৮৫৫-১৯১৬) বলেছেন। বিষয় (অবজেক্ট) ভাবের (আইডিয়ার) বাহ্যিক অর্থ এবং ভাব বিষয়ের আন্তর অর্থ। ভাবের আকাঙ্ক্ষা হল বিষয় এবং বিষয়েরই অনন্য যোগ্যতা আছে ভাবের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার বা মূর্ত করার। বিষয়ের সঙ্গে ভাবের সম্বন্ধের উপরেই ভাবের সত্যাসত্য নির্ণয় করার সম্ভাবনা নিহিত। রয়েস সত্যাসত্য প্রসঙ্গে ভাব ও বিষয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কে যে-তত্ত্ব খাড়া করিয়েছেন নান্দনিক সুন্দর-অসুন্দর প্রসঙ্গেও তার প্রয়োগ সহজে কল্পনা করা যায়। বোসাঙ্কে বা রয়েস যার বক্তব্যই ধরি না কেন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সুন্দর বা অসুন্দর যাতে প্রকাশিত তার পদার্থ-সত্তা স্তরীভূত, তার অর্থের স্তরভেদ আছে; যে অনুভব, আবেগ বা ইচ্ছার সে মূর্ত প্রকাশ সেই প্রকাশের মূর্ততা অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে সবসময়ে সমান নয়; কখনো তা মনে হবে অপূর্ণ, কখনো-বা মনে হবে পূর্ণ, কদাচিৎ মনে হতে পারে পরিপূর্ণ।

প্রকাশের মাধ্যমকে, যাতে প্রকাশিত হয় তাকে, যখন শিল্প বলা হয় তার পদার্থ-সত্তা এক সঙ্গে একই ভাবে রসিকের দৃষ্টিতে বা শ্রবণে উদ্ভাসিত হয় না। প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে অনুভব বা আবেগ ধ্বনিতে প্রকাশ করা যায় তাকে হয়তো পাথরে বা কাঠে তেমনভাবে প্রকাশ করা যায় না; যা রঙে-তুলিতে-ক্যানভাসে প্রকাশ করা যায় তা হয়তো তেমনভাবে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; যা চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা যায় তা রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ে প্রকাশ করা যায় না; এক কথায়, মাধ্যম প্রকাশ-অপ্রকাশের শুধু অনুপাত নয় চরিত্র, গুণ প্রকৃতিও প্রভাবিত করে। মাধ্যমের একটি আছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহিঃসত্তা। সঙ্গীত ও কাব্যের ধ্বনি, চিত্রশিল্পের রঙ-রূপ রেখা, নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহিঃসত্তা। বলাবাহুল্য, যে-কোন ধ্বনিসমগ্র সঙ্গীত বা কাব্য হয় না, রঙ-রূপ-রেখার যে-কোনো সমাহার শিল্প ব'লে বিবেচিত হবে না; অঙ্গভঙ্গি মাত্রই নৃত্য নয়। এই সহজ সত্য থেকে বিপরীত সিদ্ধান্ত টানাও ভুল হবে: নৃত্যের জন্য অঙ্গভঙ্গি সঙ্গীতের জন্য ধ্বনি, চিত্রশিল্পের জন্য রঙ-রূপ-রেখা নিষ্প্রয়োজন। মাধ্যম প্রয়োজন, পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের শ্রেণীভেদ থাকতে পারে, জাতিভেদ নেই। শিল্পের প্রকাশ-প্রকরণে স্তর বা

পর্যায়ভেদ আছে; স্পষ্ট শিল্পের অর্থে ও উপভোগ্য রসে গভীরতাভেদ আছে। এই ভেদগুলি শ্রেণীভেদ,—মৌলিক কোনো কিছু নয়, জাতিভেদ নয়। শিল্পের উপজীব্য বস্তু, তার বস্তুধর্ম যা'ই হোক না কেন, শিল্পের অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু যা প্রকাশিত হয় তা নয়, শিল্প যাতে প্রকাশিত হয় তা-ও শিল্পের অপরিহার্য অঙ্গ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃসত্তার পরিবর্তন ঘটালে স্পষ্ট শিল্পের শুধু আত্মপরিচয়ে নয় তার রসভোগেও পরিবর্তন ঘটে। একটি গান শুনতে গেলে শ্রোতা তার কতোগুলি গুণ লক্ষ্য করে, অর্থাৎ শোনে,—তান, লয়, সুর প্রভৃতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ। সুরের উচ্চতা-নিম্নতা, স্বরের গাঢ়তা-লঘুতা। একটি ছবি দেখতে গিয়ে দর্শক দেখে রঙের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি। লিখিত ভাষা পড়তে গিয়ে কতোগুলি বিভিন্ন আকারের শব্দবন্ধ হরফ দেখি এবং উচ্চারিত ভাষা শুনতে গিয়ে কতোগুলি বিভিন্ন কাঠামোর (শব্দবন্ধ) ধ্বনি শুনি।

দ্বিতীয়ত, যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃসত্তা, গুণ ও সম্বন্ধগুলি, অনুধ্যান করি তখন বহিঃসত্তার আরেকটি স্তর চেতনায় জাগে। এই স্তরটি দৈশিক-কালিক। রাগের কালধর্ম আছে দুই অর্থে : এক, কোন রাগ কখন গাইতে হয় এবং, দুই, রাগের ধ্বনি (সা রে গা মা ইত্যাদির) উচ্চারণে কতোটা সময়-ভেদ রীতি মানতে হবে। তাছাড়া সা রে গা মা প্রভৃতি ধ্বনির একক উচ্চারণে কতোটা সময় দেওয়া হবে তার উপরেও গানের চরিত্র নির্ভর করে। দ্রুত ও বিলম্বিত লয়, তাল ও মাত্রার পার্থক্য প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই কাল-ধর্ম অনুস্যূত। ছবির ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের মধ্যে দেশ-ধর্ম অনুস্যূত। দ্বি-মাত্রিক ছবিতে শিল্পী যে ত্রি-মাত্রিক দূরত্বের, ঘনত্বের, ব্যাপ্তি বা বিস্তারের আভাস সৃষ্টিতে সার্থক হয় তার কারণ দেশ-প্রত্যক্ষের গুণগুলিকে সে সার্থকভাবে সাজাতে সমর্থ হয়। স্থাপত্য বা ভাস্কর্যে দেশ-ধর্ম প্রায় সরাসরি (অন্যান্য মাধ্যমে নয়) প্রকাশিত। "প্রায়" বলছি এই জন্য যে উপজীব্য বস্তুর মূল দেশ-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েও, শিল্পকর্ম তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড় হয়েও, মূলের আভাস আনতে পারে। অনেক শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে "মূল দেশ-ধর্মের" কথা ওঠেই না। দেশ-কাল শুধু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ ও সম্বন্ধের নয় ভাব ও অনুভবেরও আধার বা অধিকরণ হতে পারে।

এটাই প্রকাশ-মাধ্যমের তৃতীয় এবং, এক অর্থে, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দেশ-কালকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-গুণের স্থাণু-কাঠামো ব'লে নিউটন ও কান্ট থেকে অনেকেই মনে করে আসছেন সে যে মুক্তপক্ষ বা গতিময়ী অনুভব ও আবেগেরও আধার হতে পারে তা হয়ত (দার্শনিক) আবিষ্কার হিসেবে খুব একটা নতুন কিছু না, কিন্তু শিল্পে এর সৃষ্টিশীল প্রয়োগ সত্যিই নতুন। এক্সপ্রেশনইজম্, ইম্প্রেশনইজম্ এবং কিউবিজম্-এর প্রবক্তারা সকলেই তাদের শিল্পকর্মে এক অর্থে ইউক্লিডের জ্যামিতি ভেঙে' নতুন, বিচিত্র,

বিচ্ছিন্ন, আবার কখনো-বা মুক্ত কল্পনায় সংযুক্ত, জঙ্গম জগৎ তৈরী করতে চাইলেন। দেশ-কালের লোহ কাঠামোর লোহ যেন কল্পনার দীপ্ত দহনে গলে গেল, নতুন আকৃতিতে রূপান্তরিত হল, সৃষ্টির অন্তরায় না হ'য়ে যেন সহায়ক হল। পিকাসোর লোহ ও ব্রোঞ্জে "আঁকা" *Woman in the Garden* (১৯২৯-৩০) শিল্পকর্মে ধাতুর দেশধর্মিতা, বিস্তার ও স্থিরতা, সত্বেও নারীর নমনীয়তা ও ফুলের কোমলতা সুস্পষ্ট। চিরিকোর *The Disquieting Muses* (১৯১৭) তৈলচিত্রে বস্তুর সঙ্গে স্বপ্নের, শৈশবের সঙ্গে পরিণত বয়সের, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের, চেনার সঙ্গে অচেনার স্বাধীন সংযোগগুলোকেও দেশধর্মের কল্পনাসমৃদ্ধ ব্যবহার যে বাঞ্ছিত-অথচ-অবাস্তব স্বপ্নসৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে তার প্রমাণ অভ্রান্ত। শিল্পে কালের ব্যবহার দেশের ব্যবহারের সঙ্গে এক অর্থে অবিভাজ্য। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ এক অর্থে কালকে সাহিত্যে যে-ভাবে, যতো সূক্ষ্ম ও সার্থকভাবে, ব্যবহার করা যায় ছবিতে, স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে সে-ভাবে করা যায় না। কালের সঙ্গে জ্ঞানে বা কল্পনায় যুক্ত কতোগুলি ধারণা, চিত্রকল্প, ছাঁদ, স্টাইল, গাঁথা, কাহিনীর মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত শিল্পলোক সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বা নাটকে গত যুগ পূর্ণতার আভাস নিয়ে আসে। ধ্রুপদী প্রভাব সৃষ্টিতে এজ্‌রা পাউণ্ড বা জীবনানন্দ যখন অতীতচারণ করেন তখন বিগত যুগের শুধু ঝিলিক মেলে, প্রতীক স্বাদ পাই, পূর্ণাঙ্গ সমাজ পাই না। অতীতকে তো বটেই ভবিষ্যৎ-কেও বর্তমানে উপস্থিত করার শিল্পকর্মের মধ্যে সাংকর্যধর্ম থাকবেই। শিল্পী যতই নৈর্ব্যক্তিক হতে চান বা চেষ্টা করুন না কেন তিনি তার দেশ-কালের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে উঠতে পারেন না। যে-অতীত বা যে-ভবিষ্যৎ তাঁর কল্পনায় জন্মলাভ করে সেই অতীত বা সেই ভবিষ্যতের শিল্পরূপে শিল্পীসত্তার চিহ্ন, তাঁর দেশ-কালের চিহ্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে না হলেও প্রতীকে, রূপকে বুদ্ধি-কল্পনা-গ্রাহ্যরূপে উপস্থিত হতে বাধ্য।

প্রকাশের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো একটিকে সাধারণভাবে প্রকাশ-প্রকরণের মূল বলায় অনেক অসুবিধা আছে। শিল্পরূপে একটি ছোট গীতি-কবিতা, একটি বড় দেয়াল-চিত্র এবং একটি শহর সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা প্রকরণ "একরকম" হতে পারে না, হয় না। তবু যদি জিজ্ঞাসা করি "তাদের কোন সাধারণ ধর্ম আছে কি না?" তার উত্তরও এত সাধারণ এবং সেজন্য এত অস্পষ্ট হবে যে তাতে জিজ্ঞাসু মনের সন্তোষের তুলনায় বিরক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সমধিক।

সকল শিল্প-সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই কোন-না-কোন উৎসাহ, আস্পৃহা এবং লক্ষ্য-চেতনা কাজ করে। উৎসাহ, আস্পৃহা ও লক্ষ্য-মুখিতা চেতনার সক্রিয়তারই লক্ষণ। সৃষ্টিশীলতা মানবচেতনার ক্রিয়াশীলতার উৎকৃষ্ট ও চারু রকমবিশেষ। ক্রিয়াশীলতার প্রথম পর্যায় স্বতঃস্ফূর্তি। "প্রথম পর্যায়" বলছি এইজন্য যে এর পূর্ববর্তী পর্যায় যদি

কিছু থেকেও থাকে শিল্পীমন তা সৎ ও নির্ভরযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে শিল্প-প্রকরণের আদি পর্যায়ের সঙ্গে, সংযুক্ত করতে পারে না। মন দিয়েই তো মনের উপর নজর রাখতে হবে, গভীরে যেতে হবে, গুপ্তচরবৃত্তি করতে হবে। আত্মচেতনা চেতনার স্বতঃস্ফূর্তির পূর্ববর্তী পর্যায়ের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারে সমর্থ নয় যার উপর নির্ভর ক'রে সে ঐ পর্যায়কে শিল্পসৃষ্টির সূচনা ব'লে মনে করতে পারে। উৎসাহের একদিগ্‌দর্শী আধিক্য কখনো কখনো উন্মত্ততার লক্ষণাক্রান্ত। উন্মাদ, প্রেমিক, সাধক ও শিল্পীর সমগোত্রের উল্লেখ অনেক মনস্তাত্ত্বিক ও তত্ত্বদর্শীর লেখাতেই পাওয়া যায়। আস্পৃহা ক্রমে সেই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মত্ততাকে সংহত ও লক্ষ্যাভিমুখী করতে থাকে। যা প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্যাভিমুখী নয় দ্বিতীয় পর্যায়ে তা লক্ষ্যাভিমুখী হতে সুরু করে। স্বতঃস্ফূর্তি, যদিচ আত্মচেতন স্তর নয়, প্রকাশের আকুতি তবু তাতে সক্রিয়। আস্পৃহার স্তরে শিল্পী অস্ফুটভাবে আত্মচেতন : চেতনা সৃষ্টির জন্য শুধু সক্রিয় নয়,—একাগ্রও। যে শিল্প-সৃষ্টির জন্য চেতনা একাগ্র সে-চেতনার মধ্যেই একাগ্র লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্তরায়ও রয়েছে : যেমনভাবে সৃষ্টিচেতনার উদ্বোধন হয় ঠিক তেমনভাবেই তার যাত্রাশেষ হয় না : পথের মধ্যে আবিষ্কার, বিচিত্র উৎক্ষেপ, বিক্ষেপ, এবং তার জন্য সাময়িক আত্মচ্যুতি : আবার শিল্পচেতনার লক্ষ্যাভিমুখিতা আত্মচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে অগ্রগামী সৃষ্টির বৃহত্তর পরিধি-পথে ফিরে আসে। শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য শিল্প-চেতনাকে কখনো নির্দ্বন্দ্ব স্বতঃস্ফূর্তির সরল পথে এগোতে দেয় না। শিল্প-প্রকাশের লক্ষ্যাভিমুখিতায় তাই দ্বন্দ্বের আলো-ছায়া অনিবার্য।

শিল্প-প্রকরণের সুরু যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তি থেকে একথা ভাবা ভুল হবে যে এর শেষও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুরু থেকে শেষ গোটা সৃষ্টির প্রাণ স্বতঃস্ফূর্তি। কখনো একটি সুরের মূর্চ্ছনা, কখনো ক'টি শব্দের সঙ্গীত বা একটি চিত্রকল্পের মনোরম অর্থময়তা, কখনো বা একটি নিসর্গ-দৃশ্য, কখনো জন্ম, মৃত্যু, বিরহ, মিলন, বা প্রেমের গভীর অনুভব-আবেগ শিল্প-প্রকরণের বীজ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত যা শিল্প-অনুভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেক বস্তু বা ভাবও শিল্প-সৃষ্টির উদ্দীপনা যোগায়। এমন-কি বাইরের থেকে যা নিছক রাজনীতিকের, ধর্মীয় যাজকের বা বাণিজ্যিক বিক্রেতার প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব'লে মনে হতে পারে তা-ও কোনো শিল্পীর মনে সৃষ্টির উৎসাহ যোগাতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে বস্তু, ভাব বা বিষয়টি শিল্প-সৃষ্টির কারণ নয়,—শিল্পীর মনোজগতে একটি বিশেষ মুহূর্তে উৎস হিসেবে কাজ করে মাত্র। সৃষ্টি-প্রকরণের কারণ ও অবলম্বনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এই প্রকরণের কর্তা আছে, কারণ নেই। কর্তার বা স্রষ্টার কল্পনা যোগ্য বিষয়কে অবলম্বন ক'রে প্রকাশে পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়ে ওঠে। এর জন্য চাই সাধনা,

প্রয়াস। উৎসাহের উৎস থেকে শিল্পের সিদ্ধি, প্রকাশের পূর্ণতা, অনায়াস লব্ধ বা প্রাপ্ত কিছু নয়। শিল্পীর মন প্রকাশ-প্রকরণের নিষ্প্রাণ পথ নয় যে উৎসাহের স্বতঃস্ফূর্তিই শিল্পকর্মকে তার সিদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

স্টিফেন স্পেণ্ডার বলেন[২১] :

Inspiration is the beginning of a poem and it is also its final goal. It is the first idea which drops into the poet's mind and it is the final idea which he at last achieves in words. In between this start and this winning post there is the hard race, the sweat and toil.

প্রকাশের প্রকরণ যে সকল শিল্পীর ক্ষেত্রেই একরকম তা নয়। স্পেণ্ডারের মতো কেউ কেউ বলেন যে উৎসাহ প্রথম তাদের মনের আকাশে ভেসে আসে ভাবের একখণ্ড অস্পষ্ট মেঘের মতো; তারপর শিল্পসিদ্ধ অনুভবের প্রাবল্যে ও প্রয়াসে তা শব্দের সঙ্গীত বর্ষণের মতো ঝরতে থাকে। প্রয়াস ও যত্নের দিকটির উপরেই তাঁরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। সৃষ্টির জন্য শিল্পীকে সংহত, একাগ্র করতে হবে তার চেতনাকে। সৃষ্টি চেতনা অনায়াসে সংহত হয় না, কারণ তার মধ্যে বিপ্রতীপ টান, কেন্দ্রাতিগ বৈচিত্র্যের প্রবণতাও আছে। আত্মসমর্পণ না করে সেই প্রবণতাকেও অনুসরণ করতে হবে; সে-প্রবণতাকে পরে আবার সংহত ক'রে কেন্দ্রানুগও করতে হবে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বে পরিণামে শিল্পের চূড়ান্ত প্রকাশ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমগ্রসন্ধিতে এক,—ঐক্যে পূর্ণ। একথা বোধহয় পিকাসোর বিখ্যাত দেয়াল-চিত্র *Guernica* (১৯৩৭) সম্বন্ধেও খাটে। ফ্যাসিস্তদের বোমায় বিধ্বস্ত স্পেনের ছোট শহর গুয়েনিকার মৃত্যু-যন্ত্রণা, বেদনা, লাঞ্ছনা, প্রতিরোধ, আশা ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছুই সাতটি মূর্তির একটি চিত্রে তুলে ধরার পিছনে যে-কল্পনা, যত্ন, শ্রম রয়েছে তাকে শুধু উৎসাহ ও স্বতঃস্ফূর্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।[২২] মোজার্টের মতো আরেক জাতের শিল্পী আছেন যারা মনে করেন তাদের শিল্প-কীর্তি প্রকরণ-কর্মে প্রকাশ করতে, প্রস্ফুট করতে, সময় লাগলেও কীর্তিটি এক ঝলকেই প্রথমে মনের পটে দেখা দেয় : প্রকাশ করা হল অস্ফুটকে প্রস্ফুট করা, অস্পষ্ট প্রথম প্রাপ্তিকেই পরে স্পষ্ট পরম প্রাপ্তিরূপে পাওয়া।

প্রকাশ প্রকরণের ভেদ শুধু শিল্পী চরিত্রের জাতিভেদের জন্য নয়, অংশত শিল্পের জাতিভেদের জন্যও বটে। একটি গান বা গীতি কবিতায় শিল্পীর প্রকাশ-প্রকরণ যা হয় একটি উপন্যাস রচনায় বা চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তা হবার কথা নয়। শিল্পে জাতিভেদের কথা অস্বীকার ক'রে কেউ বলতে পারেন : "শিল্প-প্রকরণ সকল ক্ষেত্রেই এক ;

বৈচিত্র্যের মধ্যে নান্দনিক ঐক্যকে সৃষ্টি করা, প্রকাশ করা; প্রকাশ-পরিধি বড় হোক কিংবা ছোট হোক, উপন্যাস ও চলচ্চিত্র হোক কিংবা গীতিকবিতা হোক তাতে কিছু এসে যায় না,—পার্থক্য হয় না। "পঞ্চগ্রাম", "গণদেবতা"র ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর, "পথের পাঁচালী"র সত্যজিৎ রায় এবং "বাবরের প্রার্থনা"র কবি শঙ্খ ঘোষ কিংবা "প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই"র কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় শিল্প-প্রকরণে একই পথের পথিক।" আমার অবিশ্যি এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় না। বড় উপন্যাস, মহাকাব্য, বড় দেয়াল-চিত্র, নগর স্থাপত্য, গান, ছোট কবিতা প্রভৃতি শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত প্রকরণ এবং পরিণামের সমগ্রসন্ধি একই রকম,—এই কথা আমার মনে সায় দেয় না। মানুষের চেতনার মতো শিল্পীর চেতনাও দেহাশ্রিত এবং কতোগুলি সীমায় অল্পবিস্তর আবদ্ধ। তার কল্পনার শক্তি, সৃষ্টির প্রতিভা যতই অসামান্য হোক না কেন, একটি নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের উৎপত্তি থেকে বিকাশ, ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পূর্ণ প্রকাশ—সকল কিছুর রূপরেখা, অস্পষ্ট হলেও সমগ্র সন্ধিটিই, প্রথম থেকেই মনের পটে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব। বিশেষত উপন্যাস, মহাকাব্য কিংবা যে-রকম শিল্পের সামগ্রিক চরিত্র খুব জটিল, বহু রূপের সম ও বিষম সামঞ্জস্যে যার মধ্যে বিচিত্র ঐক্য প্রকাশ করতে হয়, তার প্রকরণ পর্বে পর্বে, কখন থেমে গিয়ে—ঠেকে গিয়ে আস্তে আস্তে, এগোয়,—কখনোই এক নিঃশ্বাসে ছুটে এসে জয়-সীমার সুতো বুকে ছুঁতে পারে না। প্রকাশ-প্রকরণের এই চরিত্র ক্রোচে-কলিংউডের প্রকাশবাদ-বিরোধী। কারণ, এক, প্রকাশ তাহলে একরকম আন্তর উদ্ভাস নয়, (ব্যাপক অর্থে) ভাষায় চিত্রকল্পের আমূল প্রকাশ হয় না। সৃষ্টিধর্মী (স্মৃতিধর্মী নয়) চিত্রকল্পকে যদি বোধি হিসেবে স্বীকারও করা হয়, তবু, জিজ্ঞাসা থেকে যায়: একটি জটিল ও বিচিত্র শিল্পকর্ম কোন একটি বোধির প্রকাশ হতে পারে কি?" সেই "প্রকাশ" আন্তর না কি বাহ্য সে-প্রশ্ন না তুলেই উত্তর বোধহয়: "না, হতে পারে না।" দুই, মাধ্যম-নিরপেক্ষ প্রকাশ কল্পনা করা যায় না। প্রকাশকে বোধির সমার্থক করলেও না। উপরন্তু পুরণো প্রশ্ন তো থেকেই যায়: প্রকাশকে বোধির সমার্থক মনে করা আদৌ উচিত হবে কি? চেতনা যখনি ভাষাশ্রয়ী হয় (রূপাশ্রয়ী তো হতেই হবে, তা না হলে আন্তর প্রকাশ বা উদ্ভাসও অসম্ভব) তখনি রূপময় হয়। রূপময় হওয়া, এক অর্থে, চেতনার পক্ষে প্রকাশ হতে না-পারা। তবু রূপের নিগড়ে নয় বোধিলক শিল্প (বা শিল্প-প্রকাশ) দেহাশ্রয়ী কল্পনা, অনুভব প্রভৃতির আকর্ষণেও কিছুটা আবদ্ধ। রূপের নিগড় মূলত প্রকাশের সহায়ক,—মুক্তির অনুকূলধর্মী: তবু, মূল চেতনাকে যদি নির্বিশেষ ও রূপহীন মনে করা হয় তাহলে রূপময় হওয়ার অর্থ ই স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া, নির্দিষ্ট হওয়া এবং খানিকটা মুক্তি হারানো। তুলনায় অনুভব বা কল্পনার মুক্তি সীমিত। যতোই

সলীল-সক্রিয়-স্বষ্টিশীল হোক না, অনুভব ও কল্পনা যা স্বষ্টি করতে চায়, প্রকাশ করতে চায়, তার আদি ও অন্ত একই সঙ্গে চেতনায় উপস্থাপন করতে পারে না। চেতনার ব্যক্তিস্বরূপই স্রষ্টা : ব্যক্তি-শিল্পীর চেতনাই স্বষ্টির উৎস ও প্রকরণ-নিয়ামক। নৈর্ব্যক্তিক চেতনা পরাতাত্ত্বিক ধারণামাত্র,—স্রষ্টা নয়। শিল্পী যতই প্রতিভাবান হোক না কেন শিল্পের জাতিভেদে শিল্প-প্রকরণ হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়, শিল্পের সমগ্র-সন্ধির জটিলতা, বৈচিত্র্য প্রভৃতিরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

প্রকাশ-প্রকরণের আদিপর্বে থাকে এক অনিবার্য আন্তর আকৃতি। দান্তে একে বলেছেন, অত্যুৎসাহ। প্লাতো বলেছেন, উন্মাদনা (*Phaedrus*, 245 ; *Ion* 534)। উন্মাদ, প্রেমিক এবং কবিকে কল্পনার শক্তিতে শেক্সপীয়র সমগোত্রীয় ব'লে উল্লেখ করেছেন (*Midsummer Night's Dream,* V, i)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি স্বভাবতই মনে আসে ঃ

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।

শিল্পীর সঙ্গে উন্মাদ, প্রেমিক বা সাধকের মিল কোথায় তা খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। উৎসাহ ও আস্পৃহা মানুষের মনকে জড়তা থেকে জাগ্রত করে, জাগ্রত মনে লাগিয়ে দেয় কল্পনার রূপ ও রঙ, ফুটিয়ে তোলে ভাষা। স্বষ্টির প্রেরণা ও উদ্দীপনা যখন প্রবল হয় তখন প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অনিবার্য প্রেরণা বা উদ্দীপনা ঠিক প্রেরণা বা উদ্দীপনা হিসেবে প্রকাশ করলে তা শিল্পের ধর্ম বা গৌরব মণ্ডিত হবে কি না তাতে সন্দেহ আছে। অদৃশ্য কোনো নিয়মে বা সংযমে প্রেরণাকে চালিত না করলে, উদ্দীপনাকে লক্ষ্যাভিমুখী না করলে প্রকাশ নিছকই প্রকাশ, দৃশ্য বা শ্রাব্য কোনো বস্তু, হবে—শিল্প হবে না। সুতরাং শিল্প-প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্তির ভূমিকা স্বীকার করলেও তাকে অত্যধিক প্রাধান্য দেবার কোন হেতু নেই। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনাকে অদৃশ্য আন্তর, সংযমের শৃঙ্খলায় প্রকাশ করতে হবে, মুক্ত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই শৃঙ্খলা বাইরে বন্ধন, অন্তরে মুক্তি। এই তো স্বষ্টি।

"প্রকাশ একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই···। ···আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব।"[২৩]

"সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিষের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম।"[২৪]

"তুমি মুক্তিকামী মুক্তি চাও? একটু একটু ক'রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি।"[২৫]

সৃষ্টির উদ্দীপনা যাতে বিনাশ না হ'য়ে প্রকাশ হয় তার জন্য সংযম পালন আবশ্যিক। এই সংযমই উদ্দীপনাকে অর্থহীন উচ্ছ্বাসের সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করে, সৃষ্টির মুক্তি পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্রষ্টার আকূতি, সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার উদ্বেল আকূতি। প্রকাশকে সার্থক করতে হলে প্রকাশককে তার উদ্বেলতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রকাশের এই আন্তর আকূতির উপর চিত্রশিল্পী ভাসিলি ক্যাণ্ডিন্স্কি খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই আকূতি সৃষ্টির জন্য শিল্পীর আত্মার স্পন্দনজাত। আন্তর আকূতি যে নৈর্ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি শিল্পীর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ,—ক্যাণ্ডিন্স্কি-র এই বক্তব্য আমি সমর্থন করি। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য : প্রত্যেক শিল্পী শুধু তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে নয় তাঁর যুগধর্মকেও প্রকাশ করেন। শিল্পী-সত্তা যে সমসাময়িক সমাজ (দেশ) ও ইতিহাস (কাল) দ্বারা প্রভাবিত হবে তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য স্বভাবতই শিল্পী যে-সমাজে যে-যুগে বাস করেন সেই সমাজের, সেই যুগের স্টাইলই অনুসরণ করবেন,—ক্যাণ্ডিন্স্কির এই ধারণার ভিত্তি নেই। হতে পারে যে সাধারণত শিল্পী প্রচলিত স্টাইল অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। শিল্পী স্টাইল উদ্ভাবনও করেন। শিল্পীরা যদি শুধু প্রচলিত স্টাইল অনুসরণ করতেন এবং নতুন স্টাইল উদ্ভাবন না করতেন তাহলে স্টাইলের বিবর্তন, নতুন স্টাইলের প্রচলন সম্ভব হয় কেমন করে? ক্যাণ্ডিন্স্কির মতে, শিল্পীমাত্রই শিল্পের সেবক এবং এই সেবা করতে গিয়ে শিল্পের চিরন্তনী উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বকে ও যুগকে যুক্ত করে দেন। এমনি ক'রে তিনি দেখাতে চান যে, শিল্পীর আন্তর আকূতি ও যুগধর্ম আসলে এক চিরন্তনী রহস্যময় অন্তঃপ্রবাহের অস্ফুট প্রকাশ। এবং এরই জন্য নাকি একটি নির্দিষ্ট যুগের শিল্পকর্ম সেই যুগের সীমিত চৌহদ্দির মধ্যে থেকে না-দেখে' পরবর্তী কালের উদার প্রাঙ্গণ থেকে ও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আরো অর্থপূর্ণ ব'লে মনে হয়। এই মনে হওয়া আসলে নতুন ভাষ্যও হতে পারে। একটি যুগকে পরবর্তী কালে যে একই রকম দেখা হয় বা হয়েছে তা তো নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী একটি যুগকে, তার শিল্পকর্মকে, বিভিন্নভাবে দেখেছে, ব্যাখ্যা করেছে। কারণ, ঐতিহাসিক অতীতকে আবিষ্কার করতে গিয়ে অংশত সৃষ্টিও করেন। তাঁর ব্যক্তি-সত্তার অনন্যতা থেকে তাঁর মুক্তি নেই; বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—যা'ই সে

বুঝবার ও কল্পনা করবার চেষ্টা করুন তাতে তাঁর দৃষ্টিকোণের ও মূল্যবোধের অনন্যতার রঙ লাগবেই, রোদ-ছায়া পড়বেই।' তাছাড়া ঐতিহাসিক বা শিল্পী যা বোঝবার বা কল্পনা করবার চেষ্টা করেন তা যে চিরন্তনী ও অখণ্ড কোনো কিছু তা বিশ্বাস করবার মতো পর্যাপ্ত যুক্তিও নেই। শিল্পের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নেই; শিল্পীর নিজের উদ্দেশ্য থাকতে পারে; সমাজ বা অন্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যকেও শিল্পী আপন উদ্দেশ্য ব'লে গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য দৈব বা অতিপ্রাকৃত উদ্দেশ্য মূলত বিশ্বাসের ব্যাপার, প্রমাণের নয়। বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করে, যা কিছু ঐতিহাসিক (স্টাইল বা আঙ্গিকের বিবর্তন), এবং যা কিছু ব্যক্তি মনের কথা (প্রকাশের আকৃতি বা প্রেরণা) তা সবই অতিপ্রাকৃত চিরন্তনী সত্তার কালিক প্রকাশ, ব্যক্তিসত্তা—এ ক্ষেত্রে শিল্পীসত্তা—প্রকাশের উপায় মাত্র। প্রকাশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেরণা এবং প্রভাবের বহির্ভূত যখন কোনো দৈব বা পরাতাত্ত্বিক উৎস সন্ধানের আমরা চেষ্টা করি বিশ্লেষণ করলে তখন দেখানো যায় যে, সেই চেষ্টার পিছনে রয়েছে কোন নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণায় আমাদের দীক্ষা বা বিশ্বাস। সমাজ ও ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে অতিপ্রাকৃত কোন "কারণ"কে প্রকাশের উৎস ব'লে বিশ্বাস করাকে সমাজ-ও ইতিহাস-আশ্রিত ধ্যান-ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যে-শিল্পী অদ্বৈত, হেগেল বা ইয়ুং-এর ধ্যান-ধারণায় আস্থাবান তার পক্ষে তার শিল্প-প্রেরণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অতি-প্রাকৃত সত্তার উল্লেখ করা খুব স্বাভাবিক। এই উল্লেখ থেকে শিল্প-প্রকাশে অতি-প্রাকৃতের ভূমিকা প্রমাণিত হয় না,—যা ব্যাখ্যা হয় তা হল সংশ্লিষ্ট শিল্পী কেন তার শিল্প-প্রকাশের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অতি-প্রাকৃত তত্ত্বের অবতারণা করলেন।

শিল্প-প্রকাশ শুধু একটি প্রকরণ বা পদ্ধতি নয়, তার পরিণামও আছে। বস্তুত পরিণামই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সেই ভিত্তিতে উপভোগ্য; প্রকরণ মূলত কল্পনা ও অনুমানে উপলব্ধ। প্রকাশ যেখানে পরিণাম স্বভাবতই তার গুণগুলি তখন সঞ্চারযোগ্য ও বিচারযোগ্য। প্রকরণের স্তরে শিল্পের প্রকাশ অসম্পূর্ণ; বড় জোর প্রকরণ তাই রসিকচিত্তে রসোদ্রেক করতে পারে, রসতৃপ্তি ঘটাতে পারে না। প্রকরণ থেকে পরিণামকে আমি একাধিক কারণে পৃথক ক'রে দেখতে চাই। এক, যা বলছিলাম, প্রকরণের স্তরে প্রকাশ মূলত (সম্পূর্ণত নয়) আন্তর, এবং তাই তাকে স্পষ্টভাবে বোঝা শক্ত; তাছাড়া যেটুকু বুঝি তা সন্দেহাতীত নয়। পরিণাম-প্রকাশকে তুলনায় অধিক বোঝা যায়; কিন্তু তা তার শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটির জন্য নয়। দুই, পরিণামের বুদ্ধি-বিচার ও কল্পনা-গ্রাহ্য রূপ, গুণ ও পর্ব থেকে প্রকরণের রূপ, গুণ ও পর্ব অনুমান ও কল্পনা করা যায়: কিন্তু বিপরীতক্রমে, প্রকরণের রূপ, গুণ ও পর্ব থেকে পরিণামে শিল্প-প্রকাশ কী হয়ে উঠবে তা অনুমান বা কল্পনা করা শক্ত। যে-শিল্প প্রকাশমান, নির্মীয়মান তার পরিণাম, চূড়ান্ত রূপ, কী করে

বলা যায়! যদি বলা যেত তাহলে প্রকাশবাদীদের একটি মূল তত্ত্ব, "বাহ্য প্রকাশের পূর্বে আন্তর প্রকাশেই শিল্প সিদ্ধ বা পূর্ণ", স্বীকার করাও যেত। আদি (বা উৎস), প্রকরণ (বা বিকাশ-প্রক্রিয়া) এবং অন্ত (বা পরিণাম)—শিল্প-প্রকাশের এই তিন প্রধান পর্বকে একটি তাৎক্ষণিক উদ্ভাস মনে করলে ভুল হবে। প্রকাশের প্রেরণা বা উদ্দীপনা যতই উন্মাদ হোক না কেন তার সাধন পর্ব (অন্তরে ও বাহিরে) যে সময়-সাপেক্ষ তা স্বীকার করতে হবে। বাইরের সাধন-পর্বকে নিছক কারুশিল্প, বাহ্যিক প্রতিবেদন এবং সেজন্যই গুরুত্বহীন বললেও ভুল হবে। পরিণামের দিকে প্রকাশের অগ্রগতি অনিবার্য নয়। অগ্রগতির হেতু শিল্পী-মনের আকূতি ও কল্পনা ; প্রকাশ যখন প্রকরণ পর্বে (প্রারব্ধ) তখন শিল্পীর সেই আকূতি সংযত, কল্পনা সার্থকতার সন্ধানে ঋতবদ্ধ ; এবং সেইজন্য প্রকাশের অগ্রগতি নিবার্য, গতির বেগ পরিবর্তনীয়, এমনকি, পরিণাম-চেতনার পশ্চাদ্-গতিও সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে, পরিণামকে প্রকাশের সঙ্গে একাত্ম করার জন্য, শিল্পে অংশগুলি ও উপকরণসমূহ যাতে সমগ্রসন্ধির মৌল চরিত্রকে না ক্ষুণ্ণ করে, প্রকরণ পর্বে প্রকাশের পশ্চাদ্‌গতি শুধু সম্ভব নয় কখনো কখনো নিতান্তই আবশ্যিক হয়ে ওঠে। প্রকাশ-প্রকরণের অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌গতি পরস্পর সম্পূরক ; সম্পূরণের স্তর কখনো কখনো একাধিকও হয়। প্রকরণের আদি ও অন্ত্য পর্বের মধ্যে যাতে বিষয়গত সামঞ্জস্য থাকে, সামগ্রিক সামঞ্জস্য যাতে অন্তর্গত বিষম সামঞ্জস্যে ক্ষুণ্ণ না হয়, সমগ্রের রস যাতে অংশের রসে বিকৃত বা লক্ষ্যচ্যুত না হয়, সমগ্রসন্ধির রূপ ও রস যাতে শিল্পীর আকূতি ও শিল্প-অনুভবকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারে···এই রকম পরস্পরসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রকাশ-প্রকরণের অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌গতির মধ্যে সৃজনশীল দ্বন্দ্ব চলে। অনেক শিল্প-কর্মের পরিজ্ঞাত ইতিহাস থেকে দেখানো যায় যে কীভাবে পুনর্ভাবনায় শিল্পী তার শিল্পের মূল রূপ-রেখা পরিবর্তন করছেন, মূল পরিকল্পনাকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় নতুন করে সাজাচ্ছেন, রঙের বিন্যাসে ও উজ্জ্বলতায়, প্রতিবেদিত বস্তুর আকৃতি ও আয়তনে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

পরিণাম একরকম পূর্ণতা, লক্ষ্যপূর্ণতা, উদ্দেশ্য সিদ্ধি। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। এক, শিল্পীর বা প্রকাশকের উদ্দেশ্য। তার উৎসাহ ও আস্পৃহা প্রকাশের উৎস। সেই উৎসাহ নিবৃত্ত হয় এবং আস্পৃহা চরিতার্থ হয় যখন তার শিল্প-প্রকরণ, প্রকাশ-পর্ব, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়। দুই, উদ্দেশ্য শুধু শিল্পী-মনের নয়, শিল্প-কর্মেরও বটে। যে-কোন শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীনিরপেক্ষ কিছু প্রতিশ্রুতি থাকে। অসম্পূর্ণ একটি শিল্পকর্মকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করা যায়, কিছু করা যায় না। শিল্পবিচার ও শিল্পের রসভোগ শিল্পী-মনের কথা।আক্ষরিকভাবে না

জেনেও যে করা যায় তাতে শিল্পের নিজস্ব চরিত্র বোঝা যায়। তাই সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলতে পারে "এই রকম না ক'রে ঐ রকম করলে শিল্পী যা করতে চেয়েছেন তা আরো সার্থকভাবে করা যেত।" শিল্পী যা করতে চেয়েছিলেন তা আরো সার্থক কীভাবে করা যায় তা সমালোচকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ; এই সম্ভাবনা শিল্পের পরিণাম-প্রতিশ্রুতি যে শিল্পেই থাকে তার পরোক্ষ প্রমাণ। সমালোচক এমনি ক'রে আরব্ধ কর্ম এগিয়ে নিতে পারে, সমালোচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি করতে পারে।

সমালোচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি করার তাৎপর্য একটি শিল্পকর্মের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ না-ও থাকতে পারে। সমালোচক রসভোক্তাও বটে। সৃষ্টিশীল সমালোচকেরা নিজেরাই স্রষ্টা, কথনো সৃষ্টি করার মৌল প্রেরণায় সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে, কথনো-বা সমালোচকের মৌল ভূমিকা পালন ক'রেই সৃষ্টি করে। অতীতে দেখা গেছে মহৎ শিল্পীর সার্থক শিল্প-কীর্তিকে কেন্দ্র ক'রে যে প্রশংসা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে তাতে যেমন নির্দিষ্ট শিল্প-ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্যের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে তেমনি আরেকটি ঐতিহ্যের সূত্রপাতও সূচিত হয়েছে। একটি শিল্প-কীর্তির পরিণাম তাই কথনো কথনো যুগান্তকারী ব'লে চিহ্নিত হয়। এটা অবশ্য চিহ্নই ; তার অধিক কিছু নয় ; একে আক্ষরিক অর্থে নেবার প্রয়োজন নেই। তবে মনে রাখা উচিত মহৎ শিল্প-কীর্তির প্রেরণা একটি পরিণাম সৃষ্টিতেই নিঃশেষ হয় না, অনেককে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ঐতিহ্য সৃষ্টির বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রথম সারিতে আসন অধিকার করে নেয়।

প্রকাশে পরিণামেও সমাপ্ত নয়, যদি "পরিণাম" বলতে শিল্পী যে শিল্পকর্মটুকু সম্পন্ন করল তা'ই শুধু বুঝি। বিষয় রূপে শিল্প পরিণামের অধিক কিছু। শিল্পকে পরিণাম বলি প্রকরণের চূড়ান্ত পর্ব ব'লে। যা শেষ তা'ই সমাপ্ত নয়। প্রকরণ যেখানে শেষ হল, শিল্প সৃষ্টির অন্ত্য-পর্ব, সেখানেই শিল্পী তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল ভাবলে ভুল হবে। অন্ত্য-পর্বে শিল্প রসিক সমাজে পরিবেশিত হল ; তার আবেদন পর্বের উদ্বোধন হল—সঞ্চার সার্থক হবার যোগ্যতা অর্জন করল। রসিকের আস্বাদন ও সমালোচনা করবার বিষয়রূপে শিল্প যখন যোগ্য হল তখন নিশ্চয়ই তার একটি নিজস্ব চরিত্র রয়েছে, কতোগুলি গুণ রয়েছে ; এবং শিল্পের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কথা হল : শিল্প-প্রকাশ একটি গভীর অর্থে শিল্পীর অনুভব ও আবেগকে রসিক-সমাজে সঞ্চারের প্রয়াস-মথিত। প্রকাশ অঘোষিত (কিন্তু শিল্পী-মনে পরিজ্ঞাত) রসিক-সমাজের উদ্দেশে নিবেদিত। এই নিবেদন সঞ্চারের আকাঙ্ক্ষায়। নিজের সৃষ্টি সার্থক অন্ত্য-পর্বে শিল্পীর পক্ষে আনন্দদায়ক। প্রকাশ ক'রে শিল্পী তার অনুভব-আবেগের ভার থেকে মুক্ত হয়, লঘু হয়। রূপের স্পষ্টতায় শিল্প যখন প্রকাশমান শিল্পীর আনন্দযজ্ঞে তখন

আহুতি পড়ছে, চেতনায় আনন্দ তখন দীপ্যমান। নিজের অন্তরে প্রকাশ করা ও আনন্দ পাওয়া এবং অন্যের কাছে প্রকাশ ক'রে তার অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করা মূলত এক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একাত্ম দু'ই দিক।

বিশ্লেষণের জন্য অবশ্য প্রকরণের সকল পর্বকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং সেইজন্যই বিষয় পর্বকেও পরিণাম পর্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক'রে দেখা ও দেখানো সম্ভব। বিশ্লেষণাত্মক এই মনোভাব প্রায়োগিক,—প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। নান্দনিক কোনো বস্তু প্রকাশ করার পর্বগুলি একই সঙ্গে শিল্পী-চেতনায় সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না, এ কথা যেমনি সত্যি তেমনি সত্যি প্রকাশের সামগ্রিক চরিত্রটি।

প্রকাশের দুই দিক ॥

শুদ্ধ-মুক্ত এবং বাস্তবিক-প্রায়োগিক। প্রকাশবাদীদের কেউ কেউ, যেমন ক্রোচে ও কলিংউড, প্রকাশের শুদ্ধ-মুক্ত দিকটিকেই কেবল নান্দনিক বলতে রাজী। বাস্তবিক-প্রায়োগিক দিকটিকে প্রকাশের শুদ্ধ মুক্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করেন। তাঁরা একে নৈতিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্য কিছুর মর্যাদা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যার উদ্ভব ইচ্ছা থেকে, যা কর্মের প্রস্তুতি, যা কোন প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে তাড়িত তাকে এঁরা নান্দনিকের স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। প্রকাশের প্রয়োগ প্রকাশ নয়। শিল্পের প্রয়োগ শিল্প নয়, তার বহির্ভূত কিছু।

আন্তরবাদীদের এই বক্তব্য প্রকাশবাদীদের অন্য তরফ, টলস্টয় ও স্যান্টায়ানা প্রমুখরা, মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, প্রকাশ শুধু সৃষ্টির তাগিদে নয়, সঞ্চারের তাগিদেও বটে। সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে সঞ্চারের আনন্দও শিল্পীকে প্রেরণা যোগায়। সঞ্চারের তাগিদ যদি হয় ব্যবহারিক এবং যা ব্যবহারিক তা যদি হয় শিল্পের কৌলীন্যভ্রষ্ট তাহলে কৌলীন্যসহ শিল্প-প্রকাশ অসম্ভব দায়। নৈতিক মূল্য মূলত ব্যবহারিক। শিল্প শুধু নান্দনিক মূল্যেই সমৃদ্ধ নয় তার মধ্যে নৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির প্রেরণাও উপস্থিত। এবং এ কথা ভাবা ভুল হবে যে, নৈতিক লক্ষ্যসাধনা শিল্পীর নান্দনিক সাধনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু। যে আকৃতিতে শিল্পের প্রকাশ ঘটে সেই আকৃতিই নীতিবোধের নিয়ামক। শিল্পী শুধু যা সুন্দর তা'ই সৃষ্টি করেন না যা মূল্যবান—শিল্পীর দৃষ্টিতে নিজের জন্য ও অপরের জন্য মূল্যবান—তা'ও সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি স্বভাবতই ভিন্ন হবে তা নয়। কখনো কখনো মহৎ শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা সমাজহিত, মানুষের প্রতি শিল্পীর অনুভূত মৈত্রী ও প্রেম, কিন্তু এই প্রেরণা বাস্তবিক বা ব্যবহারিক ব'লে এর নান্দনিক প্রেরণা ও মূল্য নেই এমনটি ভাববার কারণ নেই। এক কথায়, অনেক ক্ষেত্রে—যেমন টলস্টয়ের নিজের ক্ষেত্রেই—

তার আত্মপ্রকাশের পথ ও পরিণাম দুই-ই জানে। পথের ঠিকানা, সরলতা-বক্রতা, উৎড়াই-থাড়াই এবং পরিণামের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রায়োগিক চেতনাই যোগায়। শিল্প-প্রকাশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, অসম্পূর্ণতার চেতনা শিল্পীকে অন্তর-লোক থেকে বাহিরলোকে নিয়ে আসে। বাহ্য প্রকাশেও শিল্পী সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয়। যা সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে রসিক সমাজে পরিবেশন করল তা কাঙ্ক্ষিত জনেরা কাঙ্ক্ষিতভাবে আস্বাদন করল কি না, অর্থাৎ শিল্পী যা সৃষ্টি করল তা সঞ্চারে সে সার্থক হল কি না, এ ভাবনা শিল্প-প্রকাশের আকৃতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

এখানেই ভেরোঁ, টলস্টয় ও স্যান্টায়ানার সঙ্গে ক্রোচে ও কলিংউডদের মৌল পার্থক্য। সৃষ্টির আকৃতি ও সঞ্চারের আকৃতি অন্তরে অভিন্ন,—বাহিরে বিশ্লেষণে যদিচ তাদের পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। সঞ্চার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বহির্ভূত এবং অ-নান্দনিক,—ক্রোচের এই মত মেনে নেওয়া কঠিন। টলস্টয় ও স্যান্টায়ানার নন্দনতত্ত্বের উপর লেখা বই দুটিই প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ এবং ক্রোচের বইটি ১৯০১ সালে। ক্রোচের বইতে ভেরোঁ ও টলস্টয়ের উল্লেখ ও সমালোচনা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ক্রোচে নান্দনিক ও প্রায়োগিকের ভেদ দেখাতে গিয়ে শিল্প-প্রকাশে সঞ্চারের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেন নি।

মানুষের আবেগ তার চেতনায় কোনো কিছু অনুভূত অভাবের তরঙ্গ। প্রত্যেক মানুষই শান্ত ও সীমিত; কোনো না কোনো কিছুর অভাব তার থাকবেই। কিন্তু সকল অভাব সে অনুভব করে না। অভাবের অনুভব চাহিদার সঙ্গে জড়িত। যা সে চায় তা যতক্ষণ পর্যন্ত সে না পায় তার চাহিদা সে অনুভব করে। অনুভূত অভাবের চাহিদা মূল্যবোধেরও সঙ্কেত। শিল্পী যখন প্রকাশ করে তখন সে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করে। এই তাগিদ কোনো এক চাহিদা পূরণের তাগিদ। প্রকাশের আবেগ অপ্রকাশের বেদনা ও ও চঞ্চলতা দূর করবার ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার বেদনা ও আন্দোলন দূর হয়, অভাবের বোধ থেকে মুক্তি মেলে এবং কাঙ্ক্ষিত মূল্য প্রাপ্তির আনন্দলাভ ঘটে। একটি বিশেষ সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রকাশকর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পী যা লাভ করে তা নিয়ে তার সকল সময়ের সকল অভাব মেটে না; এমন-কি ঐ বিশেষ সময়েরও সকল অভাব মেটে না; কারণ, ঐ নির্দিষ্ট শিল্পকর্মকে ঘিরে শিল্পীর চাহিদা শুধু অপ্রকাশকে প্রকাশ করার নয়,—যা প্রকাশ করা গেল তা কাঙ্ক্ষিত জনের মনে সঞ্চার করা গেল কি না তার চাহিদাও বটে। যদি অন্তঃপ্রকাশেই শিল্পীর ইচ্ছা পূর্ণ হত তাহলে বহিঃপ্রকাশ কেন? বহিঃপ্রকাশেই বা শিল্পী ক্ষান্ত ও শান্ত নয় কেন? কেন সে রসিক সমাজের প্রতিক্রিয়া জানতে চায়, স্বীকৃতি পেতে চায়? কারন সে মূল্যের

সন্ধানী। সে পরশপাথর খুঁজছে না ; সে যে পাথর পেয়েছে, যা দিয়ে সে সৃষ্টি করছে, তা পরশপাথর কি না সে-কথা সে জহুরীদের মুখ থেকে শুনতে চায়। মূল্যের সন্ধানে সে জহুরীদের আশ্বাস চায়, বিচার শুনতে চায়। মূল্যের সন্ধান করতে গিয়ে শিল্পীকে প্রথম অন্তর থেকে বাইরে আসতে হয়। পল ভ্যালেরি বলেন, চিত্রকর সর্ব অঙ্গ দিয়ে চিত্র অঙ্কন করেন, পৃথিবীকে চিত্রে রূপান্তরিত করেন। শরীরে পৃথিবীর রঙ-রূপ-রস যে আনন্দ ঢেউ তোলে তার আন্দোলনে শিল্পীর দেহতট উদ্বেল। দেহের বেগ মনে আবেগ হয়ে দেখা দেয়।

আবেগ একদিকে অনুভাবাতুর, অন্যদিকে ইচ্ছাকুল। আবেগ আত্ম-সংবৃত বা আত্ম-সমাহিত নয়। আমি যখন কিছু অনুভব করি তখন আমার মন মূলত আমার চেতনাকে ঘিরেই সক্রিয়। চেতনা সক্রিয় হয় কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে। আমি চেতনাকেও চেতনার বিষয় করতে পারি। বহির্জগতের কোনো বস্তুকে যখন বিষয় হিসেবে অনুভব করি তখন চেতনা যতটা অন্তর্মুখী তার থেকে বেশী অন্তর্মুখী হয় যখন বিষয়টি নিজেই চেতনা। অন্তর্মুখিতায় স্তরভেদ আছে ; অনুধ্যানে তা স্পষ্ট। চেতনা তো শুদ্ধ বা নিরালম্ব নয় ; দেহকে ভিত্তি ক'রেই চেতনা। অন্তর্মুখিতার "গভীর" স্তরেও ("গভীরতম" স্তর বলে নির্দিষ্ট কোনো স্তর নেই) দেহ-ভিত্তিকতা চেতনাকে একটি সক্রিয় বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। বিষয়মুখী ও অন্তর্মুখী (কিংবা বিষয়ীমুখী) চেতনার মধ্যে স্তরভেদ আছে, মৌলিক কোন প্রকারভেদ নেই।

দেহী হবার দায় অভাব-বোধ। দেহ একদিকে যেমন আমাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, ব্যক্তিত্বের একটি মৌল উপাদান হয়, অন্যদিকে দেহ আমাকে জগৎ থেকে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। যে-জগৎ থেকে ও যে-সমাজ থেকে দেহ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই জগৎ ও সেই সমাজের প্রতি আমি আকর্ষণ অনুভব করি। জগতের ও সমাজের অভাব আমি অনুভব করি। অভাব অনুধ্যান করি, করতে বাধ্য হই। অভাবের "উৎস" সন্ধান করতে গিয়ে বিষয়কে স্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্টতরভাবে, অনুভব করি। বিষয় যখন চেতনায় স্পষ্ট হতে থাকে তার প্রতি আকর্ষণও অনুভবে স্পষ্টতর ও চঞ্চুমান হতে থাকে। বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন চেতনা অনুভবের অভাববোধকে অনুসরণ ক'রে বিষয়টিকে পেতে চায়। অনুভবের এই "চাই"-চরিত্রটি, চাহিদা-বোধটি, দেহে-মনে আবেগ জাগায়।

অভাব-বোধটি নিছক অভাব-বোধই নয় মূল্য-বোধও বটে। এই অভাব-বোধটি দেহ-ভিত্তিক বটে,—দেহসর্বস্ব নয়। মানুষের পক্ষে দেহ-সর্বস্ব অভাব-বোধ প্রায় অসম্ভব ; মূল্য-বোধ অভাব-বোধের সঙ্গে একাত্ম। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দেহসর্বস্ব (অবশ্যই উল্লিখিত

সীমিত অর্থে) ; প্রেম ও ঘৃণা দেহভিত্তিক ; প্রেম ও ঘৃণার স্তরভেদে তাদের দেহ-ভিত্তিকতার তারতম্য ঘটে। আবেগমাত্রেই অনুভবের, সুখ বা দুঃখের, রোদ-ছায়া পড়ে। অনুভব আবেগে দানা বাঁধে ; আবেগ অনুভবকে প্রকাশযোগ্যতার গুণ যোগায়, প্রকাশোন্মুখ করে। শিল্পী তার আবেগকে নিজস্ব করতে চায়। আবেগে অভিভূত না-হয়ে তাকে নিজস্ব করতে হলে তাকে রূপে বাঁধতে হয়, সে-বাঁধন ভাষার (সাহিত্যের) হতে পারে, রঙ-রেখার (চিত্রশিল্পের) বা অন্য কোনো রকমেরও হতে পারে। আবেগকে রূপময় প্রকাশে রূপান্তরিত করতে গিয়ে শিল্পীকে একপ্রকার দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয় ; যে-আবেগ তাকে মথিত বা উদ্বেল করে সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজস্ব করে,—ক'রে একপ্রকার মুক্তি অর্জন করে ; এবং এই মুক্তি যাতে আবার নিরঙ্কুশ ও নৈর্ব্যক্তিক না হয়ে যায়, অর্থাৎ শিল্পীর আবেগ যে তার নিজস্ব সেই নিজস্বতার চরিত্রটুকু যাতে সে না হারায়, তা-ও সে দেখে। অনুভবে যা অস্পষ্ট, আবেগে যা কিছুটা স্পষ্ট, তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রকাশ পর্যায়ে। এখানেও উন্নততর স্তরে শিল্পীকে আবার দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে হয়। যা সে প্রকাশ করতে চায় একদিকে সে তা রসিক সমাজে সঞ্চার করতে চায়, যা তার প্রকাশ তা অন্যের কাছেও সার্থক নান্দনিক প্রকাশ ব'লে স্বীকৃত হোক, এবং অন্যদিকে সে চায় তার প্রকাশে তার নিজস্ব চরিত্রটি (বা স্টাইলটি) বজায় থাকুক ও সে-ভাবেই তা স্বীকৃত হোক। এখানেও ব্যক্তিত্ব ও মুক্তির সৃজনশীল দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত ও সক্রিয়। ভেরোঁ (১৮২৫-১৮৮৯) বলেন :

"...art is the manifestation of emotion, obtaining external interpretation, now by expressive arrangements of line, form or colour, now by a series of gestures, sounds, or words governed by particular rhythmical cadence."

"A work is beautiful when it bears strong marks of the individuality of its author, of the permanent personality of the artist, and of the more or less accidental impression produced upon him by the sight of the object or event rendered."

"Style, which is a simple reflection of the artist's personality, is naturally found in the work of every artist who possesses any personality...the assemblage of qualities, the conditions of being and temperament which caused Rubens to see things differently from Rembrandt."[২৬]

ভেরোঁ যে আবেগের বহিঃপ্রকাশের কথা বলেছেন তা ক্রোচের মতে কারুশিল্প। আমি তাকে শিল্পই বলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলি যে তা নিছক বহিঃপ্রকাশ নয়,—অন্তঃপ্রকাশও বটে। রূপে-রঙে-শব্দে—যে-ভাষাতেই কিছু প্রকাশ করি না কেন—বহিঃপ্রকাশের পূর্বে তার প্রস্তুতি অন্তঃপ্রকাশেও উপস্থিত। যখন কিছু উচ্চারণ করি, লিখি বা আঁকি তখনি তা সৃষ্টি হল,—বহিঃপ্রকাশের এই অর্থকে না বলা যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, না স্বীকার করা যায় শিল্প ব'লে। শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ স্ব-গুণে শিল্প নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ শুধু প্রমাণ নয়, প্রকাশ-প্রকরণের পরিণামও বটে, এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চরিত্রটি প্রস্ফুট হবার আগে তার অন্য একটি অনুভবগ্রাহ্য পরিচয় আছে। শিল্পরূপের অনুভবগ্রাহ্য দিকটি যে শিল্পীর চেতনায় বহিঃপ্রকাশের পূর্বে অবশ্যই উপস্থিত হয় তা প্রমাণের অভাবে অস্বীকার করলে এই তর্কও তোলা যায় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি যে অনুভবগ্রাহ্য হবেই তার নিশ্চয়তা কী। শিল্পকর্ম যে অরসিকের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও শিল্প ব'লে স্বীকৃত হয়নি, এমন হাজারো প্রমাণ আছে। এ-কথা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত টানেন যে বহিঃপ্রকাশের মূল্য খুব গৌণ তা হলে ভুল হবে। অন্তঃপ্রকাশের পূর্ণতার জন্য বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজন গভীর। প্রয়োজনের এই দিকটিকে বাস্তবিক বা প্রায়োগিক ব'লে ছোট ক'রে দেখা ভুল হবে। এই দিকটিই শিল্প সঞ্চারের ভিত্তি, শিল্পীর আত্ম (চরিত্র) প্রকাশের উপায়।

শিল্প এক প্রকার আত্মপ্রকাশ হলেও বিচারের ও সঞ্চারের বিষয় হিসেবে শিল্পীর আত্মচরিত্র থেকে তা স্বতন্ত্র। শিল্পের স্টাইল শিল্পী : জীবনের উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হলেও তার স্বাতন্ত্র্য যে থাকতে পারে ও থাকে তার ব্যাখ্যা অলভ্য নয়। শিল্পীর চরিত্র যে কীভাবে শিল্পে প্রকাশিত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়ম নেই। শিল্পীর স্বাধীনতা, তার কল্পনার স্বাধীনতা, নানাভাবেই প্রভাবিত করতে পারে। প্রকাশিত হবার পরে বিচারের বিষয় হিসেবে শিল্পকর্ম অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয় এবং যার ফলে যে-বিচারক শিল্পীর আত্মজীবনী ও অন্তর্জগতের কথা জানে না সে-ও তার শিল্পকর্মের বিচার করতে সক্ষম। এর কারণ নির্ণয় করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। প্রথমত, যা দিয়ে শিল্পের বহিঃপ্রকাশ সম্ভব করা হয়, অর্থাৎ যে-সব উপকরণ ও উপাদান ছাড়া শিল্পকর্মকে অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায় না—যেমন, কালি-কলমের আঁচড়, তুলির টান, গলার বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, শরীরের অঙ্গভঙ্গি—তা সামাজিক, নিয়ম অনুসারে ব্যবহার্য (যে নিয়ম জানবে সে-ই ব্যবহার করবে) বস্তুধর্মী এবং সে-জন্য স্থির ও সর্বজনগ্রাহ্য। দ্বিতীয়ত, বস্তুধর্মিতা ছাড়াও প্রকাশের জন্য ব্যবহার্য উপকরণ ও উপাদানগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাকে বলা যায় প্রতীকধর্মিতা। বস্তুধর্ম

মূলত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং প্রতীকধর্ম মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য ও কল্পনাগ্রাহ্য। শব্দপুঞ্জ দিয়ে যে বাক্য হয় তার বাক্যার্থ ব্যাকরণের নিয়ম জানলেই বোঝা যায়। কিন্তু কবি ও সাহিত্যিকদের রচিত রসময় ও অর্থঘন এমন অনেক বাক্য আছে যার অর্থ বোঝবার জন্য শুধু ব্যাকরণের নিয়ম-জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তুলির টান ও স্বরের টানেরও প্রতীকধর্মী অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনা বোঝবার জন্য উচ্চতর, সূক্ষ্মতর এবং আরো বিচিত্র ভাষার ব্যাকরণ ও তার নিয়মাবলী জানা দরকার। এই দ্বিতীয় স্তরের ভাষা, ব্যাকরণ ও তার নিয়মাবলীকে বৈচিত্র্য, সৌকুমার্য ও অন্যান্য কারণে হয়তো পঙ্ক্তীভুক্ত ও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ও ব্যবহার অনস্বীকার্য। তাদের অভাবে রসিক সমাজে শিল্পের ভাষা ব্যবহার ও সেই ভাষায় সঞ্চার, উপভোগ ও সমালোচনা অসম্ভব হত। উল্লিখিত দুই স্তরে, সাধারণ নিয়মানুসরণের মধ্য দিয়ে শিল্পীর আত্মচরিত্র ও তার শিল্পকর্মের মধ্যে প্রকাশ ও অপ্রকাশের একটি দ্বি-মাত্রিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। শিল্পকর্মে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটে,—একথা যেমন সত্য, শিল্পীর চরিত্র বাদ দিয়েও শিল্পের নিজস্ব একটি চরিত্র প্রকাশিত হয়,—একথাও তেমনি সত্য।

শিল্পী আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজে হাল্কা হয়, মুক্ত হয় এবং তৃপ্তি লাভ করে। যা সে প্রকাশ করে তা—অর্থাৎ তার শিল্পকীর্তি—তাকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে, লোকসমক্ষে উপস্থাপন করে, একপ্রকার স্থায়িত্ব দেয়। শিল্পকীর্তি তার অন্তরের সঙ্গে অন্যের সেতু-বন্ধনের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ একে মূলত বুদ্ধি-নির্ভর মনে করে। কেউ কেউ একে মূলত অনুভব-নির্ভর মনে করে। ভেরোঁর মতো টলস্টয়ও এই সঞ্চারের ভাষাকে অনুভব-নির্ভর মনে করেন। টলস্টয়ের ভাষায় :[২৭]

"Speech transmitting the thoughts and experiences of men serves as a means of union among them, and art serves a similar purpose. The peculiarity of this latter means of intercourse by means of words, consists in this, that whereas by words a man transmits his thoughts to another, by art he transmits his feelings."

"The activity of art is based on the fact that a man receiving through his sense of hearing or sight another man's expression of feeling, is capable of experiencing the emotion which moved the man who expressed it"......

"And it is on this capacity of man to receive another man's expression of feeling and to experience those feelings himself, that the activity of art is based."

টলস্টয়ের মতে শুধু অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গে বহিঃপ্রকাশ নয়, বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে অন্যের মনে অনুরূপ অনুভব জাগানো শিল্প-প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অভিমুখ বা উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অংশত প্রায়োগিক হলেও তাতে নান্দনিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং বর্ধিত হয়। সার্থক সঞ্চারে প্রকাশের প্রভাব-পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। এই প্রকরণ বড় সহজ-সরল নয়। ধ্যান-ধারণা সঞ্চার করা তুলনায় সহজ। অঙ্ক শেখানো সহজ, কিন্তু শিল্পকর্ম শেখানো সহজ নয়। কিছু ধ্যান-ধারণা আছে যা বই পড়ে শেখা যায়; কিছু ধ্যান-ধারণা আছে যা গুরুগম্য, শিক্ষকের কাছে গিয়ে না শিখলে সম্পূর্ণ হয় না; আর কিছু প্রতিভা ও নৈপুণ্যের ব্যাপার আছে যা শিল্পীর অন্তর থেকে মূলত উৎসারিত না হলে পুস্তক বা শিক্ষক তা যোগাতে পারে না। এর কারণ, যা অমূর্ত—অপেক্ষাকৃত অমূর্ত—তা অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রয়োগ-সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলিও সাধারণ ও ব্যাপক; সে-জন্য তাদের প্রয়োগ-পদ্ধতি সরল ও বাস্তব প্রয়োগ সহজ। প্রতিভার বা কল্পনার সৃষ্টি, যা অনুভবলব্ধ এবং যে-আকৃতিতে শিল্পকর্মের সৌকুমার্য নিহিত তার "নিয়ম" অসম্ভব জটিল ও বিচিত্র এবং তাদের প্রয়োগ-কৌশল শেখানো যায় না বললেই চলে,—অর্জন করতে হয় যত্নে ও চেষ্টায়। এই কথাগুলি সবই অল্পাধিক আপেক্ষিক। প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যেহেতু অল্পাধিক শিল্পরস আছে তার পক্ষে সেহেতু সূক্ষ্মতা ও জটিলতা সত্ত্বেও অন্যের শিল্প-প্রকাশ উপভোগ করা, সমালোচনা করা ও সমালোচনাচ্ছলে সৃষ্টি করা সম্ভব।

একের চিন্তা অপরকে বোঝানো তেমন কঠিন নয়। "তেমন কঠিন নয়" বলছি এই জন্য যে চিন্তার বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে এবং যে-ভাষায় সেই চিন্তা প্রকাশিত তা মোটামুটি জানা থাকলে একের চিন্তা অনেকে জানতে পারে। শিল্প সঞ্চারের ক্ষেত্রে "জানা" ব্যাপারটির ভূমিকা গৌণ। শিল্পরস উপলব্ধির জন্য শিল্প-জ্ঞানের তুলনায় বেশি আবশ্যক শিল্পবোধ। তাছাড়া, যা আগেই উল্লেখ করেছি, শিল্পের ভাষা বড় বিচিত্র। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তার ভাষা, যা প্রকাশ করতে চাওয়া হচ্ছে তার ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সার্থকতা··· সব কিছু মিলিয়ে শিল্পের মধ্য দিয়ে শিল্পী যে-ভাবে প্রকাশিত, তার যে "বক্তব্য" প্রকাশিত, চিন্তা প্রকাশের জন্য আবশ্যিক ছকে তা বাঁধা বড় শক্ত, প্রায় অসম্ভব। আমি "প্রায় অসম্ভব" বলব "সম্পূর্ণ অসম্ভব" বলব না। কারণ চিন্তার রূপ বিচিত্র, সূক্ষ্ম, সুকুমার ও নমনীয় রূপে শিল্পে অনুস্যূত। তা না হলে ভাষা ও অন্ধ অনুভবের মধ্যে পার্থক্য করা যেত না, একের অনুভব অন্যের সহানুভবের যোগ্য করে তোলা যেত না। ভাষায় শুধু ভাব প্রকাশিত নয়, অনুভবও। চিন্তার সঞ্চার এক-মাত্রিক; ব্যবহৃত ধারণাগুলির অর্থ নির্দিষ্ট থাকায় এবং সংজ্ঞা ও পূর্ব-প্রকল্পগুলি অনুচ্চারিত হলেও সুবিদিত হওয়ায় বক্তার বক্তব্য শ্রোতার বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না। শ্রোতা, পাঠক বা দর্শকের শুধু সংশ্লিষ্ট

ধারণা, সংজ্ঞা, পূর্ব-প্রকল্প এবং, বলাবাহুল্য, ভাষার সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় থাকা আবশ্যক। শিল্পের সঞ্চার বহুমাত্রিক। শিল্পী শ্রোতা বা দর্শককে চিন্তার মতো স্পষ্ট কিছু দিতে পারে না, চিন্তার স্পষ্টতা অমূর্ত, একমাত্রিক। শ্রোতা বা দর্শকের অন্তরে শিল্পী সঞ্চার করে এক ভিন্ন ধরণের স্পষ্টতা; তাতে রসিকের শুধু বুদ্ধির জাগরণ ঘটে না,—তাতে তার দেহ-প্রাণ-মন জুড়ে রসানুভবের একটি অনির্বচনীয় উদ্বোধন হয়। শ্রোতা বা দর্শককে শিল্পী শুধু বোঝবার সীমিত লক্ষ্যে এগোবার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত হয় না; সে রসিককে আমন্ত্রণ করে রসতীর্থে শিল্পীর সাযুজ্যে অবগাহন করতে, দেহে-প্রাণে-মনে অভিসিক্ত হতে। রসিককে একটি বা দুটি চিন্তার কথা শুনিয়ে শিল্পী কখনো তৃপ্ত হয় না; সে চায় রসিককে তার নন্দনলোকের পূর্ণ নাগরিক করতে। শুনিয়ে বা দেখিয়ে যা বোঝানো যায় না, অধিবাসী ক'রে তা অনুভব করানো যায়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য তার শিল্পলোকের আকাশে-বাতাসে-মাটিতে মিশে থাকে। চিন্তার জগতে ব্যক্তির অনুপস্থিতি ভাবতে কোন অসুবিধা নেই। চিন্তা অনেকাংশেই নৈর্ব্যক্তিক, শিল্প কখনো তা পূর্ণত নয়। বিজ্ঞানের জগৎ বিজ্ঞানীকে বাদ দিয়ে বোঝা যায়। বিজ্ঞানের ভাষা—গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, রাশিবিজ্ঞান—বিজ্ঞানকে সত্যিই উল্লেখযোগ্য নৈর্ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য দেয়; দার্শনিকও এ-দাবী খানিকটা করতে পারে; "খানিকটা" বলছি এইজন্য যে তার ব্যবহৃত ধারণাগুলিকে বীজগণিত বা প্রতীকী ন্যায়ের পরিমাণগত ভাষায় খানিকটা প্রকাশ করা যায় মাত্র। শুধু বিজ্ঞান বা দর্শনের ক্ষেত্রেই নয় সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চিন্তার অমূর্ত প্রকাশ বা সূত্রগুলিকে যখনি বাস্তব প্রয়োগের জন্য ব্যাখ্যা করতে হয়, বহির্জগতের মূর্ত বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করতে হয়, তখনি তাদের নৈর্ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যের সীমিত চরিত্র ধরা পড়ে, উন্মোচিত হয় বিজ্ঞানের পশ্চাদ্‌পটে বিজ্ঞানীর ও দর্শন-চিন্তার পশ্চাদ্‌পটে দার্শনিকের ব্যক্তিসত্তার ভূমিকা। এই দিক থেকে বিচার করলে শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক অনেক নিবিড়; বিশ্লেষণের জন্য শিল্পকে শিল্পীর মনোজগৎ ও ব্যক্তিসত্তা থেকে নিশ্চয়ই পৃথক ক'রে দেখা যায়; কিন্তু শিল্পের ভাষায়ই এই রকম যে তা মূলত শিল্পীকে প্রকাশ করার জন্য, গোপন করার জন্য নয়। ভেরোঁর ভাষায়ঃ

"Get some one who *can* read, to read a page of Demosthenes *and* of Cicero, of Bossuet and of Massilon, of Corneilla and of Racine, of La Martine and of Victor Hugo. However slight may be your literary perceptions, you will at once notice that no two of them sound the same. Apart from the subjects or ideas, which may be identical, each one has an air, an accent, which can never

either be confounded or replaced. In some of them we find elegance, finesse, grace, the most seductive and soothing harmony ; in others, a force and *elan* like the sound of a trumpet, enough to awaken the Seven Sleepers."

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তার অনন্যতা, তাকে অন্য সাধারণ শ্রোতা বা দর্শক থেকে পৃথক করে। সে তার বিষয়কে এমনভাবে দেখতে পারে, শুনতে পারে, অনুভব করতে পারে যে সংশ্লিষ্ট বিষয় তার অনন্যতা শুধু শিল্পীর কাছেই উন্মোচন করে। শিল্পীর দিক থেকে বললে, সে-ই শুধু পারে শিল্প-বিষয়ের অবগুণ্ঠন লুণ্ঠন করতে। বিষয়কে যখন শিল্পী সুকুমারভাবে অনুভব করে তখন তাকে সম্যকভাবে নিজের সর্বসত্তায় উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে ; উপলব্ধি ও প্রচেষ্টার যুগ্ম শ্রুতিফল শিল্প-প্রকাশ। অনুভব ও উপলব্ধি যদি প্রকাশের প্রয়াসে-যত্নে না জাগ্রত হয়, তাহলে অনুভব তার সৌকুমার্য হারায়, উপলব্ধি হারায় তার সামগ্রিক গভীরতা ; প্রয়াস-প্রযত্নের পেছনে যখন অনুভবের সৌকুমার্য ও উপলব্ধির সামগ্রিক গভীরতা না থাকে, তখন তা হয়ে ওঠে সুরলোকে অসুরের উৎপাত বিশেষ,—শিল্পের নামে প্রাণহীন অন্ধ অনুকরণবৃত্তি কিংবা মাধুকরীবৃত্তি।

শিল্পীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন শিল্পরূপে তাকে প্রকাশ করা ও রসিক সমাজে তা সঞ্চার করার প্রকরণ বড় জটিল ও বিচিত্র। শিল্পী ও রসিক—দুজনের দিক থেকেই এ কথা অল্পাধিক সত্য। যা প্রকাশিত হয় তা আসলে রূপকে মূর্ত করা। বিরহের গানে আক্ষরিক অর্থে বিরহ নেই। অথচ বিরহের গানে এমন যদি গুণ না থাকে যাতে রসিকের কানে-প্রাণে বিরহের ভাবটি জাগে তাহলে গানটিকে বিরহের গান বলা যথার্থ হয় না। এক অর্থে সকল শিল্পকর্মই প্রতীক। শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি অন্য কিছুর প্রতিরূপ হতে পারে (যেমন রবীন্দ্রনাথের "মাছ" অমৃতা শের-গিলের "কলা-বিক্রেতা" বা নন্দলাল বসুর "গোপালপুরের জেলেরা") অনুরূপ হতে পারে (যেমন, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "বেনারসের ঘাট" বা তুলুস লোত্রেকের "মুলাঁ রুজ"এ), ভাবরূপ হতে পারে (যেমন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আত্মার যাত্রা", পিকাসোর "গুয়েনির্কা" বা পল ক্লীর "ডায়না"), আবার অত্যন্ত অমূর্ত প্রতীকও হতে পারে (যেমন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "হাসি" বা সালভাডর ডালির "স্মৃতিভার")। প্রতিরূপ, অনুরূপ, ভাবরূপ ও অমূর্ত প্রতীক রূপের মধ্যেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে ও উদাহরণ দিয়ে স্তরভেদ দেখানো যায়। প্রকাশ কখনো বিবরণাত্মক, কখনো-বা প্রতিরূপ ; উভয় ক্ষেত্রেই প্রতীকের সঙ্গে প্রকাশিত বিষয়ের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অপরোক্ষ। প্রকাশ কখনো উদাহরণধর্মী ; প্রতীক সেক্ষেত্রে প্রকাশিত বিষয়কে সরাসরি না "বুঝিয়ে" অন্য কোনো প্রতীকের মাধ্যমে

"বোঝায়।" "বোঝানো" এখানে "সঞ্চারণধর্মী প্রকাশ",—মূলত বুদ্ধি-বিচারের ব্যাপার নয়। সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও চিত্রশিল্পে বিবরণাত্মক প্রকাশের ভূমিকা বিস্তৃত। বিবরণ কখনো অনুকরণ। আবার ত্রি-মাত্রিক বস্তু যখন এক-মাত্রিক ছবিতে বা লিখিত ভাষায় অনুকৃত হয় তখন কিঞ্চিৎ বিকৃতি বা রূপান্তর অনিবার্য। বিবরণ কখনো অনন্য, কখনো সাধারণ। ভ্যান গগের *Postman* অথবা রবি বর্মার "রাবণ ও জটায়ু" সাধারণধর্মী বিবরণ। গগনেন্দ্রনাথের "কাঞ্চনজঙ্ঘা", অবনীন্দ্রনাথের "রবীন্দ্রনাথ" প্রকাশিত বিষয়ের বিচারে বিবরণাত্মক ও অনন্য। শিল্পে যা অনন্য বলা হয় তা ঠিক অনন্য হতে পারে না। রেনোয়ার "মুলাঁ রুজ" ও তুলুস-লোত্রেক-এর "মুলাঁ রুজ"-এর শিল্পগত উদ্দিষ্ট এক হয়েও ঠিক এক নয়। গগনেন্দ্রনাথের "রবীন্দ্রনাথ" ও অবনীন্দ্রনাথের "রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধেও ঐ এক কথা।

ঐ একই কারণে প্রতিরূপ-প্রকাশ ও অনুরূপ-প্রকাশেও প্রকাশিতের সঙ্গে প্রকাশের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই রকম সম্বন্ধই থাকতে বাধ্য। সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত বা শিল্পের অন্য যে-কোনো প্রকাশের ভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন, মূল যে-সম্বন্ধটি প্রকাশিতের সঙ্গে প্রকাশের থাকে তাকে বলা যায় সাদৃশ্য। সাদৃশ্য বর্ণনা যোগ্য হতে পারে, আবার অবর্ণনীয় অমূর্তও হতে পারে। অমূর্ত হতে পারে রূপান্তরের জন্য আর সেই জন্যই অবর্ণনীয়। ফ্রাঞ্জ মার্কের "Tower of Blue Horse" অথবা ক্যাণ্ডিন্স্কির "Picture with white Edge"-এর যেটুকু বর্ণনীয় সেটুকু শিল্পমূল্যে নগণ্য। শরৎচন্দ্রের "আঁধারের রূপ"-এর বর্ণনা শিল্পমূল্যে অতীব সমৃদ্ধ। শিল্পে "বর্ণনা" ও "সাদৃশ্য" দুটি কথাই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সেই অর্থও সর্বত্র এক নয়। প্রতিরূপ-প্রকাশে সাদৃশ্য অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; তবু সেখানে শিল্পীর স্বাধীনতা, রূপান্তরণের বৈচিত্র্য সৃষ্টির অধিকার, থেকেই যায়। গগনেন্দ্রনাথের "রবীন্দ্রনাথ" ও অবনীন্দ্রনাথের "রবীন্দ্রনাথ" একই ব্যক্তির প্রতিরূপ কিন্তু তবু দুটির মধ্যে শিল্পকর্ম হিসেবে পার্থক্য অনস্বীকার্য। অনুরূপ-প্রকাশে শিল্পীর কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির অবদানে প্রকাশিতের সঙ্গে প্রকাশের সাদৃশ্য কম হতে বাধ্য।

উদাহরণধর্মী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশ প্রকাশিতের গুণের অধিকারীও বটে আবার প্রকাশিতকে উদ্দেশ ক'রে "বোঝায়"ও বটে। রূপ, সজ্জা ও অলঙ্কারের দিক থেকে উদাহরণধর্মী প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশিতের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। গথিক, ব্যারোক বা মোগল স্থাপত্যের যখন উদাহরণ দেওয়া হয় তখন ঐ ধরণের কোনো নির্দিষ্ট শিল্পকর্মকে না বুঝিয়ে একটি শ্রেণীকে ও শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায়।[২৮]

শিল্পীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর মেলে ভাবের প্রকাশে, বিশেষত সেই ভাব যখন ইন্দ্রিয় প্রতিবেদনে পরিবেশন করা দুরূহ। প্রথমে ভাবকে রসময় করতে হবে, অনুভবগ্রাহ্য

করতে হবে, এবং তারপরে উদ্ভাবনী কল্পনায় আবিষ্কার করতে হবে এমন প্রতীক যার মাধ্যমে অমূর্ত ভাবও নান্দনিক অভিজ্ঞতার উপজীব্য ও সঞ্চারযোগ্য হয়ে উঠবে। শিল্পের শ্রেণীগত অর্থময়তা, অনন্য অর্থময়তা, উদাহরণধর্মিতা শিল্পীভেদে ও শিল্পের চরিত্রভেদে ভিন্ন হতে বাধ্য। স্থাপত্যের উদাহরণধর্মিতা চিত্রশিল্পে আনা শক্ত। নৃত্যের প্রকাশ যেমন উদাহরণধর্মী সঙ্গীত তেমনটি হতে পারে না। সঙ্গীতের অর্থময়তা কাব্যসাহিত্যে খানিকটা আনা গেলেও প্রবন্ধ সাহিত্যে আনা যায় না।

এক কথায় ও খুব সাধারণভাবে (এবং সেইজন্যই অনেক শর্ত ও "কিন্তু" সাপেক্ষ) বলা যায়, শিল্পের ভাষামাত্রই—এমন-কি গদ্য-সাহিত্যও—অল্পাধিক সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী। প্রকাশমাত্রই তাই অপ্রকাশের ছায়া সঙ্গী। প্রকাশ-অপ্রকাশের রৌদ্র-ছায়ায় শিল্পীর অনুভূতি ও প্রকাশ দুই-ই উজ্জ্বল-অথচ-অনুন্মোচিত। অনুভূতি প্রকাশের আকূতি শিল্পীকে সঞ্চারে উৎসাহী ও উদ্বুদ্ধ করে। শিল্পীর অনুভূতির অন্তর্লোকেও সমাজ-চেতনার রৌদ্র-ছায়ার খেলা চলেছে নিরন্তর।

সুন্দর ও অসুন্দর

সূচনা ॥

"সুন্দর" শব্দটি একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এবং বোধহয় ঠিক এক অর্থেও ব্যবহৃত হয় না। আমরা যখন বলি "সুন্দর ব্যবহার", "সুন্দর কাজ", "সুন্দর মন", "সুন্দর গানের গলা" কিংবা "সুন্দর ছবি আঁকার হাত" তখন সব ক'টি "সুন্দর" শব্দ ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। একটু তলিয়ে দেখলে পার্থক্য বোঝা যাবে। ব্যবহারের সৌন্দর্য মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিচারের ব্যাপার এবং দৃশ্য নয়। নিপুণ, কঠিন, বা সার্থকভাবে সমাপ্ত কাজকেও আমরা সুন্দর বলে থাকি। মনের সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার বা কাজ থেকে অনুমান করা হয় এবং সেজন্য মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য। বলা বাহুল্য, সুন্দর মন দেখার জিনিস নয়। কেউ হয়ত বলবেন, সুন্দর মনকে বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে, মন দিয়ে। "হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।" অন্যান্য যে গুণ থাকলে মনকে সুন্দর বলা হয় তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি : সৌকুমার্য ; পরিচ্ছন্নতা ; সুরুচি ; সুশৃঙ্খলা ; ক্ষমা। এ-প্রসঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে সুন্দরের তাৎপর্য নান্দনিক না হয়ে নৈতিক হয়ে যাচ্ছে। "সুন্দর" প্রায় "ভালো"-র সমার্থক হয়ে উঠছে। গানের গলায় সৌন্দর্যে কিন্তু নৈতিকতার লেশমাত্র নেই। ওটা একটা মাধুর্য, বা কুশলতা বা দক্ষতা। কেউ হয়ত বলবে, "ওক্ষেত্রে 'সুন্দর' না ব'লে বলা উচিত 'মধুর'।" কিন্তু "সুন্দর"-এর এ ব্যবহার অনুচিত হলেও স্বীকৃত। কোনো কোনো দার্শনিক বলবেন, "ভাষা ব্যবহারের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচারের কাজ নন্দনতাত্ত্বিকের নয় ; তার কর্তব্য "সুন্দর"-এর বিভিন্ন বাস্তবিক ব্যবহার থেকে তার "সাধারণ" কিংবা বিশেষ অর্থ উদ্ধার করা, ব্যাখ্যা করা।

"সুন্দর"-এর অর্থোদ্ধার ও তাৎপর্য বোঝবার জন্য ভাষার ব্যবহার ছাড়া আরো কতগুলি দিক লক্ষ্য করতে হবে। কেন কোনোকিছুকে, তা সে সাহিত্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য যা-ই হোক না কেন, সুন্দর বলা হয়? তা কি শুধু ভালো লাগে, সুখপ্রদ না মনোরম ব'লে? নাকি, সুন্দর বস্তুর মধ্যে এমন কোন গুণ বা ধর্ম আছে যার জন্য ঐ জাতীয় (অর্থাৎ নান্দনিক) ভালো লাগা, সুখপ্রদ বা মনোরম মনোভাব আবশ্যিক হয়ে ওঠে? সমস্যা হল, নান্দনিক সৌন্দর্যও মাঠে মারা যায়, উপভুক্ত ও অনুভূত হয় না, যদি রসিক জন (রসিক মন) না থাকে। নিছক বস্তুর ধর্মে বা গুণে সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে পেতে চাইলে অসুবিধা আছে।

আবার যদি বলি, "সৌন্দর্যের নিকেতন হল রসিকের মন" তাহলেও অসুবিধা আছে। রসিক সামাজিক জন। তার মন সমাজায়ত। দেশভেদে, কালভেদে রসিকের পরিচয়, উপভোগ, অনুভব ভেদ, পরিবর্তিত, হয়। হয় এই পরিবর্তনের সদ্ব্যাখ্যা দিতে হবে, নতুবা রসিক মনের বাইরে, বিষয়বস্তুর অন্তরে, সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করতে হবে। বিষয়বস্তু ও শিল্পবস্তুর বস্তুরূপ পদার্থবিদ্যার বিচারে এবং দৃশ্যত এক হলেও নান্দনিক বিচারে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য স্তরের ; বস্তুর দ্রব্যরূপের নয়,—দৃশ্যরূপের তো নয়ই। নান্দনিক স্তর যে বস্তুস্তর থেকে পৃথক তা বোঝানোর জন্য একাধিক জিনিষের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। রসিক মনের, নান্দনিক অভিজ্ঞতার সাধারণ লক্ষণগুলি কি ? রসানুভব অস্থায়ী হলেও সাধারণ লক্ষণগুলি জানা থাকলে যথার্থ নান্দনিক বিচার করা সম্ভব। ব্যক্তিগত ভালো লাগা বা না-লাগার অন্তহীন নৈরাজ্য থেকে সেক্ষেত্রে নিষ্কৃতি-লাভ সম্ভব।

অনেকে বলেন, সৌন্দর্যের লক্ষণ নির্ণয় অসম্ভব।[১] সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। সৌন্দর্যের লক্ষণ নির্ণয় যদি সম্পূর্ণ অসম্ভব হত তাহলে এ-বিষয়ে সার্থক কথোপকথন ও মতবিনিময় অসম্ভব হত। সৌন্দর্য কি,—এ সম্পর্কে আমরা নিজেরাই শুধু বুঝি না, আমরা যা বুঝি অন্যকেও তা অল্পাধিক বোঝাতে পারি। মূলতত্ত্বের অন্যান্য মৌলিক ধারণাগুলি, যেমন, "ভালো", "ন্যায়", বুঝতে বা বোঝাতে যে-অসুবিধা দেখা দেয় স্বাভাবিক কারণে তা এক্ষেত্রেও স্পষ্ট। সরাসরি এই জাতীয় ধারণাগুলির মর্মে পৌঁছবার চেষ্টা না করে আমাদের পদ্ধতি হওয়া উচিত আনুষঙ্গিক ধারণা ও অবস্থাদির পর্যালোচনা করা ও তাদের তাৎপর্য অনুসরণ করা। "সৌন্দর্য কি ?" এই প্রশ্ন না তুলে' বরং বোধহয় প্রশ্ন তোলা উচিত "কেন কোনো কিছুকে সুন্দর বলি ?" এই "কেন"-র বৃহৎ ছত্রছায়ায় দেহ, মন, সমাজ, বস্তু, রূপ, রস, বর্ণ, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি অনেক কিছুই উপস্থিত। "কেন"-র প্রারম্ভিক উত্তর সন্ধানে "সুন্দর"-এর অ-নান্দনিক ব্যবহার থেকে নান্দনিক ব্যবহারকে পৃথক করা খুবই প্রয়োজন।

সৌন্দর্যের প্রথম স্পর্শ ॥

সৌন্দর্যের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন কিছুকে আমরা সুন্দর বলি। বলাটা অভিজ্ঞতার প্রকাশ। অ-প্রকাশিত বা অ-ঘোষিত অভিজ্ঞতারও একটি সুন্দর স্ব-সিদ্ধ রূপ আছে। এই রূপ ও তার লক্ষণসমূহ আবিষ্কার ও আলোচনার আগে দেখার চেষ্টা করা যাক কীভাবে সৌন্দর্য আমাদের প্রথম স্পর্শ করে। সৌন্দর্যের প্রথম স্পর্শে দেহ-মনকে ব্যাপৃত ক'রে একটি অখণ্ড অনুভূতি জাগে। অনুভূতির প্রথম পর্যায় স্বভাবতই

প্রবল এবং তখন দেহবোধই প্রধান। ইন্দ্রিয়ও তখন উদ্দীপনার প্রভাবে আনন্দরসে আপ্লিষ্ট, অল্পাধিক নিশ্চেষ্ট। দেহবোধপ্রধান সৌন্দর্যের অনুভবে অনুভূতির অন্তর্নিহিত রূপ এবং যে শিল্পবস্তুর অনুভব হচ্ছে তার স্বরূপ খুব অস্পষ্ট কিংবা অনুপস্থিত। অভিজ্ঞতার এই নির্বিশেষ স্তরে বস্তুর রূপ (যে-বস্তুকে ঘিরে শিল্পবস্তুর রূপ প্রস্ফুট হয়) সম্পর্কে সচেতন হওয়া আরো কঠিন।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক। আনন্দের অনুভূতি যখন শরীর-প্রধান হয় তখন বিশ্লেষণ বা অনুধ্যান করলে দেখা যাবে সামঞ্জস্য, বিন্যাস, বিস্তার, তরঙ্গ বা এই ধরণের কতগুলি জটিল জ্যামিতিক রূপ অনুভূতিকে নন্দিত করছে। সৌন্দর্যের আনন্দের অন্তরে অদৃশ্য রূপ-বিভঙ্গ নিহিত। রূপহীন আনন্দকে নিছক সুখের থেকে পৃথক করা শক্ত। কামোদ্দীপক চিত্র, বা চলচ্চিত্র দেখলে সৌন্দর্যের অনুভব গৌণ হয়ে শরীরে সুখের অনুভব প্রবল ও প্রধান হতে পারে। একটি রসোত্তীর্ণ শিল্পবস্তুর বিষয়টি "কামোদ্দীপক" হলেও রসিকের পরিশীলিত রসবোধের জন্য তার প্রধান উদ্দীপনা কামের না হয়ে আনন্দেরও হতে পারে। যে রূপ-বিভঙ্গ ও রস সঞ্চারের জন্য শিল্পবস্তুর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কামভাব কালক্রমে নির্মলতর সৌন্দর্যানুভবে উত্তীর্ণ হয় তা প্রাথমিক স্তরে অস্ফুট থাকলেও একেবারে অনুপস্থিত হয় না। সৌন্দর্যানুভবের উপাদান সবই রসিকমনের কল্পনাসৃষ্ট নয়। রূপ-বিভঙ্গ ও বিন্যাস জ্যামিতিক হিসেবে নিখুঁতভাবে উপস্থিত থাকলেও কুকুর বা শিম্পাঞ্জীর মত জীবের মধ্যেও সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা হয় ব'লে মনে হয় না। সৌন্দর্যবোধ নিছক রূপনির্ভর নয়। রূপ অতিরিক্ত যে জিনিসটি দরকার তার নাম রস। রস রূপহীন অন্ধ অভিজ্ঞতা নয়। তাই মনুষ্যেতর জীব রস আস্বাদনের ক্ষমতাবিহীন। সৌন্দর্য রূপাশ্রয়ী ও রসসিক্ত। শারীর অভিজ্ঞতা সৌন্দর্যবোধের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। যা প্রয়োজন, রূপ ও রস, তার সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা সচেতন হতে না পারলেও তার অস্ফুট প্রতিশ্রুতি দেহ-মন প্রথমাবধিই নিঃশব্দে বহন করছে।[২]

শারীর স্তর থেকে সৌন্দর্যবোধের উত্থান ও বিকাশ সম্ভব হবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। এ বিষয়ে স্মৃতি ও কল্পনার অবদান উল্লেখযোগ্য। অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিতে সঞ্চিত রাখা এবং ইচ্ছানুসারে তাকে সঞ্জীবিত করার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে অবাক হতে হয়। শরীরের অন্ধ সংস্কার, প্রবৃত্তি এবং মূল অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ থেকে সুন্দর যা স্মরণীয় তাকে মনে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলা বড় সহজ কাজ নয়। এই কাজের মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনা ছাড়া বিচার-বুদ্ধির ভূমিকাও রয়েছে। বিচার-সঞ্জীবিত স্মৃতির ভাণ্ডার এবং কল্পনার সৃষ্টিশীলতা অতীতকে সাম্প্রতিক করে এবং বর্তমানকে অনাগত ভবিষ্যতের মহাঙ্গনে মুক্তি দিতে পারে। ইচ্ছার আলোয় বিচার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আনন্দদায়ক

সুন্দরকে চয়ন করে এবং তার অ-পূর্ণতা বা বিঘাতকে কল্পনার সাহায্যে পূর্ণতা দিতে, বিমোচন করতে চেষ্টা করে। তাই শিল্পের সৌন্দর্য ঐতিহাসিক সত্যের নির্বিকার প্রতিবিম্ব না-ও হতে পারে। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা ছাড়া ইচ্ছা, প্রত্যাশা ও অনুভূতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যা মনোরম, সুখপ্রদ বা ভালো লাগে তাকে যদি আমরা নির্বিচারে প্রশ্রয় দিই তাহলে সৌন্দর্যবোধ শারীরবোধের গোধূলিতে অস্ফুট-অস্পষ্ট থেকে যাবে। নির্বিচার অনুভূতির প্রাবল্যকে দূর করার জন্য দরকার বুদ্ধির বিধি-নিষেধ পালন করা। সুখপ্রদ অভিজ্ঞতার উৎপত্তির স্থান থেকে কালের মাপকাঠিতে দূরে, অনেক দিন দূরে, থাকার পরেও যদি সৌন্দর্যবোধ অক্ষুণ্ণ ও জাগ্রত থাকে তাহলে মনে করা যেতে পারে ইচ্ছা, প্রত্যাশা ও অনুভূতির সম্মিলিত প্রভাব ছাড়াও অধিক কিছু আছে যা সৌন্দর্যবোধের মূল ভিত্তি। মানুষের আশ্চর্য শরীর সৌন্দর্যস্মৃতির সার্থক আশ্রয় হতে পারে বটে, তবে তার সঞ্জীবন মন্ত্র রয়েছে বিচার-বুদ্ধির অধিকারে, কল্পনার সৃষ্টিধর্মী মায়াবী কৌশলে।

সৌন্দর্য সন্ধানে একটি বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা কি কোন বিষয়ের (বা বস্তুর) সৌন্দর্যের কথা বলতে চাইছি? নাকি, (সেই) বিষয়ের যে-ছাপ বা প্রভাব আমাদের মনে পড়ছে তার কথা বলতে চাইছি? এই দুটি কথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়; তবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য অনুধ্যানের সূত্রপাত হিসেবে আমি শারীর অভিজ্ঞতা, সুখ বা সন্তোষের অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

শারীর অভিজ্ঞতার লক্ষণগুলি সম্পর্কে সম্যক অনুধ্যান করলে বিষয়ী (বা মানস) জগতের বৃহত্তর পটভূমিতে যেমন সুখানুভূতির অন্তর্লীন কারণগুলোর স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি আবার সুন্দর বিষয়ের বস্তুরূপ অনুধ্যান করলে ক্রমশ উন্মোচিত হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধিকরণে অনুভবের অবদান। বস্তু অনুভবকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। ভাব ও অনুভবকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। বস্তু-দীপ্ত অনুভব অপেক্ষাকৃত অধিকতর শরীর-নির্ভর, সুখ-দুঃখের স্পর্শপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাহীন। পক্ষান্তরে, যে অনুভবের কারণ কোনো-না-কোনো ভাব তার সুখ-দুঃখের দিকটা শূন্য না হলেও তুলনায় লঘু। ভাব কিংবা বস্তু যে দিক থেকেই শুরু করি না কেন, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের অনুধ্যানের একটি সীমান্ত বিষয় (অবজেক্ট)।

বলাবাহুল্য, সৌন্দর্যসন্ধানী বা নন্দনতাত্ত্বিক এই বিষয়গত সীমান্ত সম্পর্কে মূলত জিজ্ঞাসু নয়। যাদের ঝোঁক প্রত্যক্ষবাদের দিকে তারা সুখ-দুঃখের অনুধ্যানেই ব্যস্ত; সৌন্দর্য তাদের কাছে সুখদায়ক বিষয়ের প্রত্যক্ষ; বস্তু তাদের কাছে ভাবশূন্য বই কিছু

নয়। সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে একদিকে শারীরিক প্রবৃত্তি ও সংস্কার এবং অন্যদিকে মানসিক স্মৃতিরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদি বিচারের দীর্ঘ অনুশাসনে প্রবৃত্তি ও সংস্কার পরিবর্তিত না হয় তাহলে এক জাতীয় ভাব এক জাতীয় প্রবৃত্তি ও সংস্কারকেই নির্দিষ্ট প্রকারে জাগ্রত করে এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতিও প্রায় পূর্ব-নির্ধারিত পথে বিকশিত বা সঙ্কুচিত হয়। বিচারহীন অনুভব সম্ভব হলেও তা সাময়িক ; এবং কালক্রমে তা বিচারের প্রভাবাধীন হয়ে আসে। সংস্কার ও প্রবৃত্তি সৌন্দর্যের অশেষ বৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট, পূর্ব-নির্ধারিত গণ্ডীতে, জ্যামিতিতে বন্দী করতে পারে না। অন্য দিক, মানসিক দিক, থেকে বললেও স্বীকার করতে হয়, স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে স্থির নয়, কল্পনা তা'কে কখনো সচেতনভাবে, কখনো নিঃশব্দে পরিবর্তিত করছে। শরীর নিঃসন্দেহে সৌন্দর্য চেতনার, বিশেষত সুখ-দুঃখ অনুভূতির, সাধারণ অধিকরণ। এ কথা অন্যান্য প্রকার চেতনা বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও অল্পাধিক সত্য।

কিন্তু যে-কথা মনে না রাখলে সৌন্দর্য অভিজ্ঞতায় শরীরের ভূমিকা সম্পর্কে এক-দিক্‌দর্শী ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে তা হল এই। বস্তুবিজ্ঞান বা, এমন-কি, সমাজ-বিজ্ঞানেও বস্তুরূপ নির্ণয় যতটা সহজ ও সম্ভব সৌন্দর্য অভিজ্ঞানে তা নয়। বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বস্তুর তুলনায় সুন্দর বস্তু নিঃসন্দেহে অধিকতর মূর্ত, এবং সেজন্য তা সহজেই সুখ-দুঃখের (শরীরাশ্রয়ী) অনুভূতি (অস্থায়ী হলেও) জাগাতে পারে। কিন্তু সে অনুভূতির বৈচিত্র্য ও মুক্তির বিস্তার এত অধিক যে প্রত্যক্ষবাদীর শরীরাশ্রয়ী সুখ-দুঃখ, সংস্কার ও প্রবৃত্তিপ্রধান বিশ্লেষণে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া শক্ত ; সৌন্দর্যের সম্যক পরিচয় পেতে হলে একদিকে যেমন প্রত্যক্ষের বিষয়ীগত অংশটি বোঝা দরকার প্রায় তেমনিই বোঝা দরকার প্রত্যক্ষের বিষয়গত অংশটি, বস্তুরূপটি।

গ্রন্থের সুরুতেই আমি বস্তুরূপ এবং শিল্পরূপের পার্থক্যের কথা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। বস্তু বস্তুরূপেই সুন্দর প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার বিষয়ীগত বা অন্তর্লীন ভাব দিকটির অনুধ্যান করলে দেখানো যাবে যে, তথাকথিত ঐ বিশুদ্ধ বস্তুরূপ বিশুদ্ধ নয়,—ওর মধ্যে ভাবরূপ, কল্পনার বিন্যাস, আবিষ্কার এবং বহুক্ষেত্রে অপরোক্ষ অবদানও একাকার হয়ে গেছে।

সৌন্দর্যের গভীর স্পর্শ ॥

কিসের জন্য বস্তুরূপ শিল্পরূপে, সুন্দররূপে, রূপান্তরিত হয়? এ প্রশ্ন অন্য দিক থেকেও তোলা যেতে পারে। কেন, কিসের জন্য, শরীরাশ্রয়ী সুখ-দুঃখের অনুভূতি সংস্কার, প্রবৃত্তি ও স্মৃতির সীমিত পরিধি অতিক্রম ক'রে বৈচিত্র্যে বিকশিত হতে পারে?

শরীরে যা সুখ-দুঃখরূপে অনুভূত হয় তার উৎপত্তি বা কারণ সম্পূর্ণভাবে শারীরিক নয়। শরীর আধার বা অধিকরণ,—কারণ নয়। এক অর্থে নিশ্চয়ই অংশত শরীর সৌন্দর্য অনুভূতিরও কারণ। মনুষ্যেতর শরীরে সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতির কোন সম্পর্ক আছে ব'লে জানি না। অংশত যে-কারণে শারীরিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে সৌন্দর্যের আস্বাদ লাভ করি তার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থবহতা, তাৎপর্যময়তা বা ব্যঞ্জনা।

অর্থবহতা, তাৎপর্যময়তা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি পদের অর্থ এক ও অভিন্ন নয়। এ-জাতীয় আরো কিছু পদ আছে। যেমন, অভিধা, সঙ্কেত, ইঙ্গিত। অর্থের মধ্যেও ভেদ আছে—ভাব্য ও ভাষণীয়, যা ভেবে' বুঝতে হয় ও যা শুনলে বোঝা যায়।[৩] এ সমস্ত শব্দগুলির একটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাকে বলা যেতে পারে আত্মঅতিক্রামক। প্রত্যেক পদের শ্রাব্য বা দৃশ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) রূপের অতিক্রান্ত কিছু তার মধ্যে আছে। যে বাঙ্গলা ভাষা জানে তার কাছে "বর্ষা" শুধু একটি (শ্রাব্য) ধ্বনি নয়, অর্থপূর্ণ পদও বটে। "বর্ষা" ধ্বনি স্বশক্তিতেই অর্থপূর্ণ পদ ব'লে স্বীকৃত হয় না। এ স্বীকৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিক-সামাজিক পরিচয় জানা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, ধ্বনির অর্থ অন্তর্নিহিত এবং সামাজিক রীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়। সেক্ষেত্রেও ধ্বনি নিছক ধ্বনি, কর্ণপটাহে শব্দতরঙ্গ সংযোগ নয়, তা থেকে অতিরিক্ত কিছু। ধ্বনির অনুধ্যানে ধ্বনির-অতিরিক্ত কিছু ধ্বনির "অন্তর্নিহিত" গুণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীর কাছে প্রতিভাত হয়। আমার সন্দেহ আছে, সত্যিই অর্থ ধ্বনির অন্তর্নিহিত গুণ বা সম্পদ কি না। যদি ভাষা ও সমাজ-নিরপেক্ষভাবে ধ্বনির অর্থ বোঝা বা বোঝানো যেত তাহলে আমি সন্দেহের কথা বলতাম না। ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক দ্বিবিধ, সমাজাশ্রিত ও চেতনাশ্রিত। তাছাড়া এ সম্পর্ক দ্বান্দ্বিকও বটে। ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক নির্ণয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ব্যাখ্যার রীতি ও নিয়মগুলি সমাজাশ্রিত বা সামাজিক। "শব্দ বা বাক্যের অর্থ সমাজাশ্রিত" বললে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বলা হল না। সমাজ চেতনাতেও উপস্থিত। কেউ কেউ মনে করেন, সমাজ শুধু চেতনাতেই উপস্থিত। আমি তা মনে করি না। কারণ, চেতনা, এক্ষেত্রে মানব-চেতনার কথা বলছি, সামাজিক। যে চেতনা সৌন্দর্যের আধার, বাহক ও স্রষ্টা তা স্পষ্টতই সামাজিক। সমাজের সঙ্কেত, সঙ্কেত-সঙ্কলনরীতি, আচার-ব্যবহার-অভ্যাস, প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রভৃতি দ্বারা তা বহুলাংশে নির্ণীত। "বহুলাংশে" বলছি ও "সম্পূর্ণ" বলছি না এই জন্য যে আমার ধারণা সৌন্দর্য, অসৌন্দর্য (এমন-কি ব্যাপক অর্থে নান্দনিক) চেতনার বহির্ভূত, অ-সামাজিক ও অ-সাঙ্কেতিক চেতনার অস্তিত্ব সম্ভব। যদিচ চেতনার এই দুই অংশের মধ্যে কোন স্থায়ী ভেদ-রেখা নেই, তবু

আচারে ও বিশেষত বিচারে এ ভেদ-রেখা আমরা টানি। যদি সৌন্দর্য-চেতনার সমাজাশ্রিত দিকটিকে আমরা অস্বীকার করি, তাহলে দুটি প্রশ্ন, কিংবা একটি প্রশ্নেরই দুটি দিক, মনে জাগে। অন্য সমাজের, অন্য ভাষাভাষীদের সঙ্গীত-সাহিত্য প্রভৃতির রসভোগে আমরা কেন অপেক্ষাকৃত ব্যর্থ হই? কেন তাদের শিল্পরসের আস্বাদনে আমাদের চেষ্টার সার্থকতা তাদের সঙ্কেত, সঙ্কেত-সঙ্কলনরীতি, অভ্যাস অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সাপেক্ষ?

অর্থের দাক্ষিণ্যে কোনো কোনো ধ্বনি পদে কোনো কোনো শব্দপুঞ্জ সুরে এবং কোনো কোনো বর্ণবিন্যাস চিত্রে রূপান্তরিত হয়, মানুষের মন অর্থের বিস্তার ও গভীরতা কোনো এক নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিমাপ ও পরিগ্রহণ করতে পারে না। অর্থের প্রাথমিক প্রত্যক্ষের পরে যদি তা মনকে আকর্ষণ করে মন তাতে সন্নিবিষ্ট হয়, তাকে অনুধ্যান করে এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে সংশ্লিষ্ট ভাষা, সুর বা চিত্রের তাৎপর্য মনের কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। এই উন্মোচন সময় ও অনুধ্যান-সাপেক্ষ। তাৎপর্যের নির্দিষ্ট একটি, দু'টি বা কিছু দিক আছে। অর্থকে নির্দিষ্ট দিকে অনুসরণ ও অনুধ্যান করলে তাৎপর্য উন্মোচিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, তাৎপর্যের অনুসরণ সঙ্কেত-সঙ্কলন রীতির সঙ্গে পরিচয়সাপেক্ষ। সঙ্কেত-প্রধান নাটক বা চিত্রশিল্পের তাৎপর্য হঠাৎ একসঙ্গে অনুধাবন করা কঠিন। সঙ্কেতাবৃত তাৎপর্য বোঝবার এবং পরে উপভোগের জন্য বিচার-বুদ্ধির সক্রিয় ব্যবহার প্রয়োজন হয়।

তাৎপর্যের নির্দিষ্ট গ্রন্থিতে বা ক্রমান্বয়ে আবদ্ধ নয় অথচ সৌন্দর্য প্রকাশের সহায়ক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে এমন একটি গুণের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে গুণটিকে আমি বলব ব্যঞ্জনা। অর্থ সীমিত; ব্যঞ্জনার তুলনায় সীমিত। ব্যঞ্জনা অর্থের অস্পষ্ট অথচ অনুভাবনীয় ব্যাপ্তি। অর্থের স্পষ্টতায় এবং তাৎপর্যের নির্দিষ্টতায় ব্যঞ্জনা বন্দী বা বদ্ধ নয়। ব্যঞ্জনা স্বভাবতই সামান্যধর্মী। গানের ব্যঞ্জনায় গান-শেষ দেশ-কাল অনুপ্রাণিত, অনুরণিত। অর্থকে আশ্রয় ক'রে, বিশেষ রীতি-পদ্ধতির আধারে, ব্যঞ্জনার বিস্তার সম্ভব হয়। ব্যঞ্জনা শুধু সঙ্গীতে বা চিত্রশিল্পেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য শিল্প-কর্মেও ব্যঞ্জনার অল্পাধিক ভূমিকা বর্তমান। ব্যঞ্জনা সৌন্দর্যের অনুভব ও উপভোগকে সহজ ও মুক্ত করে। মুক্ত অর্থের একটি রূপ ব্যঞ্জনা। চিত্রে প্রকাশিত বিষয়টি নানাভাবে পটভূমি, রঙের রকমভেদ, উজ্জলতা-অনুজ্জলতা, রেখার বিন্যাস, সামঞ্জস্য, সাঙ্কেতিক কোনো কিছুর উপস্থিতি···ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সহায়ক উপাদান। শিল্পকর্মের বাচ্য বা প্রকাশ্য বিষয় ও ব্যক্ত বিষয়ের যে ব্যবধান তা ব্যঞ্জনার ভিত্তিভূমি। উচ্চাঙ্গের যে কোনো শিল্পকর্মে কিছু-না-কিছু অকথিত বা অব্যক্ত থেকে যায়। কিন্তু কী যে অব্যক্ত থেকে গেল তাকে নির্দিষ্ট

ভাবে বলা যায় না ;—ব্যাখ্যা করা যায় মাত্র। ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে সবসময়েই তাই একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। ব্যঞ্জনার একদিক শিল্পকর্মের বিশেষ বিষয়বস্তু বা বাচ্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যদিকটি নির্ভরশীল রসিকচিত্তের উপর। ব্যঞ্জনা রসিকচিত্তের সৃষ্টি নয় ; রসিকচিত্তে তা ধরা পড়ে মাত্র। ব্যঞ্জনা অর্থের সমগোত্রীয় ; অর্থাৎ বহুলাংশে প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ। সঙ্গীত, চিত্র, চলচ্চিত্র, নাটক ও অন্যান্য যে-সব শিল্পকর্মে প্রত্যক্ষের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে আশ্রয় ক'রে ব্যঞ্জনার বিকাশ হয়। যতই বিকশিত হোক না কেন ব্যঞ্জনা কখনো সম্পূর্ণ ব্যক্ত নয়। "সম্পূর্ণ ব্যক্ত ব্যঞ্জনা" স্ব-বিরোধী। ব্যঞ্জনা ব্যক্তকে ঘিরে অব্যক্তের সার্থক আকৃতি। বাচ্য ও ব্যক্ত যখন অভিন্ন ব্যঞ্জনা তখন বিলুপ্ত। ব্যঞ্জনার মূল আবেদন বুদ্ধির কাছে ; প্রত্যক্ষের প্রতিবেদন তাকে গভীর ও শক্তিশালী করে।

রূপ ও সামঞ্জস্য ॥

বাঙ্গলা ভাষায় "রূপ" শব্দের একটি সুবিদিত অর্থ "সুন্দর।" "মেয়েটি রূপবতী" না ব'লে অনায়াসে বলা যায় "মেয়েটি সুন্দরী।" রূপ শব্দের মূল্যায়ন নিরপেক্ষ একটি অর্থও আছে। রূপ শব্দটির আগে "সু" বা "কু"যোগ ক'রে অধিকাংশ সময়ে তাকে মূল্যায়নসূচক শব্দে পরিবর্তন করা হয়। রূপ কখনো আকার বা আকৃতি, কখনো প্রকার বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুরই একটি বা একাধিক রূপ আছে। রূপ-এর নিকটতম ইংরাজী প্রতিশব্দ ফর্ম। রূপ কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কখনো বুদ্ধিগ্রাহ্য। অধিকাংশ সময়েই রূপ উভয় বৃত্তিগ্রাহ্য ; শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে তো বটেই। রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকটি শিল্পবস্তুর মুখ্যত বিষয়সত্তাকেই প্রকাশ করে এবং গৌণত তার অর্থের, তাৎপর্যের বা ব্যঞ্জনার দিকটিকে অস্ফুটভাবে প্রকাশ করে। বস্তুত দুটি দিক একই সঙ্গে আমাদের মনের কাছে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বস্তুর বিষয়রূপ ও শিল্পরূপকে শুধু একই সঙ্গে নয় ঐক্যবদ্ধ-ভাবে উপস্থাপন করে। বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য আমরা মূলত নির্ভর করি বুদ্ধির উপর। বিষয়ের সৌন্দর্য/অসৌন্দর্য জানার জন্য বুদ্ধির তুলনায় ইন্দ্রিয়ের উপর আমরা বেশি নির্ভর করি। ইন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট আলোয় রূপ সম্পূর্ণ আত্ম-প্রকাশ করে না। মানুষ ইন্দ্রিয় রূপ আবিষ্কার করতে পারে, সম্পূর্ণ উন্মোচিত করতে পারে না। বুদ্ধি রূপের সম্পূর্ণ পরিমাপ জানে ; কিন্তু রূপ যে কীভাবে রসের অধিকরণ হয় তা সে স্বশক্তিতে ধরতে পারে না। শুদ্ধ বুদ্ধির আদর্শ বিষয় জ্যামিতি ও গণিত। যদিচ সঙ্গীতে গণিত গুপ্ত ও চিত্রে জ্যামিতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাদের মাধুর্য ও সৌন্দর্য উপভোগে গণিত বা জ্যামিতির তুলনায় ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা প্রধান। ইতিপূর্বেই আমি দেখাতে চেয়েছি যে সৌন্দর্যের

প্রথম স্পর্শ ইন্দ্রিয়াশ্রিত এবং তাতে শরীরের অবদান সমধিক উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যবোধে যখন শরীর স্পন্দিত হয় তখনই বুদ্ধির দৃষ্টিপ্রদীপে রূপ, বিভিন্ন রূপের সামঞ্জস্য ধরা দিতে থাকে। আসলে সুন্দরের অভিজ্ঞতায় মন যে নন্দিত, আনন্দিত হয় তার শারীরিক দিকটি প্রবল হলেও অন্তর্লীন বৌদ্ধিক দিকটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন রূপের সঙ্গে কোন রূপের সামঞ্জস্য সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সম্ভব ও উচিত তা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও আবিষ্কার। রূপবোধ মনুষ্যেতর জীবে উপস্থিত। সেই স্তরে রূপ নিছকই আকারগত। অর্থাৎ সেই স্তরে রূপ রসের অধিকরণ হয় না। বিশেষ বিশেষ আকার দেখে' মনুষ্যেতর জীবের সুখবোধ হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ হয় না। কারণ, রূপের সামঞ্জস্য ধরবার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি দরকার তা মনুষ্যেতর জীবের নেই। অন্তত আছে ব'লে এখনো জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন।

সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ও উপভোগে রূপের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রূপ রূপহিসেবে, শুদ্ধ রূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। শুদ্ধ রূপ অমূর্ত। অথচ রূপের সমন্বয়, সামঞ্জস্য, সংগ্রহগ্রন্থি সৌন্দর্যের ভিত্তি। ভিত্তি, কারণ নয়। রূপ-সামঞ্জস্য হলেই যে সৌন্দর্যবোধ হবে তা নয়। রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মাত্রেই অন্তর্নিহিত। রূপ ও বিষয় বস্তুজগতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিল্পজগতে সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুরোধে শিল্পী রূপ ও বিষয়ের সম্পর্কে পরিবর্তন, নতুনত্ব, বৈচিত্র্য প্রভৃতি, আনার চেষ্টা করে। শিল্পজগৎ বস্তুজগতের প্রতিবিম্ব নয়। সুতরাং এ পরিবর্তন স্বাভাবিক, স্বাগত। রূপ ও বিষয়ের সম্পর্ক বুঝবার জন্য মানুষের দেহের উদাহরণ সাহায্য করবে। মিকেলেঞ্জেলোর ম্যাডোনা, ডেভিড বা বাকাম চিত্রে মানুষের দেহ আকর্ষনীয় চিত্রসৌন্দর্য ধারণ করেছে। এ চিত্রগুলির অন্তর্নিহিত অস্থিসংস্থান, পেশীসংস্থান, গ্রন্থি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের সকল নিয়ম ও নির্দিষ্ট রূপ অনুসরণ করেছে। ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম শুধু ডেভিডের করতল দুটি। কিন্তু শুধু তা'ই নয়। এর অতিরিক্ত অন্য কিছু রূপ ও বিষয়ের সম্পর্ককে বিজ্ঞানের কৌলীন্য অক্ষুন্ন রেখেও সৌন্দর্যের প্রায়-অনির্বাচ্য স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। এই "অন্য কিছু" প্রায়-অনির্বাচ্য হলেও সংকেতে ইঙ্গিতে খানিকটা বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। সামঞ্জস্য, সমন্বয়, সংগ্রহগ্রন্থি, সমগ্রসন্ধি প্রভৃতি গুণগুলি রূপ ও বিষয়কে একাত্ম ক'রে সুন্দর, সানন্দ করে তোলে। বিষয়ের উপাদানগুলিকে কীভাবে সামঞ্জস্যে আনা যেতে পারে ; কত ভাবে তাদের সমন্বয় করা যেতে পারে ; কত বিচিত্র, বিভিন্ন উপাদান একই শিল্পকর্মে সংগৃহীত করা যায় ও তাদের গ্রন্থনের রকম ও চরিত্রে কত বিন্যাস আনা যায় ; সকল উপাদানকে একটি অখণ্ড সমগ্র শিল্পকর্মে উপস্থাপনের জন্য কোন চিন্তা বা কোন বিস্তার (অস্পষ্ট) আভাসকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায় তার কোন পূর্বনির্দিষ্ট স্থায়ী রীতি-নীতি নেই। ঐতিহাসিক ও

সামাজিক কারণে অনুসৃত রীতি-নীতিগুলো ক্রমাগত পাল্টে যায়। বিভিন্ন, বিচিত্র উপাদানগুলি শেষবিচারে যে একটি সামগ্রিক সুন্দর রূপ ধারণ করে তাকেই আমি সমগ্র-সন্ধি বলি। উপাদানের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অল্পাধিক সংরক্ষিত হয়; এবং সেই দিকটির গুরুত্ব উল্লেখ করার জন্য তাদের কীভাবে সন্ধিবদ্ধ বা গ্রন্থিবদ্ধ করা হয় তা-ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যকর্মে, বিশেষত নাটকে বা উপন্যাসে, শিল্পের উপাদান, স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী, ঘটনা, কাহিনী প্রভৃতি যে-ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়, বলাবাহুল্য, সঙ্গীতে বা চিত্রে তা করা হয় না। এতে শুধু যে শিল্পকর্মের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তা নয়; এতে উপাদানের বৈশিষ্ট্যও, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যও, ধরা পড়ে। এতে আরো একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়: কোনো কোনো শিল্পকর্মে রূপের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও তার সার্বভৌমত্ব এবং বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণ হয় না। রূপ ও বিষয়ের সামঞ্জস্যের ধারণাটির মধ্যে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য উহ্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি রাগের আবেশে কিছু বাণী বদ্ধ হয়। বাণী-রূপ ও রাগরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। বাণীর রূপ তার অর্থে প্রকাশিত। রাগরূপ তান-লয়-মূর্চ্ছনায় প্রকাশ করার চেষ্টা হয়। ঋতু, কাল বা প্রহর, গায়কের মন, আমেজ, রসিক পরিবেশ প্রভৃতি সঙ্গীতের মাধুর্য বিকাশে সহায়তা করে। চিত্রের ক্ষেত্রেও নানা উপাদান একটি মূল ভাবকে প্রকাশ করার জন্য ছোট-বড় নানা বিষয়ের, রঙের, পশ্চাদ্-ভূমির সাহায্য নেওয়া হয়। সবকিছু নিয়ে শেষ বিচারে একটি কিছু হয়ে ওঠা চাই। সকল রূপ, সকল বিষয়, তাদের ঘাত-বিঘাত-সংঘাত সত্ত্বেও, একটি সামগ্রিক রূপে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ওঠে। শিল্পকর্মের এই সমগ্রসন্ধি গুণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক স্বতন্ত্র বিষয়ের উল্লেখ, অবতারণা হলেও উল্লিখিত বিষয়গুলি, যা হয়ত স্বতন্ত্রভাবে মনোরম বা আকর্ষণীয়, একটি সামগ্রিক রূপে সন্ধিবদ্ধ হয়ে ওঠে না এবং পরিণামে একটি মূল ভাব, অনুভব বা লক্ষ্যে সার্থক ও সংহত হয় না।

সমগ্রসন্ধিকে সুন্দর বা মধুর করার পেছনে আরো কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। শিল্প-কর্মে উপস্থাপিত বা পরিবেশিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা চাই। এ-কথা শুধু বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নয়, বিষয়ের সঙ্গে ভাষার, ধ্বনির, সুরের, ও রঙের সম্পর্ক প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। লঘুর সঙ্গে গুরুর, কান্নার সঙ্গে হাসির ভারসাম্য একই শিল্পকর্মের পরিধির মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করা বড় কঠিন। কঠিন, তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব। বিপরীত ধর্মের শিল্পসম্মত যুগপৎ পরিবেশন শুধু সম্ভব নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ভাব বা অনুভব উদ্বোধনের তা সহায়কও। বিপরীতধর্মী সুর, ধ্বনি, রেখা, বর্ণ প্রভৃতি শিল্পের প্রকাশ-উপাদান একাধিকভাবে সমগ্রসন্ধিতে সংগ্রথিত করা যায়।

স্তরভেদ, স্তরভঙ্গ, তরঙ্গ, বিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পী বিষয়কে মনোরম, সুন্দর বা মধুর করার চেষ্টা করে।

এই যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করছি তা সবই বৈচিত্র্য ধর্ম প্রকাশের পরিপোষক, অনুষঙ্গ। সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা দু'টি পরিষ্কারভাবে বোঝবার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটি ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোচনা করা দরকার। এবং উদাহরণ দিলে সমস্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। বারান্তরে আমি তা চেষ্টা করব। এখন যে কথাটির উপর জোর দিতে চাই তা হল এই। সমগ্রসন্ধি সুন্দর যে সাধারণ গুণে তা ঐক্যানুগ বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য প্রকাশ হয় দু রকমে, সম রূপ ও রসের অন্বয়ে, বা বিষম রূপ ও রসের অন্বয়ে। সুখে, সন্তোষে, সার্থকতায় নিশ্চয়ই অন্বয় হতে পারে : সমধর্মী অন্বয়। সুখে-দুঃখে, সন্তোষে-অসন্তোষে, সার্থকতায়-ব্যর্থতায়ও অন্বয় হতে পারে : বিষমধর্মী অন্বয়। সমধর্মী অন্বয়ে বৈচিত্র্য তীব্র, প্রখর, বা উজ্জ্বল হয় না ; হয় নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধ। বিষমধর্মী অন্বয়ে বৈচিত্র্যের উদ্বোধন হয় দ্রুত, তীব্র, প্রখর, উজ্জ্বল, প্রবল। সমধর্মী অন্বয়ের উদ্বোধন ও বিলয় দুই-ই বোধহয় সময় সাপেক্ষ, বিলম্বিত।

বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য স্রষ্টার মনে একটি (অস্পষ্ট হলেও) পরিকল্পনা বা নক্সা বা ডিজাইন চাই। এই নক্সা যে প্রথম থেকেই শিল্পীর মনে স্থির-স্থায়ীভাবে থাকে তা নয় : এই নক্সা সমগ্রসন্ধির সন্ধানে বা তার আকাঙ্ক্ষায়, অনুসরণে বাড়তে থাকে, বিকশিত হতে থাকে। অনেক শিল্পীর আত্মকথায়ই দেখা যায় যে তাঁরা তাঁদের কোন শিল্পকর্মের প্রারম্ভে সেই শিল্পকর্মের সমগ্র রূপটি, পরিণতিটি পরিষ্কারভাবে মনশ্চক্ষে দেখতে পান না। তবু স্বীকার করা ভালো যে, কতোগুলি সম বা বিষম ছককে (প্যাটার্ন) ঘিরে স্রষ্টার শিল্প-আকৃতি স্তরে-স্তরে পরিণামকে, তাৎপর্যকে সন্ধান করতে থাকে। সমগ্রসন্ধির মধ্যে যে-সব বিভিন্ন বিষয় থাকে তাদের স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্র ছক—থাকা সত্ত্বেও মূল পরিকল্পনার বিকাশ ব্যাহত হয় না ; বরং তাতে বৈচিত্র্যের উদ্বোধন হয়, বিন্যাস আরো সার্থক হয়, সামঞ্জস্য স্পষ্টতর হয়।

সৌন্দর্য, রুচি ও ঐতিহ্য ॥

রূপ রসের আশ্রয় বা অধিকরণ। রস রূপের প্রাণ। রূপ জ্যামিতিক হয়েও জ্যামিতির অধিক। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রূপের ব্যবহার এত বেশি নমনীয়, বঙ্কিম, ভাঙা-চোরায় নির্বচনীয় যে স্রষ্টার কল্পনা প্রকাশ তাতে ব্যাহত, তবে ব্যর্থ নয়। রূপের সঙ্গে রসের মিলন সার্থক হল কি না ? এবং তার ফলে সৌন্দর্য সৃষ্টি হল কি না ? অনেকের মতে এ-জাতীয় প্রশ্নের সদ্ব্যাখ্যা রুচির উপর নির্ভরশীল। নব্য প্লাতোপন্থী কেউ কেউ

মনে করেন, রুচি মানুষের সহজাত বৃত্তি এবং মূলত দেশকালোত্তীর্ণ। এই মত কেন অগ্রহণীয় তা আমি অন্য প্রসঙ্গে অন্যত্র উল্লেখ করেছি। রুচি সমাজায়ত। রুচি নিঃসন্দেহে বিষয়ীপ্রধান, রসিকের মানসিকতা-নির্ভর। কিন্তু রুচি নিরালম্ব, নিরধিকরণ নয়। ব্যক্তিমন, সমাজ ও সামাজিক ঐতিহ্যের উপর রুচি প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করে।[৫]

রুচির উৎপত্তি ও বিকাশে পাঁচটি বিভিন্ন স্তর ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) রুচির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের মাধ্যমে মন বস্তুজগতের সংস্পর্শে আসে। (২) রুচি প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হলেও বস্তুজগতের বিশেষ একটি দিকের প্রতি মনোনিবেশ করে। এ দিকটিকে কেউ বলেন "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য", কেউ বলেন "মনোরম রূপ সামঞ্জস্য।" নন্দনতত্ত্বে যাঁরা রুচির উপর জোর দেন জ্ঞানতত্ত্বে তাঁরা কেউ বুদ্ধিবাদী, আবার কেউ অভিজ্ঞানবাদী। আমি এখানে অভিজ্ঞানবাদীদের কথা বলছি। প্রত্যক্ষের উপর জোর দিতে গিয়ে তাঁরা সৌন্দর্যের প্রথম স্পর্শ শরীরবোধের উপরও পরোক্ষে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" বা "মনোরম রূপ সামঞ্জস্য" মূলত প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও এর অন্য দুটি দিকও আছে : (ক) শরীরে (এ কথা বোধহয় শুধু মানুষের শরীর সম্পর্কেই প্রযোজ্য) সুখানুভূতি (যা অস্পষ্ট হলেও অন্ধ নয়); এবং (খ) মানসিক বিচার। বিচার ব্যতীত ঐক্য বা সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য-রূপটি পরিস্ফুট হয় না। (৩) রুচিবাদীরা অবিশ্যি রুচিকেই একটি স্বতন্ত্র বা আংশিক মানসিক (বিচারক্ষম) বৃত্তি ব'লে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে রুচি মূলত শিল্পবস্তুর প্রতি মনোচেতনার একরকম প্রক্ষেপণ ; জ্ঞান লাভ তার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। (৪) এ প্রক্ষেপণের ফলে মনে সুখ, আনন্দ বা সন্তোষবোধ জাগে। (৫) মনের এই বোধকে ঘিরে শেষে দেখা দেয় বিচার। তখন আমরা বলি, উদাহরণস্বরূপ, "এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত গঙ্গা কী সুন্দর!" কিম্বা "এই এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে বিষয়বস্তু সুন্দর হয়ে ওঠে।" রুচির বিচার একটু জটিল। ভাষা-রূপ থেকে তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধার করা সহজ নয়। "পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নাত গঙ্গা" বিষয়টি এবং "এই এই বৈশিষ্ট্য (মণ্ডিত) বিষয়বস্তু(গুলি) রয়েছে বহির্জগতে, কিন্তু "সুন্দর" বহির্জাগতিক কিম্বা বস্তু-উদ্দীপ্ত শারীরিক-মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষণ নয়। "সুন্দর" হল বস্তু-উদ্দীপ্ত আনন্দ, সুখ, সন্তোষ বা তৃপ্তিবোধের বৈশিষ্ট্য। বস্তুজগৎ রুচির প্রাঙ্গণে বিচারের মাধ্যমে শিল্পজগতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। "সুন্দর"-এ বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তির চেতনা বিচিত্র দ্বন্দ্বে সংলগ্ন। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, সব সুখানুভূতিই রুচির দান নয়। এমন কি শিল্পবস্তুর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সুখও রুচিবৃত্তি-বহির্ভূত হতে পারে। একটি নগ্ন সুন্দর নারীদেহ কারুর কাছে নিছক উলঙ্গ ও যৌন তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। সেক্ষেত্রে রুচিবৃত্তি সক্রিয় ও সক্ষম হতে ব্যর্থ হয়েছে। তার জন্য চাই খানিকটা

মানসিক প্রশান্তি, স্থৈর্য, মনের একটি অনুত্তেজিত, সংস্থিত ভাব। বিরুদ্ধ বা সম্পর্কহীন কতগুলি ধারণা বা কামভাব যদি রুচির স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত বা বিকৃত করে তাহলে রুচির বিচার অগ্রহণীয়।

প্রশ্ন জাগে : রুচি কি সত্যিই একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বা ক্ষমতা? বলা হয়েছে, রুচির বিচার্য বিষয় অনন্য, সাধারণ নয়। অর্থাৎ একটি সমগ্র শ্রেণী, এমন-কি একটি শ্রেণীর অনেকগুলি বস্তুও রুচির বিচার্য বিষয় হতে পারে না। এ-জাতীয় কথা কান্টপ্রমুখ দার্শনিকেরা বলে থাকেন। সমস্যা হল : যাঁরা এ-কথা বলেছেন তাঁরা একই সঙ্গে দাবি করেছেন, রুচির বিচার যদিও অনন্য এ-বিচার সার্বজনীন, দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে সকলের পক্ষে উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। রুচি মূলত বিচারধর্মী, সৃষ্টিধর্মী নয়। সৃষ্টির জন্য চাই প্রতিভা, প্রেরণা। লক্ষ্যসিদ্ধির চেষ্টায় প্রতিভা যাতে অসংলগ্ন ও অনাবশ্যক ভাবনা ও কামনাদির সঙ্গে জড়িত না হয়ে পড়ে রুচির অন্যতম কাজ হল তাই। রুচি শৃঙ্খলাবিধায়ক ও স্বাতন্ত্র্যদায়ক। কল্পনা, বুদ্ধি ও অতিমানস সৃষ্টির প্রেরণা শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে বস্তুত সার্থক করার জন্য চাই রুচির বিচার।

সংজ্ঞা দিয়ে রুচিকে আমরা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ও উপভোগে যে-ভূমিকাই দিই না কেন আসলে রুচির বিচার বা ভূমিকা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সার্বজননীন হয়ে ওঠে না। রুচি শৃঙ্খলাবিধায়ক হতে পারে, কিন্তু খুব সীমিত অর্থে ছাড়া স্বাতন্ত্র্যদায়ক নয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন। তবু যে একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে এক প্রকার বেশভূষা, সাহিত্যশৈলী, স্থাপত্য বা চিত্রশিল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বা জনপ্রিয়তা হারায় তার কারণ মূলত সামাজিক, ঐতিহাসিক। এ-কথা অন্যান্য প্রসঙ্গে অন্যত্রও আমি বলার চেষ্টা করেছি।

রুচি ব্যক্তির। ব্যক্তি যেহেতু মূলত সামাজিক তার রুচিতে তাই সমাজের প্রভাব প্রায় অনিবার্য। "প্রায় অনিবার্য" বলছি এ-জন্য যে কখনো কখনো এই প্রভাব আনুমানিক নিবার্য। রুচি ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অনড় অনিবার্যতার সম্পর্ক নেই। একই ব্যক্তি একই জীবনের নানা পর্যায়ে—কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে—নানা রুচির পরিচয় দিয়ে থাকে। কৈশোরে বা যৌবনে মানুষ সাধারণত রোমান্টিক শিল্পকর্মের দিকে যে অনুরাগ দেখায় প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে প্রায়ই তা অনুপস্থিত। কৈশোরে ও যৌবনে শরীর সতেজ ও সবল এবং মন থাকে সতর্ক, উন্মুখ। শরীর মনের স্বাস্থ্য ও অবস্থা রুচির উপর ছাপ ফেলে। জীবনের প্রথম দিকে রুচি যতটা পরিবর্তিত হয় শেষ দিকে তা আর সাধারণত হয় না। বার্ধক্যের রুচি রক্ষণশীল, মোটামুটি স্থির। প্রথম দিকে মন থাকে বহির্মুখী, কল্পনাপ্রবণ, প্রত্যাশী ও সৃষ্টিপ্রবণ; কালক্রমে মন হতে

থাকে অন্তর্মুখী, বিচারপ্রবণ, স্মৃতিভারাক্রান্ত ও অন্নাধিক বন্ধ্যা। বলাবাহুল্য, এ-সব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় রুচি গভীরভাবে, (অনিবার্যভাবে নয়) গ্রন্থিবদ্ধ। রুচি ব'লে কোন স্বতন্ত্র বিচার-বৃত্তি নেই। নব্য প্লাতোপন্থীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার মূল প্রতিবাদ এইখানে। রুচি হল রসিক মানসে সমাজশিক্ষিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী নান্দনিক মনোভাব।

রুচির (টেস্ট-এর) সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির (আউটলুক ও এ্যাটিচিউড) পার্থক্য ও তুলনা এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব রুচির মতই বিষয়ীমুখী। সৌন্দর্যের সঙ্গে রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা অনেকেই স্বীকার করেন। মূলত এই তিনটি মনোভাবই অন্নাধিক স্থায়ী ও বিষয়ীমুখী। রুচিতে বিষয়ীমুখিতার আধিক্য স্পষ্ট। বিষয়বস্তুর মানসিক সুখদুঃখাশ্রিত প্রক্ষেপণের বিচার করে রুচি। কিন্তু এই বিচার মূলত অন্তর্মুখী। রুচির তুলনায় দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব বহির্মুখী। যে কোনো মানসিক ঘটনার একটি বিষয়মুখী, বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষাধর্ম আছে। রুচির ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষাধর্ম অপেক্ষাকৃত দুর্বল; দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত প্রবল। মনোভাব বিষয়বস্তুর স্বরূপকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করে এবং নিজস্ব স্থির প্রবণতায় তাকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা মনোভাবের প্রবণতার তুলনায় কিঞ্চিৎ অস্থির। ফলত তার আবরণীশক্তি ও বিষয়বস্তুকে শিল্পবস্তুতে সুন্দররূপে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা কম। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবে রুচির স্বাতিব নেই। রুচি (ভুল করে হলেও) স্বতন্ত্র বৃত্তির স্বীকৃতি পেয়েছে। এ স্বীকৃতি দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের প্রাপ্য নয়। মনোভাব বিষয়ের (অবজেক্ট-এর) প্রতি আকাঙ্ক্ষাধর্মে ধর্মী (ইন্টেণ্ডেড), ধাবিত ও জীবিত। বিষয়ের বিচার মনোভাবে নেই। দৃষ্টিভঙ্গিও বিচারবর্জিত কিংবা, বোধহয় বলা ভালো, প্রাক্-বিচার মানসিক অবস্থা।

মনোভাব নিরালম্ব নয়। দৃষ্টিভঙ্গি তো নয়ই। সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রভাব তাতে অনিবার্য,—স্পষ্ট না হলেও অনিবার্য। সমাজের কাঠামো ব্যক্তিত্বকে এবং ব্যক্তিত্বের কাঠামো দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও রুচিকে প্রভাবিত করে।

অসুন্দর।

অসৌন্দর্য কি সৌন্দর্যের আভাসমাত্র? নাকি অসৌন্দর্যের স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা আছে? যে-সব গুণ বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৌন্দর্যকে বুঝি বা বোঝানোর চেষ্টা করি তার অন্নাধিক অভাব দিয়েই কি অসৌন্দর্যকে বুঝতে হবে? নাকি অসৌন্দর্যের ধারণাটিকে স্পষ্ট করার জন্য স্বতন্ত্র কতগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আবশ্যিক? যা অসুন্দর তাই কি কুৎসিৎ?

সুন্দর ও অসুন্দর/কুৎসিত কি বিপরীতধর্মী? নাকি একই ধর্মের স্তরভেদে ভিন্ন? শিল্প-সৃষ্টিতে কি যা অসুন্দর বা কুৎসিত তার স্থান আছে? যদি থাকে তবে সমগ্রসন্ধিতে তাদের সহাবস্থান, সহগামিতা, সমবিবর্ধমানতা এবং সামঞ্জস্য সম্ভব হয় কেমন করে?[৬]

কোনো কিছুকে অসুন্দর মনে হলে সেই মনে হওয়ার মধ্যে কোন বোধটি প্রবলতর? অভাববোধ,—যেন কিছু নেই, এই বোধটি? নাকি একটি ভাববোধ,—যেন অসুন্দর ব'লে স্বীয় সত্তায় ও শক্তিতে কিছু আছে? সুন্দর যদি কিছুর অভাবজনিত হয় তবে তার সন্ধান ও নির্দেশ তেমন দুরূহ নয়। আমরা দেখেছি "সুন্দর" প্রথম স্তরে শরীর (ইন্দ্রিয়) ও সুখাশ্রিত। অশক্ত শরীর ও অ-সুখ সৌন্দর্য উপভোগ ও বোধের অন্তরায়। রূপ ও রূপ, রস ও রস, রূপ ও রস, সমরূপ ও রস, বিষম রূপ ও রস প্রভৃতির অনন্বয়, অসামঞ্জস্য এবং পরিণামে সমগ্রসন্ধির ব্যর্থতাকে অসৌন্দর্যের হেতু ব'লে নির্দেশ করা যায়। তাছাড়া তাৎপর্য ও বৈচিত্র্যের অভাবকেও অসৌন্দর্যবোধের অন্যতম হেতু বলা যায়।

প্রশ্ন হল: যে-সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় তার অভাবের তারতম্যই কি অসৌন্দর্য ব্যাখ্যার পক্ষে যথেষ্ট? সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য কি একই বস্তুর ব্যাপ্তিরেখার দুটি প্রান্ত? সেই ব্যাপ্তিরেখার এক প্রান্তকে এক (১) এবং অন্য প্রান্তকে শূন্য (০) দিয়ে নির্দেশ করলে কি ভুল হবে? সৌন্দর্যের যে স্তরভেদ আছে, কোন শিল্পবস্তু যে অল্পাধিক সুন্দর/অসুন্দর হতে পারে তা স্বীকার করতে হবে। সমস্যা হল: সৌন্দর্যের মধ্যে যে স্তরভেদ হতে পারে, কোনো শিল্পবস্তু যে অল্প বা অধিক সুন্দর হতে পারে এ কথাই অনেক নন্দনতাত্ত্বিক স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, সৌন্দর্যের কোন স্তর (ডিগ্রী)ই নেই, এবং স্তরভেদের কথাই তাই ওঠে না। অসৌন্দর্যে স্তর আছে। সৌন্দর্য স্তরহীন এবং অভিন্ন। সত্যের মধ্যে স্তরভেদ নেই; স্তর আছে শুধু মিথ্যার। এ-জাতীয় কথা হেগেল এবং ক্রোচে একাধিক যায়গায় বলেছেন। আসলে এঁদের সত্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত বক্তব্য এঁদের অদ্বৈতবাদী দার্শনিক বক্তব্যের প্রায়-প্রতিধ্বনি। "প্রায়" বলছি এ জন্য যে সৌন্দর্য যেহেতু সম্পূর্ণত শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এবং সুন্দর বিষয় যেহেতু বহু ও বিশিষ্ট এ-সব নন্দনতাত্ত্বিকেরা সৌন্দর্য ব্যাপারে একদিকে বৈচিত্র্যের ও অন্যদিকে অনুভব-অভিজ্ঞতার ভূমিকা স্বীকার করেন। বৈচিত্র্যে যা অসুন্দর তার ভূমিকা আছে বটে তবে তা সীমিত ও সাপেক্ষ ভূমিকা, তার স্বকীয় সত্তা ও সার্বভৌমত্ব নেই। সৌন্দর্যবোধকে সৃষ্টি এবং উদ্বোধন করার জন্য যা অসুন্দর তার প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্য যেমন তার সার্বভৌমত্বে স্বপ্রতিষ্ঠ অসৌন্দর্য তা নয়, তার মূল্য ঔপকরণিক। এই মূল্য ঔপকরণিক হলেও আবশ্যিক।

সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের উল্লিখিত জাতিভেদ দুস্তর ব'লে মানলে এ দুটি ধারণাকে একই ব্যাপ্তিরেখায় (স্কেলে) সংস্থাপন করা ভুল হবে। ঐ একই কারণে সেক্ষেত্রে অসৌন্দর্যকে কুৎসিতের সমার্থক বলাই ঠিক হবে। যা অসুন্দর তার প্রবলতর, তীব্রতর, রূপটিকে, রসভাবটিকে আমরা কুৎসিত ব'লে থাকি। কুৎসিত বা অসুন্দর যে পদই ব্যবহার করি না কেন বস্তুত তা সুন্দরের সঙ্গে একই জাতিভুক্ত কি না তা সংশ্লিষ্ট পদের অর্থ না বুঝলে বলা শক্ত। অর্থ বোঝবারও নানা পদ্ধতি আছে। অভিধান বা ভাষাব্যবহার থেকে অর্থ বোঝা যেতে পারে। বিভিন্ন দর্শনপ্রস্থান বা নন্দনতাত্ত্বিকদের বক্তব্য উদ্ধার করেও বোঝা যেতে পারে। অর্থবোধের মানসিক ব্যুৎপত্তি ও বিস্তারের সূক্ষ্ম-অথচ সুদৃঢ় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, বারবার সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, যাকে বলা যায় নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যান, দিয়েও সুন্দর-অসুন্দরের সীমা ও সম্বন্ধ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা যায়। কুৎসিত সুন্দরের বিরোধী না কি সম্পূরক ? যদি বিরোধধর্মী কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ও তবু তারা সম্পূরক হতে পারে কি না ? আমার মনে হয়, তা হতে পারে এবং হয়ও। বিষম রূপ, বিষম রস এবং উভয়েরই কোনো কোনো সমগ্রসন্ধিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সম্ভব। সামঞ্জস্যের এই বোধ বা উপলব্ধি নিছক বস্তুর স্বরূপ, জ্যামিতি, রঙ বা ধ্বনি থেকে বোঝা যাবে না। বিষয়বস্তুর শিল্পবস্তুতে রূপান্তরণের জন্য সহায়ক পটভূমি, সহৃদয় সমাজ, অনুকূল ঐতিহ্য প্রভৃতিও সাহায্য করে। যথাযথ মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত এবং সমধর্মবিবর্ধক সঙ্কেত শিল্পকর্মের অর্থ উন্মোচনে সাহায্য করে। যদি দর্শক, শ্রোতা বা পাঠক শিল্পকর্মের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হয় তাহলে শিল্পকর্ম অল্পাধিক অনাস্বাদিত থেকে যায়, ব্যর্থ হয়। ফলত একই শিল্পকর্ম এক ব্যক্তির বা এক সমাজের কাছে কম আদৃত এবং অন্য ব্যক্তির বা সমাজের কাছে বেশি আদৃত হয়। এমনও দেখা গেছে যে অনাদৃত শিল্পকর্ম দেশান্তরে, কালান্তরে সমাদৃত হয়। শিল্পবস্তু উপভোগের এই দিকটির বিশ্লেষণ করলে সৌন্দর্যের অন্য একটি দিক উন্মোচিত হয়।

আগে আমি বলেছি যে, অর্থবোধের মানসিক ব্যুৎপত্তি ও বিস্তারের ক্রমাম্বয়ী সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যান, সৌন্দর্যের সীমা নির্ণয়ে সাহায্য করে। তার আগে আমি বলেছি, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সমাজ ও ঐতিহ্য আশ্রিত। এবার আমি বলতে চাই : শিল্পবস্তুর সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য উপলব্ধিতে এই দুটি দিকই সংশ্লিষ্ট, সক্রিয়। নান্দনিক অনুধ্যানে মন শিল্পবস্তুর বিষয়গত দিকে চালিত হয়। কিন্তু বিষয়গত দিকটি শিল্পবস্তুর বস্তুরূপটি মূলত প্রকাশ করে না,—প্রকাশ করে তার সৌন্দর্যসঞ্চারী অঙ্গাদি ও উপকরণ। বিশ্লেষণাত্মক অনুধ্যানে সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। যা সুন্দর বিষয় হিসেবে তা সামগ্রিক অর্থে এক হলেও আসলে তা

অনেক কিছুর ঐক্য, বৈচিত্র্যময় ঐক্য। এবং তাতে সুন্দর ও অসুন্দর দুয়েরই সহাবস্থান সম্ভব। সৌন্দর্য অভিজ্ঞতার আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দের আকাঙ্ক্ষাধর্ম,অভিজ্ঞাত শিল্পবস্তুর বিষয়রূপটি মনশ্চক্ষে প্রস্ফুট করে তোলে। আকাঙ্ক্ষাধর্মী অভিজ্ঞতার বিকাশ, প্রগতি ও স্তর সর্বদা এক নয়। বিশেষত নান্দনিক অভিজ্ঞতায়, যেখানে জ্ঞানমানসের ভূমিকা গৌণ, আকাঙ্ক্ষাধর্মবশত অভিজ্ঞতার বিকাশ বিষয়মুখী হলেও তার প্রগতিতে বহু বৈচিত্র্যের এবং বিভিন্ন স্তরে বহু বিন্যাসের সম্ভাবনা, মুক্তিরই ইঙ্গিতবাহী সম্ভাবনা, থেকে যায়। সৌন্দর্য অভিজ্ঞতায় মন অপ্রমত্ত স্বাধিকারমগ্ন। নানা বৈচিত্র্য ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নান্দনিক অভিজ্ঞতায় মন বিষয়ের দিকে এগিয়ে যায়, বিষয়ের অনুধ্যানে স্থির থাকে, বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। আবার কখনো বা মন বিষয়কে স্মৃতিতে বা কল্পনায় পরিক্রমন করে। মনের এই স্বাধীনতা, স্বাধীন সক্রিয়তা, আকাঙ্ক্ষাধর্মিতার সঙ্গে একত্র হ'য়ে শিল্পবস্তুর সমগ্রসন্ধিকে স্মৃতিতে, কল্পনায় এবং এমনকি প্রত্যক্ষেও বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলতে পারে। বিশ্লেষনের জন্য কুৎসিত সমগ্রসন্ধি সুন্দর এবং সুন্দর সমগ্রসন্ধি কুৎসিত প্রতিভাত হতে পারে ; বস্তুত হয়েও থাকে। এই গূঢ় তত্ত্ব কথাটি নানাভাবে সাধারণ কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়।

কেউ বলে, "দেখার চোখ নেই তাই অমুক সুন্দর ছবিটিকেও তুমি বললে অসুন্দর" ; কিম্বা, কেউ বলে, "যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা" প্রভৃতি। রুচি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ধারণা দিয়ে সুন্দর-অসুন্দর সম্পৃক্ত এসব বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা অনেকটা ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকটা করা যায়, সবটা নয়। রুচি, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রমুখ ধারণাগুলিও মনের স্বাধীন সক্রিয়তা-অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষাধর্মিতা এবং (তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত) শিল্পবস্তুর স্বরূপ দিয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত। স্বীকার করা ভালো, শিল্পবস্তুর স্বরূপ বস্তুর স্বরূপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে না। শিল্পীর রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি, এক কথায় শিল্পীসত্তার স্বাধীন সক্রিয়তা, শিল্পবস্তুর বস্তুরূপকে আবৃত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে পারে বটে, কিন্তু তাও নির্দিষ্ট দেশে-কালে, সমাজে ও ইতিহাসে, অল্পাধিক সীমাবদ্ধ। সুন্দরী নারী, মধুর সুর, এমন-কি মধুর স্বর, ভালো চিত্র, ভালো চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ধারণা, সুচিন্তিত অভিমতও, বিভিন্ন সমাজে ও সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। অনেক সময়ে শুনেছি, "brainless beauty does not make a good wife but only a fashion model or an air hostess।" নির্দয় পুরুষের দাম্ভিক উক্তি। এসব ক্ষেত্রে হয়ত বলা হবে "সৌন্দর্য ও প্রয়োজন—এই দুটি স্বতন্ত্র ধারণার মধ্যে গোলমাল হয়ে গেছে।" বিশ্লেষণ'করলে সৌন্দর্য অভিজ্ঞতায় বস্তু, রূপ, রস, অর্থ প্রভৃতি বহু-কিছুই সমগ্রসন্ধিতে একত্র হয়ে যায়। একে "গোলমাল" না ব'লে বরং ভালো ক'রে

বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী সীমানা যে টানা যায় না তার কিছু "কারণ" বিষয়ীগত, কিছু বিষয়গত, বস্তুগত। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যা সামাজিক তা-ও বিষয়গত, বস্তুগত রূপ পরিগ্রহ করে। তবে এই রূপপরি-গ্রহণের সঙ্গে শিল্পীর ও শিল্পরসিকের স্বাধীন সক্রিয়তার মধ্যে মৌলিক বিরোধ নেই। বিরোধ যা দেখা দেয় তা-ও সামাজিক, ঐতিহাসিক।

নানাভাবে এই সাধারণ সত্যটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। এক, রসবোধ, রুচিবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি যে প্রাথমিক স্তরেই দেশ-কাল-পাত্রসাপেক্ষ তা দেখানো যেতে পারে। দুই, রূপ, রীতি, বিন্যাস প্রভৃতিও সৌন্দর্য-বিচারে আপেক্ষিকধর্মী। এদের আপেক্ষিকতা দ্বিতীয় স্তরের। মনেরাখা দরকার যে রূপ নানা স্তরের এবং, বলাবাহুল্য, সব রূপই সমান মৌলিক নয়। একই কারণে রীতি ও বিন্যাস তাদের সাধারণত্ব ধর্মবশত দীর্ঘস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী হয়। রুচিবোধ ও রসবোধের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো বিপ্লব দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার সাধারণ নিয়ম খাটে না। তিন, শিল্পবস্তুর যে-দিকটা তুলনায় সব থেকে বেশি স্থায়ী ও সাধারণগ্রাহ্য তাহল অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনার দিকটি। ধ্রুপদী সাহিত্য (যথা, মহাকাব্য), চিত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্পবস্তুর আবেদন ও "কালজয়ী" সার্থকতার মূলে রয়েছে অর্থ, তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাদি। ইতিহাস-সিঞ্চিত মূল্যবোধের সংগ্রহকে বলা হয় ঐতিহ্য। যা কালজয়ী তাকে অতিশয়োক্তিচ্ছলে বলা হয় শাশ্বত। আজ যা ধ্রুপদী তা নিত্যকালের ধন নয়; তা বহুকালের সম্পদ। ইতিহাসমাত্রই সামাজিক মানুষের ইতিহাস। অনেকে তাই শিল্পবস্তুর সৌন্দর্যকে বলেন "সামাজিক আরোপন" ("socio-historically conferred status")। এটা অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের উন্নত ও আধুনিক সংস্করণ এবং আমার মতে অংশত সত্য। প্রশ্ন থেকে যায়: কেন এক যুগের শিল্পের মূল্য ও মর্যাদা অন্য যুগে অনুরূপভাবে স্বীকৃত হয় না? আদৌ কেন এই আরোপন সামগ্রিক সামাজিক রূপ পরিগ্রহণ করে? সৌন্দর্য যদি আরোপিত সত্তা হয় তাহলে সে সত্তা সামগ্রিক বা সর্বজনস্বীকার্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বাধীন রসিকের বিচারে "সর্বজনস্বীকৃত" যা সুন্দর তা-ও অসুন্দর ব'লে মনে হতে পারে। এবং বস্তুত হয়ও। এই সব কারণে ও প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না ব'লে "সামাজিক আরোপন" তত্ত্ব আমার কাছে অর্ধ সত্য মনে হয়; পূর্ণ সত্য মনে হয় না।

সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্য সম্পর্কিত পূর্ণ সত্য তত্ত্বে যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পরসিকের ইচ্ছা, অনুভব ইত্যাদির সৃষ্টি নয় তা সবের যথাযোগ্য স্বীকৃতি প্রয়োজন। শিল্প সৃষ্টিতে যে অনুকরণের ভূমিকা অনিবার্য তা আমরা অন্যত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি। যার অনুকরণ তা কল্পনা বা ইচ্ছাপ্রসূত নয়। এমন-কি শিল্পবস্তু সৃষ্টির অনুরোধে বস্তুজগতের মনোরম

রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় রূপ ও অন্যান্য অনুকরণ, রীতি প্রভৃতিকে যে যেমন খুসি ব্যবহার করতে পারে না। সৌন্দর্য সৃষ্টির দাবির কাছে শিল্পীর ইচ্ছা ও কল্পনাকেও অংশত অনুগত হতে হয়। সুন্দরের ভাব শুধু অনুভব নয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহের ইঙ্গিতও বহন করে। এই বিশেষ অর্থে সুন্দরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য। শিল্প-স্বাতন্ত্র্যের এই স্বীকৃতি, বলাবাহুল্য, ক্রোচে-কলিংউডদের কলাকৈবল্যবাদ বা শিল্পের মুক্তি তত্ত্ব থেকে মূলত পৃথক।

নগ্ন ও উলঙ্গ

সৌন্দর্য মূলত অনুভবসিদ্ধ হলেও তা বিচার্যও বটে। তবে সুন্দর-অসুন্দর বিচারের পরিধি অনুভবের প্রভাবে-প্রাবল্যে বহু বিস্তৃত, বিচিত্র। অনুভবের উৎস ও বিকাশ অনুসরণ করাও কঠিন। সাধারণত অনুভবের প্রকাশকে অবলম্বন ক'রেই আমরা নান্দনিক অনুভবের উৎস সন্ধান করি ও তার বিকাশধারা বুঝতে চেষ্টা করি। সহজ কথায় বলা যায়, সৌন্দর্য অনুভব সমাজায়ত। কিন্তু এ কথার মর্ম বোঝবার জন্য বিশ্লেষণ, সৌন্দর্য অনুভবের বিশ্লেষণ, আবশ্যিক।

কোন একটি অনাবৃত বা বিবস্ত্র নারীদেহ বা পুরুষদেহ সুন্দর কিনা ?—এই প্রশ্নের একটি তাৎপর্য হতে পারে নিছক গঠনগত, শারীর বিজ্ঞানের নিয়মানুসারী, অপর একটি তাৎপর্য হতে পারে নান্দনিক। বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ প্রয়োজনে এই তাৎপর্যের আরো প্রকারভেদ হতে পারে। আমি এ-প্রবন্ধে নগ্ন ও উলঙ্গের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করব তার তাৎপর্য মূলত নান্দনিক। কিন্তু, যেহেতু, আমার ধারণা, সৌন্দর্যের অনুভব ও বিচার উভয়ই সমাজায়ত, আমি দেখাতে চাইব যে নগ্ন দেহের নান্দনিক চেতনা সার্বভৌম নয়। দ্রষ্টার মনোভাব (ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ইষ্ট-অনিষ্ট-বোধ প্রভৃতি) তো বটেই দৃষ্টের (তা সে মানুষের দেহ বা নিসর্গ-দৃশ্য যা-ই হোক না কেন) প্রকাশ-চরিত্র, তার (দেশ-কালসহ) পরিমণ্ডলও সৌন্দর্য-বিচারকে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য-অনুভব কখনো-কখনো এর ফলে আচ্ছন্নও হয়ে যায়। বলে রাখা ভালো, সৌন্দর্য অনুভব ও বিচারের আওতায় অসুন্দরের উপস্থিতি বা তার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। অনাবৃত একটি দেহ উলঙ্গ (এবং সে-জন্য অসুন্দর) নাকি নগ্ন (ও সুন্দর) তা অনুভবসিদ্ধ হলেও সেই অনুভব নান্দনিক বিচারের উন্মোচনী দৃষ্টির সামনে তার আন্তর পরিচয় পাপড়ি মেলে দেয়। বিচারের নিপুণ-কোমল আঙুল অনুভবের পাপড়িগুলি না ভেঙে' খুলতে পারে। লক্ষ্যণীয় হল : নান্দনিক অনুভব (তা সে নগ্ন-সুন্দরের বা উলঙ্গ-অসুন্দরের যারই হোক না কেন) নিরেট, নির্ভাজ, অখণ্ড এক নয়। এই অনুভবে ভাজ বা স্তরতরঙ্গ আছে, খণ্ডের সমাহার বা ঐক্য আছে। মের্লো পঁতির মতো কিছু দার্শনিক-মনস্তাত্তিক আছেন যারা "নিরেট" শারীর অনুভবেও স্তর-তরঙ্গ আছে ব'লে স্বীকার করেন। মুশকিলের মূলে রয়েছে ইংরাজী শব্দ ঈস্‌থেটিক্‌স্‌-এর গ্রীক মূল *aisthetikos* (যা শারীর সংবেদন বা অনুভবের থেকে অভিন্ন)। বরং সংস্কৃতজ "অনুভব" শব্দটি এই দিক থেকে

বেশী অর্থবহ। কারণ, অনুভব যে ভাবধর্মী, ভাবানুসারী, তা ঐ শব্দের প্রকট অর্থ থেকেই যে কেউ বুঝতে পারে।

যে দেহ প্রাথমিক দৃষ্টিতে কারু চোখে উলঙ্গ সেই দেহই ঐ দর্শকের দৃষ্টিতে ক্রমে নগ্ন প্রতীয়মান হতে পারে। বিপরীতটিও ঘটতে পারে। নান্দনিক অনুভবের এই আপেক্ষিকতা শুধু মানুষের দেহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, নৈসর্গিক বস্তু বা দৃশ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মেঘাবৃত আকাশ কখনো যার চোখে সুন্দর লেগেছিল তার চোখেই কখনো আবার মেঘমুক্ত আকাশ সুন্দর লাগতে পারে। নান্দনিক অনুভবের এই আপেক্ষিকতার ব্যাপারটি খুব সাধারণ কিন্তু যা ঠিক সাধারণ নয় তা হল এই: অনুভবকে বিচার করতে গেলে স্বীকার করতে হবে যে এ-বিচারের ভিত্তিতে এমন কিছু আছে বা বিচার্যের তুলনায় স্থির, স্থায়ী। যে-ব্যক্তি প্রথম অপ্রস্তুত মুহূর্তে তার বিবস্ত্রা মডেল (নারী) কে দেখে মনে করতে পারে "উলঙ্গ···অশ্লীল···" সে-ব্যক্তিই তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে অনুভব করতে পারে "সুন্দর···নগ্নতার নিঃশেষ স্বাভাবিকতায়ই সৌন্দর্য সার্থক-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে···।" এই ভাষা অনুভবের স্তর উত্তীর্ণ হয়ে বিচারের স্তরেও স্থায়ী হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে নগ্ন ও উলঙ্গের পার্থক্যকে ব্যক্তির অনুভব-নিরপেক্ষভাবে বোঝবার চেষ্টা করা আবশ্যিক। উলঙ্গ নারী-দেহ অনুভবের বিষয় হতে পারে, ভাবনা বা বিচারের বিষয়ও হতে পারে। শুধু হতে পারে না। হয়ে থাকে। মেঘে-ঢাকা সূর্য এবং মেঘ-মুক্ত সূর্য—উভয়ের সৌন্দর্য অনুভবসিদ্ধ হয়েও বিচার্য। অর্থাৎ অনুভবের বিষয় হিসেবে তারা নিঃশেষ নয়,—বিচারের অবকাশ সেখানেও আছে।

অনুভবের মধ্যে যে স্তর-তরঙ্গ আছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে অন্তত তিনটি স্তর-তরঙ্গের পার্থক্য দেখান যাবে। "অন্তত" বলছি এই জন্য যে দেহ-মন এমনই "নমনীয়" ও "গভীর" বস্তু যে এর মধ্যে স্তর-তরঙ্গের সংখ্যা, উদ্ভব ও বিলয় সঠিকভাবে বা নির্দিষ্টরূপে দেখানো শক্ত। অনুভবের একটি স্তর প্রধানত নিষ্ক্রিয়, দেহাশ্রয়ী ও অন্তর্মুখী। এই স্তরে অনুভবের বিষয় দেহ-মনের আশ্রয়ে লুপ্ত প্রায়: তাকে চেনা দায়। অনুভব দুর্বল হলে তো বটেই প্রবল হলেও এক্ষেত্রে তার বিষয়ের রূপ ও গুণ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চেতন। অনুভব-চেতনায় বিষয় বিস্মৃত প্রায়। বিষয়ের রূপ-গুণভেদে দেহ-মনের জগতে তার পরিচয়ভেদ ঘটে। সমুদ্র বা আকাশের অনুভব সাধারণত যতটা নিষ্ক্রিয়, অন্তর্মুখিতায় লীন হয় পথ, পার্ক ও দালান ভরা একটি শহরাঞ্চলের অনুভব ততটা নিষ্ক্রিয় ও অন্তর্মুখী হয় না। বিষয় যখন জটিল, অনেক কিছু নিয়ে তৈরী, যা নিয়ে তৈরী তার রূপে যদি প্রকটতা ও বৈচিত্র্য থাকে তবে তার অনুভবকে বড় সহজে অন্তর্লীন করা যায় না। প্রথম স্তরের মধ্যে উপ-স্তর আছে।

দ্বিতীয় স্তরে অনুভবকে বলা যায় মূলত প্রতিক্রিয়াধর্মী। বিষয়কে অস্পষ্টভাবে মনে রেখে অনুভবের এই উৎক্ষেপণ ও আন্দোলন লক্ষ্যচেতন নয়। অনুভবকারী এই স্তরে সক্রিয়। সক্রিয়তার আধিক্য একদিকে তাকে করে চঞ্চল, অন্যদিকে বিষয়ের রূপ-গুণ সম্পর্কে সম্যকভাবে তার সচেতন হবার পথে হয়ে ওঠে অন্তরায়। প্রতিক্রিয়ায় মন উন্মূলও বটে, লক্ষ্যচ্যুতও বটে। প্রায়ান্ধ আন্দোলনই এ-স্তরে মূল উপভাগ্য। প্রতিক্রিয়ার প্রাবল্যে অনুভব উন্মূল হতে পারে না, লক্ষ্যচ্যুত হয়েও সম্পূর্ণ লক্ষ্যচ্যুত হয় না। যদি তা হত তাহলে প্রতিক্রিয়া-প্রধান অনুভবের উৎস-সন্ধান ব্যর্থ হত, তাকে নিয়ে আসা যেত না বিচারের নির্দিষ্ট অথচ মুক্ত অঙ্গনে। অনুভবের তৃতীয় স্তরে লক্ষ্য করি বিচারের সূত্রপাত। অনুভব তখন দেহ-মনের সীমা অতিক্রমনে প্রয়াসী; প্রয়াস ব্যর্থ; তবু লক্ষ্য-চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। যা "নগ্ন" অনুভবের কোন স্তরে তা ভাসমান, কোন তরঙ্গে তা আন্দোলিত তার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে তাকে নগ্ন বলা হবে নাকি উলঙ্গ বলা হবে। এটা নিছক বলার ব্যাপার নয়, অনুভবসিদ্ধ বিষয়ের বিচারমুখী প্রকাশ। রতিমগ্ন দেহ-মনও কখনো সম্পূর্ণ বিচার-বিমুখ হতে পারে না। এটা মনোময় জীব—মানুষ—হবার দায়।

প্রাক্-বিচার স্তরে নগ্ন ও উলঙ্গের পার্থক্য অস্ফুট,—কিন্তু অনুপস্থিত নয়। অনুভবের স্তর-ভেদে অস্ফুটতারও স্তর-ভেদ ঘটে। দেহ-মনের অন্তর্লীন প্রাথমিক স্তরে এই অস্ফুটতা অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমিক স্তরে অস্ফুটতা অপসৃয়মান কিন্তু পার্থক্যের ভাবটি রূপ পরিগ্রহণ করেনি। যদিচ নির্দিষ্ট ভাব-রূপের পার্থক্য লক্ষ্য-চেতন অনুভবের তৃতীয় স্তরেও স্পষ্ট নয়, তবু শিল্পী বা শিল্প-রসিক বুঝতে পারে কোন মূর্তি, চিত্র বা বর্ণনাটি মূলত নগ্ন কিংবা উলঙ্গ। সমালোচক প্রশ্ন তুলতে পারেন: অনুভবের যে-আপেক্ষিকতা থেকে নগ্ন/উলঙ্গের পার্থক্যকে মুক্ত করার জন্য আমরা অনুভবের স্তর-ভেদের বিশ্লেষণ করছি এবং অনুভবে অনুস্যূত বিচারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি সে-ই আপেক্ষিকতাই কি ব্যক্তি-ভেদের (রসিক-অরসিকের) ঘোরানো পথে ফিরে আসছে না? নগ্ন/উলঙ্গের পার্থক্য কি তবে শিল্পীর বা শিল্প-রসিকের অনুভব-সাপেক্ষ? সাধারণ মানুষের অনুভবে তা ধরা পড়ে না? এই প্রশ্ন শুধু আপেক্ষিকতার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীরতর নান্দনিক জিজ্ঞাসা: সকল সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ কি সুন্দর/অসুন্দরের পার্থক্য-বিচারে অল্পাধিক সমর্থ নয়? এই বিচারের জন্য কি যথার্থ নান্দনিক বিচারককে ঈশ্বরদত্ত বা প্রকৃতিদত্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে? —না, আমার তা মনে হয় না। সাধক রামপ্রসাদ "উলঙ্গ" কালীমূর্তিতে সুন্দরী মা'কে দেখেছেন। জীবনানন্দ কুষ্ঠ রোগীকে বেহালা বাজাতে দেখেছেন। এই কৃতিত্ব (বা "বিশেষ ক্ষমতা") শুধু রামপ্রসাদের সাধকত্বে বা জীবনানন্দের কবিত্বে খুঁজলে ভুল হবে।

সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ উলঙ্গ/নগ্ন, সুন্দর/অসুন্দরের যে পার্থক্য করে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য "সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ"—এর একাধিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ ক'রে লাভ হবে না। তার থেকে বরং সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষেরা বিভিন্ন দেশ-কালে, (অসতর্ক) বাস্তব জীবনে এই বিষয়ে তাদের মনোভাবের যে-সব প্রকাশ-প্রমাণ (কথায়, আচরণে বা অন্যভাবে) রেখে যায় তার সহৃদয় বিশ্লেষণ অনেক বেশী ফলপ্রসূ। মনস্তাত্ত্বিকতায় নিহিত উগ্র আপেক্ষিকতাবাদের দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা,—শাশ্বতবাদ বা অনৈতিহাসিক বুদ্ধিবাদ নয়।

একটি দেহ আবৃত হলে সুন্দর হবে, নাকি অনাবৃত হলে সুন্দর হবে, নাকি কিছুটা আবৃত ও কিছুটা অনাবৃত হলে,—এই জাতীয় প্রশ্নের সদুত্তর "হাঁ" বা "না" ব'লে এক কথায় দেওয়া যায় না। সুন্দর হওয়া বা সুন্দর হয়ে থাকা এবং সুন্দর লাগা—এই দুটি জিনিষকে পৃথক করা আবশ্যিক। যা সুন্দর লাগে সুন্দর লাগার সম্ভাবনারূপে বা বস্তুরূপে কোনো-না-কোনো ভাবে, মোটামুটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে, তার অস্তিত্ব (না জানলেও) মানতে হয়। তা না হলে চরম একটি বিপরীত মত মেনে নিতে হয় এবং সেটি হল : দ্রষ্টাই স্রষ্টা,—একরকম দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ। বলাবাহুল্য, এই মতের অসুবিধা বহু ; যা কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। মূল অসুবিধা হল : সুন্দর লাগা ও সুন্দর হওয়াকে, অভিন্ন মনে করলে সুন্দর-অসুন্দরের বিচার অসম্ভব হয়ে ওঠে। অথচ সুন্দর-অসুন্দরের নান্দনিক বিচার যে সম্ভব তা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও সাহিত্যিকের শিল্পকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত এবং শিল্প-রসিকের সমালোচনা থেকেই স্পষ্ট।

বিষয়কে নানাভাবে দেখা বা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে : বস্তুরূপে (ত্রি-মাত্রিক দেশ-কালে), স্থায়ী ভাবরূপে, সঞ্চারী অনুভবরূপে, কিংবা এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো রূপে। চর্ম চক্ষু থেকে একটি ত্রি-মাত্রিক দেশ-কাল-আয়ত বস্তুকে (একটি গাছ কিংবা মানুষের দেহকে) মনশ্চক্ষে বা স্মৃতিতে আনা ও রাখা (অন্তত প্রাথমিক স্তরে) অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অমূর্ত একটি ভাবকে (তা সে শক্তি, প্রেম বা করুণা যারই হোক না কেন) চেতনায় ভাসিয়ে রাখা সহজ নয় : তার জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষযোগ্য বা প্রতীকিত কোনো অবলম্বন। অনুভব ভাবের তুলনায় যেহেতু আরো সঞ্চারী, রূপান্তরে চঞ্চল, তাকে চেতনায় ভাসিয়ে রাখা আরো শক্ত। সহজ বা শক্ত যা'ই হোক না কেন তবু প্রত্যক্ষের বস্তুকে তো বটেই ভাবের, কল্পনার ও অনুভবের বিষয়কেও (অনুধ্যানে মনে স্থায়ী ক'রে) বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা যায়, তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি-তর্কেরও অবতারণা করা যায়। তবে বিজ্ঞানীর বস্তু-বিচার ও দার্শনিকের ভাব-বিচারের থেকে শিল্প-সমালোচকের (নগ্ন/উলঙ্গের মতো) শিল্প-বিষয়ের বিচার অনেকাংশেই ভিন্ন।

ভাব, কল্পনা বা অনুভব,—চেতনার যে রূপ থেকেই শিল্পী-মনের যাত্রা সুরু হোক না কেন তার নান্দনিক আকৃতি প্রকাশ-প্রয়াসী,—সাধনাকে প্রকাশে সিদ্ধ করতে চায়। এই প্রকাশকে কেউ কেউ (ক্রোচে-কলিংউড প্রমুখরা) অন্তর্লীন সিদ্ধি ব'লেই ক্ষান্ত। ভাষার পটে বা অন্য কোন আধারে প্রত্যক্ষযোগ্য, বুদ্ধিগম্য ভাবে বা অন্যভাবে শিল্পের বিষয়কে প্রকাশ করার পূর্বে তার একটি ভাব-সিদ্ধ রূপ যে শিল্পী-মনে থাকে বা থাকতে পারে সে-সম্ভাবনা আমি আগেই স্বীকার করেছি। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের অস্বীকৃতিই প্রকারান্তরে এই প্রাক-প্রকট প্রকাশ পর্বের স্বীকৃতি। কিন্তু এই প্রাক-প্রকট প্রকাশ তত্ত্বটি কিংবা এর একটি চরম ভাষ্য—যাকে বলা যেতে পারে অ-প্রকাশ[১] প্রকাশ[২]—নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। প্রকাশ[১] শিল্পের স্বরূপ (-ভাব): প্রকাশ[২] (প্রত্যক্ষযোগ্য) আঙ্গিক। প্রবন্ধান্তরে তা আমি কিছুটা আলোচনাও করেছি। বহিঃপ্রকাশকে সঞ্চারের নিছকই বহিরাঙ্গিক মাধ্যম বা উপায় ব'লে মনে করলে, প্রকাশের গ্রহণযোগ্য একটি অর্থই মাত্র অবশিষ্ট থাকে: আর সেটি হল নান্দনিক চেতনার একটি আন্তর বা অনুভব (বোধি) সিদ্ধ রূপ। শিল্পের স্বরূপ সঞ্চার (কমিউনেকশন বা বহিঃপ্রকাশ) সর্বস্ব না-হলেও ভাষায়, পটে বা অন্য কোন উপায়ে/বস্তুতে নান্দনিক চেতনাকে ধরে রাখা এবং অন্তত রসিকজনের পক্ষে অনুভব করবার মতো করে তোলার দায়িত্ব পালন করা শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য।

বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন যুগের সাধারণ ও অ-সাধারণ সকল শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের আমরা বুঝি, উপভোগ করি। "শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে" বা এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহার করলে, আমি জানি, প্রকাশবাদীরা অভিযোগ তুলবেন যে আমরা শিল্পের আঙ্গিকের সঙ্গে শিল্পের স্বরূপকে একাকার করে ফেলছি। শিল্পের সঞ্চার-অঙ্গ, বহিঃ-প্রকাশের শব্দ, রঙ ইত্যাদি বাদ দিয়ে স্বরূপে স্ব-প্রতিষ্ঠ শিল্পকে তার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে বোঝবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই চেষ্টার পূর্ব-প্রকল্পই ভুল। শিল্প বুঝবার জন্য রসিককে শিল্পের স্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন আত্মা বা একাত্ম হবার বিশ্বাসটিই ভুল। একাত্ম হবার রূপকটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু রূপক রূপকই। শিল্প রসিকের পক্ষে যে সহমর্মিতার প্রয়োজন রয়েছে এই গূঢ় সত্যটি ঐ একাত্ম হবার রূপকের মধ্যে লুকায়িত।

শিল্প-কর্মে তো বটেই প্রতিকৃতি অঙ্কণে এবং এমন-কি আলোকচিত্র গ্রহণেও শিল্পীর ভাব বা অনুভবের প্রকাশ—প্রচ্ছন্ন বা প্রকট যে-ভাবেই হোক না কেন—অনিবার্য। আলোকচিত্র গ্রহণেও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। রচনা বা গ্রহণ-কৌশল (কম্পোজিশন), দৃষ্টিকোণ, দূরত্ব, আলোর উজ্জ্বলতা ও ছায়ার নিবিড়ঘনতা বা লঘুতা প্রভৃতির বিভিন্ন সমন্বয়ে আলোকচিত্রও শিল্পের ধর্ম অর্জন করতে পারে। ক্যামেরার

লেন্সের চোখেও উচ্চাঙ্গের আলোকচিত্রশিল্পী ভাব-অনুভাবের ভাষা, ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলতে পারে। প্রতিকৃতি অঙ্কণে শিল্পীর দক্ষতা ও প্রতিভা-প্রকাশের সুযোগ আরো বেশী। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। কোনো এক রাজার চিত্র রাজ-দরবারে রাখার জন্য যদি আঁকা বা খোদাই করা হয় তবে সাধারণত গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভাবটি ফোটাবার চেষ্টা হবে। সেই রাজাকেই যদি প্রেমিকভাবে কোন শিল্পী দেখাতে চায় তবে সে অন্য পন্থা নেবে। যদি তাকে উপহাস্যাস্পদ ক'রে তুলতে চায় শিল্পী তাহলে তার অন্য কতগুলি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাবে ও পরিপার্শ্বকে লক্ষ্য অনুসারে উপস্থাপন পরিবর্তন করবে। কিন্তু বস্তু-বিচারে রাজা, প্রেমিক-রাজা এবং উপহাস্যাস্পদ রাজা একই ব্যক্তি: কেউ বলতে পারে, "এক হয়েও ঠিক এক নয়।" "ঠিক এক না হবার" কারণ শিল্পীর সৃষ্টিধর্ম, অন্ধ অনুকৃতি নয়,—সৃষ্টির জন্য কিঞ্চিৎ বিকৃতি, নান্দনিক বিকৃতি। অ-নান্দনিক বিকৃতি রসবিকার ঘটায়, কখনো রসবিনাশ ঘটায়; নান্দনিক বিকৃতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন। অ-সুন্দরমাত্রই যেমন অ-নান্দনিক নয়, শিল্পসৃষ্টির বাধক বা অন্তরায় নয়, তেমনি বিকৃতি-মাত্রই অ-নান্দনিক ও রসসৃষ্টির অন্তরায় নয়। বলাবাহুল্য, "বিকৃতি" আমি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করছি। শিল্পের মাধ্যমভেদে অনুকৃতি ও বিকৃতি, এক কথায়, শিল্প সৃষ্টির স্বাধীনতার, কিছু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যে-ভাবপ্রকাশের জন্য পট বা কাগজ উপযুক্ত মাধ্যম সেই ভাব প্রকাশের জন্য পাথর বা কাঠ উপযুক্ত মাধ্যম নয়।

ইংরাজী ও আরো অনেক ভাষার মতো বাঙ্গলা ভাষায়ও উলঙ্গ ও নগ্ন এই দু'টি ধারণার মধ্যে পার্থক্য প্রচলিত ভাষা থেকেই এসেছে। উলঙ্গ মানুষের কথা মনে হলে ভাষার ব্যবহার ধর্মে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তার আবরণ-বস্ত্রাদি ছিল কিন্তু পরে তা সে নিজে ফেলে দিয়েছে কিম্বা অন্য কেউ তা কেড়ে নিয়েছে। উলঙ্গ কেউ থাকে না। (ভাবখানা যেন) উলঙ্গ কেউ হয় বা কাউকে করা হয়। উলঙ্গ হবার বা করার পূর্ববর্তী রূপটি পরবর্তী রূপটির তুলনায় নান্দনিক উপভোগের দিক থেকে অধিক কাঙ্ক্ষিতও বটে। এই নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা—উলঙ্গ-পূর্ব রূপের আকাঙ্ক্ষা—অনেকটাই হয়তো ঐতিহ্য-অনুসারী ও সমাজায়ত কিন্তু আকাঙ্ক্ষার এই চরিত্র তার গুরুত্ব কিছু কমায় না। ফলে মানুষের যে-রূপটি মানুষ আবৃত, কোনো-না-কোনোভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত, দেখতে অভ্যস্ত—এবং অভ্যাসটি ঐতিহ্য-অনুসারী ও সমাজায়ত—সে-রূপটিকে হঠাৎ, পর্যাপ্ত আন্তর-বাহিক পরিবেশ সৃষ্টি না ক'রে, অনাবৃত বা বিবস্ত্রভাবে উপস্থাপন করলে তা (শরীর-বিজ্ঞানের বিচারে নিখুঁত হলেও) রসিকের সৌন্দর্যবোধকে আহত করে। মানুষের শরীর স্বাভাবিক-ভাবেই (অর্থাৎ অস্থি-সংস্থান, পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপে ও সংযোগেই) সুন্দর। শরীরের স্বাভাবিক রূপটি সুন্দর হলেও এ-কথা মনে রাখা দরকার যে তার আবরণ-

আচ্ছাদনে ঘেরা রূপটিও এক অর্থে (সভ্য সমাজে) খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাভাবিক রূপ থেকে অন্য একটি স্বাভাবিকরূপে আকস্মিক ও অপ্রস্তুত প্রস্থানে মানুষের রুচিবোধে ধাক্কা লাগে। এই ধাক্কামাত্রকেই যে সর্বদা পাল্টাতে হবে,—এমনটি ভাবলে ভুল হবে। এক "স্বাভাবিক" রূপে রূপান্তরণের প্রাথমিক পর্ব পরিশীলিত রসবোধকে পীড়া দিতে পারে, ধাক্কা দিতে পারে। এ-সম্ভাবনা সম্পূর্ণ এড়াতে গেলে শিল্প-সৃষ্টিকে অন্ধ অনুকৃতির নামান্তর ব'লে মেনে নিতে হয়। বস্তুত ব্যাপারটি তো তা নয়।

প্লাতো তাঁর সিম্পোজিয়াম গ্রন্থে গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর ভেনাস সম্পর্কে উল্লেখ করছেন দুটি রূপের,—একটি স্বর্গীয় (celestial) অপরটি প্রাকৃতিক (naturalis)। লর্ড কেনেথ এই "প্রাকৃতিক" বিশেষণের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন "vulgar" (ভালগার), যা সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙ্গলায় হবে "গ্রাম্য" (যার মধ্যে মর্ত্য উলঙ্গতার ইঙ্গিত স্পষ্ট)। প্রথমেই স্বীকার করা উচিত, ভাষান্তরে (অনুবাদে) বিশেষণের তো বটেই বিশেষ্য পদেরও অর্থ বিভিন্ন রাখা বড় দুষ্কর, প্রায় অসম্ভব। তবু ভাব ও অনুভবকে যতটা সম্ভব অর্থান্তর না ঘটিয়ে অনুবাদের চেষ্টা করা হয়। এই দুটি রূপকে অনুসরণ ক'রে কেনেথ উল্লেখ করেছেন ভেনাসের অন্য দুটি তুল্য রূপের,—একটি স্ফটিকস্বচ্ছ (crystalline), অপরটি বনজ (vegetable) : প্রথমটি ভাবের অবগাহনে নির্মল, দ্বিতীয়টি পুষ্পে-পত্রে প্রাকৃতিক স্পর্শময়।[১] ভারতীয় পৌরাণিক দেবী কালীর দুটি মূর্তি সুবিদিত ;—একটি উলঙ্গ, রণরঙ্গিণী, ধ্বংসের শক্তি ; অপরটি মহীয়সী মাতৃরূপা, সৃষ্টিময়ী। পৌরাণিক উপাখ্যানে ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে দেব-দেবীর বিভিন্ন যেসব মূর্তি কল্পিত হয়েছে তার থেকে কবি-শিল্পীরা তাদের সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত উপাদান থেকে শিল্প-কর্মে উত্তরণ অনায়াস নয়। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পীর প্রতিভা, কল্পনা শক্তি ও দক্ষতা। শিল্পীর প্রতিভা যতই অ-সাধারণ হোক না কেন তার সৃষ্টিতে সমসাময়িক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রভাব পড়বেই। ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উত্থান-পতন, পরিবর্তন, ঘটে। তার সঙ্গে মূল সম্পর্ক কোন শিল্পীই ছিন্ন করেন না। বোধহয় করতে পারেন না। সম্পর্ক বজায় রেখেও শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে নতুন কিছু উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করেন। তা না হলে পাশ্চাত্যে ভেনাস ও এ্যাপোলো ও প্রাচ্যে শিব, শক্তি ও বুদ্ধের মূর্তি নিয়ে এত বিভিন্ন কল্পনা হত না। এটাও লক্ষণীয় যে ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্য বুদ্ধের মূর্তি কখনো নগ্নভাবে কল্পিত হয়নি। হয়েছে ব'লে অন্তত আমি জানি না।

ভেনাসকে খ্রীষ্টপূর্ব গ্রীসে ও ইতালীতে বনের (বোধহয় মূলত ফুল-সব্জি বনের) দেবী ব'লে কল্পনা করা হত। আসলে এই কল্পনা মাটির ফলন শক্তির প্রার্থনা। ফুল ও সব্জির সঙ্গে নির্মলতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ভাব ক'টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তবু দেখা

যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীসে বনদেবীর ফলন শক্তির মতো নিসর্গলগ্ন কল্পনায়ও নগ্ন নারীমূর্তিকে সহজে স্বাগত জানানো হচ্ছে না। কথিত আছে কস রাজ্যের লোকেরা প্রাক্সিটেলিসের তৈরী নগ্ন ভেনাস মূর্তি স্থাপন করতে অসম্মত হয় এবং সে-মূর্তি পরে উদার মতাবলম্বী স্নাইডসের লোকেরা সানন্দে গ্রহণ করে। স্নাইডস ছিল এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ। এখানে প্রাচ্যের স্পর্শ লেগেছিল। ভেনাসকে যে কামনার দেবী ব'লে কল্পনা করা হয়েছিল তার আদি উৎপত্তিস্থল সিরিয়া। গ্রীস দেশে এই দেবীমূর্তিকে কল্পনা করা হয়েছে শক্তির ও কামনার উগ্রতাকে পরিহার ক'রে। যদিচ এই মূর্তি কল্পনায় ইন্দ্রিয়-আবেদন উপস্থিত, তবু এর স্ফটিকোপম নির্মলতা অবিসংবাদিত।

প্রাক্সিটেলিসের ভেনাস মূর্তিকে ঘিরে আরো দু'টি বিখ্যাত স্ফটিকোপম ভেনাস মূর্তি কল্পিত হয়েছে: ক্যাপিটোলাইন ভেনাস ও মেডিচি ভেনাস। স্নাইডিয়ান ভেনাসের মতো ক্যাপিটোলাইন ভেনাস স্নানে যাবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু দ্বিতীয় জন যে নগ্ন এবং তাকে যে দেখা যাচ্ছে সে বিষয়ে যেন সে সচেতন। স্নাইডিয়ান ভেনাসের ডান করতল দিয়ে যদিও তার কটিতটান্ত আবৃত, তবু তার বক্ষ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং ভঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত সহজ। ডান পা'র উপরে বেশী ভর দিয়ে বাঁ পা ঈষৎ বাঁকা, বাঁ হাতে বস্ত্রাদি, আবৃত কটিতটান্ত এবং সর্বোপরি মুখের নম্র-মধুর ভাবটি—সব মিলিয়ে এক সহজ সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা। ক্যাপিটোলাইন ভেনাসের বাঁ হাতে আবৃত কটিতটান্ত, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার মধ্যে বাঁ স্তনের বৃন্ত, দু' হাতের ভঙ্গীতে লজ্জার ছন্দ, ডান পা ঈষৎ বাঁকা, দৃষ্টি, স্থির ও শান্ত, চুল স্নানের ছাঁদে বাঁধা। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, নগ্নতা যখন ঈষৎ আবৃতরূপে দেখান হয় তখন তার ইন্দ্রিয়-আবেদন তীব্রতর। সে দিক থেকে অনুভব করলে একথা অনস্বীকার্য যে, তার সলজ্জ ভাবটি সত্ত্বেও ক্যাপিটোলাইন ভেনাস মূর্তিতে (স্নাইডিয়ান ভেনাস মূর্তির তুলনায়) কামনার ভাবটি স্পষ্ট। মেডিচি ভেনাসের মূল দেহ-ভঙ্গীটি ক্যাপিটোলাইন ভেনাসের মতই। ডান পা'টি একটু বেশী বাঁকা—একটু বেশী রমণীয় পা'র আঙুলগুলির মাটি-ছোঁয়ানো ও গোড়ালিটি একটু উঁচুতে উঠানো। কিন্তু হাত দুটি একটু আড়ষ্ট। নাভি থেকে কটিতটান্তের দৈর্ঘ্য যেন একটু বেশী। দৃষ্টি স্থির; কিন্তু কম অর্থবহ। মেডিচি ভেনাসকে যদিচ অনেক শিল্পীই নারী সৌন্দর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্তিরূপে মেনে নিয়েছেন তথাপি এর মধ্যে সহজতার (স্নিগ্ধতার নয়) অভাব রসিকের দৃষ্টি এড়ায় না।

জ্ঞাত-অজ্ঞাত বহু শিল্পীই ভেনাসের মূর্তি কল্পনা করেছেন ও তা উত্তর কালের জন্য পাথরে রূপ দিয়ে গেছেন। প্রাচীন গ্রীসের শেষ (১০০ খ্রীঃ পূঃ) উল্লেখযোগ্য ভেনাস মূর্তি হল মাইলো ভেনাস। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কারের পর এই মূর্তিটিই নারী

সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তিরূপে বহু শিল্প-সমালোচক এবং, মূলত তাদের প্রভাবে, অজস্র সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও প্রথমে এই মূর্তির সৃষ্টিকাল ঠিক হয়েছিল ৫০০ খ্রীঃ পূঃ, কিন্তু পরে তা ঠিক হয় ১০০ খ্রীঃ পূঃ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের মাইলো ভেনাসের ঐ শিল্পী পূর্ববর্তী ভেনাস কল্পনা দ্বারা এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন এবং তা যে সম্ভব তা তাঁর শিল্পকর্ম দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। স্নাইডিয়ান, মেডিচি ও ক্যাপিটোলাইন ভেনাসের তুলনায় মাইলো ভেনাস অনেক বেশী পরিচিত ও নন্দিত। বাঁ হাতটি সম্পূর্ণ ভাঙা (কাঁধ থেকে), ডান হাতের শুধু বাহুর ঊর্ধ্বাংশটি আছে, ডান দিকে কাঁধ একটু ঝোঁকা, তার সঙ্গে তাল রেখে' ডান পা'টি একটু পিছনে ভর দিয়ে, বাঁ পা ঈষৎ বাঁকা—হাঁটু এগিয়ে, স্তনবৃন্ত দুটি ও নাভিমূল স্পর্শ ক'রে যেন একটি সমবাহু ত্রিভুজ (শুধু শরীর একটু ডান দিকে হেলান ব'লে বাঁ স্তনবৃন্ত থেকে নাভিমূলের দূরত্ব সামান্য একটু বেশী), বুকের ঊর্ধ্বাংশ, উদর ও কটিতট প্রশস্ত ও প্রশান্ত, দীর্ঘ গ্রীবা, চুল ঘন ও ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখাবয়বে ঋজুতা ও মধুরতার কামদ ভারসাম্য, দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ স্বনির্ভরতা। এবং, বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কটিতটান্ত থেকে (পা'র পাতা দুটিকে বাদ দিয়ে) মাটিতে ঝোলানো স্নানের কাপড় ; পূর্ববর্তী ভেনাস মূর্তিগুলি থেকে এই পার্থক্য লক্ষণীয়। পূর্ণ নগ্নতার শিল্পাদর্শ অস্তায়মান।

গ্রীসদেশে প্রাচীনযুগে নগ্ন নারীমূর্তির শেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রকাশ বোধহয় ত্রি-সুন্দরী (থ্রি গ্রেসেস)। আনুমানিক ১০০ খ্রীঃ পূঃ। ভেনাসকে তারই মতো সুন্দরী দুই সহচরীর সঙ্গে দেখানো হয়েছে। ললিত ভঙ্গীতে তিনজন তিনজনের কাঁধে হাত দিয়ে, স্নান-পূর্ব পরিচিতা ভেনাসের মত দাঁড়িয়ে। পাশের দু'জন সামনে তাকিয়ে এবং মধ্যের জন পেছন ফিরে। একক এবং মিলিতভাবে সুন্দর ঠিকই। তবু যেন সেই পরিচিত, প্রত্যাশিত প্রাণস্পন্দন নেই নগ্ন সৌন্দর্যে। শিল্প-সৃষ্টির তুলনায় শিল্পী যেন মনোরম গৃহ-শোভার বস্তু তৈরীতে ব্যস্ত। অনুকরণের প্রাবল্যে যেন সৃষ্টির প্রেরণা ম্রিয়মান। শুধু সৃষ্টি-কল্পনায় নয় শারীর নৈপুণ্য প্রয়োগেও যেন ভাঁটার টান। শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের নিশ্চয়ই গূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু প্রয়োজন যখন শিল্প-চরিত্র নিধন ক'রে প্রাকৃত ক্ষুধার টানে শিল্পকে গ্রাস করতে শুরু করে তখন তাতে শিল্পীর ও রসিকের শারীর প্রয়োজন মিটতে পারে, শিল্প-বোধের আকুতি থেকে মুক্তি মেলে না, শিল্প-সৃষ্টি হয় না। সুন্দরী ও মহীয়সী ভেনাস ক্রমে কামদ ভেনাসে পরিণত হয়।

এই পরিণামের কারণগুলি সমাজ-সভ্যতার মধ্যে থেকেও দেখা দেয়, আবার বাইরের দিকেও প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প-রীতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাহিনী এক-

তরফা নয়। অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বে এর কারণনিচয় নিহিত। একদিকে রোমান রীতি-নীতির অনুশাসন, অন্যদিকে খ্রীস্টধর্মের মধ্য দিয়ে ও স্বতন্ত্রভাবে ইহুদী সংস্কৃতির প্রভাব গ্রীসের প্রাচীন মুক্ত মনের প্রকাশকারীকে দুর্বল করে তুলছিল। তাছাড়া অন্ধ অনুকরণ ও অভ্যাসবশত, অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির আকূতি-বর্জিত, একটি শিল্প-রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আন্তর উৎস যত শুকিয়ে আসে বাহ্যিক আবেদনও তত ব্যর্থ হতে থাকে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে প্লাতোর দর্শনের স্পর্শোজ্জ্বল, স্ফটিকোপম নগ্ন ভেনাসের চিহ্ন আর পাওয়া যায় না।

প্রায় তের-চোদ্দ শ' বছর পরে রেনেশাঁস-এর যুগে আবার যখন ভেনাস কল্পনা শিল্পী মানসকে নাড়া দিল তখন শ্লীল-অশ্লীল ও নারী সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা, সাজ-সজ্জা, মানুষের বাস-পরিবেশ, শিল্প-রীতি, রস-বোধ, এক কথায়, গোটা জগৎ, অনেক বদলে গেছে। ইতালীতে তখন নব-প্লাতনিক দর্শনের প্রভাব সমধিক। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির "লিডা ও রাজহংস"-এ (মূর্তি ও চিত্রে) নৈসর্গিক ভেনাসের কল্পনা স্পষ্ট রূপ নিল (১৫০৪-১৫০৬ খ্রী:)। এই বহুমুখী প্রতিভার লেখা থেকে বোঝা যায় যে, তদানীন্তন কালের প্রধান দার্শনিক চিন্তাধারার (নব-প্লাতনিক মতবাদের) প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল না তাঁর ঝোঁক ছিল, অভিজ্ঞতার ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে। পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যানেও তাঁর আস্থা ছিল না। নারী দেহ ও প্রেমের প্রতিও তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ-উৎসাহ ছিল ব'লে জানা যায় না। তবু যে তিনি "লিডা ও রাজহংস"কে ঘিরে প্রাকৃতিক ভেনাস কল্পনা করেছিলেন তার কারণ বোধহয় দ্বিবিধ: ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিগত। চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই নগ্ন নারীদেহ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় নিষেধ শিথিল হয়ে আসছিল। গথিক থেকে রেনেশাঁস শিল্পরীতি উত্তরণের অন্যতম পথিকৃৎ গিওভানি পিসানো (১৩৯৫-১৪৫৫) পিসার ক্যাথিড্রালে "সংযমে"র একটি মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন যাতে নগ্নতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তবে তা নিষিদ্ধের উদাহরণ রূপে। কিন্তু সমসাময়িক কালেই দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ভেনাসকে কামনার প্রতিমূর্তিরূপে কল্পনা না ক'রে নারী সৌন্দর্যের, এমন-কি স্বর্গভ্রষ্ট প্রাকৃত রূপের, প্রতীক রূপে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রচলিত কথকথা ও রূপকের মধ্য দিয়ে কামনা ও যৌন আবেদনের সঙ্গে ভেনাসের মধ্যযুগীয় সংস্রবকে ছিঁড়ে ফেলা হল: তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হল খ্রীস্টীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে' স্বর্গীয় সৌন্দর্যের পার্থিব প্রতীক রূপে। সান্দ্রো বত্তিচেলির (১৪৪৫-১৫১০) "ভেনাসের জন্ম" চিত্রে সত্য ক'রেই স্বর্গীয় (স্ফটিকোপম) ভেনাসের খ্রীস্টীয় (পার্থিব, প্রাকৃত ও বনজ) জন্ম হল। বত্তিচেলির হাতে "ত্রি-সুন্দরী"রও নতুন ক'রে জন্ম হল: নারী-

সৌন্দর্যের শারীর আবেদন অক্ষুন্ন রেখে', ক্ষীণ আবরণের সংযমে তাকে স্বল্প বেঁধে', অর্থাৎ ধর্ম-রীতি রক্ষা ক'রে মধ্যযুগের অ-সুন্দর বন্দীত্ব থেকে প্রাকৃত পরিবেশে তাদের জন্ম হল নতুন যুগের প্রাগূষায়। লিওনার্দোর শিল্পকর্ম বোঝবার জন্য শুধু তাঁর ঐতিহাসিক পটভূমি নয় তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাও বোঝা দরকার। তিনি ছিলেন কল্পনার বিরুদ্ধে, অভিজ্ঞতার স্বপক্ষে। জড় উদ্ভিদ ও জীব জগতের বিচিত্র রূপ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অভিভূত করত। বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁকে কখনো উদ্দাম কল্পনার অনুবর্তী করে নি।[২] বস্তুত বত্তিচেলির শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়েছে স্বর্গীয়-দার্শনিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা-লব্ধ দুটি ভিন্ন চিন্তা ধারা, যার দ্বিতীয়টি লিওনার্দো মূলত অনুসরণ করেছিলেন। বত্তিচেলির ভেনাসে একদিক রয়েছে পৌরাণিক ধর্ম-কাহিনীর অনুষঙ্গ, লজ্জা, লঘিমা ও স্বর্গীয় পবিত্রতার স্পর্শ, অন্যদিকে রয়েছে সদ্য স্বীকৃত নগ্নতা, জীব ও উদ্ভিদ জগতের প্রাণ-স্পর্শ।

সঙ্কর শিল্প-রীতির নগ্ন সুন্দরী ভেনাস শুধু লিওনার্দোর হাতেই নয় আরো একাধিক রেনেশাঁস শিল্পীর হাতে নতুন প্রাণ, মানবিক স্পর্শ, ফিরে পেয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গিওরগিওনের (১৪৭৫-১৫১০) ভেনাস, তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু গিওভানি বেলিনীর (১৪৩০/৪০-১৫১৬) "স্নানঘরে রমণী" এবং তাঁর শিষ্য টিশিয়ানের (১৪৮৭-১৫৭৬) "ভেনাস (অব আরবিনো")। গিওরগিওনের ভেনাস ঘুমন্ত, শান্ত, প্রাকৃতিক পরিবেশে সংস্থাপিত হলেও যেন তার সঙ্গে একাত্ম নয়। দূরত্ব আছে। তাই সঙ্কর। টিশিয়ানের ভেনাস জাগ্রত। তার পরিবেশ মানবিক, অভিজাত গৃহস্থের ; শয্যায় শায়িত কুকুর ও জানালায় দৃশ্য উদ্ভিদ প্রকৃতির ও প্রাণের যুগ্ম স্পর্শ রেখেছে। শায়িত নগ্ন শরীরের ললিত ও সহজ ভঙ্গী ভেনাসকে তার পরিবেশের সঙ্গে অনেকটা যেন একাত্ম করে নিয়েছে। ভাসারি (১৫১১-৭৪) প্রমুখ অনেক শিল্প ঐতিহাসিকের অনুমান যে গিওরগিওন ও টিশিয়ান হয়ত লিওনার্দোর লিডা দেখেছিলেন।[৩] বিশাল রাজহংসের সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে সংলগ্ন নগ্ন লিডা প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম। ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা-ফুল, পশু-পাখী, শিশু ও মানুষের মধ্যে ও মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লিডা যেন কোনো একটি বিশিষ্ট নারী নয়। সে যেন একই সঙ্গে প্রকৃতিকন্যা ও সার্বিক নারী। লিওনার্দোর মতে শিল্পীর কর্তব্য তার উপজীব্য বিষয়ের, তা সে প্রাণী বা অন্য বস্তু যা'ই হোক, সারধর্মকে (প্লাতনিক অর্থে নয়) রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা। লিওনার্দো "লিডা ও রাজহংসে" শিল্পীর এই উপলব্ধি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

একটি নারীদেহ নগ্ন কি আবৃত এ দিয়ে যে তার বিপরীত (নাকি ভিন্ন ?) মূর্তি, মানবিক-প্রাকৃতিক ও স্বর্গীয়-ইন্দ্রিয়াতীত, চূড়ান্তভাবে ঠিক করা যায় না তা বহু শিল্প-

কর্মের উদাহরণ দিয়ে দেখানো যেতে পারে। শিল্পীর কল্পনা এমন নারী মূর্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে তা সম্পূর্ণ নগ্ন হলেও তা যেন স্পর্শ করার মত নয়, অনেক দূরের, যৌন আবেদন মুক্ত, এবং, ভাষান্তরে, দিব্য। পক্ষান্তরে আবৃত বা অর্ধাবৃত নারীমূর্তিকেও শিল্পী মানবিক ইন্দ্রিয় আবেদনে নিটোল করে তুলতে পারেন। এ প্রসঙ্গে টিশিয়ানের "ভেনাসের" সঙ্গে তাঁর "স্বর্গীয় ও পার্থিব প্রেমের" তুলনা করা যেতে পারে। "ভেনাস" মানবিক; "স্বর্গীয় ও পার্থিব প্রেমের" নারী প্রাকৃতিক, শান্ত ও মুক্ত। "ভেনাসের" তুলনায় "প্রেমের নারী"র অঙ্গগঠনে রূপসী লালিত্যের স্পর্শ স্পষ্টতর। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়েও "ভেনাস" কামদ নয়: "প্রেমের নারী"র কটিতটান্ত ও বাঁ বাহু বস্ত্রাবৃত, তবু, (নাকি সেজন্যই?) সে ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদনে তীব্রতর। স্বল্পাবরণ নগ্নতার আবেদনকে তীব্রতর করে। নিসর্গ দৃশ্য ও দূর দিগন্তও সে আবেদনকে কেড়ে নিতে পারেনি। টিশিয়ানের অন্য "ভেনাস"ও সম্পূর্ণ নগ্ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে সংস্থাপিত: কিন্তু ইন্দ্রিয়-আবেদন প্রধান নয়। যৌথ প্রাকৃতিক-মানবিক পরিবেশে সংস্থাপিত টিশিয়ানের "ভেনাস ও অর্গানবাদক" চিত্রের ভেনাসও সম্পূর্ণ নগ্ন: কিন্তু তারও কোনো প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় আবেদন নেই। পরিবেশনের আদিম স্বাভাবিকতা যেন তার ইন্দ্রিয় আবেদনকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছে।

পরবর্তীকালে (ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে) টিশিয়ান তাঁর শিল্প-কর্মে যৌবনের অতি-সংযত ভাবটি পরিত্যাগ করেন। তখনকার আঁকা ছবিতে নারীদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অধিকতর পরিস্ফুট হল। এর ভাল উদাহরণ "ডানি" এবং "ডায়না ও এ্যাকটিওন" ছবি দু'টি। "ডানি"র নগ্ন নারীদেহ পূর্বের তুলনায় মেদবর্জিত, অনাবশ্যক তরঙ্গহীন এবং সেহেতু অনেক বেশী মনোরম। এসব দেহ কল্পনায় মিকেলেঞ্জেলোর প্রভাব লক্ষনীয়। তবে মিকেলেঞ্জেলোর স্বর্গীয় সুষমা সৃষ্টির প্রবণতাকে টিশিয়ান যেন অনেকটা মানবিক, স্বাভাবিক ও পার্থিব আকর্ষণময়তায় রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

তবু যেন নগ্ন নারীদেহের পূর্ণ স্বাভাবিকতা সৃষ্টিতে টিশিয়ানের তুলনায় সার্থকতর হয়েছিলেন তাঁরই সমসাময়িক আরেক মহৎ শিল্পী করেগিও (এ্যান্টোনিও এ্যালেগ্রি) (১৪৮৯-১৫৩৪)। করেগিও "জুপিটার ও এ্যান্টিওপ", "ডানি", "লিডা" ও "ভেনাস" চিত্রে নারীদেহের মনোরম সৌন্দর্য ও কামদ রূপটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে, অথচ অশ্লীলতার স্পর্শ মাত্রও নেই। সুতরাং তাদের মূল আবেদন রসিকজনের শিল্পবোধের দরবারে, ইন্দ্রিয়ের দরবারে নয়। কামদ-সুন্দর রূপ সৃষ্টিতে করেগিওর সাফল্যের মূলে ছিল লিওনার্দো থেকে পরিগৃহীত এক শিল্প-রীতি। এই রীতি অনুসারে অঙ্কিত দেহের উপর সম্মুখ থেকে সরাসরি সমভাবে আলোর ব্যবহার না ক'রে আলো মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে

ছায়ার সংমিশ্রণে গভীরতা ও দূরত্ব সৃষ্টির অমোঘ উপায় হিসেবে। টিশিয়ানের "ভেনাস", "স্বর্গীয় ও পার্থিব প্রেম" ও "ভেনাস ও অর্গানবাদক"—এর নারী দেহে আলো এসে, একই সঙ্গে সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করেছে। গভীরতা ও দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা নেই বললেই চলে। টিশিয়ানের "ডানি" বোধহয় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। তার কারণ হতে পারে "ডানি"তে মিকেলেঞ্জেলোর প্রভাব, বিশেষত "রাত্রি"র প্রভাব, রয়েছে। লিওনার্দোর ধারণা ছিল যে, নারীদেহের এবং, বিশেষ করে, তার মুখের রহস্যময় সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজন গোধূলির অস্পষ্ট আলো। গোলাকৃতি বা অর্ধ গোলাকৃতি শূন্য পথে আলো কীভাবে সঞ্চারিত হয় লিওনার্দোকে অনুসরণ ক'রে করেজিও সে-বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। জুপিটারের দেহের এক দিক অস্পষ্ট আলোয়, অপর দিক—ডান পাশের থেকে সম্মুখের দিক—দূরতর লঘু আঁধারে ঘনায়িত; এ্যান্টিওপের নাতিবৃহৎ কোমল নগ্ন দেহের সর্বত্র আলো সমানভাবে পড়েনি, ঘুমের আবেশ পেশীর স্বাভাবিক শৈথিল্যে প্রকাশ, নগ্নতার জন্য শরীরে কোথাও আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই, বন-পরিবেশে তার সুন্দর দেহ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম।

প্রাকৃতিক ভেনাসের যে-কল্পনার উৎপত্তি ইতালীতে তার পরিপুষ্টি ও স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে উত্তর ইয়োরোপে, ফ্লেমিশ শিল্পী রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০) ও ফরাসী শিল্পী এঁগ্রেসের (১৭৮০-১৮৬৭) হাতে। মিকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর মূর্তি ও ফ্রেসকো, টিশিয়ান, ভিরোনেজে এবং করেজিওর চিত্রাবলীর সযত্নে নকল করেছিলেন রুবেন্স তাঁদের শিল্প-রীতি আয়ত্ত করবার জন্য। অভিজাত ও রাজকীয় পরিবেশে জীবন কাটালেও, এবং নিজে বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাবান সামাজিক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রদূত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর আন্তর জীবন ছিল যথার্থ শিল্পীর। তাছাড়া তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। উজ্জ্বল রঙ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ফ্লেমিশদের ক্ল্যাসিসিজম্ থেকে যাত্রা শুরু ক'রে তিনি তাঁর স্বাধীন প্রকাশে অবগাহন ক'রে এক রূপসমৃদ্ধ শিল্প-রীতি প্রতিষ্ঠা করেন যার মতো মনোবিজ্ঞানস্পৃষ্ট। তাঁর অঙ্কিত নারীদেহ আলো ও সৌন্দর্যে টলোমলো, কিন্তু লালসাপূর্ণ নয়। এ-প্রসঙ্গে রুবেন্সের চিত্রাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য "ত্রি-সুন্দরী", "ভেনাস, কিউপিড, সেরিস ও বাকাস", "পারসিউস ও এ্যান্ড্রোমিডা" এবং "লিউসিপ্পাসের কন্যাদের বলাৎকার"। "ত্রি-সুন্দরী"র তিন নারীর রূপমণ্ডল উজ্জ্বল, তাঁর সুন্দর অঙ্গ সহ্য করে না। গাছ, ফুল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তারা একাত্ম। কেশবিন্যাসের সঙ্গে ফুলের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। বস্ত্র আংশিক পাশে গাছের উপরে, আংশিক শরীর ছুঁয়ে-জড়িয়ে, কিন্তু নগ্নতার সৌন্দর্য হানি ক'রে না। পীতাভোর জঙ্ঘা ললিত-সুঠামিত। চক্ষু দুটি স্বপ্নোজ্জ্বল, প্রাণময় ও স্নিগ্ধ। মাংসল শরীরে ও ফুলে আলো এসে পড়ছে সরাসরি,

সমানভাবে। "ভেনাস, কিউপিড, এরিয়া ও বাকাসের" ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। আলোর বিন্যাস-বিকীরণে মায়াময় গভীরতা সৃষ্টির লিওনার্দীয় প্রয়াস নেই। তবে এই শরীরগুলি বাঙ্ময়, প্রকাশধর্মী,—নিছক কামদ, চক্ষুস্পর্শী নয়। এর অন্যতম কারণ, নারীর মুখমণ্ডল ও বিশেষত চখের দৃষ্টিতে রূবেন্স কখনো কামজ চপলতা প্রদান করেন নি। শরীরে লালিত্য দিয়েছেন, লাস্য দেন নি। রূবেন্সের অঙ্কিত নারীদেহে প্রকৃতির আত্মীয়তা আছে; অমর্ত্য, অচেনা সৌন্দর্য আছে; যা নেই তা হল ঘনিষ্ঠ হবার ইঙ্গিত।

এঁগ্রেসেরও (১৭৮০-১৮৬৭) প্রথম জীবনের একাংশ কেটেছে রোমে, এবং তখন অতীতের শিল্পগুরুদের কাজ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর শিল্প-কর্মে একদিকে ঐতিহ্যের এবং অন্যদিকে সমসাময়িকতার প্রভাব ও তজ্জনিত দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। নারীদেহের সৌন্দর্য রূপায়ণে তিনি অকুণ্ঠ, আধুনিক। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তনে এবং আয়ত উদরে গথিক শিল্প-রীতির ছাপ। উপজীব্য নারীদেহের কল্পনা তাঁর কথনো পৌরাণিক (যথা, "ভেনাস এ্যাণ্ডোমেনে"), আবার কখনো আধুনিক ("লা গ্রাঁদ ওদালিস্ক" ও "ব্যাইনিয়োজ্‌ দ ভ্যাল্‌প্যাসোঁ")। এঁগ্রেসের ভেনাসের দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে, রেখার টানে বত্তিচেলির ভেনাস স্মরণ করিয়ে দেয়। ধ্রুপদী রীতি পরিত্যাগ ক'রে চিত্রের সামগ্রিকতার উপর মূল দৃষ্টি না দিয়ে তিনি সমধিক গুরুত্ব দেন শিল্প সৃষ্টির অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে। নারীদেহকে সোজাভাবে বা ঈষৎ বাঁকানো রেখায় দেখানোর থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বসে-থাকা স্নানার্থিনী বা শায়িত ভঙ্গী ("লা গ্রাঁদ ওদালিস্ক")। দেহের প্রতিটি অংশের উপর যে এঁগ্রেস এত গুরুত্ব দেন, কথিত আছে, লা গ্রাঁদ ওদালিস্কের নগ্ন নারীর পিঠের দৈর্ঘ্য মেরুদণ্ডের অস্থিখণ্ডের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। তাঁর হাতে নারীদেহ শান্ত সৌন্দর্য পেয়েছে, সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গী পেয়েছে, যা পায়নি তা হল শিল্পগুরুদের স্পর্শলব্ধ উদ্বেল প্রাণময়তা। "স্নানার্থিনীর" বসে থাকার ভঙ্গীটি স্বাভাবিকতায় অনবদ্য; মসৃণ ও আয়ত পিঠ (বুক পেছন থেকে স্বভাবতই অদৃশ্য), বাঁ হাত কাপড়ে ঢাকা ও সামনের দিকে মাঝখান থেকে এগোনো, ডান হাতটি একটু বেঁকে আঙুলগুলি নরম বসার জায়গাটি ছুঁয়েছে, বসার জায়গায় সাদা কাপড়ের ভাঁজ ও প্রান্তের নাতি সূক্ষ্ম, নীলচে রঙের সূচী-কর্ম, মাথায় প্রাক-স্নানের কাপড় দিয়ে চুলের পেছন দিক ঢাকা, ঈষৎ ডানদিকে ঘোরানো মুখাবয়বে শুধু নাক ও চোখের পাতা দৃশ্য, এবং দৃষ্টি স্থির। টুকরো-টুকরো ভাবে দেখলে এঁগ্রেসের কাজের নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞান-সম্পদ অনস্বীকার্য। কিন্তু সবকিছু একটি অন্তর্নিহিত ভাবের ঐক্যে সংহত নয়। স্বাভাবিকতার আধিক্য এর শিল্পমূল্য কিছুটা যেন কেড়ে নিয়েছে। পরবর্তী-কালের ছবিতে (যথা, "Le Bain Ture" এ) এঁগ্রেস স্বাভাবিকতার সহজ আকর্ষণ

সংবরণ করেছেন। তাঁর শিল্পের উপজীব্য ছিল সীমিত (যথা, স্নানদৃশ্য) : অভিজ্ঞান নির্ভরতার আধিক্যের ফল। এর জন্য তাঁর আঁকা নগ্ন নারীদেহগুলিতে ইন্দ্রিয়ের আবেদন তীব্র, কখনো প্রায় সঙ্গীতময়, কিন্তু প্রায়ই উগ্রতায় বড় বেশী ভাবালু ও শূন্যগর্ভ।

ভাবালু শূন্যগর্ভতা থেকে নগ্ন নারীদেহের রমণীয়তাকে রেনেসাঁসের পরে যে-শিল্পী প্রথম বাঁচিয়ে তুললেন তিনি মানে (১৮৩২-৮৩)। একই পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয়কে উপজীব্য ক'রে বারবার ছবি আঁকলে ও মূর্তি গড়লে তাতে যদি শিল্পী নিজের কল্পনা থেকে অথবা সমসাময়িক যুগের শিল্প-রীতি ও অন্য প্রভাব থেকে নতুন কিছু না সঞ্চার করতে পারেন তবে কালক্রমে তা বন্ধ্যা অনুকরণে ও ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানে যখন দেগা (১৮৩৪-১৯১৭), সেজান (১৮৩৯-১৯০৬), মোনে (১৮৪০-১৯২৬) ও রেনোয়া (১৮৪১-১৯১৯) প্রমুখ রিয়ালিষ্ট ও ইম্প্রেশনিস্ট এক নতুন শিল্প-রীতির প্রবর্তন করছিলেন তখন সাধারণভাবে শিল্পের উপজীব্যই শুধু পাল্টে যাচ্ছিল না পুরনো উপজীব্যও (যেমন, নগ্ন নারীদেহ) নতুন শিল্প-রীতি, আঙ্গিক ও রঙ ব্যবহারের জন্য নতুন হয়ে দেখা দিচ্ছিল। মানে তাঁর মূল শিক্ষা নিয়েছিলেন ভেলাস্কোয়েজ (১৫৯৯-১৬৬০), মুরিয়ো (১৬১৭-৮২) ও রিবেরা (১৫৯১-১৬৫২) প্রমুখ স্পেনদেশীয় শিক্ষাগুরুদের শিল্পকর্ম থেকে। যদিও তিনি ইতালীতে গিয়েছিলেন ও শিল্পগুরুদের কাজ দেখেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার মানসিকতা তাঁর ছিল না। "দি ডেড ক্রাইস্ট উইথ এ্যাঞ্জেল্‌স্‌" (১৮৬৪, দি মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট, ন্যু ইয়র্ক) বোধহয় ব্যতিক্রম। তবু ইতালীয় শিল্পগুরুদের অনিবার্য, স্বাগত প্রভাব যে মানের শিল্পকর্মে রূপান্তরের মধ্য দিয়েও স্পষ্টতা উপলব্ধির জন্য বেশী বিশ্লেষণ ও উদাহরণ অনাবশ্যক। জিওরজিওনের "প্যাস্টোরাল কনসার্ট"-এর (১৫১০) সঙ্গে যে মানের "লাঞ্চন অন দি গ্রাস"-এর (১৮৬৩) এবং টিশিয়ানের "ভেনাস অব আরবিনো"র (১৫৩৮) সঙ্গে মানের "ওলিম্পিয়া"র (১৮৬৩) আশ্চর্য মিল রয়েছে তা অতি স্পষ্ট। তাদের কল্পনা, চরিত্র ও ব্যঞ্জনার পার্থক্যও বড় স্পষ্ট। তাদের পোশাক, পরিবেশ ও নারীদেহের নগ্নতা উপস্থাপনার স্বাভাবিকতায় (নাকি বলব, বাস্তবতায় ?) সবই নতুন। "ওলিম্পিয়া"র নারীর অর্ধ-শায়িত ভঙ্গী সহজ ; অঙ্গ-ভূষণ স্বল্প ও আধুনিক,—মাথায় গোঁজা ফুল, গলায় কালো রিবন ও ডান হাতে মোটা বালা ; পরিবেশ বাস্তবিক-মানবিক ; শয্যার চাদরে প্রাচ্যের ছাপ ; পাশে নিগ্রো পরিচারিকার হাতে উপহারের পুষ্পস্তবক ; এক পায়ে চটি, অন্য পায়ের চটি বিছানার উপর ; পায়ের কাছে কালো একটি পোষা বেড়াল ; মুখাবয়বের শান্তভাব ও দৃষ্টির স্থিরতা

—সব মিলিয়ে নারীর নগ্নতাকে আধুনিক স্বাভাবিকতায় দেখানোর এক সাহসী ও সার্থক শিল্প-প্রয়াস। রিবনের, পরিচারিকার ও বেড়ালের কালো রঙ নির্বাচনে; পরিচারিকার জাতি ও শয্যার রেশমী চাদরের প্রাচ্য কারুকার্য এবং, বিশেষত চোখ-মুখের স্থির চরিত্রের কল্পনায় মানে রেনেসাঁস থেকে অনায়াসে তিন শ' বছর এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ এই অতি-এগোনো শিল্পকর্মের জন্য শিল্পীকে তীব্র সমালোচনা, গঞ্জনা এবং এমন-কি অ-রসিকদের হাতে প্রায় লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল। শিল্পী তাঁর দুঃসহ অপমান ভোগের কথা যখন বোদলেয়ারকে চিঠিতে জানান কবি তাঁকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, প্রতিভাবান শিল্পীদের ভাগ্যে এ-ই ঘটে, কিন্তু তাতে তাঁরা কেউ মারা যান নি। সমালোচনার ঝড় যখন থেমে এল, স্বীকৃতির বরমালা আসতে লাগল, দেগা মন্তব্য করেছিলেন, "এখন তাহলে আপনি গ্যারিবল্ডির মতো বিখ্যাত।"[৪] "লাঞ্চন অন দি গ্রাস" এঁকেও মানেকে অনেক অনেক গাল-মন্দ শুনতে হয়েছিল। আগাগোড়া পোষাকে ঢাকা দু'জন পুরুষ মানুষের সঙ্গে তৎকালীন "ভদ্রলোকেরা" গাছের ছায়ায় এক সম্পূর্ণ নগ্ন নারীকে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। যদিচ এখানেও নারীর দেহ-ভঙ্গী ও দৃষ্টি অচঞ্চল স্বাভাবিক, কিন্তু নিসর্গ-পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা দৃঢ়ত প্রতিষ্ঠিত নয়। বাস্তবতার মাঝে কোথায় যেন একটা অবাস্তবতা ঢুকে পড়েছে। যে-মডেলকে মানে "ওলিম্পিয়া" ও "লাঞ্চন"-এ এঁকেছিলেন তাকে আবার তিনি পরে (১৮৭৮) এঁকেছিলেন "দি ব্লণ্ড উইথ বেয়ার ব্রেষ্ট"-এ। সবুজে রঙের পশ্চাৎপটে উন্মোচিত স্তন ও দেহের সাদা ও উজ্জ্বল বাদামি রঙ ও বনজ বেশ-ভূষণ ছবিকে নিঃসন্দেহে নিসর্গ-স্পর্শ দিয়েছে। সার্থক শিল্প সৃষ্টির জন্য সুন্দর মডেল অপরিহার্য নয়। সৌন্দর্য সর্বদা অনুকরণ জন্য নয়, শিল্প জন্যও বটে। অনুকরণ, এমন-কি অভিজ্ঞাত জগৎ-কে অনুসরণ করার প্রয়াস থেকে শিল্পী যখন মুক্তি নেয়, স্বভাবতই তখন তাকে অন্তর্মুখী হতে হয়। অন্তর্মুখী শিল্পী কল্পনার সাহায্যে পুরনো—এক অর্থে, চিরনতুন—উপজীব্যকে নতুনতরভাবে সৃষ্টি করতে পারেন। অন্তহীন অসম্ভবকে সম্ভব করার, বাস্তব করার চেষ্টা, আর সে-চেষ্টার অনিবার্য ব্যর্থতায় মর্মক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করা রোমান্টিক শিল্পের অন্যতম লক্ষণ, ধ্রুপদী শিল্পরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অন্তর্মুখী শিল্পী কল্পনার অনির্ভরযোগ্য পাখার উপর নির্ভর ক'রে অসম্ভবের অমরাভিসারে বের হবার পরিবর্তে কখনো বেছে নেয় আপন অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন-বিকীর্ণ, কিন্তু বিষণ্ণ, ছায়াপথ। সে জগতে অনেক কিছুই বোধগম্য নয়; তাই বোঝানোও যায় না। তবু তা পরিচয়ের প্রবলতায় ছায়া-ছিন্ন হয়েও আলোর অধিক অনিবার্যতায় মনোহরণ করে। এখানেই রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে ধ্রুপদী সৌন্দর্য সন্ধানের বিপরীত পন্থায় ইম্প্রেশনিষ্টদের প্রথম সার্থক প্রতিবাদ। অস্ফুট, ছিন্ন ও বিকীর্ণ অভিজ্ঞতার

অসংলগ্ন মণিহারে মন আন্দোলিত হয় বটে, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার পরিচয় কিন্তু ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও সামগ্রিক হয় না।

তত্ত্বজগৎ (রিয়ালিটি) ও ছিন্ন-বিকীর্ণ অভিজ্ঞতার (ইম্প্রেশনের) মধ্যে সম্বন্ধ কি ?— এই প্রশ্নের একাধিক দার্শনিক, এবং ততোধিক, নান্দনিক উত্তর রয়েছে। রূপসী শিল্পীরা অভিজ্ঞাত বিষয়-বস্তুকে দেখেছেন অবস্তুতিরিক্ত এক তত্ত্বজগতের অসম্পূর্ণ, অস্ফুট এবং, সেজন্য, আপাত-অসংলগ্ন প্রকাশ রূপে। শিল্প-কর্মকে তাঁরা চেয়েছেন সেই অপাপ-অমর্ত্য জগতের মহিমা-গরিমাময় প্রকাশরূপে দেখতে। নারীদেহের ভোগ্য সৌন্দর্যকেও তাঁরা তাই এমন রূপে পৌরাণিক বা ধর্মীয় পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করেছেন যে তাকে স্পর্শ করতে দ্বিধা হয়, পাছে পাপ হয় : এবং ঐন্দ্রিয়পন্থী মন তাকে সংগুপ্ত কামনা দিয়ে পূজা করতে চাইলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। রোমান্টিক শিল্পীরা তাকে স্পর্শোত্তীর্ণ রেখেই কল্পনায় পেতে চেয়েছে : আর স্বাভাবিক অপ্রাপ্তির সহিষ্ণু বেদনা প্রকাশ করেছে রূপে-রসে-রঙে। স্পর্শোত্তীর্ণ জগতের আকর্ষণকে অস্বীকার ক'রে কিন্তু সৌন্দর্যকে স্বীকার ক'রে তাকে কীভাবে সার্থক জাগতিক চরিত্র দেওয়া যায়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করা যায়, রেনোয়ার ছিল তা'ই মূল অন্বিষ্ট। সত্য বটে, প্রধানত তিনি ইন্দ্রিয়পন্থী ছিলেন, তাঁর আঁকা নারীদেহের নারীত্ব ছিল প্রাণময়তায় (কেতাবী সৌন্দর্যে নয়) অনবদ্য, কিন্তু টিশিয়ান ভেনাসের রূপসী তন্বীর আকর্ষণ যে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি তার প্রমাণ "Bather with Griffon" (১৮৭০)। টিশিয়ান ভেনাস তার নিলজ্জতায় ও নির্মলতায় অন্ধ লোকের পার্শ্বশায়ী। রেনোয়ার নগ্ন স্নানার্থিনীকে পেছন থেকে মিলিয়ে চোখে এক পুরুষ দেখছে : জল, বনছায়া, কালো কুকুরটি ও পরিত্যক্ত পোষাক তাকে ঘুরিয়েছে নৈসর্গিক-মানবিক, এক কথায়, ইহজাগতিক, পরিমণ্ডল। টিশিয়ান ভেনাসের ডান পা সোজা, বাঁ পা ঈষৎ বাঁকা, বাঁ হাতে ফুল-পত্র, ডান করতলে কটিতটাগ্র : আর রেনোয়ার স্নানার্থিনীর ডান পা সোজা, বাঁ পা ঈষৎ বাঁকা, কিন্তু পরিধেয় ধরা ডান হাতে, কটিতটাগ্র বাঁ করতলে। ভেনাসের কেশবিন্যাস, মুখাবয়ব ও দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক শান্তি : স্নানার্থিনীর কেশবিন্যাস, মুখাবয়ব ও দৃষ্টিতে পরিচিত, প্রায়-নিরাসক্ত স্বাভাবিকতা। ভেনাসের স্তন দুটি অস্ফুট, সরু ও নাভি-উদররেখা সীমিত, সবই অস্বাভাবিকতায় সুন্দর : স্নানার্থিনীর স্তন দুটি বয়সোচিত, স্বাভাবিকতায় ঈষৎ নত, নাভি-উদররেখা ঈষৎ স্ফীত, কিন্তু স্বাভাবিক। যদিও শিল্পরীতিতে তিনি প্রাচীন গ্রীস ও রেনেশাঁসের শিল্পগুরুদের অনুসরণ করছিলেন, রেনোয়ার আধুনিকতা প্রীতি (যার মূল দুটি অঙ্গ ছিল বিষয়-নিষ্ঠা ও স্বাভাবিকতা) দীর্ঘকাল তাঁকে এই দ্বি-ধারার কাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্যে পৌঁছে দিতে পারে নি। কুর্বের (১৮১৯-৭৭) বস্তুবাদিতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে

স্বাভাবিক নগ্ন নারী দেহ আঁকার : কিন্তু ঐতিহ্যের পশ্চাৎটান এবং অনুষঙ্গের আটপৌরে প্রভাব স্নানার্থিনীকে যেন প্রিয়জনের নগ্ন সৌন্দর্যে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

এর জন্য রেণোয়াকে আরো আন্তর সন্ধান, আরো বহির্দৃশ্য আগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল শিল্পতত্ত্বের সূক্ষ্মতার পরিবর্তে সামঞ্জস্যের দুর্লভ দৃষ্টিপ্রদীপ সন্ধান করার। অভিজ্ঞানের ছিন্ন-কীর্ণ রূপাঙ্গুলিকে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে?—এই প্রশ্নের উত্তর রেণোয়া খুঁজে পেলেন, অন্তরের অবদানের কথা বাদ দিলে, ইতালীর শিল্পগুরু রাফেলের বিখ্যাত স্টাঞ্জে ও ফার্নেসিনার চিত্রাবলী থেকে ও কার্পাচিওর (১৪৬০-১৫২৫/২৬) রঙের ব্যবহার থেকে। রাফেলের "Venus showing her wounds to Cupid" এবং "Galatea"র নারী ও পুরুষ দেহগুলির গতি ও আন্দোলন রেণোয়া গ্রহণ করেন নি, তিনি গ্রহণ করেছিলেন উদার আলোর নীচে দেখা মনুষ্যদেহের মহিমা ও সরলতা।[৫] ইতালী ভ্রমণ ও গভীর অনুধ্যানের ফলশ্রুতি "স্বর্ণকেশী স্নানার্থিনী" (লা বাইনিয়োজ ব্লন্দ্) স্ত্রীকে মডেল ক'রে রেণোয়ার আশ্চর্য চিত্র (১৮৮১/৮২)। নগ্ন যুবতী সাগরের বিস্তৃত জলরাশির পাশে শান্তভাবে বসে আছে, বাতাসে তার দীর্ঘ কেশরাশি উড়ছে, স্তন দু'টি নিটোল, ডান হাঁটুর উপর ছাড়া কাপড়ের অংশবিশেষ, কটিতট-নিতম্ব-ডান উরু বেশ মাংসল, গতি যেন তাতে বেশী ব্যাহত—স্থিতির শান্তি প্রস্ফুট, আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য মুখমণ্ডল ও দৃষ্টির (ছাপ নয়) বিষণ্ণতা বা প্রশান্ত ঔদাস্য। রেখা টেনে নয় রঙের ব্যবহারে দেহ তার (গতিহীন) তরঙ্গ ও রূপ পেয়েছে। অভিজ্ঞান, ভাব, প্রকৃতি ও নারী সৌন্দর্যের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই নাতি সুন্দরী নারীকে ঘিরে। পরবর্তীকালেও বারবার রেণোয়া নগ্ন স্নানার্থিনীদের নিয়ে ছবি এঁকেছেন : "স্নানার্থিনীরা" (Les Grandes Baigneuses), "তিন স্নানার্থিনী", "উপবিষ্টা স্নানার্থিনী নগ্ন নারী", এবং আরো অনেক। "তিন স্নানার্থিনী"র ড্রয়িং থেকেই "স্নানার্থিনীরা" আঁকা হয়েছিল : অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল ভার্সাইর জলপরীদের ঝর্ণা। অঙ্গরেখার টানগুলি ললিত : বাঁ দিকের কাৎ নারীদেহের ভঙ্গী কিছুটা কৃত্রিম। বিশেষ লক্ষণীয় যা তাহল রেণোয়ার ভাস্কর্যধর্মী চিত্র আঁকার প্রয়াস : আলো রঙের ব্যবহারে গভীরতা সৃষ্টির চেষ্টা নেই : একাধিক দেহ ও অন্য বস্তু (যেমন, গাছ ও জল) দিয়ে, একজনকে দিয়ে অপরকে অদৃশ্য করায় যেটুকু দূরত্বের সংস্থাপনাজনিত অধ্যাস তার অতিরিক্ত কিছু নয় : দেহগুলি যেন বেশ আড়ষ্ট। পরবর্তীকালে তিনি ভাস্কর প্রতিমাও রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে "Judgment of Paris" (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য। এতেও একদিকে তিনি তাঁর ধ্রুপদী শিল্পাদর্শের আকর্ষণ, নগ্ন নারীমূর্তির ভঙ্গী, কেশবিন্যাস ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, অন্যদিকে আধুনিক স্বাভাবিকতা থেকেও বিচ্যুত নন। "Such nudes are classic as well as

classical, not because of any iconographical reference to Antiquity but because Renoir was able to maintain for more than twenty years (1896-1919) that equilibrium between natural appearance and an ideal conception which occurs in all truly classical art ।”[৬]

একটি বিশেষ ঐতিহ্যে লালিত, বিশ্বাস-সংস্কারে প্রভাবিত ও সমাজ-পরিবেশে সংস্থিত শিল্পী, তা তিনি যতই মৌলিক কল্পনা ও প্রতিভার অধিকারী হোন না কেন, তাঁর শিল্পকর্মে সংশ্লিষ্ট সমাজ, সংস্কার ও ঐতিহ্য কোনো-না-কোনোভাবে দেখা দেবেই। এ-কথা সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভেনাসের পার্থিব রূপটিও ভেঙে যাচ্ছিল, তবু ঐতিহ্য-চেতন শিল্পীর কল্পনা প্রেমিকা, স্ত্রী বা নগ্ন নারীদেহের প্রাতনিক রূপের উৎস সন্ধানে ঘুরে-ফিরে ভেনাসের দিকেই ধাবিত হচ্ছিল। একদিকে ভেনাস যেন প্লাতোর "আইডিয়া"র মতো অমূর্ত ও শাশ্বত নারী সৌন্দর্যের আদর্শ: ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের অনন্তযৌবনা উর্বশীর মতো। অন্যদিকে ইয়োরোপীয় শিল্প ইতিহাস থেকে দেখি নারী-সৌন্দর্যের আদর্শ আস্তে-আস্তে হলেও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর দিক থেকেও এবং আঙ্গিকের দিক থেকেও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের ফলশ্রুতি যখন হয়ে ওঠে আমূল তখন মূল আদর্শ বিকৃত, ভ্রষ্ট, নষ্ট ও বিস্মৃত প্রায়। আদর্শের সন্ধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পী জ্ঞাতসারে তো নয়ই অজ্ঞাতসারেও আর প্লাতোর শাশ্বত আদর্শের সন্ধানে উৎসাহী নন। নতুন বিজ্ঞান, দর্শন, যন্ত্রযুগ ও সমাজ পরিবর্তনের প্রভাবে তাঁর রুচি ও মূল্যবোধেও পরিবর্তন এসেছে। চিরন্তনীর পরিবর্তে ক্ষণিকার দিকেই তাঁর কল্পনা বেশী আকৃষ্ট হচ্ছিল। চিরায়ৎ দর্শন ও নন্দনতত্ত্বানুগ রূপ সৃষ্টির আদর্শ পরিত্যক্ত হতে লাগল। মুহূর্তে উদ্ভাসিত ও কালক্রমে লুপ্যমান যে মনুষ্য-জীবন তার বিচিত্র, সুখ-দুঃখ, মহত্ত্ব-করুণতাময় রূপগুলিই শিল্পসৃষ্টির মূল প্রেরণা হতে লাগল। মানে (১৮৩২-৮৩) পিসারো (১৮৩০-১৯০৩), সিজলি (১৮৩৯-৯৯), গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), ভ্যান গগ (১৮৫৩-৯০), তুলোজ লোত্রেক (১৮৬৪-১৯০১), বোনার্ড (১৮৬৭-১৯৪৭), পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) এবং উট্রিলো (১৮৮৩-১৯৫৫) প্রমুখ শিল্পীদের অনেকেই শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭), বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), জোলা (১৮৪০-১৯০২), প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২), মালার্মে (১৮৪২-৯৮) প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় প্রকাশিত দৃষ্টি-ভঙ্গি ও দর্শন থেকে। উল্লিখিত চিত্র-শিল্পীদের অনেকেই একজীবনে একাধিক শিল্প-আন্দোলনের প্রবক্তা রূপে পরিচিত। রিয়ালিজ্‌ম্ ও ইম্প্রেশনইজ্‌ম্, সিম্বলিজ্‌ম্, সিন্থেটিজ্‌ম্ আধুনিক রেনেশাঁস, কিউবিজ্‌ম্, মেকানিজ্‌ম্, এক্সপ্রেশনইজ্‌ম্, এবং সুর-রিয়ালিজ্‌ম্ প্রভৃতি আন্দোলন হল যুগসন্ধির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিভিন্ন

আন্দোলনের আয়ুষ্কালের স্বল্পতা ও বিন্যস্ত চরিত্র এবং তাদের সঙ্গে একই শিল্পীর সঞ্চরমান সংযোগ একটি সাধারণ সত্যকে প্রকাশ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ যেমন ইয়োরোপীয় শিল্প-ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত আরেক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সাম্প্রতিক অধ্যায়ে বৈচিত্র্য বেশী, অস্থিরতাও বেশী। এর জন্য একে কম মূল্যবান বা তাৎপর্যহীন মনে করা ভুল হবে।

পার্থিব ভেনাস উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তার ধ্রুপদী চরিত্র হারাতে পারে, কিন্তু তার রূপান্তরিত বিকল্প শিল্পীর কল্পনা থেকে কখনো ছুটি নেয়নি। উর্বশী ঘরণী হলেও চিরায়ু ও অনন্তযৌবনা হয় না। ঘরণীকে তাই যদি কেউ উর্বশীরূপে কল্পনা করতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে এ-কথা ভাবা ভুল হবে যে ঘরণী মূল্যহীনা বা অনাদৃতা। দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, জীবনের সর্বাংশে আধুনিক যুগের ছায়া, বিজ্ঞানের ও পরিবর্তনের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত। এ-যুগের সাংস্কৃতিক কর্মে লিপ্ত এমন প্রতিভা খুব বিরল যিনি মনে করেন তাঁর অন্বিষ্ট হবে উত্তরকালের অমর্ত্য আদর্শ। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও বস্তুনিষ্ঠা তাঁকে এই গভীর সত্য বুঝিয়েছে যে যুগান্তকারী সৃষ্টিও (তা সে বিজ্ঞানেরই হোক কিংবা শিল্পেরই হোক) চিরায়ু নয়। নারীদেহের সৌন্দর্য চিরকাল মানুষকে আকৃষ্ট করেছে,—সৃষ্টিকর্মে প্রেরণা যুগিয়েছে শিল্পীদের : কিন্তু তার প্রকাশে অনেক পরিবর্তন এসেছে ও গিয়েছে। এ যুগের প্রকাশে ক্রমশ প্রস্ফুট হচ্ছে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় বিধৃত নারীদেহের স্বল্পায়ু চলচ্চিত্র রূপটি। স্বভাবতই এই রূপ এক নয়, অনন্ত যৌবনের নয়, এমন-কি দৈহিক বিচারে সর্বদা সুন্দরেরও নয়। তবু এই রূপ সৃষ্টির মধ্যে নিহিত শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রযত্ন, সর্বোত্তম আকৃতি।

সেজান ও দেগা রেনোয়ার সমসাময়িক ; মানেরও বটে। একই সময়ে এঁরা নগ্ন নারী দেহ নিয়ে অনেক সার্থক চিত্র এঁকেছেন। আধুনিক অর্থে সার্থক এ-সব ছবিতে গ্রীসীয় স্বর্গীয় নির্মলতা নেই ; নেই বত্তিচেলি বা রূবেন্সের দেওয়া মনোহরণ নারী-সৌন্দর্য ; কিন্তু আছে কালনিবদ্ধ অর্থবহতা, কাছের মানুষের শিল্পসুন্দর রূপ। দেগার "ব্রেকফাষ্ট আফটার দি বাথ" (১৮৮৩), "আফটার দি বাথ" (১৮৮৫), "দি টাব" (১৮৮৬ দু'টি), "দি মর্ণিং" (১৮৯০), "উ'ম্যান ড্রাইং হারসেল্ফ" (১৯০৩) প্রমুখ চিত্রে নগ্ন নারীর ঘনিষ্ঠ ও ঘরোয়া রূপটি ফুটেছে : কিন্তু রূপসী নেই। নারীদেহের সক্রিয় স্বাভাবিক রূপগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রকৃতির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। ঐ অঙ্গে স্বর্গের বা প্রকৃতির কোন মহৎ ঘোষণা নেই। সক্রিয়তা ছাড়া রয়েছে স্বকীয়তা, আত্মীয়তা, দূরত্ব-ভাঙা একান্ত পরিচিতি। সেজানের "উ'মেন বেদার্স"-এ (১৮৯৮-১৯০৫)

নারীদেহগুলির সংস্থাপনা প্রকৃতির প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই (গাছ, নদী ও আকাশ-ঘেরা), তবে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একাত্ম করার চেষ্টা নেই। দেহগুলি ও গাছগুলির দৃঢ় রূপ-সামঞ্জস্য (উভয়কেই ছদিক থেকে ঈষৎ হেলান ত্রিভুজের মত) শিল্পীর সৃষ্টি,—স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়। এ ছবিতে কবি তার বাল্যবন্ধু জোলা ও অন্যান্যদের সঙ্গে যে কবিতা আবৃত্তি ক'রে ও ঘুরে' দিন কাটিয়েছেন সে সুখস্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তবু, ভাবালুতা নেই—না রঙে, না রেখায়: আছে ঋজুতা। ভঙ্গীটি ব্যারোক, ভাষা আধুনিক।[৭] মানে ও রেণোয়ার, বিশেষত সেজান ও দেগার, তুলিতে নগ্ন নারীর রূপান্তরণ প্রায় সম্পূর্ণ হল। প্রাকৃতিক ভেনাসেরও দিন শেষ হয়ে এল। উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যাস্তের ঘনায়মান অন্ধকারে ভেনাসকে আর চেনা যাচ্ছে না। নারীদেহের যে রূপ শিল্পীর কল্পনায় ধরা পড়ল তা ভেনাসের নয়।

রূপ ভাব প্রকাশের উপায়। ভাব স্বতই রূপময় কি না; রূপময় হ'লে রূপের লক্ষণ কী—এ প্রশ্ন আমি প্রবন্ধান্তরে বিশদ আলোচনা করেছি। রূপ ও ভাবের সম্বন্ধ তাদাত্ম্যের নয়। ভাবহীন রূপ আছে। ভাব প্রকাশ করে না যে-রূপ তা অর্থ হীন। ভাব রূপময়, অর্থবহ হতে হলে তার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (তা খুব সূক্ষ্ম হতে পারে) অধিকরণ বা আশ্রয় চাই। দেহের অধিকরণে ভাব পরিস্ফুট হয়। "ভাব" আমি প্লাতোর নিশ্চল অর্থে ব্যবহার করছি না। ইন্দ্রিগ্রাহ্য অধিকরণের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাবের অর্থান্তর ঘটে। বিপরীত-ক্রমে, ভাবের পরিবর্তন অধিকরণহীনভাবে কোনো স্তরেই অন্তরে বা বাইরে প্রকাশ করা যায় না, সঞ্চার সম্ভব নয়। তবে একাধিক রূপ এমনভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব যা অর্থবহ, ভাবসঞ্চারক এবং সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ, রূপসংগ্রহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বস্তুর মতই ভাবের অধিকরণ হয়ে ওঠে।

ভেনাস যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবের প্রতীক বা প্রকাশক ছিল, এবং ক্রমে রূপান্তরণের ব্যাপকতায় ও জটিলতায় হারিয়ে গেল (অন্তত আপাতত), তেমনিভাবেই হারিয়ে গেছে এ্যাপোলোর নগ্ন পুরুষ দেহের স্বর্গীয় সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের সারধর্ম হল রূপানুপাত ও রূপ-সামঞ্জস্য। গণিতিক সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন যে আদি গ্রীসদেশের দার্শনিক পিথাগোরাস, তিনি নাকি নিজেকে মনে করতেন পিথিয়ান এ্যাপোলোর পুত্র। এ্যাপোলো আলোর দেবতা। স্বভাবতই তিনি দীপ্ত: তবে অসহ্য তেজময় নয়। আলোক রশ্মির রূপ-রেখার নিখুঁত সামঞ্জস্যেরও তিনি ছিলেন প্রতীক। এ্যাপোলো নির্মল, শান্ত এবং জ্ঞানী। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই ভাব-রূপ ইয়োরোপীয় শিল্প-কলার প্রায় আড়াই হাজার বছর (ছ' শ' খ্রীঃ পূঃ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) বেঁচে ছিল। পৌত্তলিক যুগ থেকে খ্রীস্টীয় যুগে: মিশরীয়, গ্রীসীয়, রোমক এবং উত্তর-পশ্চিম

ইয়োরোপীয় ধ্যান-ধারণার প্রভাবে এ্যাপোলোর রূপান্তর, ভেনাসের মতো বিচিত্র না হলেও, উল্লেখযোগ্য।

নগ্ন এ্যাপোলোর মূর্তি পুরুষ দেহ-সৌন্দর্যের অপ্রমত্ত রূপ। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর এ্যাপোলো দৃপ্ত, স্ব-নির্ভর, কিন্তু বেশ আড়ষ্ট (অর্থাৎ ভঙ্গীতে অনুপাত আছে, ছন্দ নেই)। কেশবিন্যাসে মিশরীয় প্রভাব স্পষ্ট। অনুপাতে-ছন্দে মনোহর প্রথম পুরুষ মূর্তি ক্রিটিঅসের সৃষ্টি (এফিবি)। ছন্দ, অনুপাতের সঙ্গে যখন নির্ভুল শারীর বিদ্যা ও অস্থিবিদ্যার পরিচয় ফোটে স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে, দৃপ্ত ও শান্ত ভঙ্গীতে তখন মূর্তি (কামদ না হয়েও) প্রাণবন্ত হয়। পলিক্লিটাসের নামের সঙ্গে জড়িত নগ্ন মূর্তিগুলি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, নখাগ্র থেকে কেশশীর্ষ পর্যন্ত সকল কিছু নিখুঁত হিসেবে বাঁধা। ভারসাম্য, সামঞ্জস্য ও অনুপাতের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার শিল্প সৃষ্টির সার্থকতার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। মুখাবয়বে ও চোখের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের এমন কোনো প্রকাশ নেই যা সমগ্র দেহকে একটি সানন্দ অনুভবের উৎস করতে পারে। স্বর্গীয় বা দৈব চরিত্র প্রকাশের আগ্রহে প্রাচীন শিল্পীরা এ্যাপোলোর মুখে স্বাভাবিক মানবিক ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। এ্যাপোলো দেবতাকে মর্ত্য-মুখী ও মানবিক করার শিল্পরীতি প্রবর্তন করেন ফিডিয়াস "এ্যাপোলো অব দি টাইবার"-এ। এ্যাপোলোর দৃষ্টি স্থির, নীচের দিকে নিবদ্ধ, মুখে প্রসন্নতার (স্মিত হাসির ?) ছাপ। এই মানবিক ভাবটি আরো স্পষ্ট হল প্রাক্সিটেলেস-এর হার্মিস-এ (চতুর্থ শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ)। স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিত হল শান্ত মাধুর্যের। স্বর্গীয় দেবতার মর্ত্যে অবতরণের পর প্রাচীন গ্রীসে তার শেষ উল্লেখযোগ্য নয়নাভিরাম রূপ ফুটেছে "দি এ্যাপোলো অব বেলভেডিয়ার"-এ। মুখের সৌন্দর্যে, দৃষ্টির গৌরবে ও দাঁড়ানোর নৃত্যায়ত ভঙ্গীতে এ্যাপোলোর ইন্দ্রিয়ার্পিত রাজসিক ভাবটি হয়ে উঠেছে আশ্চর্য প্রাণবন্ত।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ প্রাচীন গ্রীস-রোম জগতের আলো ম্লান হতে সুরু করেছে। সংস্কারের পরাক্রমে সৃজনশীলতা নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল। নগ্নতা সংস্কারাচ্ছন্ন চোখে ও মনের মুকুরে সৌন্দর্য হারাচ্ছিল। হয়ে উঠছিল নিষিদ্ধ বিষয়। নীতি-ধর্মের নামে নগ্ন দেহ-সৌন্দর্যকে উপজীব্য ক'রে শিল্প-সৃষ্টির মানবিক ধারা রুদ্ধ হয়ে এল।

প্রায়-দেড় হাজার বছর পরে রেনেশাঁসের প্রাগূষায় আবার যখন নীতি-ধর্মের নিষেধ-ভেদ ক'রে শিল্পের মুক্তি-সন্ধানে পুরুষ দেহের নগ্ন সৌন্দর্য স্বীকৃতির আলোয় ফিরে এল তখন এ্যাপোলোর অনেক রূপান্তর ঘটেছে। গ্রীসীয় দেবতা ফিরে এল ইস্রায়েলের তরুণ রাজা ডেভিডের রূপ ধ'রে। দোনাতেল্লোর (১৩৮৬-১৪৬৬) ডেভিড কিশোর, মাথায় রাজার শির-ভূষণ, ডান হাতে যুদ্ধের তলোয়ার, বাঁ হাত কোমরে, দৃপ্ত ভঙ্গী। পেরুগিনোর (১৪৪৫/৫০-১৫২৩) এ্যাপোলো ধ্রুপদী রীতির স্মারক, সামঞ্জস্যে সুন্দর, রাজকীয়তায়

নিঃসঙ্গ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত। উর্ধ্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, নিম্নাঙ্গ যেন একটু রুগ্ন। এ্যাপোলো আলোর দেবতা হলেও রেনেশাঁসের পূর্বে কোনো শিল্পী সূর্যের দৃপ্ত তেজের আলোয় তাঁকে দেখান নি। এদিক থেকে ড্যুরেরারের (১৪৭১-১৫১৮) এ্যাপোলো যথার্থই নতুন। সূর্যের তেজকে যেন বাহুবলে ধারণ ক'রে আছে নগ্ন, দৃপ্তদেহী আলোর রাজা। আকাশ, মেঘ ও আলোর সঙ্গে সে একাত্ম। শান্ত, মধুর প্রাচীন এ্যাপোলো আর যেন নেই। কিন্তু ড্যুরেরার শিল্পরীতিতে ধ্রুপদী ছাপ অতি স্পষ্ট: ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, ভঙ্গীর ততটা নয়। রেনেশাঁসের দ্বি-প্রহরে রাফেল ও মিকেলেঞ্জেলোর হাতে প্রাচীন গ্রীস দেশের এ্যাপোলোর নতুন ক'রে জন্ম হল। পুরুষ দেহের সৌন্দর্য এদের দুজনকেই গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। প্লাতোর রূপপ্রধান ভাবদীক্ষা মিকেলেঞ্জেলোর আবেগ-অনুভবের প্রকাশকে কখনো প্রাধান্য পেতে দেয়নি: তাদের সর্বদাই রূপানুগতায় স্থির ক'রে রাখতে চেয়েছে। আশ্চর্য ও প্রাণবন্ত সামঞ্জস্যের পূজারীর হাতে নগ্ন সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ার্পিত বেলভেডিয়ারের এ্যাপোলোর রূপ আর ফিরে পেল না বটে, কিন্তু যা পেল তা যুগধর্মী (খ্রীস্টধর্মীয়) হয়েও ধ্রুপদী স্পর্শে সঞ্জীবিত। প্রথম বয়সে খোদাই করা ডেভিডের মূর্তির দেহে ধ্রুপদী মহিমা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট: দৃপ্ত ভঙ্গীটি মনোহরণও করে বটে, কিন্তু মুখাবয়ব ও দৃষ্টি, বিশেষত বড় হাত ও স্কন্দভঙ্গীটি, বীরোচিত,—দেবোচিত নয়। অবিশ্যি, প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিড মূল ভাবে অসুর-নিধনকারী; সৌন্দর্যে এ্যাপোলোধর্মী হতে পারে,—পূজ্য দেবতার ছাঁদে তৈরী নয়। নগ্ন পুরুষদেহ মিকেলেঞ্জেলোর হাতে বারবার লাভ করেছে নিখুঁত, স্বাভাবিক, সঞ্জীবনী স্পর্শ: সিষ্টিন সিলিং-এ (ভ্যাটিকানে) এজেকিয়েলের উপরে ডান দিকের নগ্ন যুবক (১৫০৯-১০), কিউমিয়ান সিবিলের উপরে বাঁ দিকের নগ্ন যুবক (১৫০৯-১০), "দি ফল অব ম্যান" (১৫০৯-১০), "দি ক্রিয়েশন অভ্ আডাম" (১৫১১) প্রভৃতি এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সংশ্লিষ্ট কাহিনীর অনুরোধে এ-সব অসামান্য শিল্প-কীর্তি এ্যাপোলোধর্মী হবার ছিল না, হয়ও নি। এ্যাপোলোধর্মী যে নগ্ন মূর্তিটি ভাবে-ব্যঞ্জনায় আলোর রাজাকেই স্মরণ করায় তা বার্গেল্লোতে (ফ্লোরেন্সের) রক্ষিত ডেভিড (হাতে ধরা প্রস্তর-নিক্ষেপক "স্লিং")। এই ডেভিড দেখতে অনেক মধুর, প্রায় স্বপ্নালু, ইন্দ্রিয় আবেদনময়। মানব-দেহের নির্ভুল রূপ প্রকাশে এই মূর্তি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়: এর মূল্য দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশের সার্থকতায়।

পৌরাণিক কাহিনী, ধর্ম-বিশ্বাস এবং এমন-কি ইতিহাসও যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের চিন্তায়-কর্মে দেখা দেয়। কখনো-বা তারা হারিয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতির এই অঙ্গগুলি খুব মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত হয়ে বারবার ফিরে আসে।

যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সংস্কৃতির আত্মীয়তা না থাকলে সংস্কৃতির প্রকাশ প্রথমে বিস্মরণে ডুবতে থাকে, ক্রমে বিকৃত হ'তে থাকে, একসময় আসে যখন অপ্রয়োজনের বাহুল্যে জাতির স্মৃতির তলে হারিয়ে যায় (এক অর্থে, থেকেই যায়)। প্রয়োজনে মানুষের চিন্তা-কর্ম, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুই-ই, হয় আদর্শমুখী : ইতিহাসের পশ্চাৎ টান ঐতিহ্যের রূপ নিয়ে আদর্শমুখী চিন্তাকর্মের রূপান্তরণও ঘটায়। এই দ্বন্দ্বে সংস্কৃতির এক রূপ ভাঙে, অন্য রূপ আসে : দুইরূপে অন্বয়ও থাকে, ব্যতিরেকও থাকে।

যে-ইয়োরোপে এ্যাপোলোর জন্ম হয়েছিল রেনেশাঁসের উত্তর পর্বে সেখানে দূর দেশ, আবিষ্কার, সাম্রাজ্য বিস্তার, যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লব, এক কথায়, দ্রুত পরিবর্তনের প্রবাহ এল। নির্মল আলোর দেবতার শান্তমূর্তি এই উপপ্লবের যুগে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে এল। সংস্কৃতির লক্ষণে নির্মলতা থেকে অস্বচ্ছতা, শান্তি-স্থিতির তুলনায় উত্তালতা-ক্রান্তিই হয়ে উঠল প্রধান। শুধু, মনে রাখা দরকার, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের জন্য কোন সংস্কৃতির অঙ্গই কখনো অবিমিশ্র চরিত্র অর্জন করতে পারে না। তাই, তথাকথিত মধ্যযুগের অন্ধকারেও আলোকরশ্মি দেখা যায় : রেনেশাঁসের নীচেও আঁধারপুঞ্জ সূক্ষ্মবুদ্ধি দর্শকের দৃষ্টি এড়ায় না। স্থিতি-প্রধান যুগেও তাই গতির স্পন্দন থাকে : আবার গতি-প্রধান যুগেও স্থিতির নিশ্চলতা। আলো-আঁধার, স্থিতি-গতি, এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়, নগ্ন-উলঙ্গ, সংস্কৃতির এমনই কতকগুলি মৌলিক ও সাধারণ ধারণা যে এদের কখনো সম্পূর্ণ অবিমিশ্ররূপে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

গতিশক্তির প্রকাশ, স্বাভাবিক প্রকাশ। স্থিতিও শক্তির প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক বলা হয় না। চঞ্চল হবার কারণ ঘটলেও শক্তিশালী ব্যক্তিই পারে শান্ত, অচঞ্চল থাকতে। গতি-স্থিতির, শিব-শক্তির, বা পুরুষ-প্রকৃতির ধারণা শুধু ইয়োরোপীয় বা ভারতীয় চিন্তাধারায়ই নয়, অন্যান্য চিন্তাধারায়ও লক্ষ্য করা যায়। শিবের রূপও আছে, আবার নৃত্যরত, নটরাজ, রূপও আছে। শক্তিরও যেমন আছে রণরঙ্গিণী রূপ, তেমনি আছে শান্ত, বরাভয়দায়িনী রূপ। এ প্রসঙ্গে মহাবলিপুরমের "দুর্গা ও মহিষাসুর" (৭ম শতাব্দী ও ইলোরার "দেবী মহিষমর্দিনী" (৭ম-৮ম শতাব্দী) উল্লেখ-যোগ্য। গতি ও শক্তির শিল্পরূপ দেখাতে গিয়ে ইয়োরোপে ও ভারতবর্ষে বারবার বিভিন্ন-ভাবে নগ্নদেহকে শিল্পীরা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ধ্বনি, চিত্রকল্প, ছন্দ ও সুর দিয়ে কবি ও সঙ্গীতশিল্পীও স্থিতি-গতির ভাব সৃষ্টিতে সক্ষম।

প্রধানত যোদ্ধা, মল্লবীর ও ক্রীড়াবিদদের রূপ অবলম্বন করেই গতি-শক্তির ভাবটি প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। ধর্মীয় কল্পনায় দেখা যায় দেব-দেবীরা মানুষের মতোই সহজে ঐরূপে প্রকাশিত। পবন-নন্দন হনুমান, ইন্দ্র ও জুস সকলেই বায়ুর মতো বেগবান ও

প্রবল শক্তিধর। কিউপিড ও কামদেব উভয়েই হাওয়ায় ধনু-তীর সর্বদা ভাস-মান। গ্রীস দেশের ভাস্কর্যে এবং পরে ইতালীয় শিল্পকলায় মল্লবীর এবং ডিস্কাস নিক্ষেপকারীদের নগ্নদেহ শৌর্য-বীর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে অমর ক'রে রাখা হয়েছে। হিস্টিয়ার বজ্রক্ষেপী (ব্রোঞ্জের) মূল শক্তিরই উদ্ধত রূপ বটে, তবে শক্তি এ-দেহের গতিতে বাধিত, মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, মাইরণের ডিস্কাসক্ষেপীর সেই অতি-পরিচিত দেহ-ভঙ্গীতে রয়েছে শক্তির প্রায় আধা-মুক্ত ভাবটি; আয়ত পেশীতে আবদ্ধ ক্রিয়ার মুক্তিমুখী গতি। রূপের সংস্থিতি যে গতির ভাব প্রকাশের মোটেই অন্তরায় নয়, বরং আবশ্যিক প্রকরণ, এ-জাতীয় শিল্পকর্মে তা স্পষ্ট। বিভিন্ন পেশীর রূপসংস্থাপন সর্বাঙ্গে স্পষ্ট হ'য়ে এমন সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলে যে তা একাধিক গতি-শক্তির প্রকাশের আধার, সম্ভাবনার জীবন্ত প্রতিশ্রুতি। মল্লবীরদের মল্লযুদ্ধ এবং গ্রীকদের সঙ্গে (পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ) আমাজোন নারীযোদ্ধাদের যুদ্ধের চিত্র নগ্নদেহভঙ্গীতে জীবন্ত করে রেখেছে গতি-শক্তিকে।

স্যামসন ও হার্কিউলিসকে নিয়ে প্রাচীন যুগ থেকে রেনেসাঁসের যুগ পর্যন্ত যে-সব বীরগাথা প্রচলিত ছিল তা কেন্দ্র ক'রেও বহু বিচিত্র শক্তির নগ্ন চিত্র আঁকা হয়েছে বা খোদাই করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পোল্লায়োলো আন্তোনিও (১৪৩২-৯৮) ও তার ভাই পিয়েরো (১৪৪১-১৪৯৬?) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "হার্কিউলিস ও এ্যান্টিউস" চিত্রে হার্কিউলিস যে-ভাবে এ্যান্টিউসের দু'পা মাটি থেকে তুলে তাকে দু' হাতের বজ্রপেষণে পেট ও বুকের উপরে পিষছে তা শক্তির অনবদ্য দৃশ্য রূপ। হার্কিউলিসের সম্মুখের দিকে বাঁকানো পা, পেট ও বুকের উপরে তুলে-ধরা এ্যান্টিউসের ভারে পেছনের দিকে ঈষৎ বাঁকা কোমর, দৃঢ় চোয়ালের নিরুদ্ধ মুখভঙ্গী এবং পরাস্ত-প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের হাঁ ও আর্তনাদ, মাংসপেশীগুলির নির্ভুল সঙ্কোচন-বিকোচন,—সবই অবিশ্বাস্য প্রাণবন্ত। এই ছবির ব্রোঞ্জ সংস্করণে পেশীর কাজ তত সার্থক নয়, তবে যুযুধানদের দেহ-সংস্থান, বিশেষত নিষ্পিষ্ট এ্যান্টিউসের আর্ত মুখভঙ্গী, অত্যন্ত বাস্তবোচিত। "হার্কিউলিসের হাইড্রা নিধন" পোল্লায়োলোর আরেক অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি। বহুমুখী এই সর্পদানবের সঙ্গে যুধ্যমান বীরের দেহ ও মুখের ভঙ্গী, হাওয়ায় ওড়া বস্ত্রখণ্ড, অস্ত্র সংস্থান ও সর্পদানবের দেহ ও ফণাগুলির বিন্যাস একটি অখণ্ড গতি-শক্তির সামঞ্জস্যে ছন্দিত। এই দু'টি শিল্পকীর্তি দেখে ("মহাভারতে"র আখ্যানের সঙ্গে পরিচিত) রসিকের স্বভাবতই মনে হয় একদিকে ভীম ও দুঃশাসনের, ভীম ও বকাসুরের, এবং ভীম ও শিশুপালের যুদ্ধের কথা, এবং অন্যদিকে কৃষ্ণ ও কালীয়দমনের কথা।[৮] এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু কর্তৃক অন্ধকাসুর বধের যে মূর্তি ইলোরার গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ (৭ম-৮ম খ্রীষ্ট শতক) আছে

তা উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট কাহিনীর পশ্চাৎপট জানা না থাকলে এইসব শিল্পকর্মের রসভোগে কিছু হানি হওয়া স্বাভাবিক।

পোল্লায়েওলো ভ্রাতৃদ্বয়ের শিল্পকর্ম লিওনার্দো, রাফেল ও মিকেলেঞ্জেলোকেও গতি-শক্তির চিত্র রূপায়ণে প্রভাবিত করেছিল। লিওনার্দো ও মিকেলেঞ্জেলো শারীর ও অস্থিবিদ্যার প্রগাঢ় জ্ঞান গতি-শক্তির প্রকাশে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে, কিন্তু তাতে মৌলিকতা কিছু আছে কিনা তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। এ্যান্টিউস, সিংহ ও সর্পদানবের সঙ্গে হার্কিউলিসের যুদ্ধ নিয়ে উচ্চাঙ্গের ড্রয়িং এঁকেছেন মিকেলেঞ্জেলো : নিপুণ ভাস্কর মূর্তি রচনা করেছেন স্যামসনের সঙ্গে ফিলিস্টাইনদের যুদ্ধের। কিন্তু সৃজনধর্মী কোন ভাবের পরিচয় মেলে না। তুলনায় রাফেলের নগ্নদেহী মানুষদের যুদ্ধ চিত্রের মানবিক আবেদনে নতুনত্ব আছে : অতি-পরিচিত ধ্রুপদী আস্বাদ থেকে বেশ খানিকটা ছুটি। ধ্রুপদী বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এবং মানবিকতার আবেদন অক্ষুণ্ণ রেখে' গতি-শক্তির বলিষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন রুবেন্স। এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "Abduction of Hippodamia।" দেহগুলি বিপরীত দিক থেকে প্রবল বেগে চিত্রের কেন্দ্রে যেন বিষম সামঞ্জস্যে মিলিত। দেহভঙ্গী, উড়ন্ত অঙ্গবস্ত্রের রূপ, ঘোড়ার লেজ ও পা'র পদক্ষেপে গতি-শক্তি উজ্জ্বল ও জীবন্ত। একাধিক নারীদেহের বিষম সামঞ্জস্যে ঐক্যবদ্ধ গতিময় নৃত্যরূপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় শিল্প ইতিহাসেও বহু আছে। শিকার মহাদেব মন্দিরে একটি প্যানেল (১০ম শতাব্দী) আছে যাতে পাঁচটি নারীদেহকে ললিত নৃত্যভঙ্গীতে দেখান হচ্ছে। মধ্যের নারীমূর্তির নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে ডান দিক থেকে দু'জন বাঁ দিক থেকে দু'জন বাদ্য-যন্ত্রসহ বিপরীত নৃত্যভঙ্গীতে সহযোগিতা ক'রে চিত্রের সুন্দর ভারসাম্য এনেছে।

গতি-শক্তি রূপায়নে বিষয়-বস্তু, রূপ, রঙ, রেখা, রীতি প্রভৃতি একক ও সমবেতভাবে সাহায্য করে। দৌড়, ওড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়-বস্তু হিসেবেই গতি-শক্তির দ্যোতক। শরীরচর্চা, নাচ সম্পর্কেও অল্পাধিক এ-কথা সত্যি। ইলোরার উড়ন্ত দেহ এবং রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ আশ্চর্য প্রাণবন্ত। রবি বর্মার আঁকা শূন্যে "রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ"ও গতি-স্পন্দনে সুন্দর। দেলাক্রয়ের "মেয়েদের মল্লযুদ্ধ" ("Girls' Wrestling") ও দেগার "স্পার্টান ছেলে ও মেয়েদের শরীরচর্চা" ("Spartan Girls and Boys Exercising") ছবি দু'টিতেই গতি-শক্তির উপভোগ্য সাক্ষ্য মেলে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিষয়-বস্তুর ধর্মানুরোধে গতি-শক্তির প্রকাশ সীমিত। পরবর্তীকালে দেগা বহু স্নানার্থিনী ও নৃত্যরতা নারীদেহ এঁকেছেন যাতে গতি-শক্তির প্রকাশ আরো সহজ ও স্বাভাবিক। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে "রিহার্সেল অব ব্যালে অন দি ষ্টেজ", "দি ক্যার্টেন ফল্স্", এবং "অন দি ষ্টেজ"। ছবিগুলিতে প্রদর্শিত সহজ ও সাবলীল নৃত্যভঙ্গী প্যাস্টেল

ব্যবহারে, রঙের অনুগ্রতায় এবং দেহ-ভঙ্গীর দ্রুতিতে স্পন্দিত। অনেকগুলি চঞ্চল দেহের সামগ্রিক অন্বয়ে নারীদেহের গতিতে দেগা একটি বিশেষ চরিত্র দিতে সক্ষম হয়েছেন। সীমিত দেহ-গতির প্রত্যক্ষধর্মী শিল্পরূপ দেগার "দি টাব" (১৮৮৬), "দি মর্ণিং বাথ" (১৮৯০) এবং "দি উ'ম্যান ড্রাইং হারসেল্‌ফ্"-এও পরিদৃষ্ট। অন্যান্য সকল-কিছুকে গৌণ ক'রে দেহের সক্রিয় ভঙ্গীগুলিকেই এইসব চিত্রে বলিষ্ঠভাবে দেখানো হয়েছে।

দেগা থেকে ডালি (১৯০৪—) এক শিল্প-জগৎ (ইম্প্রেশনিইজ্‌ম্) থেকে আরেক শিল্প-জগতে (সুররিয়ালিমইজ্‌ম্-এ) উপনীত হওয়া। ডালির প্রথম বয়সে (১৯২৩) আঁকা "বেদার্স অব লা কষ্টা প্রাভা—বেদার্স অব ল্‌আনার" চিত্রে স্নানার্থিনীদের নৌকোয়, জলে, গা' ঘষার বিভিন্ন ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে। কোনো নারী সাঁতরাচ্ছে, কেউ নৌকায় উঠছে, কেউ স্নান করছে, কেউ নৌকোর উপর আরাম করে বসে আছে, কেউ গা' ঘষছে, কারু কাপড় হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, দূরে নৌকোর পাল ও জলে তার ছায়া, তীরের কাছে দাঁড়িয়ে শান্ত দৃষ্টিতে কেউবা দেখছে এই অশান্ত-সুন্দর দৃশ্য, প্রকৃতি-মানবের মিলিত খেলা। দর্শকের মন গভীরভাবে স্পর্শ করে বহু ও বিচিত্র দেহ-ভঙ্গীর আশ্চর্য সমন্বয়ে প্রস্ফুট একটি অখণ্ড আনন্দরূপ। পরিণত বয়সে (১৯৭১-৭৪) আরেকটি গতি-শক্তির ছবি এঁকেছেন ডালি যার নাম দীর্ঘ ও কাব্যিক "The daughter of the West Wind/To the East Wind was wed,/When he went to see her/Returnd crying to his bed।" এই ছবিতে মানুষ-মানুষীর বহু দেহ (স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক), সমুদ্র তীর, সমুদ্র, জাহাজ, আকাশ, মেঘ, পূর্ব ও পশ্চিম হাওয়ার (দুটি-বিপরীত) প্রতীক দেহ—সবই আছে : কিন্তু দেহগুলি যেন গৌণ, প্রতীকই মাত্র, একটি ভাব প্রকাশের বাহন : আর ভাবটি রয়েছে ঐ কবিতার পংক্তিতে (ইঙ্গিতে) বিভিন্ন ও বিপরীত হাওয়ার আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলেছে ভূ-মধ্য সাগরের উপর। তীরে দাঁড়িয়ে দেখছেন ডালি ও (তাঁর স্ত্রী) গালা।

শিল্পকর্ম যতই প্রত্যক্ষের স্তর থেকে কল্পনার স্তরে, কল্পনার স্তর থেকে ভাবনার স্তরে, বা আরো অমূর্ত প্রতীকিত ভাবনার স্তরে, উত্তীর্ণ হতে থাকে, নগ্ন ও উলঙ্গতার পার্থক্য তত ক্ষীণ হতে থাকে। এ দু'য়ের পার্থক্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার প্রাধান্য-অপ্রাধান্য দিয়ে স্পষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় পৃথকীকরণের মধ্য আপেক্ষিকতার "দোষ" থেকে যেতে বাধ্য। কারণ, এক আদিম সংস্কৃতিতে (এবং শিল্পকর্মে) যা ভাবনা ব'লে স্বীকৃত তা আধুনিক সংস্কৃতির অনেকের কাছেই কল্পনা ব'লে পরিগণিত। এই অসুবিধা যে কোনো একটি সংস্কৃতির মধ্যেও আছে : যে-শিল্পকর্ম কিছু লোকের কাছে "প্রেমোদ্দীপক"

বা "প্রেমজ" তা অন্য কিছু লোকের কাছে "কামোদ্দীপক" বা "কামজ" ; ভিন্ন কিছু লোকের কাছে তা "অশ্লীল", "কুৎসিৎ" ও "অসভ্য" মনেও হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার তীব্রতা-ভেদাভেদও প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং এমন-কি গোষ্ঠী-রুচিসাপেক্ষ। যদিও কিছু বুদ্ধিবাদী নন্দনতাত্ত্বিক রুচিকে সার্বভৌম ও অচঞ্চল ব'লে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণে-বিচারে গ্রাহ্য নয়।[৯] ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে ও গুহায় উৎকীর্ণ কামকেলিরত দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষী, অপ্সর-অপ্সরা ও মানুষ-মানুষীর মূর্তি নিয়ে শ্লীলতা-অশ্লীলতার যে-বিতর্ক বহুকাল ধ'রে চলেছে তা শুধু এ-দেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এবং এ-বিতর্ক এক বৃহত্তর দার্শনিক (বুদ্ধিবাদ বনাম ইতিহাসবাদ) বিতর্কের অংশ। বিতর্কে অংশ নিয়ে বুদ্ধিবাদী বলেন, বুদ্ধি ও রুচি মানুষের ক্ষেত্রে মূলত এক ও অভিন্ন ; ভিন্নতার কারণ হল অস্থির-অগভীর দেশ-কালের অত্যন্ত সাময়িক প্রভাব ; অতএব, শিল্পীর কর্তব্য হল শাশ্বত রূপ-রসের অনুভব-ও প্রকাশ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। তার মতে, এই রুচি-বুদ্ধি রূপময় সুন্দরকে তার স্বরূপেই জানতে ও বিচার করতে পারে : নান্দনিক জ্ঞান-বিচার বিষয়াশ্রিত ও অনুভব-সিদ্ধ। যদি এই সিদ্ধান্ত আমরা না স্বীকার করি, বুদ্ধিবাদীর যুক্তি হল, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, একই শিল্পকর্ম এক ব্যক্তির/গোষ্ঠীর কাছে "সুন্দর" ও "শ্লীল" প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্য ব্যক্তির/গোষ্ঠীর কাছে "অসুন্দর" ও "অশ্লীল" প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে : এবং এ স্বীকৃতির নিহিতার্থ হল, শিল্পকর্মের "শ্লীল" ব'লে নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই ; তার তথাকথিত ধর্মগুলি মানুষের কল্পনা-আরোপিত, প্রতিক্রিয়া-জনিত। শিল্পের সর্বজনগ্রাহ্য, সর্ব দেশ-কালস্বীকৃত, একটি শাশ্বত রূপের সন্ধানে বেরিয়ে বুদ্ধিবাদী শিল্পকর্মের অনুভবসিদ্ধ রূপের যে-কথা বলেন ইতিহাসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক সে-কথা মানতে নারাজ। তার আপত্তি এই অনুভবসিদ্ধ রূপটি সমাজায়ত ও ইতিহাস-আশ্রিত। বিচারে দেখা যাবে, সমাজ-ও ইতিহাস-আপেক্ষিকতা শিল্পকর্মের নান্দনিক ধর্মকে অস্বীকার করে না,—অস্বীকার করে সে-ধর্মের চিরন্তনতার (ইতিহাস-বিরুদ্ধ) দাবীকে। ব্যক্তিমনের বিবিধ প্রতিক্রিয়ার "বিশৃঙ্খলতা" থেকে সুন্দরকে রক্ষা ক'রে তাকে "শাশ্বত" ক'রে রাখার দায়িত্ব নন্দনতাত্ত্বিকের নয়। আসলে "বিশৃঙ্খলতা"ই কাল্পনিক,—অনৈতিহাসিক মনের কল্পনা। বিচার করলে নন্দনতাত্ত্বিক দেখবেন যে, সুন্দরের রূপ পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য ও সাধারণ (বা সামান্য) ধর্ম থাকে,—যা ব্যক্তিমনের অবদান বা প্রতিক্রিয়া নয়। শিল্পের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ স্বধর্ম এমনভাবেই অধিবিষ্ঠ।

তথাকথিত পরিশীলিত মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির কাছে "প্রেম" হল ভালো ও প্রশংসনীয়

এবং "যৌন আকর্ষণ" হল মন্দ ও নিন্দার্হ। ফ্রয়েডের[১০] মতো মনস্তাত্ত্বিকেরা ও মের্লো পঁতির[১১] মতো দার্শনিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিস্তারিত যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেখিয়েছেন যে, দেহ-মনের সম্বন্ধ এতই অবিচ্ছেদ্য ও পারস্পরিক যে যৌন আকর্ষণ ব্যতীত প্রেম এবং প্রেম ব্যতীত যৌন আকর্ষণ নিছকই অমূর্ত কল্পনার অবাস্তব আহরণ। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায়ও প্রেম ও যৌন জীবনের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা স্পষ্ট। যৌন সম্বন্ধ পারিবারিক সম্পর্কের ভিৎ কিংবা নোঙর। "যৌন" শব্দটির অর্থ সীমিত আঙ্গিক অর্থে নিলে ভুল হবে। শিল্পকর্মে, সঙ্গীতে, এমন-কি কণ্ঠস্বরেও যখন "যৌনাবেশের" কথা বলা হয়, বলাবাহুল্য, তখন তার ব্যঞ্জনা বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম। সংস্কৃতির নানা অঙ্গ, বিশেষত নীতি ও ধর্ম, শিল্পকর্মে দেহের প্রকৃত ভূমিকা উপলব্ধির পথে (বিচার না করলে, সতর্ক না থাকলে) অন্তরায় হয়ে ওঠে। আমরা যখন পৌরাণিক ও ধর্মীয় দেব-দেবীর কথা পাঠ করি ও সে-বিষয়ক শিল্পকর্ম দেখি তখন এমন অনেক কিছু পাই যা আধুনিক নৈতিক বিচারে অশোভন, এমন-কি অশ্লীল ও ব্যভিচার। এ অবস্থায় নানা ষ্ট্র্যাটেজি নেওয়া হয়।[১২] এক, এই কাহিনী বা চিত্রগুলি রূপকমাত্র, সত্য নয়। দুই, দেব-দেবীদের জগৎই আলাদা : সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে তাদের বিচার করলে ভুল হবে। তিন, দেব-দেবীর রতি ও বিরহকে আধ্যাত্মিক অর্থে নিতে হবে, স্থূল মানবিক (রক্ত-মাংসের) অর্থে নয়। কন্যাপহরণ, পরস্ত্রী অপহরণ, বলাৎকার, জারজ সন্তান, হিংসা-ক্রোধবশত যুদ্ধ ও হত্যা ইত্যাদির অসংখ্য কাহিনীতে ভারতবর্ষের ও ইয়োরোপের মহাকাব্যগুলি পূর্ণ। তবু এ-সব পাঠ করা "অমৃত সমান"। সাধারণ বিচারে যা মন্দ, নিষিদ্ধ, এমন কি পাপ, দেব-দেবীদের ক্ষেত্রে ভিন্নতর বিচার দিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। এই দিক থেকে দেখলে, ভিন্ন ষ্ট্র্যাটেজি গুলির লক্ষ্য কিন্তু অভিন্ন : বুদ্ধি দিয়ে পরিশোধন করা।

লক্ষণীয় হল, আমরা দেব-দেবীদের ক্ষেত্রে কামকে প্রেম ব'লে মেনে নিতে প্রস্তুত, এবং সেই অনুসারে নীতি-ধর্মের বিচারও অন্যরকম করতে প্রস্তুত : কিন্তু ম্যালিনোওস্কি ও র‍্যাড্‌ক্লিফ-ব্রাউনের মতো নৃতাত্ত্বিকরা যখন আদিম উপজাতিদের যৌন ও বিবাহ জীবনের বর্ণনা দেন তখন তা আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই অগ্রহণযোগ্য। বুদ্ধি-পরিশোধন ব্যবহারে আমরা তখন উৎসাহী নই। বরং, পক্ষান্তরে, নীতি-ধর্মজনিত এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে আমরা "বর্বরতা" ও সভ্যতা"র পার্থক্য ব'লে বুঝি ; এবং বুঝে' তার ভিত্তিতে "বর্বর" যৌন ও বৈবাহিক আচার-বিচারের বিরুদ্ধে রায় দিই। এখানে স্বীকার করা ভালো আমাদের সকলেই যে আদিমদের জীবনধারাকে অন্ধ বুদ্ধিতে সমালোচনা করি বা রোমান্টিক কল্পনায় "হৃত স্বর্গ" ভাবি তা নয় : কিছু ব্যতিক্রমও আছে। কিছু সহানুভূতিশীল-বিচারশীল ব্যক্তি আছেন যাঁরা শিল্প ও সমাজকে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক পট-

ভূমিতে দেখতে চান। প্রথম দেখা, দেখে বুঝতে চেষ্টা করা, এবং পরে বিচার করা। নৈতিক বিচার বা নান্দনিক বিচার, যা'ই করি না কেন, বিচারের পূর্বে ও পরে বিচারে অনুস্যূত নিয়ম ও নির্ণায়ক সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে: সচেতন হ'লে বোঝা যাবে যে, আমাদের বিচারও ঐতিহাসিক ও আপেক্ষিক। এই ইতিহাস-চেতনাই আপেক্ষিকতাকে দোষাবহ না ক'রে বাস্তবধর্মী ক'রে তোলে।

ইতিপূর্বেই আমি স্বীকার করেছি "নগ্ন" ও "উলঙ্গ"র মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টানা কত কঠিন এবং কেন কঠিন। এই কঠিনতা ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতা, বাস্তব পরিমণ্ডল, দিয়ে বুঝতে হবে। অনেকেই মনে করেন: "প্রেমজ" নান্দনিক; "কামজ" অস্ফুট-নান্দনিক (হলেও হতে পারে); "যৌন" অ-নান্দনিক,—নিছকই শারীরিক। দেহ-মনের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই শ্রেণীকরণ ও ধারণাগুলি মূলত নৈতিক-ধর্মীয়, বস্তুনিষ্ঠ নয়। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের খ্যাত-অখ্যাত বহু শিল্পীর শিল্পকর্মই এক সময়ে বা সমাজে যা "প্রেমজ" ও "সুন্দর" ব'লে নিন্দিত হয়েছে তা'ই অন্য সময়ে বা সমাজে "কামজ"-তবে-"সুন্দর" ব'লে স্বীকৃত হয়েছে: একই শিল্পকর্ম "যৌন" ও "অশ্লীল" ব'লে নিন্দিতও হয়েছে। যদিও বিপরীত কামিতাকেই অতীতে ও বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ নর-নারীদের যৌন সম্পর্কের স্বাভাবিক রূপ ব'লে মনে করেছে, কিন্তু সকল সময়েই কিছু মানুষ ছিলেন (এবং এখনো আছেন) যাদের মতে সমকামিতা নান্দনিক ও নৈতিক বিচারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ইংরাজী "erotic" (কামদ) প্রাচীন গ্রীসে ছিল "যৌন প্রেমে"র সমার্থক: এরস (Eros) ছিলেন ঐ দেশের "মদনদেব। কিন্তু ইংরাজী-ছোঁয়া আমাদের অনেকের মনেই "erotic" (কামদ) হল pornograhic" (অশ্লীল লেখা বা আঁকা সম্পর্কিত)-এর সমার্থক। গ্রীস দেশের ভাষায় *porne* কথার অর্থ হল গণিকা আর *graphein* হল লেখা বা আঁকা। যে-সব শিল্পকর্ম কামদ বা কামজ তা অনেক ক্ষেত্রেই যে গণিকাসংক্রান্ত নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রেম নিয়েও অশ্লীল কিছু সৃষ্টি করা যায়: আবার গণিকার জীবন, এমন-কি দেহ, নিয়েও সুন্দর রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম হয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ক্রোচের সুপরিচিত মত। শিল্পকর্ম শিল্প হল কি না সেটাই একমাত্র বিচার্য: শিল্পের শ্রেণীকরণ (শ্লীল/অশ্লীল, কামজ/প্রেমজ প্রভৃতি) সম্পূর্ণ অর্থহীন।

> "The so-called *arts* have no aesthetic limits, because, in order to have them, they would need to have also aesthetic existence in their particularity, and we have demonstrated the altogether empirical genesis of those partitions. *Consequently, any attempt*

at an aesthetic classification of the arts is absurd.···All the books dealing with classifications and systems of the arts could be burned without any loss whatever—"[১৩] (উদ্ধৃতির বাক্য দুটি আমি চিহ্নিত করেছি)

ক্রোচের মূল কথা হল, শিল্পের শ্রেণীকরণের সূত্র বা ভিত্তি শিল্প-বহির্ভূত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, নান্দনিক নয় ; অতএব এইসব শ্রেণীকরণের কোনো মূল্য নেই। এ-জাতীয় উক্তি কলিংউডও করেছেন।[১৪] ভালো শিল্পকর্ম ও মন্দ শিল্পকর্মের মধ্যে ভেদরেখা টানতে কলিংউড রাজী নন। তাঁর মতে, মন্দ শিল্পকর্ম শিল্পকর্মই নয়,—শিল্প সৃষ্টি চেষ্টার ব্যর্থতা মাত্র। শিল্প-বহির্ভূত কোন সূত্রকে মেনে নিয়ে শিল্পকর্মের শ্রেণীকরণ করলে, ক্রোচে-কলিংউডের মতে, শিল্পের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। শিল্পের মূলধর্ম হল প্রকাশ (একটি বিশেষ অর্থে), যা আমি প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করেছি। প্রকাশ এমনই স্বতন্ত্র চরিত্রের যে তার উৎস বা কারণ (নীতি, ধর্ম, পুরাণ, সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি) অনুসন্ধান বৃথা। শিল্প এক অর্থে আন্তর অনুভবসিদ্ধ। শিল্প-বহির্ভূত অভিজ্ঞের কারণ ও উৎস অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে, শিল্প-মূল্য নেই।

আসলে প্রকাশবাদীদের এই বক্তব্য শিল্প-স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক-সামাজিক আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। একথা সহজ বুদ্ধিতে ঠিক ব'লেই মনে হয় যে, "নগ্ন সৌন্দর্য" "নগ্নতার জন্য সৌন্দর্য" নয় ; অথবা, "উলঙ্গ সৌন্দর্য" "উলঙ্গতার জন্য সৌন্দর্য" নয়। কিন্তু এ-সংস্কৃতির সূত্র ধরে প্রকাশবাদী আমাদের দিয়ে স্বীকার করাতে চাইবেন যে সৌন্দর্যের নিজস্ব জগৎ ও স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। এই স্বীকৃতির তাৎপর্য হল : সৌন্দর্য সৃষ্টির "মূল" নান্দনিক নিয়মগুলি চিরন্তনী, সামাজিক-ঐতিহাসিক নয় ; পক্ষান্তরে, সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিবেশ নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী মানবাত্মার ভঙ্গুর বহিঃ-প্রকাশমাত্র। প্রকাশবাদী নন্দনতাত্ত্বিক শিল্প-প্রকাশকে আরো মৌলিক, স্থিরায়ু প্রকাশ ব'লে মনে করেন। আমাদের মতে, শিল্পের ক্ষেত্রে "এটি সুন্দর কি না ?" এ-জাতীয় প্রশ্নই একমাত্র গ্রাহ্য নয়, "এটি সুন্দর কেন ?" এ-জাতীয় প্রশ্নও গ্রাহ্য। "সুন্দর কেন ?" প্রশ্নোত্তরের মধ্যে রয়েছে সমালোচনার সূত্র কী কী, যুগে-যুগে কেন সূত্রের পরিবর্তন হয়, এক যুগের নিন্দিত শিল্প কেন অন্য যুগে নন্দিত হয়—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার পন্থা। নান্দনিক সুন্দরের (ও অসুন্দরের) শাশ্বত রূপ-সন্ধান বৃথা। শাশ্বতের রাজ্য থেকে মানবিক অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও পরিবর্তন চির নির্বাসিত। প্লাতোপন্থী শাশ্বতবাদের বিরুদ্ধে আরিস্ততল-হেগেলপন্থী প্রকাশবাদীরা ইতিহাস সম্পর্কে আপাত দৃষ্টিতে খানিকটা উদার মনোভাব দেখান।[১৫] তাঁরা বলেন, সুন্দর ভিন্ন জগতের শাশ্বত রূপ নয় ; সুন্দর

মানব চেতনার আবেগ-কল্পনার মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে, প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়: নান্দনিক সৌন্দর্যের রূপ মানব-চেতনায় প্রকাশিত হলেও তার উদ্ভব ও বিলয় বুঝতে হলে মানবোত্তর ও অনৈতিহাসিক এক দিব্য চেতনাকে স্বীকার করতে হয়। এঁদের মতে নান্দনিক চেতনা সমাজ-ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র হলেও সার্বভৌম পরম চেতনার অনুগত ; উচ্চতম দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইতিহাস-পরিবর্তন সব মিথ্যা (থেকেও নেই)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নান্দনিক সৌন্দর্যের সমাজায়ত ও ঐতিহাসিক রূপ ও রূপান্তর তত্ত্বের যাঁরা বিরোধী তাদের মূল দুটি তত্ত্ব হল ; সার্বভৌম চেতনা তত্ত্ব এবং তার উপর নির্ভরশীল স্বতন্ত্র শিল্প-চেতনা তত্ত্ব। আমাদের বক্তব্য হল : মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ না করলে এই দুটি তত্ত্বের একটিকেও দাঁড় করানো যায় না। মানুষের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহে মূর্ত-অমূর্ত বহু স্তর আছে : কিন্তু কোনো স্তরকেই, কোনো স্তরের রূপকেই, অনৈতিহাসিক, শাশ্বত, এবং মানবোত্তর কোনো চেতনার ক্রম-স্ফুটমান রূপ ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, যা ইতিপূর্বে ই বলেছি, মানুষের চেতনা মূলত দৈহিক, স্থূল না হলেও সূক্ষ্ম শরীরাশ্রয়ী, এই চেতনার রূপও তাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে জটিলভাবে শরীরাশ্রয়ী। শরীর-মন দেশ-কালের সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সামঞ্জস্যে যুক্তাবদ্ধ। শাশ্বত সৌন্দর্যের রূপ মানুষের জানা নেই। তার সৃষ্টি রূপ-রসের তাই বারবার দেশে-কালে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। এক দেশের সুন্দর অপর দেশে সৌন্দর্যের স্বীকৃতি পায় না। এক কালে যা ধিকৃত, অন্যকালে তা আদৃত। সুন্দর সন্ধানের বিশ্বস্ত পন্থা হল নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করা, দেশ-কালের পরিমণ্ডলে অনুধ্যান করা, এবং আবার বর্ণনা করা।

সার্বভৌম চেতনা তত্ত্ব স্বীকার ক'রেও শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ-কালে শিল্প কেন পৃথক হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ-কালের মানুষের মানসিক কাঠামো ও প্রবণতা ভিন্ন হয় ব'লে কেউ কেউ দাবী করেন এবং তা দিয়েই শিল্পরূপেরও বিচারের পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেন। প্রকারান্তরে এ মতবাদ শিল্প স্বাতন্ত্র্য তত্ত্বের অনুগামী। উইলিয়াম আর্চারের মতো বুদ্ধিপ্রধান শিল্পসমালোচকরা ভারতীয় শিল্পে ইয়োরোপীয় মনের রূপপ্রধান (গ্রীসীয় গণিত-জ্যামিতির উত্তরাধিকার) দিকটি না দেখে নিরাশ হন, এবং নালিশ করেন, ভারতীয় শিল্পী-ভাস্করদের অনুপাত-চেতনা কম তাদের সৃষ্টি উদ্ভট, অবাস্তব, কখনো অর্থহীন, এমনকি অশালীন যৌন আবেদনময়। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি রজার ফ্রাইর নাম উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্য পুনরুভ্যুদয়ের পথিকৃৎ হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা সুবিদিত।[১৬] উড্রফ, হ্যাভেল[১৭]

ও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ[১৮] অধ্যাত্মবাদী শিল্পরসিকেরা স্বভাবতই এ-জাতীয় "অগভীর" বুদ্ধিবাদী বিচারে অসন্তুষ্ট। তাঁদের মতে, ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পের মর্মকথা হল রূপের মধ্যে অরূপ-অসীমকে, পরমাত্মাকে, প্রকাশ। মনিয়ার-উইলিয়ামস ও উইলসনের উদ্ধৃতি দিয়ে হ্যাভেল ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যে নগ্নতার ভূমিকা সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমার কাছে একদিগ্‌দর্শী ব'লে মনে হয়েছে। "The cult of nude female, on which all modern academic art in Europe is based, can......bring no inspiration to India. It is upon spiritual beauty that the Indian Artist is always insisting."[১৯] বলা হয়েছে, ইয়োরোপীয় শিল্পাদর্শ রূপপ্রধান : ভারতীয় শিল্পাদর্শ লাবণ্যপ্রধান ও অধ্যাত্মধর্মী।

আমার মতে, এ জাতীয় বক্তব্য, বিশ্লেষণ দিয়ে যতই সূক্ষ্ম করা হোক না কেন, এতই ব্যাপক যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। ইয়োরোপীয় শিল্প-কলায় রূপ-প্রাধান্য সর্বদা সমান ছিল না : লাবণ্যের স্বাক্ষরও দুর্লভ নয়। তাছাড়া ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সভ্যতার একটি বিশেষ পর্বে প্রায় সকল সংস্কৃতিতেই দেখা যায় শিল্প-সাহিত্যের মূল অনুপ্রেরণা। শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষের অনুকরণ কদাচিৎ অন্ধ : প্রায় সর্বদাই তা ভাব প্রকাশের বাহন। সেজন্য "ভারতীয় শিল্পকলা ভাবপ্রধান : ইয়োরোপীয় শিল্পকলা ভঙ্গীপ্রধান" এ-জাতীয় উক্তিও অনেকটা ব্যাপকতার আধিক্যে অর্থহীন। খাজুরাহো, কোণারক ও অন্যান্য মন্দির ও গুহায় খোদিত বা অঙ্কিত নগ্ন দেহের চিত্রাবলীকে "নিছক কামোদ্দীপক" ব'লে অবমূল্যায়ন যেমন ঠিক নয় তেমনি আবার তাদের "আধ্যাত্মিক জগতের অনুষঙ্গ ও দ্বারপাল" ব'লে অধিমূল্যায়নও ঠিক নয়। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যে, তন্ত্রে ও কৃষ্ণলীলায় নগ্ন দেহের ভূমিকা যে ছিল সেই অকাট্য সত্যকে শিল্পী-সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টা করলে তাতে লজ্জার বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে সব রাজাদের আগ্রহে-অনুগ্রহে শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছে এবং যে-সব শিল্পী ও তাদের সহকারীরা সংশ্লিষ্ট মন্দির তৈরী করেছেন ও গুহাচিত্র এঁকেছেন তাদের বিশ্বাসে ও জীবনে নগ্ন দেহী মানুষের স্থান নিষিদ্ধ ছিল না। লক্ষণীয় যে, পরবর্তী এক যুগে ইয়োরোপের মতো ভারতবর্ষেও নগ্ন নর-নারী নীতিধর্মের নামেই শিল্প-জগৎ থেকে প্রায় নির্বাসিত ছিল। ইসলাম সভ্যতার প্রভাব এ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষের যে চতুর্বর্গের কথা বারবার বলা হয়েছে তাতে শুধু ধর্ম ও মোক্ষের কথাই নেই,—কাম ও অর্থের কথাও আছে। ধর্মমাত্রই মোক্ষের পথ নয়। মুমুক্ষু হলে যে তাকে কাম ও অর্থের বর্গ পরিত্যাগ করতে হবে তা নয়। কাম ও অর্থ যে মুক্তির অন্তরায় নয় তা শুধু অর্থশাস্ত্রে ও কাম-সূত্রেই স্বীকৃত নয়, ধর্মশাস্ত্রেও স্বীকৃত বটে। কাম যে মুক্তির সহায়ক হতে পারে তার

স্বীকৃতি তন্ত্রে ও বৈষ্ণব মতে স্বীকৃত। বলা যেতে পারে, কাম সেক্ষেত্রে প্রেমের থেকে অভিন্ন কিংবা উচ্চতর কোন চেতনার অধীন। কাম ও প্রেমের সম্বন্ধ নিয়ে বিতর্ক এখানে আবার তোলা যেতে পারে। এ-ও বলা যায় : প্রেমের তুলনায় কামের অবমূল্যায়নের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নেই ; এর কারণ হল কোনো এক নীতিভিত্তিক জীবন-দর্শন। মানুষ যে প্রাণী তা মেনে না নিয়ে তার জন্য অবাস্তব নীতি প্রণয়ন করলে নীতি আচরিত, অনুসৃত হয় না,—জীবনের সঙ্গে তার অনন্বয় কৃত্রিমতায়, শঠতায় বিকৃত হয়ে ওঠে। মুক্তির অর্থও যে স্বতই জগদতিরিক্ত বা সর্বব্যাপ্ত কোন পরম তত্ত্বপ্রাপ্তির চেষ্টা তা না-ও হতে পারে : লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও মদনদেবও যে পূজ্য হল এই ব্যাপারটির সঙ্গে প্রধান যোগ রক্তমাংসের দেহ-মনের, প্রয়োজনের। দেবতারা সব মানবিক প্রয়োজনসিদ্ধির কল্পিত (দৈব/মানবোত্তর) উপায়। প্রত্যেক ধর্মেই আলো ও অন্ধকারের, গতি ও স্থিতির, স্বর্গ ও নরকের, এবং মানব-জীবনের অন্যান্য গভীরতর প্রয়োজন সিদ্ধির দেব-দেবী থাকে। ধর্ম এই স্বাভাবিক অর্থেই কেবল জীবনের এতো অন্তরঙ্গ সহচর, মূল্যবান উত্তরাধিকার।

আনন্দ প্রয়োজনের দাস নয় বটে, তবে তার সঙ্গে (সূক্ষ্ম হলেও) অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। শিল্প স্বাতন্ত্র্য তত্ত্বের নামে যাঁরা এই সম্পর্ক দেখতে ও বুঝতে না-রাজ তাদের পক্ষে শিল্পে নগ্নতা ও উলঙ্গতার ভূমিকা অস্বীকার করা বা আধ্যাত্মিকতার প্রতীক রূপে কল্পিত ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া উপায় কী! একথা ঠিক যে, প্রাচীনকাল থেকেই বহু দেশে লিঙ্গ ও যোনি সৃষ্টি ও উর্বরতার প্রতীকরূপে পূজিত।[২০] যা পূজ্য বা মূল্যের প্রতীক তাকে শিল্পজগতে প্রবেশাধিকার দেওয়া সহজ, কিন্তু তাকে শিল্পকর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করা অন্য জিনিষ, ভিন্ন প্রতিভাসাপেক্ষ। মানুষের নৈতিক ও ধার্মিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যা পর্যাপ্ত স্বতই তা মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ নয়। মানুষ একাধারে সুন্দরের উপাসনাও করে আবার যৌন কামনার তৃপ্তিও খোঁজে। উপাসনা ও কামনায় অন্তর্নিহিত কোন বিরোধ নেই। শিল্পে-সাহিত্যে দেব-দেবীদের জীবন-কাহিনী থেকে তা স্পষ্ট। কেবলমাত্র দেহ-কামনা বা যৌন তৃপ্তির জন্য শিল্পকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করলে "শিল্প" তার শিল্পচরিত্র হারায়। দেহ সেক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে উলঙ্গ। শিল্পচরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে যে নগ্ন দেহ সহ যে কোনো বিষয় ব্যবহার করা যায় তার উদাহরণ রয়েছে প্রচুর।

কুর্বের আঁকা "রমণীর দেহকাণ্ড"কে বলা হয়েছে "কামদ বাস্তবতার শেষ কথা" : সারা ক্যানভাস জুড়ে দেখান হয়েছে শায়িত নগ্ন দেহের বিস্তারিত উরুর মধ্যবর্তী রোমাবৃত কটিতটান্ত। দেহের স্বাস্থ্য, রোম আঁকার দৃপ্তভঙ্গী, মাংসের প্রাণময়তা, আশ্চর্য রঙের

ব্যবহার এই ছবিটিকে করে তুলেছে শিল্পসুন্দর মানবিক উর্বরতার প্রতীক : উপজীব্য সাধারণ বিচারে "কামদ" হলেও শিল্পীর প্রতিভা তাকে উপভোগ্য নান্দনিক চরিত্র দিতে সমর্থ হয়েছে। পিকাসোর আঁকা দু'হাত দিয়ে দু'পাশ থেকে টেনে-ধরা রোমাবৃত যোনির ড্রয়িং বলিষ্ঠতায় ও বাস্তবতায় আশ্চর্যভাবে নান্দনিক,—নিছক কামদতার অগ্নিভস্ম নয়। আঁদ্রে ম্যাসন ও রবার্ট এ্যাণ্ড্ পার্কারও এমন সব বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন যে দ্রষ্টা যদি রসিক না হন তাহলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের শিল্পচরিত্র তার কাছে উন্মোচিত নাও হতে পারে।[২১]

কিন্তু অনেক ছবি আছে অনুধ্যান করেও যাদের "শিল্পচরিত্র" রসিকজন উপলব্ধি করতে সমর্থ হন না। এইসব ছবি যেন উলঙ্গ নর-নারীকে নানাভাবে দেখিয়ে দ্রষ্টার নিছক যৌন কামনা তৃপ্তির, অ-শৈল্পিক কোন প্রয়োজন মেটানোর, চেষ্টায়ই মূলত নিরত। প্রসঙ্গত কিছু নৈপুণ্য, এমন-কি শিল্পসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি, যে দেখানো হয় না তা নয়। কিন্তু মূল চরিত্র শিল্পের নয়, যৌন প্রয়োজন সিদ্ধির। চীন, জাপান, পারস্য ও ভারতবর্ষের শিল্পীদের আঁকা অনেক ক্ষুদ্র চিত্র, দীর্ঘ রেশমে বা কাগজে আঁকা চিত্র পাওয়া যায় যে সবের মূল উপজীব্য হল স্বাভাবিক বা বিকৃত কামকেলির ভঙ্গী দেখানো উপজীব্য যৌন হলেই যে শিল্প তার চরিত্র হারাবে তা নয় : কিন্তু ভঙ্গীর সঙ্গে ভাবও যদি হয় নিছক কামদ তাহলে আনুষঙ্গিক পরিবেশ আঁকার শিল্পনৈপুণ্য (ষড়ঙ্গ সম্মত হলেও) চিত্রের মূল চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে না,—হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে শুধু আলঙ্কারিক মূল্যের।

নগ্নতা ও উলঙ্গতার মধ্যে পার্থক্য বিষয়গত ও বিষয়ীগত দুই-ই। এই পার্থক্য তাই অনুভবসিদ্ধ হয়েও বিচার্য। দেহের নগ্নতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা সমাজে স্বাভাবিক এবং, সেইজন্য, বিষয়গত। যে-সব ক্ষেত্রে বা সমাজে বস্ত্রাচ্ছাদন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সে-সব ক্ষেত্রে সমাজে বিবস্ত্রতা বা উলঙ্গতা শুধু অস্বাভাবিকই নয় অ-নান্দনিকও বটে। যে-সব আদিম সমাজে নগ্নতাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সে-সব সমাজে "উলঙ্গতার" প্রসঙ্গে তাদের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য বিচার আমাদের পক্ষে শিক্ষণীয়। আদিম সমাজে নগ্নতা উলঙ্গতার পার্থক্য (সমাজান্তরের অভিজ্ঞতা না থাকলে) অর্থহীন : বরং বস্ত্রাবৃত মানব দেহ সেখানে শুধু অস্বাভাবিক ও কৌতূহলোদ্দীপকই নয় (নান্দনিক বিচারে) অসুন্দরও বটে। স্বাভাবিকতার একটি সীমিত অর্থও আছে। যে শিল্পকর্মে নগ্নতার যৌন আবেদন অন্য সকল উপাদান ও অঙ্গকে অত্যন্ত গৌণ ক'রে রসিকচিত্তেও প্রবল হয়ে ওঠে সেই শিল্পকর্মের সীমিত প্রসঙ্গে নগ্নতা উলঙ্গতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু বৃহত্তর কোনো পট-ভূমিতে (বিশাল গুহামন্দিরে, প্রাসাদে, মন্দিরের গৌণ অংশরূপে) "উলঙ্গতা"ও নগ্ন হয়ে

ওঠে, নান্দনিক বিচারে (মূল ভাবের বিপ্রতীপ ভাব সঞ্চার ক'রে) সুন্দর ব'লে স্বীকৃতি লাভ করে।

রসিকচিত্ত নিঃসন্দেহে বিষয়ীগত। বিষয়ীগত ব'লে তার বিচার বা প্রতিক্রিয়ায় যথেচ্ছতার চিহ্ন নেই। কারণ, রূপ এবং ভাবের মুক্ত অনুশাসনে তার রসবোধ সৃজনী শৃঙ্খলায় অনুশাসিত। রসিকচিত্তের (বিষয়ীগতের) এই আন্তর অনুশাসন ছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ (বিষয়গত) শৃঙ্খলা ও অনুশাসন রয়েছে। তা হল রসিকচিত্তে প্রচলিত সামাজিক রূপ ও ভাবের প্রভাব। সমাজে যা প্রচলিত বস্তুত তা ইতিহাস-প্রভাবিত, ঐতিহ্য-সিঞ্চিত। সমাজ ও ইতিহাসের প্রভাব-মুক্ত কোন চিরায়ু রসিকচিত্ত নেই। তবু যে নগ্নতা ও উলঙ্গতার নান্দনিক বিচারে নানা যুগে নানা মত, এমন-কি একই যুগে নানা মত দেখা যায়, তার কারণ মানুষের মনের সঙ্গে সমাজ-পরিমণ্ডলের, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সৃষ্টিসন্ধী অন্তহীন দ্বন্দ্ব।

শিল্প ও শিল্প-বিচার

তত্ত্ব-বিচার (সত্তা ও অধ্যাসসহ) নিঃসন্দেহে দুরূহ। সত্যাসত্য-বিচার কঠিন। ধর্মাধর্ম-বিচার জটিল। সকল বিচারের মধ্যে বোধহয় সব থেকে জটিল, অনির্দিষ্ট ও বিতর্কমূলক হল শিল্প-বিচার। সমালোচনাকে আমি বিচারের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করি। লক্ষ্য বিচার : অনুগামী ও অন্যতম সহায়ক সমালোচনা। শিল্প-বিচারের এই অনির্দিষ্ট, জটিল ও বিতর্কমূলক চরিত্রের মূল কারণ এই যে শিল্পকর্মে শিল্পী মানুষ যে ভাবে জড়িত ও সক্রিয় এমনটি বোধহয় আর কোনো ক্ষেত্রে নয়। অথচ শিল্পে শিল্পী এমনভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও শিল্পসৃষ্টিতে তার মুক্তি সীমাহীন নয়। মুক্তি তার রূপ-রসের নিয়মে বাঁধা, সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্মের পরোক্ষ অনুশাসনে বাঁধা : সর্বোপরি, সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল আলোছায়ার পশ্চাৎপট তো রয়েইছে। সত্যাসত্য বিচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে (ব্যাপকার্থে) অর্থবিচার (এবং তৎসংশ্লিষ্ট আরো কতগুলি অনুবিচার)। শিল্পের প্রকারভেদে—সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি ভেদে—অর্থ ও রূপের বিচারে বৈচিত্র্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। শিল্পের স্বরূপ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি, তা সে যত অনির্দিষ্টভাবেই হোক না কেন, বিশ্লেষণ না ক'রে তাই শিল্প-বিচার গুরুত্বহীন।

শিল্প কি ? শিল্পের স্বরূপ কি ? এ জাতীয় প্রশ্নের (সর্বসম্মত তো দূরে থাক) সদুত্তর দেওয়ার অসুবিধা একাধিকবার আমি উল্লেখ করেছি। নেতি পন্থায় বলার চেষ্টা করেছি : শিল্প অন্ধ অনুকৃতি নয় ; সমাজ-দর্পণ নয় ; আন্তর লোকের বা চেতনা জগতের স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশ নয় ; বিচারপ্রধান বুদ্ধির (জ্ঞানবিবর্ধক) প্রকাশ নয় ; আনন্দ দান করার উপায় মাত্র নয় ; অনুভব-আবেগের সঞ্চারমাত্রও নয় ; রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো প্রয়োজন সিদ্ধির নিছক উপকরণও নয়। শিল্প যা যা নয় ব'লে উল্লেখ করলাম, লক্ষণীয় হল, শিল্পীদের অভিমত ও সৃষ্টির ইতিহাস থেকে তার বিরুদ্ধে অনেক প্রসিদ্ধ বক্তব্য মেলে। অর্থাৎ শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ কিংবা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু বিখ্যাত শিল্পী-সমালোচকের উল্লেখ ক'রে কোনো নন্দনতাত্ত্বিক ইচ্ছা করলে অনায়াসে বলতে পারেন, শিল্প প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুকৃতিধর্মী নয় এবং সেজন্য (অতীন্দ্রিয় তত্ত্বলোকের না হলেও) জীবন ও প্রকৃতির দর্পণ বৈ কি (হতে পারে সে-দর্পণ অস্বচ্ছ) ! আন্তর লোকে স্বয়ংসিদ্ধ না হলেও শিল্প চেতনারই প্রকাশ (হতে পারে সে চেতনার বিষয় জীবন, প্রকৃতি বা বহির্জগতের অন্য কিছু ; এবং এ-ও হতে পারে যে সে চেতনায় ভাবনা-

বিচারের তুলনায় আবেগ-অনুভূতির প্রভাব প্রবলতর)। শিল্প-সৃষ্টির উৎস ও উদ্দেশ্য যত দুর্নিরীক্ষ্য ও বিচিত্র হোক না কেন, এ-কথা অনুভব-বিরুদ্ধ যে শিল্পরস উপভোগে আনন্দ নেই। বিভিন্ন রসের বিভিন্ন টান-পড়েনে, সুখ-দুঃখে-ব্যথায় মন যতই আন্দোলিত হোক না কেন, আনন্দ দান বোধহয় শিল্পের অন্যতম স্বধর্ম। ন্যূনতম অর্থে শিল্প জ্ঞানাত্মক বা বিচারমূলক না হলে রূপ ও বিষয়ের মিলন সার্থক হয় না,—নিছক সহাবস্থানে পর্যবসিত হয়; উপজীব্যের বৈচিত্র্য লক্ষ্যসন্ধানে সংহত-সক্রিয় হয় না। অন্য মানুষের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চার করার ইচ্ছা যদি শিল্প-চেতনায় প্রবল হয় বা তাকে অভিভূত করে তাহলে শিল্পীর পক্ষে শিল্পকে সঞ্চারধর্মিতার সীমিত স্তরে সার্থক করার জন্য এবং তার ফলে শিল্পে একটি অনাবশ্যক প্রচারের প্রবণতা এসে যায়। শিল্প নিঃসন্দেহে একের অভিজ্ঞতা অনেকের মধ্যে সঞ্চার করে, কিন্তু তা তার মূল ধর্ম নয়। শিল্পের আবেদন সামগ্রিক: সঞ্চার সার্থক হলে দেহ-মন আনন্দঘন হয়ে আসে: এবং সেক্ষেত্রে শিল্পী না চাইলেও তার অনুরাগী ব্যক্তি ও সমাজ তার সৃষ্টিকে প্রচারে লাগাবেন এতে আর আশ্চর্যের কী আছে! সমাজায়ত ও ঐতিহ্যলালিত শিল্পীর ব্যক্তিসত্তায় রাজনীতি, ধর্ম ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ধ্যান-ধারণা ও ঘটনাপ্রবাহ প্রভাব ফেলবে,—এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু শিল্পীর হাতে উপজীব্য বিষয়বস্তুমাত্রই,—প্রকৃতি, মানুষ, ধর্ম, সমাজ সবকিছুই, রূপান্তরিত হয়ে যায়। রূপান্তরণের উদ্দেশ্য একটিই: শিল্পসৃষ্টি। শিল্পের শিল্পচরিত্র যদি নষ্ট না করে তাহলে উপজীব্যের বস্তুচরিত্র শিল্পের পক্ষে কিছু হানিকর নয়।

শিল্পের স্বরূপ-নির্ণয়ের নেতিপন্থা থেকে অস্পষ্টভাবে হলেও শিল্পের একটি ইতিরূপের পরিচয় মেলে। সে-পরিচয়ে উপজীব্যের বস্তু-চরিত্র যদি নির্ণীত না হয় তাহলে শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে বস্তুর নিছক অনুকরণ করলেন, নাকি অনুসরণ ক'রে বিবরণ দিলেন মাত্র, নাকি ব্যাখ্যা দিলেন, অথবা তার সঙ্গে নিজস্ব মূল্যায়নও জুড়ে দিলেন—এ-সব মূল প্রশ্নের উত্তরই ঠিক করা যায় না। মনে রাখা দরকার, একটি বস্তুর থেকে শিল্পবস্তুর পার্থক্য অনেক এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। পদার্থবিদ সূর্যাস্তের যে বিবরণ দেন শিল্পীর কাছে তা বিদিত এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কিন্তু অনেকাংশেই বাহুল্য। বিজ্ঞানী সূর্যের রঙ, তাপ, আলোর রৈখিক কোণ ইত্যাদি সম্পর্কে যা বলবেন তা যন্ত্র, জ্যামিতি ও অন্য কিছু দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় সত্য কি না। কিন্তু সূর্যাস্ত নিয়ে যে শিল্পী ছবি আঁকবেন তাঁর উপজীব্য বস্তু পদার্থবিদের জ্যামিতি ও যন্ত্রানুশাসিত রঙ, তাপ, আলো নয়। আবার পদার্থবিদের রঙ, তাপ, আলো প্রভৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে শিল্পীর ছবি আঁকা অসম্ভব, আঁকা ছবির বিচারও অসম্ভব। এক বিশেষ অর্থে, বিচারের

ভিত্তি হল বিবরণ। বিবরণের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিবরণ সত্য হতে পারে, বিবরণ মিথ্যা হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শৈল্পিক বিবরণ সত্য না কি মিথ্যা তার নিষ্পত্তি নির্ভর করে যে পূর্ব-প্রকল্প বা পশ্চাৎপট ধরে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়। যদি বলা হয় "গানের দেশে গভীর রাতে ফুল পরীরা এসে নামল" তাহলে এ-কথার বা এর চিত্ররূপের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হলে "গানের দেশ" কি ও কোথায়, "ফুলপরী" কি তা ঠিক করতে হবে, অর্থাৎ, এই শব্দ (নাম) গুলির বাক্যার্থ জানতে হবে বা ঠিক করতে হবে। যদি "গানের দেশ" ব'লে কোনো দেশ না থাকে এবং "ফুলপরী" ব'লে কোনো (লৌকিক বা অলৌকিক) জীব না থাকে তাহলে "গানের দেশে গভীর রাতে ফুল পরীরা এসে নামল" জাতীয় বাক্য সাধারণ অর্থে সত্য ব'লে মানা শক্ত। এ কথা তো বলা সম্ভব যে, শিল্প-সত্য অ-সাধারণ হলেও সত্য। সে-ক্ষেত্রে গানের দেশ "থাকা"র ও ফুলপরী "থাকা"রও একটি অ-সাধারণ অর্থ ঠিক করা বা আবিষ্কার করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। দেশ-কালে যা নেই, যা থাকতে পারে না, তাকেও থাকতে পারে ব'লে মেনে নিতে হয়। শিল্প-জগতের ও শিল্প-বস্তুর "থাকা" সে-ক্ষেত্রে দেশ-কালের জগৎ থেকে ভিন্ন হয়ে যায় ; এই জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলাও সেখানে খাটে না। ব্যাখ্যা দিয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে, অথবা প্রচলিত ব্যবহার থেকে "গানের দেশ" কি রকম দেশ, "ফুলপরী" কি জাতীয় জীব তা ঠিক করা যেতে পারে। ঠিক করা হয়ও। ঠিক করা এই সব "দেশ" ও "জীব" এর ক্ষেত্রে (বৈজ্ঞানিক অর্থে) "কোথায়?" প্রশ্নটি তুললেও উত্তর মিলবে না। আসলে শিল্পের জগৎ ব্যাখ্যার জগৎ, সিদ্ধান্তের জগৎ, এক কথায়, কল্পনার (পুনঃসৃষ্ট) জগৎ।

সমস্যা হল, শিল্পকৈবল্যবাদীরা, যাঁরা মনে করেন শিল্পের জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই কথা থেকে চট ক'রে একটি ভুল সিদ্ধান্ত টেনে বসেন : দেশ-কালের বস্তুজগৎ থেকে শিল্প-জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি সহজ অর্থে ভিন্ন তো বটেই। নইলে শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভা হ'ত যা আছে তার অনুকরণমাত্র, কিংবা, বড় জোর, বস্তুজগতের ও শুদ্ধ চিন্তার নিয়ম মেনে যা হবে তা আগে থেকে বলে দেওয়া, সাজিয়ে রাখা। সৃষ্টির জন্য সে ক্ষেত্রে কল্পনা বা প্রতিভার প্রয়োজন হ'ত না,—অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, নৈপুণ্যই হ'ত পর্যাপ্ত। বস্তু জগতে যা আছে তার অনুকরণে কোন শিল্পী "ভুল" করলে শিল্প-বিচারে তা খুব অল্প ক্ষেত্রেই ত্রুটি,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাস, গল্প বা নাটক ইতিহাস নয়। তবু অসতর্ক পাঠক বা দর্শক পাছে ভুল করে তাই প্রায়ই তাকে বলে দেওয়া হয় (যা উহ্য ও বাহুল্যমাত্র) "ইতিহাসের ছায়াবলম্বনে।" শিল্পীর পক্ষে ইতিহাসের ছায়াকে অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই : কারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাসকে সে যদি

হুবহু অনুসরণ করে তবে ইতিহাস থেকে শিল্প হবে অভিন্ন। এখানে স্বীকার করা ভালো, যা আমি স্থানান্তরে বিশ্লেষণ করেছি, ইতিহাসও কিন্তু অতীত কালের অবিকৃত কলেবর নয় : ঐতিহাসিককেও ঘটনাপুঞ্জ থেকে অনেক কিছু বাদ দিতে হয়, কিছু সংগ্রহ ক'রে তাদের প্রতিনিধিমূলক চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে অর্থবহরূপে সাজাতে হয়। সীমিত অর্থে ঐতিহাসিকও শিল্পী। অনেকটা যেন পোর্ট্রেট-শিল্পীর (মুখাবয়ব আঁকে যে শিল্পী তার) কাজের মতো। পদার্থবিদের বস্তু-জগৎ থেকে ঐতিহাসিকের মানব জগৎ ভিন্ন : আবার ঐতিহাসিকের মানব জগৎ থেকে শিল্পীর কল্পিত শিল্প-জগৎ ভিন্ন। ভিন্নতার সঙ্গে স্বতন্ত্রতারও স্তরভেদ ঘটেছে। কিন্তু একের সঙ্গে অপরের সঙ্গে সূক্ষ্ম বা স্থূল অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকেই যাচ্ছে।

সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতা মনে রেখে বলা যেতে পারে, শিল্পের প্রাথমিক উপজীব্য পদার্থ-বিদের বস্তু-জগৎ ; তার পরিশোধিত দ্বিতীয় স্তরের উপজীব্য ইতিহাস (ও সমাজ)। প্রকৃত শিল্প-জগৎ আরো পরিশোধিত, এই দুই জগৎ থেকে আরো স্বতন্ত্র, কিন্তু ছিন্ন নয়। অনুকরণবাদীরা শিল্পের প্রাথমিক উপজীব্যের উপর জোর দিয়ে বলেন : ঈশ্বরের সৃষ্ট তথাকথিত বস্তু-জগৎই সব থেকে সুন্দর—সব থেকে বেশী নান্দনিক আনন্দদায়ক। ছায়া জগৎ ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক ; তত্ত্ব জগৎ শুদ্ধ বুদ্ধিগম্য ও এই জ্ঞানের আনন্দ নির্মলতম। তাঁরা বলেন, বস্তু-জগৎ শিল্প-জগৎ নয়,—তত্ত্ব জগতের ছায়ামাত্র। ভাববাদীদের অনেকে বলেন, ইতিহাসই ঈশ্বরের ইচ্ছা-সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ শিল্প, মহানাটক, এবং মহাকাব্যে যা অনেকটা প্রকাশিত। তত্ত্ব-জগৎ, বস্তু-জগৎ, ইতিহাস-সমাজ-জগৎ ও শিল্প-জগতের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরণ ও অবতরণের। উভয় দিক থেকেই এই সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে। দেখার ও দেখানোর কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। এই নয় যে মানুষকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এই উত্তরণ ও অবতরণের একটি বিশেষ স্তরে, ইতিহাসে-সমাজে, দেখানো যায় না। যায়। কিন্তু সে স্তরেও একটি পরিচয়, জড় ও প্রাণের ভিত্তি, অঘোষিত, এবং আরেকটি পরিচয়, শিল্প-সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণা, অস্ফুট। প্রস্ফুট শিল্প চেতনায় বস্তু-জগৎ নানা স্তরে পরিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত : ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে (দেহে), ইতিহাসে সমাজে (ভাষায়), ভাবনা, অনুভব ও কল্পনায়। প্রত্যেক স্তরেই বিবরণ এবং ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সংমিশ্রিত। শিল্পীর বিবরণ ভাষ্যধর্মী, ব্যাখ্যাময়। সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে এবং এমন কি স্থাপত্যেও ব্যাখ্যা ও ভাষ্য অনিবার্য। শিল্পীর ভাব ও অনুভবকে প্রকাশ করতে গিয়ে বিবরণ ব্যাখ্যাধর্মী ও ভাষ্যময় হয়ে পড়ে। শিল্পী যে-ভাষাই ব্যবহার করুক না কেন, তার প্রতীকধর্মিতা ও সাঙ্কেতিকতা কখনো অবিকল বিবরণ দিতে পারে না। এক অর্থে প্রতীক ও সঙ্কেতের এটা অন্তর্নিহিত

চরিত্র। আরেক অর্থে, এটা সৃষ্টিমাত্রেরই ধর্ম। সৃষ্টি করতে গেলে সৃষ্টির উপজীব্য বিষয়-বস্তু থেকে অন্য কিছু, ভিন্ন কিছু, অধিক কিছু সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে আনতে হবে, অনুপ্রবিষ্ট দেখাতে হবে। নকল যদি অবিকল হয় তবে তা সৃষ্টি নয়। আসল ও নকল যদি সকল বিষয়েই অবিকল হয়, তবে তা গণনায় ভিন্ন হলেও বিষয়ে অভিন্ন: আর সে ক্ষেত্রে "নকল"কে নকল না ব'লে আসল ব'লে দাবী করলে, অথবা বিপরীত দাবী করলে, তা নস্যাৎ করা শক্ত।

"বিবরণ" শব্দটি শিল্পের ক্ষেত্রে আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। কিন্তু মূল কথাটি একই: যা আছে (তার নাম না দিয়ে) তাকে চেনবার জন্য, নিরূপণ করার জন্য লক্ষণ দেওয়া। "রাম দশরথ-পুত্র" এই বাক্যের "রাম" হলো নাম এবং "দশরথ-পুত্র" তার বিবরণ। "দশরথ-পুত্র" এই বিবরণাত্মক পরিচয় শুধু রামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়,—লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তারাও "দশরথ-পুত্র।" তাহলে, দেখা যাচ্ছে, "দশরথ-পুত্র" বিবরণ হিসেবে অনন্য নয়, একটি মাত্র ব্যক্তির পরিচয় বহন করছে না। "রাম" নামের ক্ষেত্রেও বোধহয় এ-কথা অল্পাধিক সত্য। রামায়ণের জগতের কথা ভুলে গেলে তার বাইরে "রাম" নামে পরিচিত ব্যক্তি এক বা অনন্য নয়; অনেক "রাম" আছে। ব্যক্তিবাচক নামও যদি অনন্যতার নিশ্চায়ক না হয়, তাহলে নাম মাত্রই একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সাধারণ; বহু ব্যক্তির নামই এক, কিংবা বিপরীতক্রমে বলা যায়, এক নাম বহু ব্যক্তিতে প্রযোজ্য। প্রশ্ন জাগে: ব্যক্তিবাচক নামও কি তাহলে বিবরণের মতো সাধারণধর্মী, অনন্যতাবর্জিত? জগতান্তরে ব্যক্তি নামের ও বিবরণের অর্থান্তর ঘটে, এ-কথা সহজবোধ্য, স্বীকার্য; কিন্তু একই জগতে ব্যক্তি নামের ও বিবরণের একাধিক অর্থ আছে বা হতে পারে স্বীকার করলে অনেক অসুবিধা। বিবরণ ও ব্যাখ্যায় তাহলে পার্থক্য করা যাবে কেমন করে? নাম ও যথেচ্ছ চিহ্ন ব্যবহারে তাহলে পার্থক্য করা যাবে কেমন করে? আর এই জাতীয় পার্থক্য যদি করা না যায় তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের, এমনকি সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, শিল্পের ক্ষেত্রে তাহলে সত্যাসত্য ও সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিয়ে সমালোচনা করা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

নাম, ব্যাখ্যা, ভাষ্য, বিবরণপ্রমুখ মূল ধারণাগুলির ক্ষেত্রে যদি নৈরাজ্য থেকেই যায়, তাহলে শিল্প-সমালোচনা ও বিচারের দার্শনিক ভিত্তি ব'লে নির্দিষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। শিল্পবিচার তাহলে মতপ্রকাশে পর্যবসিত হয়। এই নৈরাজ্য দূর করার জন্য কোনো কোনো উগ্র বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মনে করেন, ব্যক্তি নাম ও নামাঙ্কিতের সম্বন্ধ অনন্য ও অচ্ছেদ্য,—শুধু এক জগতেই নয় জগতান্তরেও বটে। যদি এই মূল কথাটি স্বীকার করা না হয় তাহলে,

তাঁদের মতে, "অর্থান্তর", "অর্থের পরিবর্তন" প্রভৃতি পদের কোন নির্দিষ্ট অর্থ ই নির্ণয় করা যায় না। " "দশরথ-পুত্র" শুধু রামের বিবরণ নয় লক্ষ্মণেরও বটে" এই কথার ঈপ্সিত অর্থ বোধগম্যই হয় না যদি আগে স্বীকার করা না হয় যে "দশরথ-পুত্র" (অন্তত) রামের সঠিক বিবরণ। সঠিক বিবরণ হতে গেলেই অনন্যতার শর্ত অবশ্য পালনীয় না-ও হতে পারে। সে শর্ত বরং ব্যক্তিবাচক নামের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রত্যাশিত। ব্যক্তিবাচক নামের সঙ্গে (যথা, রাম নামের সঙ্গে—নামের ও শব্দের মধ্যকার পার্থক্য মনে রাখতে হবে) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধ, উগ্র বুদ্ধিবাদীর মতে, অনন্য, অচ্ছেদ্য ও শাশ্বত। নাম-শব্দের অর্থান্তর ব্যাখ্যার জন্য এ রকম কল্পনা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু অনিবার্য নয়। যে জগতে নাম-শব্দের ও অন্যান্য অর্থপূর্ণ শব্দের উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয় হয় সেই জগতের পটভূমিকায় অর্থান্তরের পূর্ণতর ও সার্থকতর ব্যাখ্যা মেলে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে শব্দ ও শব্দ-সংগ্রহের, বাক্যের এবং এমনকি বাক্য-স্তবকেরও, সঠিক অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। সঠিক অর্থ নির্ণয়ের জন্য শব্দ ও শব্দ-সংগ্রহের ব্যবহারিক নিয়ম জানা আবশ্যিক। কোন সমাজে, কোন সময়ে, কীভাবে কোন শব্দ বা শব্দ-সংগ্রহ ব্যবহার করতে হবে তার নিয়মাবলী (তা সে যতই জটিল ও অস্থায়ী হোক না কেন) জানতে হবে।

বিবরণ যেমন জটিল থেকে জটিলতর, অন্তহীনভাবে জটিল, করা যায়, শব্দের ব্যবহারও প্রায় তেমনি অন্তহীন বৈচিত্র্যময়। রামের পিতৃ-পরিচয়, নিবাস, উচ্চতা, গাত্রবর্ণ ইত্যাদি দিয়ে তার যে বিবরণ দেওয়া হয় তা অপেক্ষাকৃত সাধারণ, জটিলতামুক্ত ; এবং, সেজন্য, এ-জাতীয় বিবরণ কাঠামোগত নিয়মের সাহায্যেই দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রামের প্রকৃতি, নৈতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবণতা প্রভৃতি দিয়ে যদি তার বিবরণ দেওয়া হয়, তবে তা হবে জটিল ও সূক্ষ্ম ; এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলিও হবে অপেক্ষাকৃত জটিল ও সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিবরণ উভয় ক্ষেত্রেই অতি ব্যাপক থেকে অতিসূক্ষ্মভাবে দেওয়া সম্ভব। শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিয়ম আছে অতি সাধারণ ও অতি প্রচলিত ; আর কতগুলি নিয়ম আছে সূক্ষ্ম, জটিল এবং স্বল্প ব্যবহৃত। "নতুন নিয়ম" বা "অভূতপূর্ব ব্যবহার" ব'লেও কিছু আছে। পুরনো নিয়ম একইসঙ্গে অনুসরণ ক'রে ও ভেঙে' নতুন নিয়মকে নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একইভাবে "অভূতপূর্ব" ব্যবহারে ভূতপূর্ব ব্যবহার অংশত বর্জিত ও অংশত অনুসৃত। কাঠামো ও নিয়মের ব্যবহারিক নৈকট্য তাদের নীতিগত আত্মীয়তার আরেক দিক।

রামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবরণ, যথা, তার "গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল", "আয়ত চক্ষু", "উন্নত নাক" সত্য হতে পারে না-ও হতে পারে। রামের বুদ্ধিগ্রাহ্য (এক্ষেত্রে প্রকৃতিগত) বিবরণ, যথা তিনি "দয়ালু", "প্রজাবৎসল" ও "রাজধর্মনিষ্ঠ" সত্য কি না তা নির্ণেয় হলেও সহজে

নির্ণেয় নয়। কারণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিবরণ ও ব্যাখ্যা/ভাষ্য বড় বেশী মিলে-মিশে গেছে। কোন কোন আচরণকে "দয়ালু", "প্রজাবৎসল" বলা ঠিক তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। অবশ্য কোন দেশে কোন গাত্রবর্ণকে "উজ্জ্বল", কোন চক্ষুকে "আয়ত" বলা ঠিক হবে তা নিয়েও যে বিতর্ক হতে পারে না তা নয়। "সত্য হওয়া" ও "ঠিক হওয়ার" মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিবরণ, অর্থাৎ বিবরণাত্মক বাক্য, সত্য অথবা মিথ্যা হয়। ব্যাখ্যা বা ভাষ্য সঠিক হয় অথবা বেঠিক হয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জগৎ, পরিমণ্ডল বা পূর্ব-ধারণা উল্লেখ করা না হলে বা মেনে না নিলে সত্যাসত্যের প্রশ্নই ওঠে না; সুতরাং তা বিনিশ্চয়ের কথাও ওঠে না। সত্যাসত্য সে সব ক্ষেত্রে অনির্ণেয়। বিবরণ ও ব্যাখ্যা/ভাষ্যের তুলনায় আরো জটিল সমস্যা দেখা দেয় যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মূল্যায়নসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক এই দুটি বাক্য "রামের পত্নীপ্রেম অতুলনীয়" অথবা "রাম সত্যপ্রিয় ও নির্ভীক।" অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা বলবেন, রামের পত্নী প্রেমকে "অতুলনীয়" বলা (মূল্যায়নসূচক শব্দটি ব্যবহার করা) ঠিক নয়; রাম "সত্যপ্রিয় ও নির্ভীক"ও নন। সমালোচকদের যুক্তি সাজালে এইরকম দাঁড়ায়। রামের পত্নীপ্রেম যদি বস্তুতই অতুলনীয় হ'ত, তিনি যদি বস্তুতই সত্যপ্রিয় ও নির্ভীক হতেন তাহলে নিষ্পাপ ও পতিব্রতা সীতাকে তিনি প্রজাদের মিথ্যা সমালোচনার মর্যাদা দিতে গিয়ে অমনভাবে পরিত্যাগ করতেন না। অনেকেই জানেন দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায়, রাম সম্পর্কে জনমত এতই বিরুদ্ধ যে সেখানকার সাধারণ মানুষ রামায়ণের সব থেকে আদর্শ চরিত্র (বা নায়ক) ব'লে রামকে মানেন না, মানেন রামভক্ত হনুমানকে।

বিবরণাত্মক সমালোচনার সূত্র-নির্ণয় ও নিষ্পত্তি অপেক্ষাকৃত সহজ। সংশ্লিষ্ট জগৎ বা পরিমণ্ডল (তা সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কাল্পনিক বা বুদ্ধিগ্রাহ্য যা-ই হোক না কেন) সম্পর্কে মোটামুটি মতৈক্য হলে ব্যাখ্যা ও ভাষ্যমূলক সমালোচনার সূত্র-নির্ণয় ও নিষ্পত্তি অপেক্ষাকৃত জটিল হলেও সম্ভব। কিন্তু জটিলতা ও বিতর্ক সর্বাধিক হল মূল্যায়নসূচক সমালোচনা নিয়ে। রামের পত্নীপ্রেম, সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীকতা বিষয়ক বিতর্কে যোগ দিয়ে অনুকূল সমালোচক যুক্তি দেখাতে পারেন যে, প্রজাদের সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে রাম যে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে বলেছিলেন তা মোটেই তাঁর পত্নীপ্রেমের, সত্যপ্রিয়তার বা নির্ভীকতার অভাব প্রমাণ করে না। রাজধর্ম যে সংসারধর্মের থেকে বড়, স্বীয় সত্যবোধের ঊর্ধ্বেও যে প্রজাদের মতকে স্থান দিতে হবে এই কর্তব্যের প্রেরণায়ই (ভয়ে, অন্যায় বা অসত্যের সঙ্গে আপোষ ক'রে নয়) রাম তাঁর নিষ্পাপ স্ত্রীর অগ্নি-পরীক্ষায় সম্মত হয়েছিলেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, মূল্যায়নসূচক সমালোচনায় মতৈক্য

আরো দুর্লভ। কারণ, সংশ্লিষ্ট পূর্ব-শর্তগুলিই (যার মধ্যে কিছু বিবরণাত্মক এবং কিছু ব্যাখ্যা/ভাষ্যময়) জটিল ও বিতর্কমূলক। "পত্নীপ্রেম", "সত্যপ্রিয়তা", "নির্ভীকতা", "রাজধর্ম", "কর্তব্য" প্রভৃতি মূল্যায়নসূচক ধারণাগুলি অধিকতর জটিল ও বিতর্কমূলক। শিল্প-সমালোচনা ও-বিচারের সমস্যাগুলি যে কত কঠিন ও তাদের নিষ্পত্তির অথবা বিশ্লেষণের সূত্রগুলি যে কতো সূক্ষ্ম তা আমাদের আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হবে।

সমস্ত ব্যাপারটি সংক্ষেপে অন্যভাবেও উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মূলত বস্তুজগতের কাঠামোগত বা নিয়ম-সংবদ্ধ বিবরণ দেয়। সমাজ বিজ্ঞান মূলত মানুষের ধ্যান-ধারণার, আচরণের ও সংগঠনের সূক্ষ্ম ও জটিল কাঠামোগত বা নিয়ম-সংবদ্ধ বিবরণ দেয় এবং এই বিবরণে উপজীব্যের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে। শিল্পের ক্ষেত্রে কাঠামো বা নিয়মের ভূমিকা অনেক ভিন্ন : এখানে শিল্পীর চেতনা ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, প্রকাশের মাধ্যম ও ভাষা, উদ্দিষ্ট শিল্প-রসিক-সমাজ, প্রচলিত শিল্পরীতি এবং, তাছাড়া, নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবনের প্রতিভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-চেতনা সূচনায় সমাজ-চেতনায় গর্ভস্থ ; সমাজ-চেতনার প্রচ্ছন্ন আধার বস্তু-জগৎ। তলিয়ে দেখলে শিল্প-বিচারে তাই শুধু সমাজ-বিজ্ঞান নয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু কাঠামোগত বিবরণে কাঠামোসূচক শব্দগুলি এত ব্যাপক থাকে যে তাদের উদাহরণ বিশ্লেষণ না করলে বস্তু-জগৎ ও সমাজ-জগতের সঙ্গে শিল্প-জগতের সম্বন্ধ বিচারে শিল্পের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায় না। "ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া"র ধারণাটি, উদাহরণ স্বরূপ বলছি, বস্তু জগতে খুবই ব্যাপক : জড়, প্রাণ, মন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। কিন্তু কীভাবে তা রূপে, রসে, রঙে বা সুরে প্রযোজ্য তা সূক্ষ্ম ও বিশেষভাবে প্রকাশ না করলে "ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া"র কাঠামোগত ধারণার মূল্য শিল্প-বিচারে প্রচ্ছন্ন ও অন্তর্লীন থাকলেও শৈল্পিক গুরুত্ববর্জিত। অন্য আরেকটি উদাহরণ নিচ্ছি। "সমাজ জীবন দ্বন্দ্বময়" সমাজ সম্পর্কে এই বাক্যের কাঠামোগত ধারণাটি প্রায় কেউই অস্বীকার করবেন না : বড় জোর কেউ বলবেন, "দ্বন্দ্ব" চরিত্রটি গৌণ, "সমন্বয়" চরিত্রটিই মৌল। সে যা হোক, এখানেও কাঠামোগত ধারণার মধ্যে, অর্থাৎ "দ্বন্দ্বময়"তার মধ্যে, এত বিচিত্র, সূক্ষ্ম ও বিশিষ্ট রূপ, রস ইত্যাদি আছে যে তার বিশেষ প্রকাশ না ঘটলে "দ্বন্দ্বময়" ধারণাটি নিছকই সমাজ-বিজ্ঞানের চৌহদ্দিতে সীমিত হয়ে পড়ে : এর শিল্প-মূল্য আর থাকে না বললেই চলে। অথচ, আমাদের মনে রাখা ভাল যে, শিল্প-বিচারও শিল্পের অঙ্গবিশেষ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্প-বিচারের জটিল ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে এই মূল কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই। যে কোনো বিষয়ই শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। বস্তু-জগৎ যেমন পদার্থবিদের একান্ত জগৎ নয় সমাজও তেমনি সমাজ

বিজ্ঞানীর একান্ত এক্তিয়ার নয়। চন্দ্র-সূর্যের জগৎ নিয়ে জ্যোতির্বিদ্যাও হয়েছে, কাব্য-সাহিত্যও হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও ইতিহাসের আত্মীয়তা বিশেষ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

শিল্প যদি সত্যসন্ধী, অনুকরণপ্রবণ ও বিবরণমুখী হয় তবে তার বিচার হবে অনেকটা জ্ঞান-বিচারের মতো। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বাক্যগুলি (যথা "আকাশ নীল") ও বাক্যের সমতুল্য শিল্পকর্মগুলি সংশ্লিষ্ট জগতের বিষয়গুলিকে ("বিষয়" এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে) সঠিক বা যথাযথভাবে প্রতিবেদন করতে পারছে কি না তা'ই মূল বিচার্য হয়ে ওঠে। শিল্পকর্মকে সেক্ষেত্রে মূলত বাক্যধর্মী ব'লে মনে করা হয়। কিন্তু, আমরা জানি, ইতিপূর্বে আলোচনাও করেছি, সকল শিল্পকর্ম বাক্যধর্মী ও সত্যসন্ধী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গীত, নৃত্য, এমন-কি কাব্য, উপন্যাস এবং নাটকও মূলত প্রকাশধর্মী। "মূলত" বলছি এ-জন্য যে সত্যসন্ধিৎসার সঙ্গে প্রকাশধর্মিতার পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সার্বিক নয়। "আকাশ নীল" সত্যসন্ধী বাক্য : নিঃসন্দেহে প্রসঙ্গ বিশেষে শৈল্পিক হতে পারে। কিন্তু এই বাক্যকে অনায়াসে বৈজ্ঞানিক ব'লেও দাবী করা যায়। "আকাশ স্বপ্নের মতো নীল" প্রকাশধর্মী বাক্য,—মূলত শৈল্পিক। কিন্তু এই বাক্যকে বৈজ্ঞানিক বলা হ'লে বিজ্ঞানীদের মহলে হাস্যরোল না পড়লেও মুচকি হাসি দেখা দেবেই। প্রকাশ মূলত সৃষ্টিকর্ম ; সত্য মূলত আবিষ্ক্রিয়া। অবশ্য যাঁদের মতে সত্য ও সাফল্য সমার্থক তাঁরা বলেন, সত্যও শিল্পের মতো সৃজন-বিনাশসাপেক্ষ,—নিয়তসিদ্ধ ও শাশ্বত নয়। শিল্পের জগৎ কল্পনা দিয়ে যেমন গড়া যায় সমালোচনা ও উপেক্ষা দিয়ে তা তেমন ভাঙাও যায়। সত্য যদি হয় বাক্য ও বিষয়ের সঙ্গতি তবে তা ভাঙা-গড়ার বাইরে। সত্য আবিষ্কারের শর্তগুলি (ভাষা, সমাজ-পরিবেশ প্রভৃতি) শুধু পরিবর্তনশীল। ভাঙা-গড়া ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও বিচার ও সত্যাসত্যবিনিশ্চয় যে সম্ভব হয় তার অন্যতম কারণ হিসেবে মেনে নিতে হয় অপেক্ষাকৃত—বিচার্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত—স্থায়ী কতগুলি নিয়ম, রীতি, রুচি, সম্বন্ধ ও নির্ণায়ক।

নাম ও নামাঙ্কিতের সম্বন্ধ যেমন নির্দিষ্ট, ধারণা ও তার অর্থের সম্বন্ধ তেমন নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু আরো ব্যাপক। "আকাশ" (নামসূচক শব্দ বা পদ) ও আকাশের (বিষয় বা পদার্থের) সম্বন্ধে কিছু অ-নির্দিষ্টতা থাকলেও তা "নীল" (ধারণাসূচক পদ) ও নীলের (বিষয় বা পদার্থের) সম্বন্ধের তুলনায় বেশী নির্দিষ্ট। কারণ, যা আগেই বলেছি, ধারণার অর্থ-পরিধি ব্যাপক ; নামের অর্থ সীমিত (গুণ ও জাতিবাচক ক্ষেত্রে), কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনন্য, অন্তত অনন্যতাসন্ধী (ব্যক্তি বা স্থানবাচক ক্ষেত্রে)। কেন, কীভাবে, কখন "নীল" ও "আকাশ" শব্দের প্রয়োগ হয় তার নির্দিষ্ট, পরিবর্তনশীল হলেও

নির্দিষ্ট, নিয়মাবলী আছে। নিয়ম মেনেও রীতির বৈচিত্র্য সম্ভব। অনেকে নিয়ম ও রীতির পার্থক্য স্বীকার করেন না। মূল্যায়নসূচক ভাষা ব্যবহারে রুচির অপ্রাসঙ্গিকতা, বিশেষত বৈচিত্র্য, নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সেক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য নৈরাজ্যের সমার্থক নয়। তাহলে বিচার অসম্ভব হত। বিচার সম্পর্কে মতদ্বৈত হতে পারে, প্রায়শঃই হচ্ছেও, কিন্তু তাতে বিচারের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয় না। আমরা যে নাম, ধারণা ইত্যাদির অর্থগত আলোচনা করছি তার মূল উদ্দেশ্য একটিই : অনুভব, আবেগপ্রমুখ অপেক্ষাকৃত দ্রুত সঞ্চারী মানব-মনের প্রকাশ ও বিবরণ নিয়ে মূলত যে শিল্পলোকের কারবার সেখানে বিচার কীভাবে সম্ভব হয় তা দেখানো।

সত্যের সঙ্গতিকে কেন্দ্র ক'রে বিচার হতে পারে ঃ আবার প্রকাশের সমন্বয়কে কেন্দ্র ক'রেও বিচার হতে পারে। বিচারে এই দুটি আদর্শের যুগ্ম প্রয়োগও অবিদিত নয়। শিল্পের প্রকারভেদে শিল্প-বিচারের আদর্শভেদ অল্পাধিক অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রবন্ধ সাহিত্যের ও কাব্য সাহিত্যের বিচার ভিন্ন হতে বাধ্য। ভাস্কর্যের ও সঙ্গীতের ; স্থাপত্যের ও নৃত্যের বিচার ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু আপাতত আমি তাদের বিচারের মূল সূত্রের সন্ধানে সত্য ও সঙ্গতি, প্রকাশ ও সমন্বয়প্রমুখ ধারণাগুলির তাৎপর্য দেখাবার চেষ্টা করছি।

আগে উল্লেখ করেছি সত্য ও সঙ্গতিকে স্থিতির (ও আবিষ্কারের) দিক থেকে দেখা যেতে পারে ; আর গতি (ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের) দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। মার্ক্স থেকে বের্গসঁ প্রমুখ অনেকেই বলবেন (যদিচ ভিন্ন ভিন্ন কারণবশত) শিল্প-সৌন্দর্য নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট দেহ-মনের, আবিষ্কার নয়,—সক্রিয়/অন্তর্লীন দেহ-মনের সৃষ্টি-ক্রিয়া। পক্ষান্তরে, প্লাতোপন্থীরা বলেন শিল্প জ্ঞানাত্মক, আবিষ্কারধর্মী ও সত্যসন্ধী। আমার মতে, আবিষ্কার ও সৃষ্টির মধ্যে, মূলত বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মূলত শৈল্পিক মনোভাবের মধ্যে, পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। মনের জ্ঞানাত্মক কর্মের সঙ্গে অনুভবাত্মক কর্মের মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। অনুভবও যে কর্ম, নিছক নিষ্ক্রিয় শারীর সংবেদন বা চেতনা নয়, তা স্মর্তব্য। অনুভব ও জ্ঞানের গূঢ় আত্মীয়তা বোঝার সহায়ক হলো কল্পনা। কল্পনার লক্ষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানুষের মন সত্য ব'লে যা পরিগ্রহণ করে তার মধ্যে, তার সঙ্গে নিজস্ব সংস্কার, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মিলিয়ে-মিশিয়ে প্রায়-নিঃশব্দে নতুন কিছু সৃজনও করে। পরিগ্রহণ ও সৃজন, জ্ঞান ও কল্পনা শিল্প-চেতনায় সহচর।

(সত্য) পরিগ্রহণ ও (শিল্প) সৃজনের সম্বন্ধ দু'দিক থেকে এবং দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। তত্ত্বের (রিয়ালিটির) দিক থেকে এবং জ্ঞানের দিক থেকে ; উত্তরণ পর্বে এবং

অবতরণ পর্বে। বস্তুজগৎ প্রাণজগৎকে, প্রাণজগৎ মনোজগৎকে নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রণ করে। মনোজগৎ সমাজজগৎও বটে : ভাষা সেখানে নিত্যব্যবহার্য : সঙ্কেতে, প্রতীকে পারস্পরিক ভাব-অনুভবের আদান-প্রদান সেখানে অব্যাহত। বস্তু, প্রাণ ও মনের প্রকাশ সর্বাধিক সার্থক বা প্রস্ফুট হয় ভাষা-নিহিত চেতনায়,—সঙ্কেত-প্রতীক প্রভৃতির ব্যবহারে। এটাকে বলা যেতে পারে তত্ত্বের দিক থেকে উত্তরণ পর্ব। জ্ঞানের দিক থেকে অবতরণ পর্বে ভাষা-নিহিত চেতনা সরাসরি তত্ত্বের বস্তুচরিত্র প্রকাশ করে না, করতে পারে না। মানুষের চেতনার সঙ্গে বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু তার প্রকাশের ও সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন সঙ্কেত-প্রতীক প্রভৃতি, এক কথায়, ভাষা। ভাষা-নিহিত চেতনা বস্তু বা প্রাণ-জগতের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়। ক্রিয়া-ধর্মী চেতনা শব্দ/পদ, বাক্য প্রভৃতির অর্থ গ্রহণও করে, সৃজনও করে। বিজ্ঞানী সৃজনের তুলনায় ভাষার অর্থ গ্রহণেই অধিক ব্যস্ত। তবে সংজ্ঞা-নিরূপণ, ব্যাখ্যা প্রদান, মডেল তৈরী প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সাপেক্ষ অর্থ সৃজন করে। বলা-বাহুল্য, শিল্পীর মূল লক্ষ্য অর্থ সৃজন। সৃষ্ট অর্থের ভিত্তিতেই সৃজন : কিন্তু সৃজনে নতুন কিছুর উদ্ভব বা অভ্যুদয়। ভাষা ব্যবহার করা মানেই হল বস্তুকে অবস্তুভাবে দেখা, প্রতীকিত করা। "আকাশ" পদটি ব্যবহার করার একটি তাৎপর্য হল আকাশ পদার্থ থেকে ভিন্ন স্তরে মনকে সক্রিয় করা। "আকাশ নীল" বলার উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য হল আকাশকে নীলের অন্যতম উদাহরণরূপে দেখা। "আকাশ স্বপ্নের মতো নীল" বলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য হল আকাশকে শুধু নীলের উদাহরণরূপে দেখা নয়, সেই নীলকে আবার বিশেষভাবে ("স্বপ্নের মতো" ব'লে) চিহ্নিত করাও বটে। নামকরণ পর্বে যে সৃজনক্রিয়ার সূচনা বিবরণে তার কিছুটা বিকাশ। রূপকে, উপমায় ও অন্যান্য অলঙ্করণে অর্থ সৃজন আরো প্রস্ফুট। পদ থেকে পদার্থ, বাক্য থেকে বাক্যার্থ, এবং পরে বাক্যার্থ থেকে লক্ষণার্থ ও ব্যঞ্জনায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে শিল্পী-মন নতুন জগৎ সৃষ্টি ক'রে চলেছে। নাম থেকে বিবরণ, বিবরণ থেকে অলঙ্করণ,—ভাষার এই অভিমুখ (সত্যের) সঙ্গতি থেকে (প্রকাশের) সমন্বয়ের দিকে। এই অভিমুখিতা ঐকরৈখিক নয়,—দ্বান্দ্বিক। না তত্ত্বের উত্তরণ পর্ব, না ভাষা-নিহিত চেতনার অবতরণ পর্ব,—কোনোটিই ঐকরৈখিক নয়,—দ্বান্দ্বিক। মানুষের চেতনা সাধারণভাবে এবং শিল্পীর চেতনা বিশেষভাবে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সৃষ্ট জগৎকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করছে।

যখন বলা হয় "শিল্পী জগৎকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করে" তখন, বলাবাহুল্য, শিল্পীর (এবং অন্যান্য মানুষের) চেতনা-নিরপেক্ষ একটি জগতের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়। এই জগৎটিকে যে শিল্পে কীভাবে নতুন ক'রে সৃষ্টি বা রূপান্তরিত করা হয় তা বোঝবার

জন্য ভাষার ভূমিকা বোঝা দরকার। বোঝা দরকার (ক) ব্যক্তি বা বস্তুর নামকরণ করতে গিয়ে, নাম দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে গিয়েও, তার আনুষঙ্গিক লক্ষণ, বিবরণ দিয়ে বসেন ; (খ) অনুকরণ করতে গিয়েও কীভাবে বিকার ও বিচ্যুতি অনিবার্য হয়ে ওঠে ; (গ) ব্যক্তি বা বস্তুকে চিত্রন বা প্রতিমূর্তন করতে গিয়ে কীভাবে, কতোভাবে, তা করা যায় ও করা হয়, (ঘ) ঘটনার চিত্রন কীভাবে কল্পনামিশ্রিত হ'য়ে অন্যরকম, ভিন্ন কিছু হয়ে যায় ; (ঙ) দৃষ্টিকোণ নির্বাচন কীভাবে চিত্রিত বা বর্ণিত বিষয়ের রূপ, রঙ, আয়তন, এমন-কি আকর্ষণী ও বিকর্ষণী ধর্ম সৃষ্টি করে ; (চ) চিত্রণে ও বিবরণে কীভাবে উদ্ভাবন সক্রিয় ; (ছ) চিত্রণে ও বিবরণ প্রদানেও কীভাবে গ্রহণ-বর্জন অনুস্যূত। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখানো যায় আরো কতোভাবে জগৎ বা তত্ত্ব (রিয়ালিটি) শিল্পের জগতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

(ক) নামকরণ ও বিবরণের মধ্যে যে বিরোধ নেই এ কথাই আগেই বলেছি। "রাম"-এর পরিবর্তে নিশ্চয়ই "দশরথ-পুত্র", "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র", "সীতার স্বামী" কিংবা "অযোধ্যার রাজা" ব্যবহার্য বিবরণ। "সীতার স্বামী" না ব'লে কেউ যদি বলে "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র" তাতে উদ্দিষ্ট অর্থ (এ ক্ষেত্রে একটি ব্যক্তি এবং সে যে কে তা) বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। মনে রাখা দরকার, অসুবিধা যদি না হয় তার কারণ সংশ্লিষ্ট মানুষদের রামায়ণের জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে। "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র" এই বিবরণটি যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য "সীতার স্বামী" বিবরণটিও সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে-ব্যক্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে এক হলেও, অর্থাৎ বিবরণের বিষয়ার্থ এক হলেও, যে-ভাবে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বিবরণের ভাবার্থ, ভিন্ন। দুটি বিবরণ "দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র" এবং "সীতার স্বামী" যে বিষয়ার্থে সমার্থক, অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, তা যুক্তিসঙ্গত ও নির্দিষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম মূল শর্ত হল অনন্যভাবে (বিষয়গত অর্থরূপে) বোঝাতে পারছে। "দশরথ" ও "রাম" নাম যে সব (এবং যদিও অনেক) বিবরণে ব্যবহৃত হচ্ছে বিবরণের সামগ্রিক অর্থের পার্থক্য সত্ত্বেও নামগুলির বিষয়ার্থ যদি স্থির, নির্দিষ্ট ও অনিবার্য না হয় বিবরণের ভাবার্থ তো দূরে থাক বিষয়ার্থের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আমরা জানি, আমাদের চারপাশে, সমাজে, "রাজা" "রাণী", এমন-কি একটু গ্রামাঞ্চলের দিকে "সীতা" ও "রাম" নামক বহু ব্যক্তি আছে। ব্যক্তি বহু হলেও তাদের তো নির্দিষ্ট ভাবে চেনা যায়, (যে নামই দেওয়া হোক না কেন) নাম দিয়ে সফলভাবে চিহ্নিতও করা যায়। নামের অর্থ (শুধু) নাম দিয়ে সুনির্দিষ্ট না করা গেলেও, সামাজিক পরিমণ্ডল, পরিভাব পূর্ব-শর্তাদি ও বিবরণের সাহায্যে কম বেশি নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে নামের ক্রিয়া বিবরণের ক্রিয়া থেকে প্রায় অভিন্ন

হয়ে যায়। সমালোচক বলতে পারেন, "নাম ও বিবরণের সম্বন্ধ চক্রবৎ : নাম বিবরণের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং বিবরণ নামের বিস্তারিত রূপ : পার্থক্য নিছকই প্রচ্ছন্নতা-প্রকটতার স্তরভেদের।" নাম যদিও বিষয়ের (ব্যক্তি/বস্তুর) শুধু অস্তিত্বের স্ফোটক হয়ে থাকতে চায়, গুণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে চায়, একটি (বিষয় বাচক) নাম ও একটি বিষয়ের মধ্যে অব্যর্থ অনন্য সম্বন্ধ আছে ব'লে দাবি করা হয়, আমি বক্তব্যের স্বপক্ষীয় যুক্তিতে কোনো বিশেষ শক্তি আবিষ্কার করতে পারিনি। নামকরণ ক্রিয়া (বা নাম) -নিরপেক্ষ (নামাঙ্কিত বা নাম-চিহ্নিত) বস্তু ও ব্যক্তি, আছে তা (অর্থাৎ বিষয়বাদিতা বা রিয়ালিজম) আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সে স্বীকৃতির অনিবার্য তাৎপর্য এই নয় যে, বিষয় ও বিষয়ের নামের সম্বন্ধ অব্যর্থ-অনন্য, দেশ-কাল-নিরপেক্ষ। এ-বিষয়ে উগ্রপন্থী বুদ্ধিবাদীদের বিষয়বাদিতা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য। এই মত শিল্প-চেতনা, শিল্পীর ভাষা, সঙ্কেত ও প্রতীক সম্বন্ধে বহু অনাবশ্যক সমস্যার সূত্রপাত ঘটায়।

(খ) অনুকরণের মধ্যেই যে বিকার ও বিচ্যুতি থেকে যায় তা আমি নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। বলা হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই স্থূল বস্তুজগৎ এক তত্ত্বের অনুকরণমাত্র। বলাবাহুল্য, এই অনুকরণে বিকার-বিচ্যুতি আছে এবং তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি নানা সূত্র দিয়ে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। নইলে এই জগৎ আর সেই তত্ত্বের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য করা যেত না। আমরা চিত্রের ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে প্রায়ই শুনে থাকি "এ ওর কাজের অন্ধ অনুকরণ (কপি) করেছেন মাত্র" অথবা "এটি আসল এবং ওটি (বা বাকি সব) নকল।" এই পার্থক্য হয়তো সাধারণ লোকের চক্ষে ধরা পড়বে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পার্থক্য ধরা পড়লেও সে পার্থক্যকে কি নান্দনিক বলা উচিত হবে, নাকি তা নিছক বৈজ্ঞানিক বস্তু (রঙ, দেশ-কাল প্রভৃতির) জ্ঞান সাপেক্ষ? শিল্প-বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি কিন্তু আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারেন : অন্তত নীতিগতভাবে তা আমাদের পক্ষে অবশ্যই স্বীকার্য। "নকল" যদি "অবিকল আসল" হয় তাহলে "আসল" ও "নকল" পদ দুটির অর্থ অভিন্ন স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নের কোনো তাত্ত্বিক গুরুত্বই থাকে না। কিন্তু, আমরা শিল্পের ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব থেকে জানি, আসল ও নকলের মধ্যে যে পার্থক্য তার গুরুত্ব বাস্তবিকও বটে, তাত্ত্বিকও বটে। কোনো বিশেষজ্ঞই যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্য ছাড়া আসল ও নকলের পার্থক্য (অন্তত নীতিগতভাবে) আবিষ্কার করতে সক্ষম না হতেন তাহলে সেই পার্থক্য হয় অনুপস্থিত অথবা অ-নান্দনিক। আসল কথা, নান্দনিক সৃষ্টিতে, অনুকরণের ক্ষেত্রেও, শৈল্পিক ব্যত্যয়, বিচ্যুতি বা নতুনত্ব অনিবার্য। অনুরূপ কারণে বিবরণাত্মক শিল্প-সমালোচকের কাজকেও সৃজনধর্মী বলা যেতে পারে।

(গ) প্রতিমূর্তন বা উপস্থাপনারও স্বচ্ছন্দশীলতা ও নতুনত্ব অনিবার্য। একটি বড় পর্বতকে ছোট পর্বতরূপে, এমনকি গিরিগোবর্ধনরূপেও, দেখানো যেতে পারে। বস্তুত দেশ-কালের অত দূরের জিনিসকে কাছের জিনিসরূপে, অথবা বিপরীত রূপেও, দেখানো যায়। শতাব্দীর ঘটনাবলীকে দু'ঘন্টার চলচ্চিত্রে/নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার এক ঘন্টার "ঘটনাকে"কে ঘিরে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসও লেখা যায়। ঈশ্বরকে ঘরের ছেলেরূপে দেখায় এবং ঐতিহাসিক রক্তমাংসের মানুষকে ঈশ্বরের অবতার বা সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে প্রতিমূর্তনের বহু উদাহরণ ইতিহাস থেকে অনায়াসে সংগ্রহ করা যায়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে কেউ দেখিয়েছেন ধর্মাত্মা মহাপুরুষরূপে, আবার কেউ দেখিয়েছেন ধূর্ত-বুদ্ধি বাস্তব রাজনীতিবিদরূপে। প্রতিমূর্তনের নতুনত্ব দু'ভাবে দেখানো যেতে পারে: স্বজাতিমূলক ও বিজাতিমূলক। সাধু মানুষকে ধূর্ত মানুষরূপে: বড় পর্বতকে ছোট পর্বতরূপে (এমনকি মডেল তৈরী ক'রে) দেখানোকে আমি বলব স্বজাতিমূলক, প্রতিমূর্তন। শুকনো গাছের ডাল-পালায় ছুটন্ত হরিণ দেখা বা আগুনের শিখায় উড়ন্ত পাখি দেখাকে আমি বলব বিজাতিমূলক প্রতিমূর্তন। সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে অন্বয় যদি বেশি থাকে, কিংবা জাতিগুলির দৃষ্টান্তে যে লক্ষণগুলি পরিস্ফুট তাদের অন্বয়ও যদি বেশি থাকে, তাহলে বিজাতিমূলক প্রতিমূর্তন উপমাধর্মী হয়ে ওঠে। বিড়াল জাতির সঙ্গে বাঘ জাতির অন্বয় অনেক। কিন্তু সিংহ জাতির সঙ্গে মানুষ জাতির লক্ষণে এমন কতগুলি অন্বয় দেখানো যায় যে তার ফলে "পুরুষ-সিংহে"র প্রতিমূর্তন ও "নৃসিংহ" অবতারের উপস্থাপনা উপমাধর্মী। পক্ষান্তরে, সংশ্লিষ্ট দুই জাতিতে অন্বয় আবিষ্কার করা যখন দুষ্কর তখনো এমন কোনো গুণ বা লক্ষণ আবিষ্কার করা যেতে পারে যে তার ভিত্তিতে ঐ দুই জাতির দৃষ্টান্ত (দুটি) কে উপমা দিয়ে সম্বন্ধবদ্ধ রূপে দেখানো যায়। মানুষের মুখ বস্তুত চাঁদের মতো নয়: তবু, কান্তি, স্নিগ্ধতা, (গোলাকৃতি?) ইত্যাদির জন্য বলা হয় "মুখচন্দ্র" বা "চন্দ্রমুখী"। যদি উপমিত ও উপমেয় বস্তুর পার্থক্য খুবই বেশি এবং কেবলমাত্র উপমান-আরোপিত গুণের ভিত্তিতেই তাদের সম্বন্ধ অলঙ্কার হয়ে ওঠে, তাকে বলা যায় রূপক: যথা, ক্ষীরসমুদ্র, সোনার পাহাড়।

(ঘ) উপস্থাপন ও উদ্ভাবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুটি ধারণা। উপস্থাপিত বিষয় বিষয়রূপে শিল্পীর স্বীকৃতির অপেক্ষায় নেই। শিল্পীর কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি তার জাতি নির্দেশ করে এবং, এমন কি, জাত্যন্তর ঘটায়। মৎস্যকন্যা, নৃসিংহ অবতার, অর্ধ-নারীশ্বর প্রভৃতি উপস্থাপন বা প্রতিমূর্তন ও উদ্ভাবনের যুগ্ম ফলশ্রুতি। বস্তুত এই ফলশ্রুতি অবিভাজ্য। নিসর্গ-দৃশ্য, সাগর-দৃশ্য ও আকাশ-দৃশ্য অঙ্কনে তো বটেই এমন কি প্রতিকৃতি অঙ্কনেও উদ্ভাবনা ও কল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যরকম করে দেয়,—জাত্যন্তর ঘটিয়ে দিতে পারে।

একটি ব্যক্তির মধ্যে বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। শিল্পী তার একটি বা দুটিকে প্রতিমূর্তনের সময়ে বেছে নেয়, তাদেরই পরিস্ফুট ক'রে তোলে। উদ্ভাবনা গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগোয়। শান্ত ব্যক্তিকে তেজস্বী, নাতিদীর্ঘাঙ্গীকে দীর্ঘাঙ্গীরূপে দেখানো হয়েছে এমন প্রতিকৃতির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই ব্যাপারটি প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের ব্যক্তিদের খুব জানতে হয়। বিশেষত যাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রচার ও বিজ্ঞাপন নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের তো এই ব্যাপারটি বিশেষ ভালো ক'রে জেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। উদ্ভাবনী ক্ষমতা ব'লে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও নাটকে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার যে অনৈতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেন তাতে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের কোন অঙ্গহানি তো ঘটেই না উপরন্তু বহুক্ষেত্রেই তা শিল্পকর্মের রসবিবর্ধক। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও উদ্ভাবনার বা পুনঃসৃষ্টির প্রভাবমুক্ত নয়।

(৪) দুই বিষয়ের মধ্যে দ্রষ্টার দর্শনের সম্বন্ধ কেমন হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিপ্রেক্ষিতের, দুই-দ্রষ্টার সম্বন্ধ-অনুপাতের উপর। এ কথা কিয়দংশে শ্রোতা-বক্তার সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও খাটে। তবে দেখার ক্ষেত্রে অনুপাত (জ্যামিতিক) প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেককেই বলতে শোনা যায়, শিল্প-বস্তুর রঙের উজ্জ্বলতা-অনুজ্জ্বলতা, আকার, সংস্থাপনা ইত্যাদি দিয়ে দেখানো যায় যে শিল্প-বস্তু ও তার প্রতিমূর্তন অবিকল ও অভিন্ন। এক কথায়, শিল্প-বস্তু যেন বিভিন্ন প্রকার আলোক-বার্তার একটি বিশেষ রূপময় সমাহার বৈ আর কিছু (ভিন্ন কোনো বস্তু) নয়। দৈশিক রূপ ও সম্বন্ধের প্রাধান্য চিত্রশিল্পে অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন ঘটিয়ে, অনুপাত পাল্টে তথাকথিত জ্যামিতিক অভেদকতাকেও অস্বাভাবিক বিকল করা সম্ভব। এ কথা হয়তো ঠিক যে, বিশেষ শর্তাধীন অবস্থায় আমি একটি শিল্প-বস্তু ও "তার" রূপময় রঙ-সমাহারের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাব না, দেখাতেও পারব না। কিন্তু তাতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে শিল্প-বস্তুর স্বরূপ এমন ভাবেই জ্যামিতিক নিয়ম-বদ্ধ যে পরিপ্রেক্ষিত বা অনুপাত দিয়ে শিল্পীর পক্ষে তাকে পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রথমত, শিল্প-বস্তু (আর্ট অবজেক্ট) ও দ্রষ্টা/বিষয়ের পার্থক্যই অস্বাভাবিক জ্যামিতিক নিয়ম আচার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, তাদের তথাকথিত অভিন্নতা প্রমাণের জন্য যে "বিশেষ শর্তে"র কথা বলা হচ্ছে তার সংজ্ঞা-নিরূপণ ও প্রয়োগ বিতর্কসাপেক্ষ। একটি ছবি দেখার সময়ে আমার চোখে যে বিশেষ রূপময় আলোক (বা রঙ) সমাহার ঘটে তা ছবিটি সরিয়ে নিয়ে অন্যভাবে ঘটানো যায় না, এবং যদি যায়, তবে তা সম্পূর্ণ অভিন্নভাবে ঘটানো যায় কি না। "অন্যভাবে ঘটানোটি" কিন্তু "বিশেষ শর্ত" সাপেক্ষ। এই শর্তগুলি স্থির ও স্থায়ীভাবে

সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় না। কারণ, বাহ্যিক শর্তগুলো প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য কৌশলের দাক্ষিণ্যে যতই স্থির ও স্থায়ী করা হোক না কেন, মানুষের প্রত্যক্ষ (দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি) চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধ্যারণা, স্মৃতি-কল্পনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শারীরিক অবস্থা ও সংস্থান প্রভৃতি দিয়ে প্রভাবিত হতে বাধ্য।

(চ) বিবরণ দিতে গেলেই, বর্ণনা করতে গেলেই, আগেই বলেছি, কীভাবে বিবরণ দিচ্ছি, কীভাবে বর্ণনা করছি তা অনিবার্যভাবে এসে যায়। কৃষ্ণকে রাখালরূপে দেখানো যায়, আবার কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথিরূপেও দেখানো যায়। তাকে কাছের থেকেও দেখানো যায়, দূরের থেকেও দেখানো যায়। তাকে ছোট আকারে, বড় আকারে দেখানো যায়। আঁকা ছবির সঙ্গে যদি দেশ বা দূরত্বের পরিমাপক স্কেল দিয়ে দেখা হয় তাহলে "বড়" ছবি "ছোট" হতে পারে, আবার "ছোট" ছবি "বড়" হতে পারে। এ-সব ক্ষেত্রে "হওয়া" ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। "হওয়া" ব্যাপারটা ব্যাখ্যা দিয়ে নিরূপিত হচ্ছে, চোখে-দেখা আয়তন বা দূরত্ব/নৈকট্য দিয়ে নয়।

বিবরণের শব্দার্থের সঙ্গে লক্ষণার্থ মিলে-মিশে যায়। বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দার্থের সঙ্গে বর্ণিতের লক্ষণার্থ আমি চিন্তায় ও বিশ্লেষণে পৃথক করতে পারলেও (চিত্র হলে) দর্শনে ও (ভাষা হলে) শ্রবণে পার্থক্য ধরা এবং ধ'রে তা মনে পরিস্ফুট রাখা কঠিন। চিত্রনের ক্ষেত্রে একটি ব্যক্তির নিকট বিশেষ ভাব (হাসিখুশি ভাব) না দেখিয়ে অন্য আরেকটি ভাব (শান্ত-গম্ভীর ভাবও) দেখানো যায়। এক ব্যক্তিকে বহু ভাবের, এমনকি বহু অনুভবেরও, অভিব্যঞ্জকরূপে দেখানো যায়। এই যে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বহু ভাব-অনুভবের অভিব্যঞ্জকরূপে দেখানো যায়, বস্তুত শিল্পে-সাহিত্যে প্রায়ই দেখানো হয়ে থাকে, তার মধ্য দিয়ে একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়ে ওঠে : বিবরণ, বর্ণনা বা চিত্রন লক্ষণার্থে তো নয়ই শব্দার্থে, নামাঙ্কণে ও নামাঙ্কিত শব্দার্থেও, একাগ্র বা একরেখ নয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ক'রে (ভাষায়) বা এঁকে/খোদাই ক'রে অনন্য এক সুনির্দিষ্ট কৃষ্ণকে (ব্যক্তিকে) বোঝানো অসম্ভব। আর রাখাল (কৃষ্ণ), অর্জুনসারথি (কৃষ্ণ) বা নীলকলেবর পীতবসন বনমালী (কৃষ্ণ) যে এক নয়, কৃষ্ণের লক্ষণার্থ যে বিভিন্ন, তা সহজেই স্পষ্ট।

যা বললাম তা থেকে কিন্তু এ-কথা অনুমান করা ভুল হবে যে (১) নাম ব্যবহার ক'রে আমরা ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে পারি না ; কিংবা (২) লক্ষণার্থবোধক শব্দ/শব্দসমষ্টি সুনির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপনে ব্যর্থ ব'লে সেই সব শব্দ/শব্দসমষ্টি যে-প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার তা মেটাতে পারে না। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ ব্যক্তিকেই বোঝায়। তবে পরিমণ্ডল (সামাজিক দেশ-কাল) উল্লেখ না করলে, নাম পদটি নির্দিষ্ট পদার্থ জ্ঞাপনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় : আর

পরিমণ্ডল উল্লেখ করলেও পদের অর্থ (এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি) যদিও বোঝা যায় তবে কাঙ্ক্ষিত একাগ্রতা, দ্ব্যর্থহীনতা অলভ্য। "রাখাল", "অর্জুনসারথি" বা "নীলকলেবর পীতবসন বনমালী" (কৃষ্ণের) এই সব বর্ণনা তার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের অভিব্যঞ্জক হলেও, অভিব্যঞ্জনায় অল্পাধিক অনির্দিষ্টতা থাকলেও একটি বর্ণনা অপর যে-কোনো একটি থেকে পৃথক : এবং পার্থক্য এমনই ধরণের যে একটিকে অন্যটিতে পর্যবসিত করা যায় না। এই যে পর্যবসিত করা যায় না, লক্ষণার্থ পরিবর্তনের এই যে সীমাবদ্ধতা, তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে লক্ষণার্থে ব্যবহৃত পদগুলির অর্থ নামাঙ্কণে ব্যবহৃত পদগুলির তুলনায় অধিক অনির্দিষ্ট হলেও তাদের অর্থেরও অস্পষ্ট সীমারেখা আছে।

(ছ) বস্তুজগৎ (এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সাধারণ বুদ্ধিতে লভ্য জগৎ এবং বিজ্ঞানের জগৎ দুই-ই আছে) কীভাবে, কতো বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে, শিল্পজগতে রূপান্তরিত হয় তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি মাত্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রূপান্তর প্রকরণে দুটি প্রধান দিক আছে, একটি নির্বাচন ও অপরটি বর্জন। যে-কোনো সৃষ্টিতে নির্বাচন-বর্জন অনুস্যূত। শিল্পী শিল্পকর্মে যা নির্বাচন করে ও প্রকাশ করে স্বভাবতই তা প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু অনুধাবন করলে, খতিয়ে ও তলিয়ে দেখলে, ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শিল্পে যা সব নির্বাচিত ও প্রকাশিত হয় তাতে শিল্পীর কল্পনা ও কর্ম যতটা নিযুক্ত হয়েছে প্রায় ততটা কল্পনা ও কর্মই নিমগ্ন হয় যা-সব বর্জিত হল ও অপ্রকাশিত রইল তা-সব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। এক গভীর অর্থে সৃষ্টির কল্পনা শূন্যতা—যা বিশেষ সৃষ্টি প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন বাহুল্যবোধে তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা। পরিমিতিবোধ ও বাহুল্যবোধ শিল্পসৃষ্টির অনিবার্য সহচর। পরিমিতিবোধ একপ্রকার শূন্যতা পূর্ণ হবার বোধ, শিল্প-চেতনায় ক্ষান্ত হবার অনুরোধ। ঐ চেতনা যখন পূর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে, ক্ষান্তি পার হ'য়ে তাকায় তখন অন্তরে স্পষ্ট হয় বাহুল্যবোধ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিষ্ক্রিয় দেহ-মনে উপস্থাপিত বস্তুজগৎ যদি শিল্পীর শিল্প-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত হত, তাহলে শিল্প-সৃষ্টিতে কল্পনার ভূমিকা থাকত না, থাকলেও তা হত অত্যন্ত গৌণ। শৈল্পিক কল্পনা হল প্রাপ্তে (প্রাপ্ত ও প্রদত্ত জগতে) অপ্রাপ্তের সন্ধান,—সক্রিয় সন্ধান। এই সন্ধান চক্ষুষ্মান। কাঙ্ক্ষিতকে এই সন্ধানী প্রয়াস শুধু সন্ধানই করে না সৃষ্টি-অঙ্কুরও যোগায়। ইন্দ্রিয়ে ও বুদ্ধিতে জগৎকে শিল্পী যে-রূপে পায় সে-রূপটি প্রায় কখনোই তার কাঙ্ক্ষিত শিল্প-ধন নয়। সে যে-রূপটি চায় তার অভাব-আভাস কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-জগৎ দেয়। স্ব-বিরোধী শোনালেও এ কথা সত্য এবং অভিজ্ঞতার অনুধ্যানে স্পষ্ট হয় : বস্তুজগতের ভাব-রূপই শিল্পীর অন্বিষ্ট অভাব-রূপগুলির আভাস যোগায়। শুধু তাই নয়। অভাব-রূপগুলিকে মনশ্চক্ষে আবিষ্কার ক'রে,

ভাসিয়ে রেখে তাদেরই অন্তর্ভূমি রঙে-রসে-সুরে পূর্ণ ক'রে শিল্প-সৃষ্টি হয়। অভাবে ভাব সন্ধান, অরূপে রূপ সন্ধান শিল্পীর অস্পষ্ট, বিপদসঙ্কুল কিন্তু অনিবার্য পথরেখা। বিষয়বস্তুর আদলেই বিষয়বস্তুর সহোদর ও অল্পাধিক অরূপ শিল্পবস্তুর উৎপত্তি ও বিকাশ। বিষয়বস্তু দেশ-কালের যে-শাসন মানে শিল্প-বস্তু তা মানে না। শাসন-ভাঙার সে-চরিত্র বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুনে ও কল্পিত (থিওরেটিক্যাল) বস্তুতেও রয়েছে। শুদ্ধ দেশ-কাল বা অভিকর্ষণ ক্ষেত্রও কল্পনা, অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। সুতরাং, হঠাৎ শুনে কাণে খটকা লাগলেও এ কথা বোধহয় ঠিক যে, বিজ্ঞান-পাঠ্য বস্তু-জগৎ ও শিল্প-কল্পনার জগৎ মূলত অভিন্ন, আধার একই, আধেয়র রূপ বিভিন্ন। আধেয়র রূপ-ভিন্ন, স্তর-ভিন্ন জগৎই শিল্প-সাহিত্যের জগৎ। মূলত বা আধার-মূলে শিল্পের ও বিজ্ঞানের জগৎ অভিন্ন কি না তা নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলেও শিল্প-বিচারে তার প্রায়োগিক তাৎপর্য সীমিত।

জ্ঞানের বিচার সত্যকেন্দ্রিক। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার বিচারও সত্যসন্ধী, তবে তা প্রয়োগ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ। শিল্প-বিচার মূলত সঙ্গতিসন্ধী। সঙ্গতি এক্ষেত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত : অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য প্রভৃতি, এমনকি তত্ত্ববিচারে যা নিতান্তই অলীক তাও সঙ্গতির অনুষঙ্গ, সহকারী উপাদান/উপায় হিসেবে শিল্পীর জগতে গুরুত্বসহই থেকে যেতে পারে। থেকে যায়ও। তাতে শিল্প-রীতিও ভাঙে না, রসভঙ্গও হয় না। কারণ, শিল্প-বিচারের আদি পর্বে মূল কথাটি যা সর্বদা স্মর্তব্য তা হল : বস্তু-জগৎ শিল্প-জগতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর সে রূপান্তরণ এতই আনুপৌর্বিক বা মৌল যে সেখানে প্রধান বিচার-সূত্র সত্য নয়, বোধহয় (সাধারণ অর্থে) সাফল্যও নয়। অবশ্যই শিল্পী তার অন্বিষ্ট বা বাঞ্ছিত শিল্প-জগতে সঙ্গতি সৃষ্টিতে সাফল্যসন্ধানী। সে সফল হতে চায় তার শিল্প-জগৎ, শিল্প-বস্তু, সৃষ্টিতে ; শিল্প-জগতের মূল আধার, আগেই বলেছি, বস্তু-জগৎ অথবা, ভাষান্তরে, তত্ত্বজগৎ। সেই জগৎ প্রচ্ছন্নভাবে আর সমাজ-জগৎ প্রকটভাবে শিল্প-জগতের অনিবার্য পশ্চাৎপট। শিল্পের উপজীব্য সন্ধানে অবিভক্ত, এই তিন জগতে শিল্পীর কল্পনা অবাধে যাতায়াত করে। এই জগৎ তিনটি ভিন্ন হলেও যে বিভক্ত নয় তা মনে রাখা বিশেষ দরকার। তা না হলে কেউ মনে করতে পারে যে সত্যের সঙ্গে সঙ্গতির, জ্ঞানের আদর্শের সঙ্গে শিল্পের আদর্শের বোধহয় বিরোধ আছে। পার্থক্য আছে, বিরোধ নেই। সত্যের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে সঙ্গতির প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না, সঙ্গতির পরিধি অন্তহীনভাবে বাড়ানো যায় না। সত্যের প্রশ্নকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা ক'রে, স্থগিত রেখে, বহু বাক্যের সঙ্গতি দেখানো সম্ভব। বস্তুত গল্প-উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি যে দেখি, যা আমরা উপভোগ করি, তা

সম্ভব হয় এইজন্য যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যাশিত সত্যের প্রশ্ন সেখানে কেউ আমরা তুলি না। এমনকি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী সাহিত্যরসিকও না। এই সীমিত অর্থে, শিল্প-জগতের স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকে সার্বভৌমত্ব ভাবলে ভুল হবে। আসলে সত্যের নোঙরে সঙ্গতি বাঁধা। নোঙর যেহেতু জলের অনেক গভীরে এবং বাঁধনের শিকল যেহেতু সুদীর্ঘ সেইহেতু সঙ্গতির স্বাতন্ত্র্যে অনেক শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকই সত্যের টান অনুভব করেন না, এবং, তাই ভাবেন এই স্বাতন্ত্র্য অন্তহীন, সার্বভৌম।

কথাটা একটু খুলে বলা যাক। কারণ, শিল্প-বিচারের মূল সূত্রটিই হল সঙ্গতি। বাক্যের সঙ্গে, (সঠিকভাবে বললে) বাক্য-প্রতীকের সঙ্গে বাক্যার্থের, বা বাক্যে প্রতীকিত বস্তুর, কিছুটা ব্যবধান অনিবার্য। পদের সঙ্গে পদার্থেরও ব্যবধান থাকা অনিবার্য। নামপদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতীকধর্মের এই অন্তর্নিহিত "অসম্পূর্ণতা" আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। "অসম্পূর্ণতা" একটি গভীর অর্থে প্রতীকমাত্রেই অন্তর্নিহিত। বলাবাহুল্য, সকল জাতের প্রতীক সমানভাবে অসম্পূর্ণ নয়। ব্যক্তি বা স্থানের নাম, বিবরণ বা বর্ণনাত্মক বাক্যে প্রতীক ধর্ম অপেক্ষাকৃত কম অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ বেশী সার্থক। সাধারণ নাম, সর্বনাম, বিশেষণ প্রভৃতি প্রতীক তুলনায় বেশী অসম্পূর্ণ বা অনির্দিষ্ট। এটা দ্বিতীয় জাতের প্রতীকগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়। বরং, বলা যায়, এই অসম্পূর্ণতা বা অনির্দিষ্টতা ব'লেই তারা স্বতন্ত্র শিল্প-জগৎ সৃষ্টিতে অধিকতর সহায়ক ও সার্থক। কারণ, প্রথম জাতের প্রতীক বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানকে নির্দিষ্টভাবে, যথাসম্ভব নির্দিষ্টভাবে, চিনিয়ে দিয়ে বা চিহ্নিত ক'রে তার কাজ সেরে ফেলে। দ্বিতীয় জাতের প্রতীক ব্যঞ্জনায়, লক্ষণায় ব্যাপক, অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট গুণ, সম্বন্ধাদি বোঝায়। প্রতীক বলতে তো শুধু পদ ও বাক্য বোঝায় না। একটি কবিতা, একটি গল্প, কিংবা পূর্ণাঙ্গ একটি নাটক বা উপন্যাসও প্রতীক। শিল্প-সৃষ্টিমাত্রই প্রতীকধর্মী। তবে, সকল প্রতীক ভাষাশ্রয়ীও নয়। "ভাষা"কে খুব ব্যাপকার্থে নিলে অবশ্য ভিন্ন কথা। মূর্তি, চিত্র, সঙ্গীতও প্রতীক। এদের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি সাধারণ ধর্মে মিল আছে। সেটি হল : সঙ্গতিপূর্ণ একটি আনন্দদায়ক বিষয় বা জগৎ-সৃষ্টি। শিল্পের মূল বিচার এই সঙ্গতি সৃষ্টিতে শিল্পী সার্থক হল কি না ? হলে কতটা ? এবং কীভাবে ?

সত্য, সঙ্গতি, সমন্বয়, অনুপাত ইত্যাদি কথাগুলির অর্থের মধ্যে (বলা যেতে পারে) একটা জাতিগত মিল আছে। সত্যাসত্য বাক্যের ধর্ম। জ্ঞানাত্মক বাক্য হয় সত্য হবে কিংবা মিথ্যা হবে। সম্ভাবনাত্মক বাক্য হয় সত্যসন্ধী কিংবা সত্যভ্রষ্ট,—সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্তী। বাক্য-প্রতীকের সঙ্গে বাচ্য বস্তুর সম্বন্ধ যখন আকৃতি বা কাঠামোগত ঐক্যে সংবদ্ধ তখন বলা হয় সংশ্লিষ্ট বাক্যটি সত্য। কাঠামোগত এই ঐক্য প্রত্যক্ষে তো বটেই

অন্যভাবেও দুর্লভ। তবু এই কাঠামোগত ঐক্যের আদর্শের ধারণা ঘিরেই বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণেয়। শিল্পের ক্ষেত্রে জ্ঞানাত্মক সত্য শিল্পীর মূল অন্বিষ্ট নয়। তবে তার যে আদর্শ (কল্পনার শিল্প-) জগৎ তার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি বা সমন্বয় (সাধন-প্রচেষ্টার) মূল্যায়ন করার জন্য সত্যের ধারণা পূর্ব-প্রকল্প হিসেবে আবশ্যিক। শিল্পকর্ম সাধারণত সম্ভাবনাত্মক প্রতীকপুঞ্জের নান্দনিক সমন্বয় সঙ্গতি কথাটির মূল প্রয়োগ বা ব্যবহার বাক্যনিচয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধে ; অর্থাৎ সাহিত্যে। সঙ্গতি কথার একটি গৌণ প্রয়োগ আছে যেখানে বলা হয় "অমুক ঘটনার সঙ্গে অমুক কথার (বাক্যের) কোন সঙ্গতি নেই।" "সঙ্গতি" না ব'লে এই সব ক্ষেত্রে "মিল" শব্দও ব্যবহার করা চলত। সঙ্গতি বা মিলের প্রশ্নে (সত্যের প্রশ্নের মতো) কাঠামোগত ঐক্যের কথা ওঠে না। প্রতীকের (বাক্যের) সঙ্গে প্রতীকিতের (বাচ্য বা ব্যক্ত বস্তুর) অনির্বচনীয় একটি কাঠামোগত ঐক্য না থাকলে (বাক্য-) প্রতীক সত্য নয়। সাহিত্যে, চিত্রে, চলচ্চিত্রে ও ভাস্কর্যে এ-জাতীয় কাঠামোগত ঐক্যের প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন নেই। "কাঠামো" কথাটি একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে বুঝতে হবে। নৃত্যে ও সঙ্গীতে তো এই সত্যকেন্দ্রিক কাঠামোর প্রশ্ন আরো দূরান্বিত। একমাত্র বোধহয় প্রতিকৃতি অঙ্কণের ক্ষেত্রে সত্যকেন্দ্রিক কাঠামোর প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে প্রাসঙ্গিক। সাহিত্য, চিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে কাঠামোর প্রশ্ন যে ওঠে না তা নয়। ওঠে। তবে এসব ক্ষেত্রে একটি কাঠামোতে বিপরীতধর্মী প্রতীক/প্রতীকসমষ্টি অনায়াসে ব্যবহার্য। শুধু ব্যবহার্য নয় বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির অনুরোধে অপরিহার্যও বটে। অধিক ব্যবহারে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিতান্ত মামুলি হয়ে গেলেও "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" কথাটি এসব ক্ষেত্রে যথার্থই। চিত্রে, ভাস্কর্যে ও (বিশেষ ক'রে) সঙ্গীতে অনুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম ও বিষম—অনুপাত দু' রকমই হতে পারে। কিন্তু শেষ বিচারে সম ও বিষম দু' রকম অনুপাতের সম্বন্ধ সামগ্রিকভাবে এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে তাতে সমন্বয়ের শিল্পানুভবই মনে জাগে। অনুপাতের বিপরীত ধর্ম অনুভবে সমন্বয়ের উদ্বোধক হয়ে ওঠে। শিল্প-সমালোচক বা বিচারক যখন শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ করেন তিনি প্রথমে নিজে বোঝেন এবং পরে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, দেখাতে চান কীভাবে বিপরীতধর্মী প্রতীক, সম ও বিষম অনুপাত/পরিমাণ শিল্পকর্মের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছে বা করতে পারে নি, কীভাবে শিল্পকর্মকে রসোত্তীর্ণ করেছে বা করতে ব্যর্থ হয়েছে। নানা প্রতীক ব্যবহার ক'রে শিল্পী চেষ্টা করেন একটি নান্দনিক অর্থে সম্ভাব্য বা বিশ্বাসযোগ্য (ক্রেডিব্‌ল্) জগৎ তৈরী করতে। এই জগৎ সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ অসত্যও নয়। এই জগৎ-বিচারের মূল সূত্র সঙ্গতি—সম্ভাব্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা, সত্যাসত্য নয়।

শিল্প-বিচারে মূল বিচার্য সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সমন্বয় এবং এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি। মূল বিচার্যের গভীর বিশ্লেষণ করলে অন্য তিনটি, অন্তত তিনটি, বিষয়ের বিচারও যে অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এক, শিল্প-বস্তু ; দুই, রূপময় শিল্প-বস্তু ; এবং তিন, রূপ। রসবিচার শিল্প-বিচারের একটি স্বতন্ত্র (চতুর্থ) অঙ্গ, নাকি উল্লিখিত তিনটি অঙ্গের সামগ্রিক ফলশ্রুতি,—এই প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ আছে।

এক। "শিল্প-বস্তু" পদটি ব্যাপকার্থে ধরলে একটু অস্পষ্ট মনে হতে বাধ্য। বস্তুমাত্রই শিল্প-বস্তু হতে পারে, কিন্তু (ক্রোচে-কলিংউডের নিষেধ মনে রেখেও) শিল্পের প্রকার ভেদ মানলে দেখা যাবে, এক প্রকার বস্তু যেমনভাবে এক বা দুই প্রকার শিল্পের বিষয়-বস্তু বা উপজীব্য হতে পারে ঠিক তেমনভাবে, ঠিক তেমন সঙ্গতভাবে, অন্য সকল প্রকার শিল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে না। একটি মূর্তি বা স্থাপত্যকর্ম দৃশ্যও বটে, আবার স্পৃশ্যও বটে। শিল্প-বস্তু এ ক্ষেত্রে রূপময় হয়ে যাবার পরের কথা বলছি। রূপময় হবার আগে যে "শিল্প-বস্তু" (উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ধ্বনি) কাব্যেরও প্রাণ তা আবার সঙ্গীতেরও প্রাণ। যে-রূপে ধ্বনির সমন্বয় ঘটালে কাব্য হয় ঠিক সে-রূপে না হলেও সমধর্মীরূপে সমন্বিত ধ্বনি সঙ্গীত হয়ে ওঠে। কাব্যধর্মী ধ্বনির সমন্বয়ের মূল রূপটির নাম ছন্দ : সঙ্গীতধর্মী ধ্বনির সমন্বয়ের মূল রূপটির নাম সুর (আসলে যা ছন্দেরই সমগোত্রীয়, কারণ এর মধ্যে রয়েছে তান, লয়, মাত্রাদি)। সুর অনুচ্চভাবে হলেও কাব্যকে ছোঁয়। কাব্যের আবৃত্তি তাই ছন্দোবদ্ধ ও অর্থমুখর হলেও সঙ্গীতময়। পক্ষান্তরে, সঙ্গীত সুরপ্রধান হলেও (মিশ্র বা শুদ্ধ) রাগধর্মী, তান-লয়-মাত্রা-অনুগ এবং (রসিকের পরিশীলিত শ্রবণে) অর্থবহও বটে (শুধু বাণীর মাধ্যমে নয়, রাগরূপের মাধ্যমেও)। যে-সব দেশের সঙ্গীত রাগধর্মী নয় সেই সব ক্ষেত্রে সুরধর্ম বস্তুর শৈল্পিক রূপান্তরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ধ্বনি যদিচ কাব্য ও সঙ্গীত উভয়েরই শিল্প-বস্তু, তবু যে রূপকে (বা রূপসংগ্রহকে) আশ্রয় ক'রে ধ্বনি সঙ্গীত হয়ে ওঠে তা ধ্বনিকে কাব্য করার পর্যাপ্ত আশ্রয় (ও প্রকরণ) নয়। রূপের কথা না ভেবে তাই শিল্পী শিল্পের বিষয়-বস্তু নির্বাচন করে না।

কোন বস্তুকে কীভাবে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে?—এই জিজ্ঞাসা শিল্পীর শিল্প-চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। "সার্থকতা" এ-ক্ষেত্রে শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে, নৈর্বক্তিক ও সার্বজনীনভাবে নয়। একই বস্তুকে সুররূপে (সঙ্গীতে), চিত্ররূপে, অথবা সাহিত্যে (গদ্যে বা কবিতায়) প্রকাশ করা যেতে পারে। শিল্পীকেই (শিল্প-চেতনার স্বাধীনতায়) সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন রূপের মাধ্যমে তার নির্বাচিত বস্তুটি তার কাঙ্ক্ষিত ভাবটিকে (অথবা অনুভবটিকে) সর্বাপেক্ষা

সার্থকভাবে, সর্বোত্তম সম্ভব অর্থবহভাবে, প্রকাশ করতে পারবে। গানে যা প্রকাশ করা যায় কবিতায় বা কথায়ও তা প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকাশের প্রতিশ্রুতি কোন রূপে বা রূপ-সংগ্রহে সর্বোত্তম তা শিল্পীকেই ঠিক করতে হবে, বস্তু তা নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না,—পারলেও তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরোক্ষভাবে। এটা শিল্পীর মুক্তি-সূচক। কিন্তু এই মুক্তি বস্তুর বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

দুই। বস্তুমাত্রই, বলাবাহুল্য, শিল্প-বস্তু নয়। রূপের মাধ্যমে, রূপময় হয়ে, বস্তু হয়ে ওঠে শিল্পবস্তু। বস্তু ও রূপের মিলন ঘটায় শিল্পী। সত্য বটে রূপ-বিরহিত বস্তু নেই : কিন্তু বস্তুর সেই স্ব-রূপ তাকে শিল্পবস্তু করে না,—বস্তুর স্বরূপ শিল্পীকে সেই বস্তুর কাঙ্ক্ষিত রূপটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে। এক অর্থে, বস্তুর রূপে তার শিল্প-রূপের প্রতিশ্রুতি স্পন্দিত। বস্তুমাত্রই যেমন শিল্প-বস্তু নয়, রূপমাত্রই তেমনি শিল্প-রূপ নয়। রূপ-বিরহিত বস্তু ও বস্তু-বিরহিত রূপ দুই-ই অমূর্ত চিন্তার সৃজনমাত্র। রূপ ও বস্তুর পারস্পরিক বিরহ সম্পর্কে সহৃদয় শিল্পীর চেতনা তাকে সমর্থ করে তাদের (রূপের কাঙ্ক্ষিত ও বস্তুর যোগ্য) মিলন ঘটাতে। এই সামর্থ্য অংশত স্বতঃস্ফূর্ত, অংশত প্রযত্ন-কল্পনা সাপেক্ষ। শিল্প-বিচারকের এ প্রসঙ্গে বিচার্য প্রশ্ন হল : রূপময় শিল্পবস্তুর রূপ তার যোগ্য হল কি না, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হল কি না ; আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার মিলন সর্বাঙ্গ সার্থক হল কি না।

গানের (বাণী) রূপ যে-লক্ষ্যে পৌছতে অসমর্থ, শিল্পীর বিশ্বাস, সুরের রূপ বাণীকে প্রচ্ছন্ন আশ্রয় ক'রে সেই লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ। শুদ্ধ নৃত্যের রূপে যা সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় না তা সঙ্গীতের অভিনয়ের রূপের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে, "হার্মনি" সৃষ্টি ক'রে, সঞ্চারিত করতে পারে। নৃত্য, সঙ্গীত (কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র) এবং অভিনয়ের রূপসংগ্রহে, বলাবাহুল্য, জটিলতা আছে : কিন্তু তার ভাব-সংবাহন ক্ষমতাও সমধিক। রূপ যতই শুদ্ধ (বা বস্তুবিরল) হয়ে ওঠে তার আবেদন, ভাব-সংবাহন ক্ষমতাও তত সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে : তার বিচারও হয়ে ওঠে কঠিন এবং বিচারকও হয়ে পড়ে বড় দুর্লভ।

তিন। শিল্পের বিচার রূপ ও বস্তুর মিলনের সার্থকতা ঘিরে। শুদ্ধ রূপকে ঘিরে শিল্প-বিচার আদৌ সম্ভব কি না ?—এই প্রশ্ন শিল্প-বিচারের ইতিহাসে বহুকাল ধ'রে বহুভাবে উঠে আসছে। এই প্রশ্নের মূল রয়েছে দর্শনশাস্ত্রে, তত্ত্ববিদ্যায় এবং ভাব-বিদ্যায়। শুদ্ধ রূপের বিশ্লেষণ, সন্ধান, স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রভৃতি প্রশ্ন মূলত আলোচিত হয়েছে জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে আমাদের দেশে বৌধায়ন ও আপস্তম্ব এবং পাশ্চাত্যে পিথাগোরাস ও প্লাতো প্রমুখ দার্শনিকেরা শুদ্ধ রূপের ও তাদের প্রায়োগিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শুধু সঙ্গীত ও শিল্পকলার অন্যান্য অঙ্গ প্রসঙ্গেই নয় ন্যায়-

নীতিধর্মের মৌল ধারণার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে লব্ধ শুদ্ধ রূপের তাৎপর্য ও প্রয়োজনের কথা বারবার আলোচিত হয়েছে।

একটি মত হল : শুদ্ধরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ ; তার (বা তাদের) অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ, অতীন্দ্রিয়, মূল রূপগুলি শুদ্ধ বুদ্ধিতে (বা বোধিতে) উদ্ভাসিত হয় মাত্র,—চিন্তা বা কল্পনা দিয়ে তাদের তৈরী করা যায় না ; চিন্তিত, কল্পিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপগুলি স্বয়ংস্থিত রূপ নয়,—মনুষ্যলভ্য (ইন্দ্রিয়বদ্ধ ও মনোময় জীব মনুষ্যের পক্ষে লভ্য) রূপের আভাসমাত্র। অন্য যে-মতটি প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য তা হল মোটামুটি এই রকম : স্বয়ংস্থিত, মনুষ্য জ্ঞান-নিরপেক্ষ শুদ্ধ রূপ ব'লে কিছু নেই ; রূপমাত্রই মনুষ্য-কল্পিত, মনুষ্য-উদ্ভাবিত ; বস্তুর স্পর্শলেশহীন শুদ্ধ রূপ কোনো অতি-মানবিক অমূর্ত বুদ্ধির কল্পনামাত্র। রূপ ও বস্তুর সম্বন্ধ সম্পর্কে আমার মত উল্লিখিত দু'টি মতের সঙ্গে কিছুটা মেলে, কিছুটা মেলে না। রূপ দেশ-কালের বহির্ভূত কিছু নয়। এই দিক থেকে দেখলে, বস্তু ও রূপ উভয়ই দেশ-কালের আধারে উপস্থিত ও অভিজ্ঞেয়। তবে রূপের (একটি বিশেষ অর্থে) মনুষ্য জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্তা আছে। তাই "পদার্থ জগতের রূপ পদার্থ বিদ্যার নিয়ম থেকে বোঝা যায়" বা "প্রাণী-দেহের রূপ প্রাণীবিজ্ঞানী আবিষ্কার ক'রে চলেছেন" প্রভৃতি বাক্য মনুষ্য জ্ঞান-নিরপেক্ষ অর্থ বহন করে। রূপ (ফর্ম) ও নিয়ম (ল) জগতেই (পদার্থজগতে, প্রাণিজগতে প্রভৃতিতে) আছে : বুদ্ধি বা কল্পনা দিয়ে আমরা তা সৃষ্টি করি না। পদার্থ-বিজ্ঞানী বা অন্য বিজ্ঞানী বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে জগতের নিয়ম (যথার্থ ই জগতের নিয়ম) আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, আবিষ্কার করেন (সৃষ্টি করেন না)। আবিষ্কারে ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। শিল্পজগতের রূপ এক অর্থে নিশ্চয়ই মনুষ্য-সৃষ্ট ; কিন্তু রূপ সে-জগতে নির্বস্তু বা শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ রূপ অনুভবে অন্তর্লীন থেকে শিল্প-বস্তুর অন্বয় ও সামঞ্জস্য পরিমাপ করে, বিচার করে।

বস্তুর রূপ স্বতঃই শিল্প-রূপ নয়। বস্তু-রূপকে বিশেষ বিশেষভাবে দেখতে পারলে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা বুদ্ধি-গ্রাহ্য করতে পারলে, তা নান্দনিক অভিজ্ঞতার, আনন্দের, উৎস হতে পারে। অভিজ্ঞতার নান্দনিক চরিত্র বস্তু-জগতের অন্ধ বা অরূপ অবদান নয়। বস্তু-রূপ মানুষের চেতনায় স্ব-গুণে ও স্ব-শক্তিতে নান্দনিক হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই "বাড়তি" একটি গুণ বা শক্তিসম্পন্ন মানুষের মন, সক্রিয় মন,—সংগঠন, সংস্থাপন, সম্মিলন করার ও সামঞ্জস্য বিধানের শক্তি (ও যোগ্যতা) সম্পন্ন মন। স্বচ্ছ আয়নায় যেমন তার সম্মুখের যা কিছুই থাক তা প্রতিফলিত হয় তেমনভাবে বস্তু-রূপ শিল্প-রূপসম্পন্ন হ'য়ে মানুষের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয় না, ভেসে ওঠে না। শিল্প-রূপমাত্রই অল্পাধিক প্রয়াস-সাপেক্ষ, মানুষিক-মানসিক প্রয়াস সাপেক্ষ। অভ্যাসে ও চর্চায় সে-প্রয়াস

কালক্রমে অনায়াস হতে পারে ; শিল্পীর ও শিল্প-বিচারকের কাছে তা হয়ও বটে ; কিন্তু কোনো মানুষই বিনা প্রয়াসে, চর্চা বা যত্ন না ক'রে, সহজাত শিল্পী নয়। শিশু-শিল্পীর বা শিল্প-চর্চার ইতিহাস-বিরহিত যে-সব শিল্পীর কথা শোনা যায় তা শুধু মানুষিক চেতনা, দেহ-মন সংগ্রহ, যে শিল্প-রূপ সৃষ্টির গুণসম্পন্ন তারই প্রমাণ। অলৌকিক কিছুর প্রমাণ নয়। শিল্প-রূপ বস্তু-রূপের যান্ত্রিক প্রতিফলন বা উৎপাদন নয়।

যা বললাম তা থেকে কিন্তু ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত টানা ঠিক হবে না। অর্থাৎ এ-কথা বলা ঠিক হবে না যে বস্তু-রূপ শিল্প-রূপ সৃষ্টির সহায়ক নয়। শিল্প-রূপ সৃষ্টিতে বস্তু-রূপের গভীর সহায়ক মূল্য আছে। বস্তু-রূপের বিশেষ বিশেষ সংগ্রহ যে শিল্পীর চোখে বা চেতনায় শিল্প-রূপ হয়ে ভেসে ওঠে তা থেকে কয়েকটি জিনিষ স্পষ্ট হয়। এক, বস্তু-জগৎ ও প্রাণ-জগতের মধ্যে বহু রূপে নান্দনিক অভিজ্ঞতার উৎস, শিল্প-সৃষ্টির (সহায়ক মূল্যসম্পন্ন) রসদ ছড়িয়ে আছে। দুই, বহির্জগতে বা নিসর্গেও সৌন্দর্য আছে কিংবা, বলা যেতে পারে, সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিন, শিল্প-রূপ সৃষ্টির জন্য চাই মানুষিক কল্পনা ও প্রযত্ন।

প্রশ্ন উঠতে পারে: "মানুষের চেতনার বাইরে, শিল্পীর কল্পনার বাইরে, বস্তুর যে-সব রূপ আছে, এবং শিল্প-রূপ সৃষ্টিতে যে-সব রূপের অবদান ও সহায়ক মূল্য স্বীকার্য, সে-সব রূপের মধ্যে নিজস্ব বা অন্তর্নিহিত কোন শিল্প-চরিত্র ও নান্দনিক মূল্য আছে কি না ?" আমার মনে হয়, এ-জাতীয় প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এ যেন প্রায় নির্বচনীয়কে বচনীয় করে তোলার দাবি। এ দাবী পূরণ করা আক্ষরিকভাবে অসম্ভব। তবু এ-জাতীয় প্রশ্ন তাৎপর্যহীন নয়। আমি এ-জাতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য যে-ভাবে বুঝি তা এই রকম। পদার্থ জগৎ (চন্দ্র-সূর্য, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ঋতুরঙ্গ ইত্যাদির) এবং প্রাণ-জগতের (গাছ, ফুল, লতা-পাতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির) নিজস্ব যে-রূপগুলি আছে তাকে নান্দনিক আনন্দ-দায়ক ও শিল্প-গুণ-সম্পন্ন বলা যায় কি না ? "নিজস্ব", "আনন্দ-দায়ক" ও সংশ্লিষ্ট বিতর্কমূলক পদগুলি নিয়ে কোন আলোচনায় না ঢুকেই আমি বলব, পদার্থ ও প্রাণ জগতের, এক অর্থে, নান্দনিক চরিত্র আছে এবং, ভিন্ন এক অর্থে, নেই। যে-অর্থে আছে তা এই : (প্রাক্-মানবিক) বিশ্ব-জগৎ নিয়মের বা রূপের সামঞ্জস্যেই সুন্দর এবং সে-সৌন্দর্যের উপভোক্তা নেই ব'লে তাকে বা তার নান্দনিক মূল্যকে অস্বীকার করার পর্যাপ্ত যুক্তি নেই। যে-অর্থে নেই তা এই : বিশ্ব-জগৎ শিল্প-জগতে নিছক বিম্বিত বা প্রতিফলিত নয়,—রূপান্তরিত ও পুনর্জাত ; এবং এই রূপান্তরণ ও পুনর্জন্ম মনুষ্যকৃত,—প্রকৃতিদত্ত নয়। যখন বলি "শিল্প অনুকৃতি নয়" তখন শিল্প সৃষ্টিতে বিকার বা রূপান্তরণের ভূমিকা স্পষ্টতই স্বীকৃত।

বস্তু ও রূপের পার্থক্য, বস্তু-রূপের ও শিল্প-রূপের পার্থক্য আছে ; আর তা আছে ব'লেই তাদের অন্বয় কল্পনা করা, একাধিক বিকল্প অন্বয় কল্পনা করা, কল্পিত অন্বয়কে সাহিত্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে বা অন্য কোনো শিল্পে রূপ দেওয়ার কথার অর্থ হয়। বস্তু-রূপই যদি শিল্পীকে ইঙ্গিতে আভাসে কাঙ্ক্ষিত শিল্প-রূপ বুঝিয়ে দিতে পারত তাহলে শিল্পীর করণীয় উল্লেখযোগ্য কোন সৃজনধর্মী কর্ম ব'লে কিছু থাকত না। "শিল্প-সৃষ্টি" কথার অর্থ বলতে খুব একটা কিছু থাকত না। স্রষ্টা সেক্ষেত্রে হত এক ও অনন্য,—তার নাম ঈশ্বর, বিশ্বকর্মা বা অন্য যা কিছুই দেওয়া হোক না কেন। সেই "অনন্য স্রষ্টা"র সৃষ্টি ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিই সেক্ষেত্রে হত অস্পষ্ট বা অশক্ত অনুরূপ অনুকৃতি। বলাবাহুল্য, এমন একটি মতবাদ গ্রহণ করার অসুবিধা অনেক ও দুরতিক্রম্য।

বস্তু ও রূপের অন্বয়, সামঞ্জস্য ও সংগ্রহ প্রত্যক্ষ, অনুভব ও কল্পনা করার মধ্যে শিল্পীর, শিল্পী-মনের, আনন্দ নিহিত। এই আনন্দ দেহ-মন ব্যাপ্ত করে, চিন্তার স্তরেও আপেক্ষিক স্থায়িত্ব লাভ করে, এবং নান্দনিক চরিত্র অর্জন করে। এই অন্বয় বা সামঞ্জস্য শিল্পীর অর্জিত বা সাধিত, ঈশ্বর বা ঐতিহ্য-প্রদত্ত নয়। শিল্প-সাধনায়, শিল্পকর্মের মধ্যে, শিল্পী যা সন্ধান করে, যা তার অন্বিষ্ট, যে লক্ষ্যে সে পৌঁছতে চায় তার মধ্যে কিছু-না-কিছু নতুনত্ব আছে। যদি তা না থাকে তাহলে সেই "সৃষ্টি" ঐতিহ্যের অক্ষম অনুকরণ,—আসলে সৃষ্টিই নয়। তার কৃতিত্ব ক্যামেরার যন্ত্রচক্ষুর সঙ্গে তুলনীয়। দৃষ্টিকোণের অভিনবত্বে অবিশ্যি ক্যামেরার "কৃতিত্ব"ও কখনো কখনো শিল্পকর্মের স্বীকৃতি পেয়ে যায়। মৌলিক শিল্পী সৃষ্টির জন্য যা আছে,—জগৎ, সমাজ, আপন অভিজ্ঞতার ইতিহাস ইত্যাদি, তা ভাঙে এবং আবার তা নতুন ক'রে গড়ে। নতুন-গড়া শিল্পকর্মে চেনা-জগৎ, ভাঙা-জগৎ, কিছুটা চেনা যায়, কিছুটা যায় না।

শিল্প-বিচারকের পক্ষে আলোচ্য প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা খুব স্বাভাবিক তা হল : শিল্পী তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল অথবা, বলা ভাল, শিল্পকর্মে যা গড়তে চেয়েছিল তা সে বস্তু ও রূপের সার্থক সামঞ্জস্য বিধান ক'রে গড়তে পেরেছে কি না ? পারলে তা কতোটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে ? অলঙ্করণ, উদ্ভাবন ইত্যাদিতে তো বটেই বিবরণ, নামকরণ ইত্যাদিতেও—শিল্পসৃষ্টির সকল উপায়ে-অঙ্গে রূপ ও বস্তুর সামঞ্জস্য সার্থক হল কি না এ প্রশ্ন কোনো-না-কোনোভাবে উঠবেই। বিবরণে ও নামকরণেও যথার্থ রূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন নিহিত। একই বিবরণে একাধিক বস্তু বিবৃত হতে পারে ; একই নামে একাধিক ব্যক্তি ও বস্তু নামাঙ্কিত হতে পারে। বিবরণ ও নাম এ-ক্ষেত্রে রূপের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, বস্তুর বা ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধ যে অনন্য ও অবিচ্ছেদ্য নয় তা এ থেকে স্পষ্ট হয়। শিল্পীর মনের কথা শিল্প হল কি না—হয়ে উঠতে পারল কি না ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রথম পর্বেই বস্তু ও রূপের সামঞ্জস্য হল কি না—এই প্রসঙ্গের বিচার আবশ্যিক। শিল্পী যা প্রকাশ করতে চান—বহিঃপ্রকাশের কথা বলছি—তা প্রকাশের সহায়ক রূপ যদি তিনি নির্বাচন করতে না পারেন তাহলে বিচারক বলবেন, "এই বস্তু, বা এই ভাব, প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পীর পক্ষে ঐ রূপ বা রূপ-সংগ্রহ নির্বাচন অনুচিত হয়েছে।" রূপ ছন্দের হতে পারে, রূপ রাগের হতে পারে, রূপ হতে পারে সংস্থাপনার বা জ্যামিতির, এবং আরো অনেক রকমের।

কবিতার বিষয়-বস্তু যদি হয় গুরু-গম্ভীর প্রকৃতির তাহলে প্রথম শ্রেণীর কবি তা মাত্রাবৃত্তে ছন্দে বা বিশেষত ছড়ার ছন্দে প্রকাশ না ক'রে সাধারণত প্রকাশ করতে চাইবেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। "সাগর জলে সিনান করি/সজল এলো চুলে/বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে/"—এই কবিতার বিষয়-বস্তুকে প্রকাশ করার জন্য কবি যদি "ভাষা ও ছন্দ"-এর গম্ভীর অক্ষর বৃত্ত ছন্দে-রূপ ব্যবহার করতেন ("যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়/মহানন্দ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার" ইত্যাদি) তাহলে বিষয়-বস্তু ও রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকত না। ছড়ার ছন্দে গম্ভীর ভাব প্রকাশ করার এবং তার বিপরীত (বিষম সামঞ্জস্যের) নান্দনিক সম্ভাব্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। শিল্পের অন্বিষ্ট সে-সব ক্ষেত্র ভিন্ন। কখনো তা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ; কখনো তা মহিমা (সীরিয়স বা সাব্লাইম) ভাবের সূক্ষ্ম ও অপ্রত্যাশিত বিদারণ ; কখনো তা গুরু-গম্ভীর ভাবকে চণ্ডাল প্রকাশভঙ্গীর পংক্তিভোজে নির্দোষ নৈপুণ্যে বসিয়ে দেওয়া। মুঙ্কের "স্ক্রীম" ("চীৎকার", ১৮৯২) ছবিতে বিষয়-বস্তুর (শব্দ-তরঙ্গের) সঙ্গে রূপের (রেখার তরঙ্গ ও তদনুরূপ রঙের বঙ্কিম বিন্যাসের) আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটেছে।[১] বলাবাহুল্য, বিষয়বস্তু যদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যপ্রধান না হয়ে বুদ্ধি-গ্রাহ্য-প্রধান হয়, তাহলে মুঙ্কের "স্ক্রীম"-জাতীয় (বস্তু ও রসের সার্থক মিলন-জনিত) সাফল্য লাভ কঠিন হয়ে ওঠে। হেনরী রুশোর "ড্রীম" ("স্বপ্ন", ১৯১০) ছবির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল যে, বনের মধ্যে, সম্পূর্ণ বনের পরিবেশে, গাছ-ফুল-লতা-পাতা ও পশু-পক্ষীর মধ্যে, সোফার শায়িতা নারীদেহ বড় বেমানান : সোফার রূপ ও বন্য রূপ-সংগ্রহের মধ্যে সংস্থাপনগত কোনো সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা কঠিন। দৃষ্টান্তের এই সমালোচনার উত্তরে শিল্পী লিখেছিলেন, "সোফায় শায়িত নারী স্বপ্ন দেখেছিল যে সাপুড়ের সঙ্গীত শুনে সে যেন বনের মধ্যে চলে গেছে। (বনের দৃশ্যে) ছবিতে সোফার উপস্থিতির ব্যাখ্যা হল এই।" দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে রূপের সংস্থাপনগত অসামঞ্জস্যের দোষ দূর করার জন্য শিল্পী এখানে কল্পনার বস্তু ও রূপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন। এক্ষেত্রে শিল্প-কর্মের বস্তু ও রূপের সামগ্রিক সামঞ্জস্য উপভোগ করবার জন্য ইন্দ্রিয়ের অবদানই পর্যাপ্ত হল না, কল্পনা ও বুদ্ধির অবদানেরও প্রয়োজন দেখা দিল। শিল্পকর্ম যত রূপ-প্রধান ও

বস্তু-বিরল হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পবিচারে শুধু ইন্দ্রিয়ের নয়, কল্পনার ভূমিকাও তত হ্রাস পায়,- বৃদ্ধি পায় বুদ্ধির ভূমিকা। এখানে উল্লেখ করা দরকার, এই বুদ্ধি শুদ্ধ বুদ্ধি নয়। এই বুদ্ধি রূপের বিন্যাসে রস-সন্ধানী। সুসমঞ্জস রূপের বিন্যাস এক অর্থে বস্তুর কাজ করে। বস্তু যেমন রূপকে রূপময় করে অনুগত রূপ বা রূপসমষ্টিও তেমনি তাদের অভ্যাগত, সংগ্রাহক বা সামঞ্জস্যবিধায়ক রূপকে রূপময় করে। মণ্ড্রিয়ানের "ন্যু ইঅর্ক সিটি (১৯৪২)", জোসেফ আলবের্সের "হমেজ টু দি স্কোয়ার (১৯৫৩)" ও ফ্রাঙ্ক স্টেলার "সিঞ্জার্লি ভেরিয়েশন IV (১৯৬৮)" প্রভৃতি চিত্রে অনুগত রূপসমষ্টি বস্তুর ভূমিকা পালন করছে। আর এই ভূমিকা বেশি অর্থবহ হয় যদি অনুগত রূপে রঙের (শুধু সাদা-কালো নয়) বিচিত্র স্পর্শ লাগে।[২] অনুগত রূপসমষ্টির সঙ্গে সংগ্রাহক বা অভ্যাগত রূপের সম্বন্ধ যদি সম না হ'য়ে বিষম বা বিচিত্রভাবে বিষম হয় (যেমন পল ক্লী, ডালি প্রভৃতির কাজ) তাহলে রসানুভব তীব্রতর হয় ; সঙ্গে সঙ্গে মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। শিল্পকর্মের রস-উপভোগে বুদ্ধির ভূমিকা যারা গৌণ বা তুচ্ছ মনে করেন তাঁরা সাধারণত দু'টি ভুল করেন। এক, দীর্ঘ সাধনা ও চর্চার ফলে বুদ্ধি-বিচারে অনস্যূত অসংখ্য-বিচিত্র-সূক্ষ্ম নিয়মগুলি শিল্পীর ও শিল্প-বিচারকের আয়ত্তাধীন ও আত্মস্থ হয়ে যায় ; এবং তার ফলে তাদের প্রয়োগ এতো অনায়াস ও স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে হয় যে বাইরের থেকে সাধারণ মানুষের একথা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে শিল্পের রসোপভোগ ও বিচারের মধ্যে বিরোধ আছে। দুই, না মনের বৃত্তিরূপে না তাদের প্রয়োগ-কালে বিচারের সঙ্গে অনুভবের মধ্যে মৌল কোনো দ্বন্দ্ব আছে। রুচি, কল্পনা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখানো সহজ হয় কীভাবে বিচারের আপাত দৃঢ়স্থির নিয়মগুলি অনুভব, সংবেদনা, সহানুভূতি প্রভৃতির রসে জারিত হয়, পরিবর্তিত হয়। বিশ্লেষণে এদের পার্থক্য প্রদর্শন নিঃসন্দেহে প্রয়োজন ; কিন্তু এদের স্থাণু দ্বন্দ্ব-বিরোধ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন।

শিল্পীর পরিকল্পনা তার শিল্পকর্মে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে কি না ?—এই প্রশ্নকে শিল্প-বিচারের প্রশ্ন ব'লে মানতে অনেক শিল্প-বিচারকই অসম্মত।[৩] তাঁরা মনে করেন, এই প্রশ্নের পশ্চাদ্বর্তী ধারণাটি নিছকই মনস্তাত্ত্বিক এবং শিল্প-বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবিত শিল্পকর্ম সম্পর্কে শিল্পীর কী পরিকল্পনা ছিল তা জেনে যদি তার কৃত শিল্পকর্মের বিচার করতে হয় তাহলে তো শিল্পবিচার অসম্ভব। শিল্পী-মনের শিল্প-পরিকল্পনা তো তার ব্যক্তিগত, আত্মজীবনীর অন্তরঙ্গ ; আর অন্তরঙ্গের সে অন্দরমহলে তো শিল্প-বিচারসহ অন্যসকলের প্রবেশ (শুধু নিষিদ্ধ নয়) অসম্ভব। যা অলভ্য—শিল্পী-মনের শিল্প-পরিকল্পনা—তার মানদণ্ডে যা লব্ধ—শিল্পকর্ম—তার বিচার হবে কেমন করে ? যে-সব

শিল্পী আর বেঁচে নেই বা বেঁচে থাকলেও যাদের অন্তরাঙ্গিক আত্মজীবনী শিল্প-বিচারকের লভ্য নয় তাঁদের শিল্পকর্মের কি তাহলে বিচার হবে না? নাকি তার বিচার হয় নি, হচ্ছে না? স্বভাবতই স্বীকার করতে হয়: আত্মজীবনী যাঁদের অলভ্য তাঁদের শিল্প-কর্মের অবশ্যই বিচার সম্ভব। আর তার উদাহরণেরও অন্ত নেই। একটু এগিয়ে এই বক্তব্যকে আরো শক্তভাবে বলা যায়: শিল্প-বিচার শিল্পেরই বিচার, শিল্পীর বা তার শিল্প-পরিকল্পনার বিচার নয়; এবং এই বিচার প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক আত্মজীবনীর বিশেষ কোনো স্থান নেই। মনস্তত্ত্বকে শিল্প-বিচার থেকে সম্পূর্ণ দূর করার জন্য প্লাতোর কিছু কিছু বক্তব্য উদ্ধার ক'রে অনুকৃতি তত্ত্বের একটি রূপ দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে: "দৈব অনুপ্রাণিত শিল্পী যখন জগৎকে নিখুঁত, অবিকলভাবে অনুকরণ করতে সমর্থ তখন শিল্পীর নিজস্ব মনোভাব, আবেগ বা কোনো পরিকল্পনার স্থান তাতে নেই, আর তখনই শিল্পকর্ম সার্থক। শিল্পকর্ম সার্থক হল দৈব পরিকল্পনা অবিকল প্রকাশের ফলে।" বলা যায়, "শিল্পকর্ম সার্থক হল শিল্পীর পরিকল্পনা প্রকাশ হল না ব'লে।" অথবা বলা যায়, "শিল্পের সার্থকতা নিহিত শিল্পীর চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতায়,—দৈব পরিকল্পনার বা সৃষ্টির অন্ধ অনুকৃতিতে। আর এর ফলেই সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে সার্বিক ও শাশ্বত।"

নৈর্ব্যক্তিক এই শিল্প-বিচারতত্ত্বের সঙ্গে স্পষ্টতই আমাদের পরিচিত একাধিক নান্দনিক ধ্যান-ধারণার বিরোধ আছে। অন্তত তা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রথমত, আমাদের অন্যতম সুপরিচিত ধারণা হল: সার্থক শিল্প-বিচারের জন্য শিল্পী-মনের সঙ্গে শিল্প-বিচারকের হার্দ্য সহানুভূতি থাকা দরকার। একটু পাল্টে এই ধারণাটিকে কখনো-কখনো এইভাবে সাজানো হয়: সার্থক শিল্প-বিচারের জন্য শিল্প-কর্মের প্রতি শিল্প-বিচারকের হার্দ্য সহানুভূতি থাকা দরকার। মুশকিল হল: শিল্প-কর্মের (রূপক অর্থে না বললে) না আছে হৃদয়, না আছে অনুভূতি; সুতরাং তার সঙ্গে হার্দ্য সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আসলে এই বক্তব্যের উদ্দিষ্ট অর্থ হল শিল্প-কর্মের পশ্চাদ্বর্তী শিল্পী-হৃদয়ের অনুভূতির (কল্পনা, পরিকল্পনা ইত্যাদির) সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিচারকের সহানুভূতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতা। সেই পুরণো কথা, একটু ঘুরিয়ে। দ্বিতীয়ত, শিল্প-জগৎ যদি কোনো-না-কোনো অর্থে নতুন জগৎ হয়, তবে তা সৃষ্টিতে শিল্পীর কল্পনা, অনুপ্রেরণা, অনুভব এবং এ-সবের প্রকাশে সৃজনধর্মী কিছুর অনুপ্রবেশ, সঞ্চার এবং তজ্জনিত বিকার অনিবার্য। শিল্প-জগৎ যদি তত্ত্ব-জগৎ বা বস্তু-জগতের অবিকল, অবিকার প্রতিচ্ছবি হয় তবে তাতে সৃষ্টি বলতে কিছু থাকতে পারে না। সৃষ্টি তাহলে হয়ে দাঁড়ায় অন্ধ অনুকৃতিমাত্র। তৃতীয়ত, শিল্পী স্রষ্টা,—এই প্রচলিত ধারণাও তাহলে পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে। দৈব সৃষ্টির পথে স্ব-ইচ্ছা বা কল্পনা দিয়ে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা বিকার ঘটতে না দিয়ে সেই সৃষ্টি-

প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তাহলে শিল্পীর কর্তব্য হয়ে ওঠে। কর্তব্যসাধনায় সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন নৈর্ব্যক্তিকতা,—স্ব-ইচ্ছা বা কল্পনাকে কোন সৃষ্টিশীল ভূমিকা না দেওয়া। সৃষ্টির দেব-দেবীরাই (সরস্বতী, ক্লিও প্রমুখরাই) সৃষ্টি করেন বাল্মীকি,—প্রমুখরা নিমিত্ত মাত্র। নৈর্ব্যক্তিকতা ও নৈষ্কর্ম দুই-ই শিল্পীর আবশ্যিক ধর্ম।

আমি নিজে শিল্প সম্বন্ধে যে-মত পোষণ করি, যা ইতিপূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে অবিশ্যি উল্লিখিত তিনটি প্রচলিত ধারণার একটিকেও পরিত্যাজ্য ব'লে মনে হয় না। প্লাতনিক বা নব্য-প্লাতনিক নৈর্ব্যক্তিক শিল্প-বিচারতত্ত্ব মূলত মনস্তাত্ত্বিক শিল্প-বিচারতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ (এবং কিয়দংশে প্রয়োজনীয়) সতর্কবাণী। শিল্প-বিচারককে সত্যিই কিন্তু শিল্পী-মনের ইতিহাস ও শিল্প-পরিকল্পনা (আক্ষরিক অর্থে) জানবার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, বোঝবার প্রয়োজন আছে। শিল্প-বিচারককে নিশ্চয়ই বিচার্য শিল্পকর্মটি বুঝতে হবে, বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। শিল্প-কর্ম (দেশ-কালস্থ টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির মতো) এমন একজাতের বিষয় নয় যে তাকে জানতে হলে কেবলমাত্র একটিভাবেই জানতে হবে, আর অন্য যে-কোনোভাবে জানলেই জানা হবে না, ভুল হবে। টেবিল, চেয়ারের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়-বস্তুকে নানা দিক থেকে, নানা সময়ে, বিভিন্ন সংস্থানে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যেতে পারে। বিচার্য বিষয় যদি হয় মূলত বোঝবার বিষয় তাহলে তাকে নানারূপে বোঝা যায়। বিচার ভিন্ন হলেই ভুল হয় না। শিল্পকর্মের এমন কোন সারমর্ম নেই যে সেই সারমর্মকে অনন্যভাবে না জানলে শিল্প-কর্মটিকে জানা হল না। শিল্প-বিচারককে যে-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তা "সাদা" বা "কালো", "সুন্দর" বা "অসুন্দর" এইরকম এক কথায় বলা যায় না। কেন সুন্দর মনে হল, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর মনে হল, কোন বিষয়ে সুন্দর বা সার্থক, কোন বিষয়ে সুন্দর বা সার্থক নয়,—শিল্প-বিচারে এই জাতীয় প্রশ্নই প্রাধান্য পায়। বিচারক তাই বিচার করতে গিয়ে শিল্পকর্মকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন। শিল্পীই স্রষ্টা নয়, শিল্প-বিচারকও স্রষ্টা। শিল্প সৃষ্টিতে স্রষ্টার কোন স্পষ্ট, পূর্ব-নির্দিষ্ট ও অনন্য পরিকল্পনা থাকে কি না তা বলা শক্ত, তবে বিচারককে যে সেই "পরিকল্পনা"র ভিত্তিতে বিচার করতে হয় না তা বোধহয় ঠিক।

এখানে ক'জন বিখ্যাত শিল্পীর বক্তব্য উদ্ধৃত করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মাতিস বলেন[৪] : "I cannot copy nature in a servile way, I must interpret nature and submit it to the spirit of the picture।" পিকাসো-র বক্তব্যও অনুরূপ[৫] : "...from the point of view of art there are no concrete or abstract forms, but only forms which are more or less convincing

lies. That those lies are necessary to our mental selves is beyond any doubt, as it is through them that we form our aesthetic point of view of life।" শিল্প-সৃষ্টিতে যে অনুকরণের ভূমিকা গৌণ তা মাতিস ও পিকাসো দুজনেই স্পষ্টভাবে বলছেন। শিল্পী যে সৃষ্টির প্রাক্কালে কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করেন না তা পিকাসোর এক সংলাপ থেকে স্পষ্ট[৬] : "In the old days pictures went towards completion by stages···A picture used to be a sum of additions. In my case a picture is a sum of destructions. I do a picture—then I destroy it. In the end, though, nothing is lost।" তাছাড়া পিকাসো শিল্পের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা চাওয়া ও দেওয়ারও বিরোধী। "Everyone wants to understand art. Why not try to understand the song of a bird ?...People who try to explain pictures are usually barking up the wrong tree।"[৭] শিল্পী তার শিল্পে যে কী বলতে চাইছেন তা শিল্পীর নিজের কাছেও সর্বদা স্পষ্ট নয়। বিষয়-বস্তু ও শিল্প-বস্তুর এই পার্থক্য সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি। এ-প্রসঙ্গে পল ক্লীর লেখা একটি চিঠি থেকে ক'টি পংক্তি উদ্ধার করছি। "Formerly it frequently happened to me that when questioned regarding a picture I simply did not know what it represented, I had not seen the subject, so to say. Now I have also included the content so that I know most of the time what is represented. But this only supports my experience that what matters in the ultimate end is the abstract meaning or harmonization।"[৮] শিল্পের শুধু বিষয়-বস্তু নয় সারবস্তু ব'লে যদি কিছু থাকে তা শিল্পবস্তুতে এমন আমূলভাবেই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে তাকে বলা যেতে পারে পুনর্নব, রূপময় ও অর্থবহ কিছু। শিল্পকর্মের এই পুনর্নব সত্তায়ই মূলত বিচার্য, এর মানসিক বা সামাজিক উৎস ও অনুপ্রেরণা নয়। উৎস ও অনুপ্রেরণা স্বীকার্য, মৌল বিচার্যবিষয় হিসেবে নয়।

এখানে আমি শিল্প-সাহিত্য ও শিল্প-বিচারকের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি। তিনি সৃষ্টির পুনর্নব সত্তার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং শিল্প-সৃষ্টির যথার্থ প্রতিভা, তাঁর মতে, কোনো ব্যক্তি-শিল্পীর জীবনের সঙ্গে জড়িত হলেও মুক্ত, এক গভীর অর্থে মুক্ত, আর এইজন্য টেনিসনের পুত্র-লিখিত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী পড়ে' অতৃপ্ত, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন "কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই।···

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চির-কৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে কেহ ইতিহাস বলিয়া গণ্য করিবে না।...কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহাও এইরূপ।...টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে—বাস্তবজীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক।" শিল্প-স্রষ্টার ইতিহাস-ভূগোল শিল্প-বিচারে, মূল বিচারে, গৌণ স্থানের অধিকারী। আর তাই সার্থক শিল্পের আবেদন দেশ-কালোত্তীর্ণ। সম্পূর্ণ স্বীকার্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের মতে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। পূর্বোক্ত পাশ্চাত্যের কোনো শিল্পীই শিল্প-বিচারের তাত্ত্বিক দিকটি তাঁর মতো গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন নি। কিন্তু শিল্পীর শিল্প-চেতনায় তিনি স্বাতন্ত্র্যের উপর যে-ঝোঁকটি দিতে চান তা স্বীকার করলে শিল্পীর সামাজিক চৈতন্যের ও দায়িত্বের গুরুত্ব লঘু হতে বাধ্য।

"সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১০], "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব, এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারে না।" স্রষ্টার সৃষ্টিগুণে শিল্পের বিষয়-বস্তু, "ভাব, বিষয়, তত্ত্ব" তা সে যা'ই হোক না কেন, বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। "সাহিত্যের সামগ্রী" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের "সাধারণ" ও "বিশেষ" দিকের মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানছেন। "রচনা"র বৈশিষ্ট্যে রচয়িতা তার শিল্প-সৃষ্টিকে একটি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র চরিত্র দেয়। রচনার বিষয়ের তুলনায় এই বৈশিষ্ট্য মূলত ঘিরে থাকে বিষয় প্রকাশের উপায়কে। "ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের।...কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে। অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।"[১১] উপায়ের মধ্য দিয়ে লেখক বা শিল্পী বিষয়-বস্তুকে অন্যের কাছে সঞ্চারিত করে। সুর, রঙ, ছন্দ, আকার, প্রকার ইত্যাদি হল উপায়। আমি এগুলির নাম দিই রূপ। রূপময় না হলে বিষয়-বস্তু সঞ্চারণ-যোগ্য হয় না; একের ভাব-অনুভব অন্যের হয় না। বলাবাহুল্য, মূর্ত-অমূর্তের মাপকাঠিতে রূপগুলির স্থান-বা স্তর-ভেদ ঘটে। বিষয়-বস্তু ও রূপের সামঞ্জস্য এনে, সম্মিলন ঘটিয়ে, শিল্পী যা প্রথমত থাকে তার নিজের তা ক'রে তোলে অন্যের, চেষ্টা করে তা রসিক অন্য সকলের ক'রে তুলতে।

"যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না; তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে।"

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যের মধ্যে রবীন্দ্র-শিল্পচিন্তার একটি বিশিষ্ট ঝোঁক প্রচ্ছন্ন। স্রষ্টার অন্তরে বিশেষ ও সাধারণের, বিষয়-বস্তুর ও রূপের, যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে প্রতিভাবলে সার্থকভাবে সাধিত হলে অচ্ছেদ্য হবে, কালজয়ী হবে। যদিও শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির উপায়-উপকরণ নির্বাচনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর নিজস্বতার সূত্র খোঁজেন এবং ঐ নিজস্বতার, রচনার স্বকীয়তার, গুরুত্বও স্বীকার করেন, তবু তাঁর মূল ঝোঁকটি কিন্তু কীভাবে শিল্প-সৃষ্টি সার্বজনীন ও শাশ্বত মূল্য অর্জন করতে পারে (পারে কি?) সেই দিকে। একের "ভালো" সৃষ্টি কি সকলের বিচারে "ভালো" ব'লে স্বীকৃত? রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রশ্ন তুলছেন, "অধিকাংশের কাছেই যাহা ভালো তাহাই কি সত্য ভালো, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভালো, তাহাই সত্য ভালো?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যা তিনি বলছেন তাতে সার্বজনীন ও শাশ্বতের দিকে তাঁর শিল্প-চিন্তার ঝোঁকটি স্পষ্ট। এই ঝোঁকের পশ্চাদ্বর্তী চিন্তাধারাটি বোঝা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে লিখছেন[১২]: "প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে তবে তাহা কল্পনার কাচের শার্সির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না।...সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে। জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।" বিশ্বমনের কারখানায় উৎপন্ন সাহিত্যের ভালো-মন্দর বিচার যথার্থই কঠিন। কারণ তা নিয়ে সার্বজনীন মতৈক্যে উপনীত হওয়া দুষ্কর। কোনো বিশেষ যুগ বা সম্প্রদায়ের কাছে কোনো সাহিত্য ভালো ব'লে স্বীকৃত হলেই তাকে ভালো সাহিত্যের প্রাপ্য শিরোপা দিতে রবীন্দ্রনাথ[১৩] রাজী নন। "মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে।...বিশেষ কঠিন এইজন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে। চির-

কালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?···যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে··· তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে।···সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন, স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

নিত্যত্বের লক্ষণগুলি চেনবার যে-ক্ষমতা শিল্পীর ও শিল্প-বিচারকের আছে ব'লে রবীন্দ্রনাথ দাবি করছেন তার প্রমাণ, প্রমাণ না হোক স্বপক্ষের যুক্তিগুলি, আমার কাছে খুব অকাট্য মনে হয় না। নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে ব্যবধানকে কাচের শার্সির মতো একদম স্বচ্ছ করতে না পারলে শিল্পী-সত্তা যুগোত্তীর্ণ নিত্যত্বের ধারক-বাহক হতে পারে না। সমাজ ও যুগ, দেশ ও কালকে এতো স্বচ্ছ কল্পনা করার অর্থ মানুষের মনকে, বিশেষত শিল্পীর মনকে, দেশ-কালজয়ী কল্পনা করা। সত্যিই কি মানুষের মন, শিল্পী-সত্তা, অনৈতিহাসিক, কিংবা ঐতিহাসিক হয়েও নিত্যধর্মী? "জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে" ঠিকই, কিন্তু সে-কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদিতে জগতের চিহ্ন, স্বাদ ও গুণ স্পষ্ট না হলেও সমুপস্থিত এবং দুরপনেয়।[১৪] "মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা" কল্পনাতে দোষ নেই: শুধু স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্বমন মনেরই নির্যাস, সমাজ ও ইতিহাসের ধারায় নিঃশব্দে নিয়ত নিষিক্ত,—স্বতন্ত্র ও কঠিন কিছু নয়।

নিজত্ব ও বিশ্বমানবত্বের সমন্বয় তত্ত্ব দাঁড় করাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক ও রীতি বা স্টাইল বিচারের দিকগুলিকে পরোক্ষে খাটো ক'রে দেখেছেন। সৌন্দর্য সৃষ্টি ও বিচার প্রসঙ্গে তিনি বারবার সংযম ও নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিল্পের বিষয়-বস্তু যখন মনের রসের প্রভাবে, ভাবে-অনুভবে মিলে যায় সেই মিলনকে প্লাবন থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মের বাঁধ দিয়ে আটকাতে হয়, সংযত করতে হয়। রসের প্রবল প্লাবন থেকে শিল্পের বিষয়কে শুধু রক্ষা করেই শিল্পীর কর্তব্য শেষ নয়, বিষয় ও রসের মিলনকে "সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত" করতে হবে।[১৫] আর তার জন্য জানা চাই সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারের নিয়ম। প্রশ্ন হল: ইতিহাস ও সমাজের প্রভাবাধীন মানুষের পক্ষে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারের নিয়মে অধিকারলাভ কি বস্তুত সম্ভব, নাকি আদর্শের কল্পনা মাত্র? বিশ্বমানবত্বের এই অধিকার নিজত্বের অধিকার ভঙ্গ না ক'রে কি লাভ করা যায়? ভঙ্গ ক'রেও কি লাভ করা যায়? যে আদর্শ বস্তুত অলভ্য তা কল্পনায় শিল্প-মূল্য নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু শিল্প-বিচারের মানদণ্ড হিসেবে তা ব্যবহার্য নয়।

শিল্প-বিচারে নিত্যত্বের দাবি যদি নম্র-নত হয় তাহলে নিজত্বের, যুগের, সমাজের ও অন্যান্য আপেক্ষিক দাবির স্বীকৃতি ও ব্যাখ্যা দান সহজ হয়। শুধু তাই নয়, নিত্যত্বের ও বিশ্বমানবত্বের দাবিও যে কতো যুগাপেক্ষিক তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহাকালের দরবারে মহাকাব্যের মতো তথাকথিত শাশ্বত শিল্পকর্মের দাবি যা'ই থাকুক না কেন দেশ-কালের খতিয়ানে তাদের দাবিও বিভিন্নভাবে মঞ্জুর-নাকচ হয়, দাবি মঞ্জুর-নাকচের অঙ্কে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এমনটি যে শিল্প-ইতিহাসে ঘটেই চলেছে তার কারণ নিত্যত্বের সন্ধানী কখনো কোথায়ও নিজত্ব বর্জন করতে পারে না, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না ইতিহাস ও ভূগোলের দাবি।

মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তা'ই সে অল্পাধিক অন্য মানুষকে বোঝাতে পারে। "বোঝানো" এখানে সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধির ব্যাপার মনে করলে ভুল হবে: অনুভব, কল্পনা ও অন্যভাবেও বোঝানো যেতে পারে। একের সৃষ্টি, একের চিন্তা, এমন কি অনুভব, অন্যের মনে সঞ্চার করার নিশ্চয়ই নিয়ম আছে। শিল্পকর্মের সৌন্দর্য ও তাৎপর্য সঞ্চার বা বোঝানো মূলত বুদ্ধির কাজ নয়। কল্পনা, অনুভব ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ বুদ্ধি শিল্পকর্মের যথোচিত বিচারে অপারগ। কল্পনা, অনুভব এইসব বৃত্তিগুলি সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রভাবে প্রভাবিত, সংস্কৃত। মানব সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মতো শিল্প-সৃষ্টির ধারাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। শিল্প-বিচার করতে গিয়ে বিচারক তার সমাজের ও যুগের প্রচলিত ধারাকে মূলত স্বীকার করে নেয়; অংশত সে অবশ্যই প্রচলিত ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে। ঐতিহ্যের আরেক নাম যে পারম্পর্য তা এইজন্যই। সৃষ্টিতে গ্রহণ-বর্জন দুই-ই আছে। যেমন শিল্পীর বেলায় তেমনি শিল্প-বিচারকের বেলায়: দেশ-কালের পটভূমি নিঃশব্দে সর্বদাই কার্যকর। তবে সর্বদা একভাবে নয়। মহাকাব্যের রস এক অর্থে কালজয়ী; কিন্তু সে অর্থটি সীমিত। এক মহাকাব্যই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে গৃহীত, নন্দিত বা নিন্দিত হয়েছে। এক ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রান্তে যুগে-যুগে রামায়ন কত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে! বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের উথান-পতনের প্রভাবে রাম-চরিত্র কতভাবেই না চিত্রিত হয়েছে! ইলিঅড ও ওডিসি নিয়েও পশ্চিমে এমনটিই হয়েছে। মূল কথা হল, মানব মনে এমন কোনো সারধর্ম নেই যা কালজয়ী, যা ইতিহাস ও সমাজের সীমা অতিক্রম ক'রে বিশ্বমানবের জন্য ও নিত্যকালের জন্য কিছু রচনা করতে বা বিচার করতে সমর্থ। বিশ্বমানবের দরবারে তার নিত্যকালের নিবেদন ঐতিহাসিক ও সামাজিক দর্পণে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আর তার কারণ শিল্পীর মতো শিল্প-বিচারকের নিজত্বও দুর্মর।

শিল্পীর নিজত্বের সঙ্গে মূল বিরোধ সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের,—বিশ্বমানবত্বের নয়। নিজত্বের সঙ্গে সমাজের (ব্যাপকার্থে) এই যে বিরোধ তা সৃজনধর্মী ও সেজন্য অভ্যর্থিত। এই বিরোধের মধ্য দিয়ে সমাজ ও শিল্পী দুই-ই পুনর্নব হবার শক্তি-প্রেরণালাভ করে। ভাষা-রীতির পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন আসে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায়। আমি শিল্পীকে সচেতনভাবে সমাজ-সংস্কারকের, বৈপ্লবিকের বা প্রচারকের ভূমিকাগ্রহণ করবার কথা বলছি না। কিন্তু নিজত্ব-চেতন শিল্পীমাত্রই সমাজ-চেতন; পরিপার্শ্বের সঙ্গে, প্রচলিতের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়েই শিল্পী সম্যকভাবে তার নিজত্বের চেতনাকে গভীরতর ও বিস্তৃততর করতে পারে। এই বিরোধ এড়িয়ে সে যদি ক্রমাগত আত্মমুখী হবার সচেতনভাবে চেষ্টা করে সে নিঃসঙ্গ, অবচ্ছিন্ন, এবং এমনকি আত্মচ্যুত হবে। এই চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা ভিতর বাহির দু' দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, ভিতর-বাহির দু' দিকের প্রেরণা আত্মস্থ ক'রে শিল্পী যদি সমাজ, বিপ্লব ইত্যাদি নিয়ে শিল্পরচনা করে তবে তা রাজনৈতিক প্রচারমাত্র হবে এমনটি ভাববার কোনো বিশেষ যুক্তি নেই। সমাজকে শিল্পী যতো গভীরভাবে আত্মস্থ করতে সমর্থ হবে ততই তার চেতনার প্রকাশ যুগধর্মী হয়েও যুগোত্তীর্ণ হবে। বিশ্বমানবত্ব বা সার্বজনীনত্ব যুগধর্ম থেকে অবচ্ছিন্ন হলে তা শিল্প-কীর্তির কোনো গুণ নয়। শিল্পীর মধ্যে কেন, কোনো মানুষের মধ্যেই এমন কোনো অনৈতিহাসিক, সমাজপ্রভাব-বিরহিত সারধর্ম নেই যার ভিত্তিতে সে নিজত্বকে বিশ্বমানবত্বের, সাময়িকত্বকে নিত্যত্বের স্বচ্ছ মুকুরে পরিণত করতে পারে। শিল্পী-সত্তার এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-ঐতিহাসিক দিকটির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে শিল্প-বিচারের অন্য কয়েকটি সাধারণত উপেক্ষিত দিকও হয়ত আমরা যথোচিতভাবে বুঝতে পারব।

মানুষের নিজত্ব দুর্মর। শিল্পীর নিজত্বতো বটেই। প্রতিকৃতি রচনার মধ্য দিয়ে নিজত্ব ও সার্বজনীনত্ব/বিশ্বমানবত্ব এবং সাময়িকত্ব ও নিত্যত্বের দ্বন্দ্ব একটি উল্লেখযোগ্য রূপ পরিগ্রহণ করে। প্রতিকৃতি রচনার বিষয় হতে পারে শিল্পী নিজে, অন্য মানুষ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক-উদ্ভিদ। রচনা হতে পারে চিত্র, ভাস্কর্য, সাহিত্য প্রভৃতি। শিল্প-ইতিহাস থেকে দেখা যায় একই শিল্পী বারবার নিজের প্রতিকৃতি আঁকছেন। ঔপন্যাসিক বারবার আত্মজীবনীমূলক চরিত্র রচনা করছেন। যেন নিজত্বের থেকে নিষ্কৃতি নেই; কিংবা, বলা ভালো, নিজত্বের বৈচিত্র্যের বোধহয় অন্ত নেই।

রেমব্র্যান্ট (১৬০৬-৬৯) বহু আত্ম-প্রতিকৃতি এঁকেছেন। কোনো প্রতিকৃতিতে (Mauritshuis, The Hague, 1629) তিনি তরুণ, আত্ম-প্রত্যয়পূর্ণ, এবং দৃষ্টিতে তাঁর দৃপ্তভাব; কোনো প্রতিকৃতিতে (Kunsthistorisches Museum, Vienna, 1652)

তাঁর মুখমণ্ডল শান্ত, স্বাভাবিক, ভাবলেশহীন; আরেক প্রতিকৃতিতে (Kunsthistoriches Museum, Vienna, 1656) তাঁর মুখভাব সম্ভ্রান্ত, দেহের গঠন শৌর্যময়, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ও তীব্রতার সঙ্গে করুণা মিশ্রিত। তাঁর শেষ আত্ম-প্রতিকৃতি (Mauritshuis, The Hague, 1669) বেদনা-নিগ্রহের সঙ্গে হৃতপ্রায় মর্যাদার দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও করুণাঘন প্রতিচ্ছবি: দৃষ্টিতে ক্লান্তি, অধরোষ্ঠে বেদনা, মুখাবয়বে নিগৃহীত শিল্পীর বিষণ্ণ অন্তর্মুখিতা। শিল্পী রেমব্রান্টকে বোঝবার জন্য প্রয়োজন তাঁর—তদানীন্তন হল্যাণ্ডের—বাণিজ্যিক পরিবেশ, আমষ্টার্ডাম এবং বিশেষত লাইডেনের চিন্তার জগৎ, দেকার্তে ও গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা; শিল্পীর নিজস্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেউলে হয়ে যাওয়া, পারিবারিক শোক-সন্তাপ; এবং সকল কিছুর মধ্যেও একাগ্র শিল্পসাধনার আন্তরিক প্রয়াস। শিল্পীর পরিমণ্ডল বুঝলেই যে শিল্পীর শিল্পকর্ম বোঝবার মতো পর্যাপ্ত উপলব্ধি আমরা পেতে পারি না টেনিসন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত এই সতর্কবাণী যথার্থই স্মর্তব্য। ভাগ্য বিপর্যয়ের, নিজের জীবনের, শেষ দুই দশকে রেমব্রাণ্ট তাঁর শিল্প-জীবনের শ্রেষ্ঠ কতগুলি কীর্তি রেখে গেছেন সুখের থেকে দুঃখ বোধহয় শিল্প-সৃষ্টির সার্থকতর প্রেরণা যোগায়। তবে এটিকে নিঃশর্ত সাধারণ নিয়ম অথবা এর চরম ভাষ্যকে মেনে নিলে ভুল হবে। শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা বোঝবার জন্য শিল্পীর পরিমণ্ডল মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, শিল্প-চেতনা সম্পূর্ণ পরিবেশ-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র নয়। নিজস্ব ও সমাজের দ্বন্দ্বে শিল্পী তাঁর আত্মোপলব্ধিতে অন্তহীন বৈচিত্র্যের সন্ধান পান, সেই উপলব্ধি প্রকাশে বৈচিত্র্য যদি সীমাবদ্ধ হয় তার কারণ শিল্পীর দেহ-মনের শক্তি-সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে রেমব্রাণ্ট নিজেকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করেছেন তার শিল্প-বিচার শিল্পীর নিছক অন্তরঙ্গের কাহিনীর ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। এই বিচার যথার্থ করার জন্য জানা চাই শিল্পীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশের তথ্য। এই তথ্যগুলি নিছকই নিষ্প্রাণ তথ্য, শিল্পের অপ্রাসঙ্গিক বহিরঙ্গমাত্র—এমন কথা মানতে আমি নারাজ। অন্তরঙ্গের বৈচিত্র্যই অর্থহীন স্বগতোক্তি হয়ে যায় যদি বহিরঙ্গের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের পর্ব শিল্প-বিচারকের পটভূমিতে না স্বীকৃতি পায়। এই প্রসঙ্গে রেমব্রান্টের শেষ আত্ম-প্রতিকৃতি সম্বন্ধে শিল্পসমালোচক লুডহ্বিগ মুঞ্জের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

"It is difficult to say why we are so deeply moved by Rembrandt's last self-portrait, painted at a time when all those he loved were gone. ...It is the portrait of a *lonely man* who examines himself, his *inner life*, so to speak, and the marks

which suffering have inflicted upon his features...it is a painting that hauntingly expresses *genuine humanity*...Rembrandt is once more determined to look at himself...tired...sorrowful···(but) does not give up the *struggle*." (উদ্ধৃতিতে গুরুত্বের চিহ্ন আমার দেওয়া)

শিল্পী তাঁর নিজত্বে সুখ-দুঃখ অনুভব করে, শিল্প-সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করে। কিন্তু অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে যা সৃষ্টি করে সেই শিল্প অনেক মানুষের সুখ-দুঃখের, মনের প্রকাশ। নিজের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সে অনেকের কথা প্রকাশ করে। নিজের সুখ-দুঃখে সে যদি অভিভূত হয়ে পড়ত তবে সে স্বগতোক্তির অধিক কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারত না। সে যে পারে তার কারণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার রসে অভিস্নাত হয়ে সে অপরকে রসদান ক'রে একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশের ও সহ-রসাস্বাদনের সার্থকতা-লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প, যত্নবান। এর জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়, আত্ম-অতিক্রমণের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই সংগ্রামকে বলবেন বিশ্বমানবত্বের সন্ধান। আত্ম-অতিক্রমণের প্রয়াস হয়ত কোনো কোনো শিল্পীকে কালক্রমে বিশ্বমানবত্বের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, বা তেমন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়; কিন্তু শিল্পীর চেতনায় সাধারণত নিজত্ব এত প্রবল যে কদাচিৎ কোনো শিল্পী সকলের লক্ষ্যকে প্রথম থেকেই নিজস্ব লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করে।

যদি বলা হয় রেমব্র্যাণ্টের শিল্পকর্মে নিজত্বের পরিচয় প্রধান, তাহলে, কেউ বলতে পারে, সেজানের শিল্পকর্মে নৈর্ব্যক্তিকতার পরিচয় প্রধান। সেজান অনেক আত্ম-প্রকৃতি এঁকেছেন। সর্বদাই যেন তিনি তাঁর নিজত্ব আবৃত রাখার চেষ্টায় নিরত। এই চেষ্টা সত্ত্বেও সেজানের আত্ম-প্রতিকৃতিগুলিতে যে-ব্যক্তি অংশত প্রকাশিত ও মূলত আবৃত তাঁকে বৈশিষ্ট্যহীন ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবা ঠিক হবে না। যদিও তাঁর শিল্প-রীতি ধ্রুপদী, তথাপি নিজেকে নিয়ে তাঁর সংবেদনা, নিরীক্ষার ও আন্তর সংগ্রামের অন্ত নেই। তা না হলে কেন তিনি ত্রিশখানা আত্ম-প্রতিকৃতি আঁকবেন? তাঁর শিল্প-রীতির জ্যামিতিক রূপ-প্রাধান্য ও স্থিরতা থেকে মনে হতে পারে যে তিনি বুঝি শুধু অমূর্ততারই পূজারী। অংশত হয়ত তা'ই। তবে, মনে রাখা ভালো, স্থির রেখা ও রঙের নিপুণ বিন্যাসে সেজান যা প্রকাশ করেছেন তা তাঁর নিজের, পরিবেশের বা প্রকৃতির বিশেষ একটি মুড, ভাব বা অভ্যাস। নিজের নিজত্বকে, অন্য মানুষকে—যথা, নগ্ন নারীকে, প্রাকৃতিক বা উদ্ভিদ বস্তুকে—যথা, গাছ-ফল-মূলকে, যদি স্থির রূপ-বিন্যাসে একবার পূর্ণভাবে ধরা যায়, তাহলে বারবারই ঐ "একই" বিষয় নিয়ে আঁকা কেন? সত্যি কি সংশ্লিষ্ট বিষয় ঘুরে-ফিরে একই থাকছে? নাকি নতুন নতুন সংহত সংবেদনা প্রকাশের আকুতিতে শিল্পী "একই"

বিষয়ের মধ্যে বহু শিল্প-বস্তু আবিষ্কারে সক্ষম হচ্ছেন? আমার মতে সেজানের শিল্প-রীতির জন্য, জ্যামিতিক রূপের প্রতি ঝোঁকের জন্য, তাঁর শিল্প-কর্মকে নৈর্ব্যক্তিক ব'লে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বরং সূক্ষ্ম ও হৃদয়বান বিচারক তাঁর শিল্পকর্মে লক্ষ্য করবেন রূপের নিয়মে-সংযমে রস কীভাবে সুন্দর, শান্ত ও সংহত হয়।

শিল্পীকে বোঝবার জন্য শিল্প-বিচারককে মূলত নির্ভর করতে হবে শিল্পীর শিল্পকর্মের উপর। তার অর্থ এই নয় যে, শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিছক মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মজীবনীমূলক ব'লে চিহ্নিত ক'রে পরিত্যাগ করতে হবে। যা উৎপত্তির দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মজীবনীমূলক প্রকাশের দিক থেকে তো তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, সাধারণলভ্য। বিচারমূলক মন নিয়ে দেখলে শিল্পীর আত্ম-কথা শিল্প-বিচারে প্রাসঙ্গিক, গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় যদি বিচারক শিল্পীর আত্ম-কথাকে নিতান্তই আত্ম-কথা হিসেবে গ্রহণ না ক'রে সামাজিক পরিমণ্ডল ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় গ্রহণ করে। শিল্পীর সৃষ্টি-চেতনা ও প্রেরণা তো শূন্যোদ্ভূত নয়, সমাজায়ত ও ঐতিহ্যলালিত। সত্য বটে কোনো কোনো শিল্পী তাঁদের সৃষ্টি দিয়ে সমাজ ও ঐতিহ্য পরিবর্তন করে দেন: কিন্তু সে পরিবর্তনের পশ্চাৎপটে ঐতিহ্যকে গ্রহণ করাও রয়েছে; থাকতে বাধ্য। গ্রহণ-পরিবর্তনের এই দ্বন্দ্ব সূক্ষ্ম, জটিল ও নিরন্তর।

কনস্টেবল্ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বেসিল টেলর যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

"From his correspondence and other writings we know more about his activities month by month over a large part of his life than any other artist working before 1900, with the exception of Van Gogh and Delacroix, both prolific letter-writers or diarists···he was by nature self-confessing and constantly eager to declare his motives and difficulties···paradroxically this wealth of evidence may cause a sense of unease, stimulated, perhaps, by certain intellectual and artistic prejudices so powerful in the twentieth century. An artist's identity and the identity of his works, one's intellectual censor warns, are two different things, not to be confused and mixed···the abundant evidence we have should be used, albeit with an attempt at critical discrimination, and···it can be continuously enlightening

not only about the appearence and the iconography of the artist's work, but about its physical qualities also."

শিল্পীর জীবন ও শিল্পকর্মের প্রাণের মধ্যে পার্থক্য স্বীকারে আমি কোনো দোষ দেখি না। বরং, কিছু গুণ আছে। এই পার্থক্যকে বড় ক'রে কল্পনা করলে কিছু বিপদ ও অসুবিধা দেখা দেয়। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে যে স্বাধীন, পরিবেশ থেকে, এমনকি নিজস্ব সুখ-দুঃখাদির থেকেও, যত্নে-প্রচেষ্টায় অল্পাধিক স্বাধীন,—এই মূল্যবান সত্যটি ঐ পার্থক্যের মধ্যে উহ্য, স্বীকৃত। কিন্তু স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ কল্পনা করার যে প্রবণতা তা সাধারণ বুদ্ধি, বিভিন্ন শিল্পীর আত্মকথা, শিল্পের সামাজিক পটভূমি ও ইতিহাস কিছুর সঙ্গেই মেলে না। হতে পারে যে শিল্পী আত্মকথা বলতে গিয়েও ভুল করেন, ভুলে যান। কিন্তু সেজন্য শিল্পীর আত্মকথাকে তাঁর শিল্প-বিচার থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দিয়ে শুধু তাঁর শিল্প-কর্মের ভিত্তিতেই যদি শিল্প-বিচারক চূড়ান্ত অভিমত গঠন করেন তবে সে বিচার হবে নিছকই কাঠামোগত, রূপগত, এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মের অনেক তাৎপর্যই অনুল্লিখিত ও অস্পষ্ট থেকে যায়। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয় প্রকাশের জন্য শিল্পী কেন বিশেষ মাধ্যম, বিশেষ রূপ, রীতি ও কাঠামোগত কৌশল নির্বাচন করেন তা'ও শিল্প-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা শক্ত। পক্ষান্তরে, সামাজিক পটভূমি ও ইতিহাস স্মরণ রাখলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীর আত্মকথা (ভুল-বিস্মৃতিসহ) বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শিল্প-বিচারে সমাজ ও ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা অন্য একভাবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অবধি (মোটামুটি-ভাবে বললে) শিক্ষিত মানুষদের মানসিক জগৎ কতোগুলি ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছে। এই ধ্যান-ধারণাগুলির সঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষভাবে জড়িত তাঁরা হলেন ডারউইন, মার্ক্স, ফ্রয়েড এবং আইনস্টাইন। এঁদের যে-কোনো একজনের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো যায়, দেখানো হয়েছেও, যে সেগুলি সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যের সঙ্গে, সমস্যা[১]-সমাধান-সমস্যা[২]র ইতিবৃত্তের সঙ্গে, কতো গভীরভাবে জড়িত। শিল্পীই হোক আর বিজ্ঞানীই হোক তার কর্ম ঐতিহ্যলালিত ব'লে তা মৌলিক হতে পারে না,—সমাজনিয়ন্ত্রণের এই ধারণা ভুল। যে-সমস্যা বা চাহিদা সামাজিক মানুষের মনকে আন্দোলন করে তা সমাধান করতে গিয়ে বা পূরণ করতে গিয়ে নতুন বিভাগ বা শিল্পের সৃষ্টি হয়। সমস্যার যে সমাধান মেলে সে সমাধান আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। চাহিদা যা দিয়ে পূরণ হয় তাই আবার নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে। নিরন্তর এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষের ইতিহাস এগোচ্ছে, কখনো পিছোচ্ছে, আবার এগোচ্ছে। এই দ্বন্দ্বকে মানুষের সৃষ্টির শুধু ব্যাখ্যা মনে করলে ভুল হবে, বিবরণও বটে। উল্লিখিত ব্যক্তিদের

ধ্যানধারণার প্রভাবে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যে, বিশেষত ইয়োরোপ ও আমেরিকায়, প্রচলিত শিল্পসৃষ্টির ধারা, রীতি, বিষয়-বস্তু ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগাল। জিজ্ঞাসার ঢেউ দূর-দূরান্তের মানুষদের, বিশেষত শিক্ষিতদের, মনেও এসে লাগল। শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলির সামরিক শক্তিও বেশী থাকায় সাগর-পারের জনবহুল ও প্রাকৃতিক সম্পদবহুল দেশগুলিতে গিয়ে তারা ছলে-বলে-কৌশলে স্থাপন করল উপনিবেশ। পৃথিবী জুড়ে ধনী-দরিদ্রের, উন্নত-অনুন্নতের দ্বন্দ্ব, নতুন রূপ নিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা ও বিপদ সম্পর্কে বিপরীত ও সমন্বয়মূলক তত্ত্বরচনার বান এল। তত্ত্বনিহিত সত্য ও তথ্যের ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পেল রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা ও তীব্রতা। বাস্তব ঘটনা, বলাবাহুল্য, যেভাবে বলছি তার তুলনায় ছিল ঢের বেশি ব্যাপক ও জটিল। বাইরের জগতের দ্বন্দ্ব-জটিলতা মানুষের অন্তর জগতে, মূল্যবোধে, রুচিবোধেও আঘাত হানল। অন্তর-বাহিরের এই দ্বন্দ্ব-বৃত্তের এক বৃত্তাংশ নিয়ে একদল শিল্পী ও বিজ্ঞানী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, অপর বৃত্তাংশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আরেকদল শিল্পী ও বিজ্ঞানী। এই সাধারণ প্রবণতাগুলি শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের বিকাশ-বিবর্তনের আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ক'রে দেখানো যেতে পারে।[১৮]

সাধারণভাবে যাকে বলা হয় সামাজিক পরিবেশ তাকে আরো সীমিত ও নির্দিষ্ট ক'রে সেই সীমিত ও নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে মানুষ কীভাবে দ্বন্দ্ব১-আপোষ-দ্বন্দ্ব২ করছে এবং তা কীভাবে শিল্পে-সাহিত্যে রূপ পাচ্ছে তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস থেকে অনায়াসে স্পষ্টভাবে দেখানো যেতে পারে। শিল্পোৎপাদনের জটিলতা ও শোষণ, যন্ত্র ও বিজ্ঞানসৃষ্ট সুখ-সুবিধা, বিচ্ছিন্নতা ও যন্ত্রণা, দূর-দূরান্তের মানব সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-মিলনের মিশ্র অভিজ্ঞতা, দ্রুত সমাজ-কাঠামো ভেঙে পড়ার উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও আশা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার-জনিত প্রত্যয় ও কল্পনা শিল্পে-সাহিত্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙ্গলা, ইংরাজী, রুশ বা অন্য যে-কোনো দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনা থেকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখানো যেতে পারে। যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিক শিল্পস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী তাঁদের রচনাতেও যে যুগধর্ম উপস্থিত তা দেখানোও কিছু মুশকিল নয়।

টল্‌স্টয়, ডস্টয়েভ্‌স্কি ও গোর্কির রচনা থেকে তাঁদের যুগের রুশ দেশের সমাজ ও মানব-জীবনের সুঃখ-দুঃখ, সমস্যাসমূহ আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয়। এই আবিষ্কার নিশ্চয়ই শিল্প-বিচারকের একমাত্র কাজ নয়, বোধহয় মূল কাজও নয়। অন্য দিক থেকে এ-কথাও স্বীকার্য যে শিল্প-সৃষ্টির এই পশ্চাৎপট আবিষ্কারে কোনো নান্দনিক বিচ্যুতি তো

নেই-ই বরং শিল্পীর রচিত সমাজ ও যুগ কীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভর্জিনিয়া উল্‌ফ, কামু, সার্ত্র, ব্রেশ্‌ট্‌, জেম্‌স্‌ জয়েস প্রমুখদের লেখায় ফুটে উঠেছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সঙ্ঘাতে আধুনিক মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল বিচিত্র সব প্রতিচ্ছবি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর লেখায় বিজ্ঞানের যে-প্রভাব দেখা যায় তা আরো পরিস্ফুট রূপ নেয় আর্থার কোয়েশ্‌লারের লেখায়। ডি. এইচ, লরেন্স প্রমুখদের লেখায় স্থান পেয়েছে সংশ্লিষ্ট সমাজ-নিন্দিত প্রেমের ও কামের বিভিন্ন প্রকাশ। টি. এস. এলিঅট ও এজ্‌রা পাউণ্ডপ্রমুখদের রচনায় দেখা যায় আধুনিক মানুষের বেদনা, নৈরাশ্য ও বিলুপ্ত ধ্রুপদী বিশ্বাস ফিরে পাবার আশা। শিল্পীদের এই নামগুলি, বলাবাহুল্য, উদাহরণ মাত্র। আরো অনেক শিল্পীদের নাম ও রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তা অনাবশ্যক। মূল কথাটি হল: এদের শিল্পকর্মে পাশ্চাত্যের চরিত্র, একটি নির্দিষ্ট যুগের চরিত্র, ফুটে উঠেছে। চরিত্রের সকল দিক স্বাভাবিক কারণে যে-কোনো একজন শিল্পীর রচনায় সমানভাবে স্বীকৃত ও প্রকাশিত হতে পারে না। তবে উল্লিখিত সকলেই একই যুগ-চরিত্রের প্রকাশক। শিল্পস্বাতন্ত্র্যবাদী কোনো শিল্প-বিচারক বলতে পারেন, মানবজীবনের যে-সব দিক উল্লিখিত শিল্পীদের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে তা ভিন্ন যুগের শিল্পীদের রচনা থেকেও দেখানো যেতে পারে: এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তও টানা যেতে পারে যে ঐ যুগের শিল্পীরা শুধু ঐ যুগের চরিত্রই প্রকাশ করেন নি অন্য একাধিক যুগের চরিত্রও প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, রসোত্তীর্ণ শিল্প-সাহিত্য সকল যুগের দর্পণ, বিশেষ এক যুগের দর্পণ নয়। আমার আপত্তি এখানেই সর্বাধিক। আমার বক্তব্য: উৎকৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের নিশ্চয়ই যুগোত্তীর্ণ আবেদন আছে। কিন্তু, যেমন স্রষ্টার দিক থেকে তেমনি রসভোক্তার দিক থেকে, প্রকাশ ও গ্রহণের রূপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট যুগের ও সমাজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত। হয়তো সে-বৈশিষ্ট্য অস্ফুট, এবং খুঁজতে হবে; তবে, খুজলে মিলবে।

শিল্প-বিচারে সমাজ ও ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা আরো বিভিন্নভাবে দেখানো যেতে পারে। একটি বিশেষ যুগের মানুষেরা কীভাবে, কীভাষায় কথা বলবে, তাদের বেশভূষা, আচার-আচরণ কীরকম হবে না-হবে তা দেশ-কাল থেকে অনেকটাই বোঝা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস-গল্প-নাটক ইত্যাদিতে তো বটেই অন্যান্য শিল্প সৃষ্টিতেও উচিত-অনুচিত, মানান-বেমানান, সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তবতার বিচার করতে গিয়ে দেখা যায় দেশ-কালের পশ্চাৎপট অল্পাধিক মানদণ্ডের ভূমিকাগ্রহণ করে। যে-সব শিল্প-সাহিত্য সরাসরি ঐতিহাসিক ব'লে ঘোষিত—সে-সবক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষে সামাজিক পশ্চাৎপটের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা অবশ্য কর্তব্য। সেজন্য যে-সব নাটক ও চিত্র-পরিচালক

ঐতিহাসিক কাহিনী রূপায়ণে হাত দেন তাঁদের দায়িত্ব অনেক কঠিন, সংশ্লিষ্ট দেশ-কালের খুঁটি-নাটি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। এ-কথার অর্থে অবশ্য এই নয় যে, ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিকদের কারবার তাঁরা কল্পনায় নতুন চরিত্র, নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন না। ঐতিহাসিক চরিত্রটি যদি রাজা বা সৈনিকের না হয়ে হয় উদাসী বাউল বা উদাসীন কবির, তাহলে দেশ-কাল অতিক্রমণের অধিকার তার অধিকতর। ইতিহাস-অতিক্রমণ ইতিহাস-বিরোধিতা নয়। অতিক্রমণের রূপের মধ্যেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা-অবাস্তবতা, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের ছাপ থেকে যায়।

দেশ-কালের কাঠামো এক অর্থে নিশ্চয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের ঐক্য-বিধায়ক। কিন্তু, কোনো কোনো শিল্প-বিচারক যথার্থই প্রশ্ন তুলেছেন, এই ঐক্য-বিধায়ক কাঠামো ভেঙে, পরিচিত বস্তুকে অপরিচিত বস্তুর সঙ্গে অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিতভাবে সংযুক্ত ক'রে নতুন ধরণের শিল্প-সাহিত্য কি সৃষ্টি হচ্ছে না? প্রকৃতির নিয়ম-রূপ ভেঙেই কি শিল্প-জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে না? এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইতিপূর্বেই আমি স্বীকার করেছি: প্রকৃতির নিয়ম-রূপের রূপান্তর, অন্তত ভাবের পরিবর্তন, ঘটাতে না পারলে শিল্পকর্ম হয় না। আলোকচিত্রগ্রহণেও প্রকৃতির চেনা রূপটিকে অন্য রূপে উত্থাপন করা হয়। "কম্পোজিশন" রচনা বৈ কি! কিন্তু, প্রশ্ন হলো: এই রূপান্তরণের মধ্যে অনৈতিহাসিকতা কোথায়? দেশ-কালের ঐক্য-বিধায়ক কাঠামো ভাঙা গেল কীভাবে? অন্ধ অনুকৃতি যে সৃষ্টির অন্তরায় তা সুবিদিত। শিল্প-সাহিত্যের দেশ-কাল যে প্রাকৃতিক নয় তা'ও ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টিতে পরিগ্রহণ-পরিবর্জন অন্তর্নিহিত। তা না হলে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা জাতির বিশ-ত্রিশ বছরের ঘটনা-অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিকেরা তিন-চার শ' পৃষ্ঠার পরিসরে ও চলচ্চিত্র পরিচালকেরা দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে তুলে ধরতে পারেন। মূল কথা হল, শিল্প-বিষয়ের দেশ-কালের বিস্তার পরিমাপে প্রাকৃতিক ভূগোল-ইতিহাস প্রায় অচল। মনে রাখা উচিত: মানসিক-ইতিহাসে পরিগ্রহণ-পরিবর্জন আছে। আর তা বোঝানোর জন্য ভূগোলের মানচিত্রে থাকে স্কেল, ইতিহাসে থাকে যুগ, বছর, মাস, তারিখের (মানুষের সৃষ্টি করা) সঙ্কেত-চিহ্ন। বিষয়-বস্তু অঙ্কণে, চরিত্রচিত্রণে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্কেল, সন-তারিখের থেকে ঢের বেশি প্রাণবন্ত, ভাবসংবাহী সঙ্কেত-চিহ্ন ব্যবহার করেন।

শিল্প-সাহিত্যে সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা এবং অমূর্ত সাঙ্কেতিকতা একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অনেক শিল্প-বিচারক মনে করেন, এই দু'টি ঝোঁকের মধ্যে বিরোধ আছে। তাঁদের প্রত্যাশা, সমাজ-চেতন শিল্পীর সৃষ্টিতে পরিপার্শ্বের, অভিজ্ঞতার জগতের, ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য পরিচিত রূপ ও বস্তুগুলি দেখা যাবে। সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের (Socialist Realism-এর) প্রবক্তারা শুধু বস্তুবাদেরই নয় একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের (সমাজতন্ত্রের) প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টায় শিল্পীর সক্রিয় সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও তদনুরূপ শিল্প-বিচার সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমত আধুনিক নন্দনতত্ত্বে বহু জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে। বহু সমাজতান্ত্রিক শিল্পী আছেন যাঁরা মনে করেন শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির স্বাধীনতাই হলো মূল কথা : কোনো মতাদর্শ প্রচার-প্রসার, তাঁদের মতে, শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশে বলশেভিক বিপ্লব হবার পরে এই বিতর্ক শিল্প-সাহিত্যের জগতে প্রবল রূপধারণ করে। এ-প্রসঙ্গে ট্রট্স্কির বক্তব্য (১৯২৩) প্রণিধানযোগ্য :

"Our Marxist conception of the objective social dependence and social utility of art......does not at all mean a desire to dominate art by means of decrees and orders......of course the new art cannot but place the struggle of the proletariat in the centre of its attention......the Revolution creates conditions for a new culture [realism]......A definite and important feeling for the world. It consists in a feeling for life as it is, in an artistic acceptance of reality and not in a shrinking from it, in an active interest in the concrete stability and mobility of life. It is a striving either to picture life as it is or to idealize it, either to justify or to condemn it, either to photograph it or generalize and symbolize it......In this large philosophic sense......the new art will be realistic. The Revolution cannot live together with mysticism. Nor......with romanticism......"[১৯]

সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের মূল তত্ত্বে গোঁড়ামি নেই। অন্তত সেইভাবে এই তত্ত্ব অনায়াসে দেখা যেতে পারে। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে নৈতিক বা আদর্শগত কোনো প্রেরণা থাকলে তাতে দোষের কিছু নেই : নান্দনিক সৃষ্টির সঙ্গে এর কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বস্তুবাদ বা জড়বাদে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে শিল্পী প্রকৃতি ও মানব-জীবনের শুধুমাত্র অনুকরণ করেন। বরং, বাস্তব মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের আধুনিক চিত্র আঁকতে গেলে শিল্পীকে ইঙ্গিত-সঙ্কেত ব্যবহার করতে হয়। নইলে এই জীবনের তীব্রতা, ভঙ্গুরতা, খণ্ডতা ইত্যাদি পরিস্ফুট করা কঠিন।

ক্যাণ্ডিন্স্কি, শাগাল, আঁদ্রে ব্রেতঁ, দিয়েগো রিভেরা, পিকাসো প্রমুখ শিল্পীরা প্রগতিশীল তো বটেই, অনেকের বিচারে, বস্তুবাদীও। কিন্তু এঁদের সৃষ্টিতে বাস্তব জগৎ, বিভিন্ন, বিচিত্র ইঙ্গিতে-সঙ্কেতে, চিত্রকল্পের বিস্ময়কর ব্যবহারে, পরিচিত বস্তুর বিকৃতিতে, রূপান্তরণে অনেক ক্ষেত্রেই নাকি "অবাস্তব" হয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের সরকারী প্রবক্তাদের ভাষায় এঁরা অনেকেই ক্ষয়িষ্ণু, মানবতা-বিরোধী, বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিভূ। মজার ব্যাপার হলো, উগ্র কম্যুনিষ্ট-বিরোধী কিছু রাজনীতিক ও শিল্প-বিচারকেরাও এঁদের শিল্পকর্মকে "অমূর্ত", "আকারপ্রধান", "অবাস্তব", "দুর্বোধ্য" ব'লে সমালোচনা করেছেন। "গুয়ের্নিকা" প্রসঙ্গে জেরোম সেক্লারকে পিকাসো বলেছিলেন (১৯৪৫)[২০] "হ্যাঁ, ঐ কাজে আমি সচেতনভাবে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছি, প্রচারের ভাব রয়েছে······আমি একজন কম্যুনিষ্ট, আমার চিত্রশিল্প কম্যুনিষ্ট-ধর্মী······কিন্তু আমি যদি মুচি, রাজতন্ত্রী, বা কম্যুনিষ্ট বা অন্য কিছুও হতাম আমি আমার রাজনীতি ঘোষণা করবার জন্য আমার জুতোয় বিশেষ একভাবে হাতুড়ির ঘা মারতাম না।" শিল্পসৃষ্টির জন্য অকম্যুনিষ্ট শিল্পী যেভাবে "হাতুড়িতে ঘা মারেন" কম্যুনিষ্ট শিল্পীও সেইভাবেই মারেন।—পিকাসোর এই মত অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। স্তালিন-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের মুখ্য প্রবক্তা ভ্লাদিমির কেমেনভ এক-সময়ে (১৯৪৭) পিকাসো, সেজান প্রমুখ শিল্পীদের তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেছেন: "এঁদের নির্বাচিত বিষয়বস্তু হলো প্রতিক্রিয়াপন্থী, জনপ্রিয় ধ্যান-ধারণার বিরোধী, বাস্তবতা-বিরোধী, প্রাণহীন রূপসর্বস্ব, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। শিল্পের স্বাধীনতার নাম ক'রে শিল্পীরা আত্মকেন্দ্রিকতা ও অন্তর্মুখী নৈরাজ্যকে মারাত্মক প্রশ্রয় দিচ্ছেন।" "গুয়ের্নিকা" প্রসঙ্গে পিকাসোর উদ্দেশে কেমেনভের সমালোচনা আরো তীব্র[২১]: "ইতালীয় ও জার্মানী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে নিরত স্পেনীয় জনগণের" অত্যাচারকে পিকাসো যখন প্রকাশ করতে চাইলেন, তিনি আঁকলেন "গুয়ের্ণিকা"। কিন্তু, এখানেও, পরাক্রমশালী স্পেনীয় প্রজাতান্ত্রিক মানুষদের না এঁকে অন্য ছবির মতোই আঁকলেন কতগুলি সেই বিশ্রী, রুগ্ন ও বিকৃত রূপ। না, বাস্তবের দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য কিংবা প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা জাগ্রত করার জন্য পিকাসো অসুস্থ, অসহ্য এই শিল্পকর্ম রচনা করেন নি। তাঁর শিল্পকর্ম ধনতন্ত্রের নান্দনিক মামুলি স্বীকৃতিমাত্র। ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর বিদীর্ণ আত্মা থেকে উত্থিত রাত্রের দুঃস্বপ্নগুলির শৈল্পিক মূল্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ·········।" আগেই বলেছি, প্রগতিশীল, আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকে শুধু যে সরকারী কম্যুনিষ্ট ভাষ্যকাররাই সমালোচনা করেছেন তা নয় বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতাবলম্বীরাও সমালোচনা করেছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার সদস্য জর্জ ডণ্ডেরো (১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৯) বলেছিলেন[২২] :

"What are these isms ?···all are instruments and weapons of destruction......

Cubism aims to destroy by designed disorder.

Futurism aims to destroy by the machine myth...

Dadaism aims to destroy by ridicule.

Expressionism aims to destroy by aping the primitive and insane···

Abstractionism aims to destroy by the creation of brainstorms

Surrealism aims to destroy by the denial of reason...

The artists of the "isms" change their designations as often and as readily as the Communist front organizations. Picasso, who is also a dadaist, an abstractionist, or a surrealist, as unstable fancy dictates, is the hero of all the crackpots in so-called modern art."

কোনো শিল্পী যদি তাঁর শিল্পে ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সমালোচকের সমালোচনা শুনতে হবে। কোনো শিল্পী যদি তাঁর শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁকে ধনতান্ত্রিক শিল্প-সমালোচকের সমালোচনা শুনতে হবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় লালিত-পালিত শিল্পীর পক্ষে বৈপ্লবিক কিংবা চিন্তা-কর্মে বিশেষ সচেষ্ট না হলে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-বিচারকের পক্ষে সন্তোষজনক শিল্পসৃষ্টি প্রায় অসম্ভব। এই কথা, বিপরীত দিক থেকে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় লালিত-পালিত শিল্পীর পক্ষেও প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক কালে সমাজতন্ত্রের কিছু-কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি গ্রহণ করেছে : আবার ধনতন্ত্রের কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি স্বীকার করে নিচ্ছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার দুই সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই অল্পাধিক স্বীকৃত। "শোধনবাদী" সমাজতন্ত্র ও "প্রগতিশীল" ধনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ঐতিহাসিক কারণে হ্রাস পাচ্ছে। সহাবস্থান নীতির প্রভাব সশব্দে তো বটেই নিঃশব্দেও বর্ধমান। শিল্পী যদি ইতিহাস-চেতন হন এবং সংবেদনশীল তাঁর মনে ভবিষ্যতের পদধ্বনি শুনতে পান তবে তাঁকে "রোমান্টিক", "ভাবুক" ইত্যাদি ব'লে সমালোচনা করা উচিত হবে কি ? কিংবা, তিনি যদি অতীতকে নতুনভাবে ভেবে পুনর্জীবিত করে তোলেন তাঁর রচনায়, তবে

তাঁকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বা "রক্ষণশীল" বলা কি উচিত হবে? মূল প্রশ্ন হলো: শিল্প-সাহিত্যের বিচারে ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব কতোটা স্বীকার করা উচিত হবে?

শিল্প-বিচারের মাপকাঠি, শিল্পী, বিচারক এবং যা বিচার্য, শিল্প, সবই ঐতিহাসিক কারণে অল্পাধিক পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্যেই বিচার নিষ্পন্ন করতে হবে। পরিবর্তন তত্ত্বটিই যাঁরা বিশ্বাস করেন না, যাঁরা মনে করেন শিল্প-বিচারের মাপকাঠি, অর্থাৎ মূল নীতিগুলি, দেশ-কালোত্তীর্ণ, শিল্পী-সত্তাও মুক্ত, শিল্প-বিচারকও শিল্পীর মতো সমাজ-ইতিহাসের বহির্বন্ধন থেকে মুক্ত, সামাজিক-রসিক হয়েও আন্তর চক্ষে ত্রিকালদর্শী, এবং শিল্প সত্য-শিবের প্রতিধ্বনি, শাশ্বত, তাঁদের সিদ্ধান্ত বিপরীত হতে বাধ্য। এই দুটি বিপরীত সিদ্ধান্তকে কোনো কোনো শিল্প-দার্শনিকেরা মেলাবার চেষ্টা করেছেন। সমন্বয় তত্ত্বগুলির মধ্যে আবার দুটি ভিন্ন ঝোঁক লক্ষনীয়: শাশ্বতবাদ অক্ষুণ্ণ রেখে ইতিহাস-বাদকে সীমিত স্বীকৃতি দেওয়া; কিংবা ইতিহাসবাদকে মূল সত্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে তথাকথিত শাশ্বত শিল্পী-সত্তা, বিচারনীতি ইত্যাদির স্থায়িত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া।

মানুষমাত্রই মর্ত্য, জন্ম-মৃত্যুর নিয়মাধীন ঐতিহাসিক জীব। তার সত্তা ঐতিহাসিক ব'লেই তা ক্ষণভঙ্গুর, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন নয়,—স্থায়ী পদার্থগুলোকে জানতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। ভঙ্গুর পদার্থ ও স্থায়ীপদার্থগুলির মধ্যে মানুষ তার কর্ম দিয়ে, লক্ষ্য-চেতন ও মূল্য-দীক্ষিত কর্ম দিয়ে, অল্পাধিক স্থায়ী সমন্বয়-সাম্য সাধন করার চেষ্টা করে। এই কর্ম-চেষ্টা দ্বন্দ্বমূলক। এই কর্ম-চেষ্টায় সাধিত সমন্বয়-সাম্যও দ্বন্দ্বমূলক। জৈবিক ও সামাজিক স্তরে সমন্বয়-সাম্যের দ্বন্দ্ব অধিকতর তরঙ্গবহুল। দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের আত্মো-পলব্ধি ও পরোপলব্ধি গভীরতর, বিস্তৃততর হতে থাকে। আত্মকে কেন্দ্র ক'রেই পরকে উপলব্ধি করতে হয়: পর জড়ও হতে পারে, প্রাণীও হতে পারে। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে পরোপলব্ধি হয় না, আত্মোপলব্ধি তো নয়ই। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা শাশ্বতবাদী তাঁরা বিশ্বাস করেন, চেতনার এমন স্তরে মানুষ উত্তীর্ণ হতে পারে যে সে আত্মাকে নিরপেক্ষ বিষয়রূপে, পর যেমন আত্মকে জানতে পারে তেমনভাবেই, জানতে পারে। দার্শনিকের মতোই কবি নাকি ত্রিকালজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী: পার্থক্য শুধু এই, দার্শনিকের উপলব্ধি বিচারের পথ দিয়ে, শিল্পীর উপলব্ধি রসের পথ দিয়ে। নৈর্ব্যক্তিক রসোপলব্ধিকে অক্ষয় রূপে ধ'রে সাজিয়ে রাখবার এই যে কল্পনা তা বাস্তব অভিজ্ঞতা-সমর্থিত নয়। শিল্পীর অভিজ্ঞতা জীবনের আহ্নিক, বার্ষিক ও বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে সঙ্ঘাতে, সংস্পর্শে কিছুটা ভাঙে, কিছুটা দৃঢ়তর, সমৃদ্ধতর হয়। যে-বৃত্তে সে বাঁচে সেই বৃত্তই সে অল্পাধিক ভাঙে এবং গড়ে। যে-নিয়মে সে চলে সেই-নিয়মকে ক্রমে ক্রমে জানে,

জানার আলোয় দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সমীকরণ-স্থত্র খোঁজে সামাজিক কর্মে। মানবজীবনের নিয়ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষের কর্ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিতও হয়। নিজের জন্য মানুষ নিজের থেকে বড় বৃত্ত রচনা করে,—পরিবার, সমাজ ও পৃথিবী। যে-বৃত্ত সে তৈরী করে সেই-বৃত্তের ধারণা ও চেতনা সে জ্ঞান ও কর্মের ফলে পূর্ব থেকেই অল্পাধিক পেয়ে বসে আছে। কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের, বিশেষত কর্মের, সংস্কারই এমন যে ধারণা ও চেতনাকে স্থির, স্থায়ী থাকতে দেয় না। জ্ঞানের মধ্যেও কর্ম-অনুস্যূত। জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নয়, একপ্রকার কর্ম। জ্ঞান-কর্ম একদিকে চেতনার পশ্চাৎপট, অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত, প্রয়োজনীয় লক্ষ্য। মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের পারিবারিক, সামাজিক নানা দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই রচিত হয় চেতনার পশ্চাৎপট এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এই পশ্চাৎপট এবং লক্ষ্য উভয়ই ঐতিহাসিক, অল্পাধিক স্থির হলেও স্থায়ী নয়; চিরায়ু তো নয়ই। শিল্প-সাহিত্যের বিচারে এই মূল কথাটি ভুললে শুধু বিচারে ভুল হবে না, রসের উপলব্ধিও ব্যাহত, বিকৃত হবে। প্রকৃতিকেও রসে ভোগ করতে গিয়ে মানুষ তার মধ্যে নিজের ইতিবৃত্ত, অন্যতম জীবনবৃত্ত, ভুলতে পারে না। নিজের, অপরের দেহ, সংসর্গ, অঙ্গ-ইঙ্গিত, ভাষা প্রভৃতি তার চিন্তা-কর্মকে তো বটেই চেতনাকেও নিয়ত সমাজায়ত করে রাখে। প্রকৃতি ও সমাজের স্পর্শ থেকে মুক্ত শিল্পীর চেতনা, শিল্প-স্বাতন্ত্র্যবাদী বা কলাকৈবল্যবাদীর স্বর্গ, সমাজ-সংবদ্ধ চেতনার বাস্তব অবয়ব থেকে তাত্ত্বিক বুদ্ধির খণ্ড, ক্ষুদ্র কল্পনামাত্র। এই কল্পনার বাস্তব ভিত্তি হল ঐতিহাসিক সৃষ্টি-চেতনাকে অনৈতিহাসিক, চিরজীবী করার আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা-ভিত্তিক চিন্তা, কর্ম।

শিল্প-বিচারের যে-সব নীতি একযুগে অবশ্য স্বীকার্য ছিল এখন আর তা নেই। প্রসঙ্গত দুর্বোধ্যতার কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। ভরত, দণ্ডী প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞরা কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে প্রসাদ ও অর্থব্যক্তি গুণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলা হয়েছে; কাব্যে শব্দপুঞ্জ দিয়ে তাদের অনুক্ত অর্থ সহজে বোঝাতে পারা কাব্যের একটি কাঙ্ক্ষিত গুণ, প্রসাদগুণ। ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ থেকে অর্থ বুঝতে যদি সহৃদয় পাঠকেরও কষ্ট হয়, তাহলে তা কাব্যের দোষ। প্রসাদগুণের থেকেও শব্দ ও অর্থের মধ্যে বেশী ঘনিষ্ঠতার দাবি রয়েছে অর্থব্যক্তিগুণে। ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জে অনুক্ত অর্থের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা (পরোক্ষে হলেও) প্রসাদগুণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত। অর্থব্যক্তিগুণের দাবি অধিক। ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ ব্যবহৃত হলে তাতে অব্যক্ত কিছুই থাকবে না। যদি থাকে তবে তা দোষ। বহু কথিত এই দুটি গুণ আধুনিক কাব্যে আছে কি? থাকলে আধুনিক ইংরেজী ও বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ কি ভিত্তিহীন হত না? পাউণ্ড ও এলিঅটের, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের বিরুদ্ধে

দুর্বোধ্যতার সমালোচনা উঠেছে। সমালোচকদের অনেকেই তাঁদের কাব্য-প্রতিভা স্বীকার করেছেন। যাঁরা করেন নি তাঁদের কথা এখন থাক। খুব অল্প সমালোচকই চেষ্টা করেছেন তাঁদের দুর্বোধ্যতার কারণ বুঝতে, আরো অল্পসংখ্যক সমালোচক পেরেছেন তাঁদের দুর্বোধ্যতার যুক্তি আবিষ্কার করতে। অজস্র জটিলতায়, যন্ত্রণায়, সজ্ঘাতে, অর্থহীন হত্যায় শতাব্দীর প্রথমার্ধের সংবেদনশীল, সামাজিক শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যেভাবে আন্দোলিত, বিদীর্ণ, প্রায় উৎক্ষিপ্ত, সার্থক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার প্রকাশ-সংহতি দেখানো তাঁদের পক্ষে সত্যিই অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিল্পীরা যুগ-যন্ত্রণার সঙ্গে বিচিত্র সমীকরণে এসেছেন, যুদ্ধ[১]—যুদ্ধ[২] লড়াই করে চলেছেন। কেউ মৃত্যু বরণ করেছেন, কেউ উন্মাদ, কেউ-বা সাধু হয়ে গেছেন। পরিমণ্ডলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে শিল্পীদের প্রতিক্রিয়া এত বিচিত্র, এত তীব্র মানুষের ইতিহাসে এর আগে কখনো হয়নি। ভবিষ্যতে হবার শঙ্কা প্রভূত।

শুধু শিল্প সৃষ্টিতে নয় শিল্প সমালোচনাতেও মানুষের নিজত্ব দুর্মর। সৃষ্টির মধ্যে যেমন শিল্পী সমালোচনার মধ্যে তেমনি সমালোচক নিজত্বকে প্রকাশ ক'রে অমর করতে চায়, মর্ত্যলোকের সীমা যথাসম্ভব ভাঙতে চায়। স্রষ্টা ও সমালোচক নিজেকে অমর করতে গিয়ে, প্রকাশ করতে গিয়ে, সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে দু'ভাবে তার অন্তহীন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে চায়। এক, সমাজ ও ইতিহাস দ্বারা স্বীকৃত নিয়ম মূলত মেনে নিয়ে সে সৃষ্টি করে, সমালোচনা করে। দুই, শিল্পী ও সমালোচক তার সৃষ্টিকে বিচার করার, অমর রাখার দায়িত্ব সমাজের দরবারেই রেখে যায়। সমালোচনা নিছক ব্যক্তি সমালোচকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ব্যক্তিগত কাহিনী নয়। মানসিক প্রতিক্রিয়ার সমাজবাধ্য নিয়ম, যুক্তি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধ্যান-ধারণাগুলি প্রকাশ না হলে ব্যক্তি মানুষের প্রতিক্রিয়া সমালোচনার গৌরব, যুগাপেক্ষিক নৈর্ব্যক্তিকতা বা বিষয়গত চরিত্র অর্জন করে না। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর দরবারে শুধু এই অর্থেই শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক পৌঁছতে পারে যে, যা তার নিজের ছিল সমাজের মুখ চেয়ে ইতিহাসের আলোয় তা সে সকলের করতে চেয়েছে। "যা তার নিজের ছিল" তা কখনোই তার একান্ত নিজের ছিল না। নিজত্বও এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে সমাজায়ত। আর যা সমাজায়ত ব'লে ব্যক্তি শিল্পীর, ব্যক্তি সমালোচকের জীবন অতিক্রম করে শাশ্বতবাদী তার মধ্যে বিশ্বমানবত্বের ছায়া দেখেন। এই সীমিত অর্থে বিশ্বমানবত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার্য। সমাজ ও ইতিহাসের প্রাঙ্গণে নিজত্ব ও বিশ্বমানবত্বের দ্বন্দ্ব-দীর্ণ ও দ্বন্দ্ব-দীপ্ত গ্রহণ-বর্জনের খেলা চিরকালের। তবে এই খেলার নিয়মও (খেলার মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল না হলেও) ঐতিহাসিক।

প্রথম অধ্যায়

শিল্পী-সত্তা, শিল্পবস্তু ও সমাজ

১ Millard Meiss, *Painting in Florence and Siena after the Black Death*, প্রিন্সটন, ১৯৫১।

২ Arnold Hauser, *Social History of Art*, লণ্ডন, ১৯৫১।

৩ Lucien Goldmann, *The Hidden God*, লণ্ডন, ১৯৬৪ এবং "The Sociology of Literature: Status and Problems of Method" (Milton C. Albrecht, James S. Barnett ও Mason Griff সম্পাদিত *The Sociology of Art and Literature*, লণ্ডন, ১৯৭০, অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৫৮২-৬০৯)

৪ E. H. Gombrich, *Meditations on a Hobby Horse and other Essays on Theory of Art*, লণ্ডন, ১৯৭১।

৫ L. Baxandall, *Marxism and Aesthetics*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৬৮।
Jack J. Spector, *The Aesthetics of Freud : A Study in Psychoanalysis and Art*, ম্যাকগ্র-হিল বুক কোম্পানী, ১৯৭২।

৬ C. G. Jung, *The Spirit in Man, Art and Literature: Collected Works, Vol. 15*, প্রিন্সটন, ১৯৭২।

৭ Kreitler ও Kreitler, *Psychology of Arts*, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প কি অনুকৃতি, না বিকৃতি ?

১ R. L. Gregory ও E. H. Gombrich, *Illusion in Nature and Art*, লণ্ডন, ১৯৭৩, পৃঃ ১৯৪। এ প্রসঙ্গে E. H. Gombrich-রচিত *Norm and Form* গ্রন্থের একটি অধ্যায় "Reynold's Theory and Practice of Imitation" এবং Melvin Rader সম্পাদিত *A Modern Book of Esthetics* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Jacques Maritain লিখিত প্রবন্ধ "Beauty and Imitation" উল্লেখযোগ্য।

২ Harold Osborne সম্পাদিত *Aesthetic in the Modern World* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Ronald Hepburn-এর "Aesthetic Appreciation of Nature", পৃঃ ৪৯।

৩ Susanne K. Langer সম্পাদিত *Reflections on Art* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Georg Mehlis-এর "The Aesthetic Problem of Distance" দ্রষ্টব্য।

৪ Melvin Rader সম্পাদিত *A Modern Book of Esthetics* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Edward Bullough-এর "Psychical Distance" দ্রষ্টব্য।

৫ উল্লিখিত (৩) গ্রন্থের Etienne Souriau-এর "Time in Plastic Arts" দ্রষ্টব্য।

৬ Paul Waldo Schwartz-এর গ্রন্থ *The Cubists*, লণ্ডন, ১৯৭১।

৭ Francois Gilot ও Carlton Lake, *Life with Picasso*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৬৪।

৮ এ প্রসঙ্গে কান্টের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। দ্র. Donald W. Crawford, *Kant's Aesthetic Theory*, পৃঃ ৭৫-৯১।

৯ ভারতবর্ষীয় নন্দতত্ত্বের দিক থেকে ঘনসন্নদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায় M. Hiriyanna-র *Art Experience* (মহীশূর, ১৯৫৪) গ্রন্থে।

তৃতীয় অধ্যায়

রস

১ *Gaekwad's Oriental Series (GOS), I*, বরোদা, পৃঃ ২৬৯-৭৪। Raniero Gnoli, *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta*, Chowkhamba Publication, বারাণসী, ১৯৬৮। A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৭৩। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য Ramaranjan Mukherjee, *Literary Criticism in Ancient India*, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ২৭১।

২ উল্লিখিত (১) গ্রন্থের পৃঃ ৩৩৭। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য J. L. Masson ও M. V. Patwardhan, *Santarsaa & Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics*, Bhandarkar Oriental Research Institute, পুণা, ১৯৬৯।

৩ V. Raghavan, *The Number of Rasas*, মাদ্রাজ, ১৯৬৭, পৃঃ ২৩-২৪।

৪ Jean-Paul Sartre, *The Psychology of Imagination*, লণ্ডন, ১৯৭২, পৃঃ ২০৭-২৬।

চতুর্থ অধ্যায়

রূপ

১ G. E. Moore, *Principia Ethica*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯০৩; Roger Fry, *Transformations*, লণ্ডন, ১৯২০, ও *Last Lectures*, ক্যাম্ব্রিজ, ১৯৩৯ ; এবং Clive Bell, *Art*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯১৪, ও *Since Cezanne*, লণ্ডন, ১৯২২।

২ J. N. Findlay, *Plato : The Written aud Unwritten Doctrines*, লণ্ডন, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৬-৯, ১৪৮-৫০, ২৯৪-৯৫।

৩ Clive Bell, *Art*, পৃঃ ১৭-৩৪

৪ Dewitt Henry Parker, *The Analysis of Art*, ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৬।

৫ A. C. Bradley, *Oxford Lectures on Poetry*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯০৯।

৬ Paul Stern-এর প্রবন্ধ "On the Problem of Artistic Form", Susanne Langer-সম্পাদিত গ্রন্থে, *Reflections on Art*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

৭ Melvin Rader সম্পাদিত *A Modern Book of Esthetics*-এ Louis Arnaul Reid-এর প্রবন্ধ "Values, Feeling and Embodiment", ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭৩।

৮ Herbert Read সম্পাদিত *Surrealism*, লণ্ডন, ১৯৭১।

৯ R. L. Gregory, *Eye and Brain : the psychology of seeing*, লণ্ডন, ১৯৭৩।

১০ Rudolf Arnheim, *Art and Visual Perception*, লণ্ডন, ১৯৭২, পৃঃ ৮২-১৫৪।

১১ E. H. Gombrich, *The Story of Art*, লণ্ডন, ১৯৭৪।

১২ J. E. Muller ও Frank Elgar, *A Century of Modern Painting*, লণ্ডন, ১৯৭২।

১৩ Roger Scruton, *Art of Imagination*, লণ্ডন, ১৯৭৪, অধ্যায় ১৫।

১৪ Rudolf Arnheim, *Art and Visual Perception*, Figure 113, পৃঃ ১৪০।

১৫ Anthony Richardson ও Nikos Stangos, *Concepts of Modern Art*, লণ্ডন, ১৯৭৪।

১৬ Immanuel Kant, *Critique of Judgment*, অনুবাদক, J. H. Bernhard, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭২, পরিচ্ছেদ ২৩-২৯।

১৭ Donald W. Crawford, *Kant's Aesthetic Theory*, ইউনিভার্সিটি অভ্ উইসকনসিন, ১৯৭৪।

১৮ H. W. Janson, *A History of Art*, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃঃ ২৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকাশ, অপ্রকাশ ও শিল্পকর্ম

১ Clive Bell, *Impressionists*, লণ্ডন, ১৯৬৯, পৃঃ ৮।
২ William Fleming, *Arts and Ideas*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪১।
৩ Benedetto Croce, *Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic*, রূপা, কলিকাতা, তারিখবিহীন, পৃঃ ১৪২-৪৩।
৪ ঐ, পৃঃ ১১২।
৫ John Hospers সম্পাদিত *Artistic Expression*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭১।
৬ R. G. Collingwood, *Principles of Art*, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃঃ ২৪১।
৭ ঐ, পৃঃ ১১০।
৮ ঐ, পৃঃ ২৪৭।
৯ ঐ, পৃঃ ১১১।
১০ ঐ, পৃঃ ২২২।
১১ ঐ, পৃঃ ২২৫।
১২ ঐ, পৃঃ ২৩৮।
১৩ Kant, *Critique of Judgment*, পরিচ্ছেদ ৫৭।
১৪ Croce, *Aesthetic*, পৃঃ ২৮০-৮২।
১৫ Kant, *Critique of Judgment*, পরিচ্ছেদ ৪৮।
১৬ Croce, *Aesthetic*, পৃঃ ৩০২।
১৭ Leo Tolstoy, *What is Art?* অনুবাদক, Aylmer Maude, লণ্ডন, ১৮৯৬; John Dewey, *Art as Experience*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৩৪; Susanne Langer, *Feeling and Form*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৫৩; C. J. Ducasse, *The Philosophy of Art*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৬৩; Eugene Veron, *Aesthetics*, অনুবাদক, W. H. Armstrong, ১৮৭৯; George Santayana, *The Sense of Beauty*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৫৫; T. S. Eliot, *Selected Essays, 1917-1932*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৫০; John Hospers, *Meaning and Truth in the Arts*, ইউনিভার্সিটি অভ্ নর্থ ক্যারোলিনা, ১৯৪৬।
১৮ Vincent Tomas সম্পাদিত *Creativity in the Arts*, (নিউ জার্সি, ১৯৬৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Etienne Gilson-এর "Creation—Artistic, Natural, and Divine, পৃঃ ৫৬।
১৯ Harold Osborne সম্পাদিত *Aesthetic in the Modern World* (লণ্ডন,

১৯৬৮) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Ronald W. Hepburn-এর প্রবন্ধ "Aesthetic Appreciation of Nature", পৃঃ ৪৯, দ্রষ্টব্য।

২০ Bernard Bosanquet, *Three Lectures on Aesthetiss*, লণ্ডন, ১৯১৫।

২১ Vincent Tomas সম্পাদিত উল্লিখিত (১৮) গ্রন্থের "The Making of a Poem" প্রবন্ধ, পৃঃ ৪০, দ্রষ্টব্য।

২২ Rudolf Arnheim, *The Genesis of a Painting : Picasso's Guernica* ইউনিভার্সিটি অভ্ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬২।

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৭৬।

২৪ ঐ, পৃঃ ৩৯৬।

২৫ ঐ, পৃঃ ৩৯৯।

২৬ Melvin Rader সম্পাদিত *A Modern Book of Esthetics*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭৩, পৃঃ ৫৮-৯।

২৭ ঐ, পৃঃ ৬১-২।

২৮ Nelson Goodman, *Language of Arts*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৬৮, পৃঃ ৫৩-৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুন্দর ও অসুন্দর

১ সৌন্দর্যের লক্ষণ দেওয়ার অসামর্থ্য যে দোষের তা নয়, কারণ সৌন্দর্যের ধারণা আমাদের সহজাত,—আধ্যাত্মিক এ-জাতীয় মত পূর্বে ও পশ্চিমে দু' মহাদেশের দার্শনিক চিন্তাতেই পরিদৃষ্ট। প্লাতো, প্লতিনাসপ্রমুখদের লেখায় সৌন্দর্যের রূপ-প্রধান অনির্বচনীয় তত্ত্বটি স্পষ্ট। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : Jacques Maritine, *Art and Scholasticism*,অনুবাদক J. F. Scanlan, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৩০ ; C. E. M. Joad, *Matter, Life aud Value*, লণ্ডন, ১৯২৯ ; T. E. Jesop, "The Definition of Beauty", *Proceedings of Aristotelian Society*, ১৯৩৩ ; এবং Ralph W. Church, *An Essay on Critical Appreciation*, লণ্ডন, ১৯৩৮।

২ Jean-Paul Sartre, *What is Literature*, অনুবাদক, Bernard Frechtman, লণ্ডন, ১৯৫৭ ; Maurice Merleau-Ponty, সম্পাদক James M. Edie, *The Primacy of Perception and Other Essays*, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪।

৩ Ganganath Jha, *Kavyaprakūsha of Mammata*, বারাণসী ১৯৬৭ ;

Charles L. Stevenson, *Ethics and Language*, ইয়েল ইউনিভার্সিটি, ১৯৪৪ ; Gustav Stern, *Meaning and Change of Meaning*, গোয়েটেবর্গ, ১৯৩১।

৪ Morris Weitz, *Philosophy of the Arts*, হার্ভার্ড, ১৯৫০ ; Roger Fry, *Last Lectures*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৩৯ ; Henri Focillon, *The Life of Forms in Art*, অনুবাদক Hogen ও Kubler, ইয়েল ইউনিভার্সিটি, ১৯৪২।

৫ Frank P. Chambers, *The History of Taste*, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩২। এ-প্রসঙ্গে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরী, হাচিসন এবং কান্টের মতবাদ উল্লেখযোগ্য ; George Dickie, *Aesthetics : An Introduction*, দ্বিতীয় অধ্যায়, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭১।

৬ Lucius Garvin, "The Problem of Ugliness in Art", *Philosophical Review*, ১৯৪৮, পৃঃ ৪০৪-০৯ ; M. J. Stolnitz, "On Ugliness in Art", *Journal of Philosophy aud Phenomenological Researeh* ১৯৫০, পৃঃ ১-২৪ ; এবং W. T. Stace, *The Meaning of Beauty*, লণ্ডন, ১৯১৯, চতুর্থ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

নগ্ন ও উলঙ্গ

১ Kenneth Clark, *The Nude*, লণ্ডন, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৪-৫। এই প্রবন্ধ রচনায় ও বিষয় সংস্থাপনায় লর্ড ক্লার্কের নিকট আমার ঋণ গভীর।

২ Ladislao Roti সম্পাদিত *The Unknown Leonardo*, লণ্ডন, ১৯৭৪, পৃঃ ২৯৩-৩০০।

৩ ভাসারি (১৫১১-৭৪) অবশ্য বলছেন যে, গিওরগিওন লিওনার্দোর ছবি দেখেছিলেন এবং অনুসরণ করেছিলেন। Giorgi Vasari, *The Lives of the Painters, Sculptors and Architects*, ৪ খণ্ড, এভ্‌রিম্যান্স লাইব্রেরী, ১৯৭০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯।

৪ Pierro Courtion, *Eduard Manet*, ন্যু ইঅর্ক, পৃঃ ৭৬।

৫ A. P. Oppé, *Raphael*, (মুখবন্ধ ও সম্পাদনা Charles Mitchell), লণ্ডন, ১৯৭০, পৃঃ ৯৩-৪ ; ৯৮-১০১, (প্লেট নং ১৬৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৮, ১৮, ১৯০-৯৯)।

৬ George Heard Hamilton, *The Pelican History of Art : Painting and Sculpture in Europe 1880-1940*, ১৯৭২, পৃঃ ৩০।

৭ Meyer Schapiro, *Paul Cezanne*, ন্যু ইঅর্ক, পৃঃ ২৩-৬।

৮ Ananda Coomarswamy, *Rajput Paintings*, দিল্লী, ১৯৭৬, প্লেট, নং *XLIX*, *LIII*, এবং *LIV*.
৯ Frank P. Chambers, *The History of Taste*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৩২।
১০ Sigmund Freud, *General Introduction to Psycho-Analysis, Lectures 20* ও *21*, লণ্ডন, ১৯২২ ; এবং *New Introdnctory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture 31*, লণ্ডন, ১৯৩২।
১১ Maurice Merleau-Ponty *Phenomenology of Perception*, লণ্ডন, ১৯৭০, প্রথম খণ্ড।
১২ Partha Mitter, *Much Maligned Monsters : History of European Reaction to Indian Arts*, অক্সফোর্ড, ১৯৭৭। বিশেষ দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায় "Eighteenth Century Antiquarians and Erotic Gods."
১৩ Benedetto Croce, *Aesthetic*, অনুবাদক Douglas Ainslie, রূপা, কলিকাতা, পৃঃ ১১৪ (তারিখহীন)।
১৪ R. G. Collingwood, *Principles of Art*, অক্সফোর্ড, ১৯৭১, পৃঃ ২৮০-৮৪।
১৫ *Hegel's Aesthetics : Lectures on Fine Arts*, অনুবাদক T. M. Knox, Vol. I, অক্সফোর্ড, ১৯৭৫, Part II, পৃঃ ২৯৯-৪২৬।
১৬ W. G. Archer, *India and Modern Art*, লণ্ডন, ১৯৫৯, দ্বিতীয় অধ্যায়।
১৭ E. B. Havell, *The Ideals of Indian Art*, লণ্ডন, ১৯১১।
১৮ Sri Aurobindo, *The Foundations of Indian Culture Birth Centenary Library Vol. 14*, পণ্ডিচেরী, ১৯৭২, পৃঃ ২৪৩-৪৮।
১৯ E. B. Havell, (১৭), পৃঃ ৯৫।
২০ Philip Rawson সম্পাদিত *Primitive Erotic Art*, লণ্ডন, ১৯৭৩, পৃঃ ৭১-৩।
২১ Bradley Smith, *Erotic Art of the Masters*, মুখবন্ধ Henry Miller, নিউ জার্সি, তারিখহীন।

অষ্টম অধ্যায়

শিল্প ও শিল্প-বিচার

১ Thomas M. Messer, *Edvard Munch*, ন্যু ইঅর্ক, তারিখহীন, পৃঃ ৮৪।
২ William Fleming, *Art and Ideas*, ন্যু ইঅর্ক, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৯০ ("ন্যু ইঅর্ক সিটি ১৯৪২"), পৃঃ ৪২৭ ("ইমেজ টু স্কোয়ার"), পৃঃ ৪২৮ ("সিঞ্জালি ভেরিয়েশন")।
৩ William K. Wismatt Jr. ও Monroe Beardsley-র প্রবন্ধ "The Intentional Fallacy", Joseph Margolis সম্পাদিত গ্রন্থ *Philosophy*

Looks at the Arts, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য Gregory Vlastos সম্পাদিত Plato গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে W. J. Verdenius-এর প্রবন্ধ "Plato's Doctrine of Artistic Imitation", এ্যাঙ্কর বুকস, ১৯৭১।

৪ Robert Goldwater ও Marco Treves সম্পাদিত *Artists on Art, from the XIV to the XX Century*, প্যান্থিয়ন, (তারিখহীন), পৃঃ ৪১১।

৫ ঐ, পৃঃ ৪১৭।

৬ ঐ, পৃঃ ৪১৯।

৭ ঐ, পৃঃ ৪২১।

৮ ঐ, পৃঃ ৪৪৩।

৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৫২-৫৫।

১০ ঐ, পৃঃ ৩৫০।

১১ ঐ, পৃঃ ৩৪৭।

১২ ঐ, পৃঃ ৩৫২।

১৩ ঐ, পৃঃ ৩৫৩-৫৪।

১৪ ঐ, পৃঃ ৩৪৭।

১৫ ঐ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৫৪।

১৬ Ludwig Munz, *Rembrandt*, নিউ ইয়র্ক, (তারিখবিহীন), পৃঃ ১২০।

১৭ Basil Taylor, *Constable : Paintings, Drawings and Water-colours*, লণ্ডন, ১৯৭৩, পৃঃ ৯।

১৮ Arnold Hauser, *The Social History of Art*, Vols. 3-4, লণ্ডন, ১৯৬২ ; Christopher Caudwell, *Studies and Further Studies on a Dying Culture*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১ ; Brian Easlea, *Liberation and the Aims of Science*, লণ্ডন, ১৯৭৩ ; William Fleming, *Arts and Ideas*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৪ ; E. Fischer, *Art against Ideology*, লণ্ডন, ১৯৬৯ ; এবং Milton C. Albrecht, James S. Barnett ও Mason Griff সম্পাদিত *The Sociology of Art and Literature*, লণ্ডন, ১৯৭০, প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১৯ Leon Trotsky, *Literature and Revolution*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭, পৃঃ ১৭০-৭১, ২২০-২১।

২০ Herschell B. Chipp, *Theories of Modern Art*, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৮, পৃঃ ৪৫৯-৬০।

২১ VOKS Bulletin (Moscow), 1947, Herschel B. Chipp-এর গ্রন্থ (২০) থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৯০-৯৬।

২২ Herschel B. Chipp-এর গ্রন্থ (২০) থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৯৬-৯৭।

গ্রন্থপঞ্জী

হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, কলিকাতা, ১৩৬৫
গোপীনাথ কবিরাজ, সাহিত্য-চিন্তা, কলিকাতা, ১৩৭২
শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ও অন্যান্য), রবীন্দ্রদর্শন, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৭৫
অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬০
শঙ্খ ঘোষ, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৭৩
প্রবাসজীবন চৌধুরী, সৌন্দর্য দর্শন, কলিকাতা, ১৯৫৪
সত্যজিৎ চৌধুরী, অবনীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৭৭
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত শিল্পে মূর্তি, কলিকাতা, ১৯৫৭
ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৪৮
বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী, কলিকাতা, ১৯৬২
শিল্পায়ন, কলিকাতা, ১৩৬৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন সাহিত্য (রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৬৭
লোকসাহিত্য (রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৬১
সাহিত্য (রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৬৭
আধুনিক সাহিত্য (রচনাবলী, নবম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭১
ছন্দ (রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭১
সাহিত্যের পথে (রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৫৮
সাহিত্যের স্বরূপ (রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৬৫
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, স্বগত, কলিকাতা, ১৩৫৪
শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য-সন্দর্শন, কলিকাতা, ১৯৬৬
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, কলিকাতা, ১৩৭০
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যবিচার, কলিকাতা, ১৯৬১
বিষ্ণু দে, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৭৪
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, কলিকাতা, ১৯৬১
সুধীরকুমার নন্দী, নন্দনতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৫৯
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাগ ও রূপ, কলিকাতা, ১৯৫৭
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পাদিত), সমালোচনা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭১
অমলেন্দু বসু, সাহিত্যচিন্তা, কলিকাতা, ১৩৭১
নন্দলাল বসু, শিল্পকথা, কলিকাতা, ১৯৪৪
শিল্পচর্চা, কলিকাতা, ১৯৫৬
রূপাবলী, কলিকাতা, ১৯৫৫
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র শিল্প-তত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৭০
প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, কলিকাতা, ১৯৬৬
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৫৫
সাহিত্য-মীমাংসা, কলিকাতা, ১৯৬০

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সাহিত্য ও পাঠক, কলিকাতা, ১৯৭০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য, শিল্প-তত্ত্ব পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৬৮
অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৩৬৩
হরপ্রসাদ মিত্র, কবিতার বিচিত্র কথা, কলিকাতা, ১৯৬৪
সাহিত্যের নানা কথা, কলিকাতা, ১৩৬৩
অন্নদাশঙ্কর রায়, আর্ট, কলিকাতা, ১৯৬৮
কানাই সামন্ত, চিত্রদর্শন, কলিকাতা, ১৮৮১ (শকাব্দ)
যামিনীকান্ত সেন, আর্ট ও আহিতাগ্নি, কলিকাতা, ১৩৫৯
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন (অনুবাদ), আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক, কলিকাতা (৩য় সংস্করণ)
অসীম সোম (সম্পাদিত), চলচ্চিত্র কথা, কলিকাতা, ১৩৭৬

Abercrombie, Lascelles, *The Principles of Literary Criticism*, London, 1932.
Albrecht, Milton C., (ed.) *The Sociology of Art and Literature*, London, 1970.
Aldrich, Virgil C., *Philosophy of Art*, Prentice—Hall, 1963.
Andrews, Michael, ed. *Creativity and Psychological Health*, Syracuse, University Press, 1961.
Archer, W. G., *India and Modern Art*, London, 1959.
Arnheim, Rudolf, *Film as Art*, Berkeley, 1958.
Arnheim, Rudolf, *The Genesis of a Painting : Picasso's Guernica*, University of California Press, 1962.
Arnheim, Rudolf, *Entropy and Art : A Study of Disorder and Order*, Berkeley University Press, 1971.
Arnheim, Rudolf, *Art and Visual Perception*, London, 1972.
Aurobindo, Sri, *Birth Centenary Library, Volume* 14, Pondicherry, 1972.

Barnett, James S., ed., *The Sociology of Art and Literature*, London, 1970.
Bazandall, L., *Marxism and Aesthetics*, New York, 1968.
Bell, Clive, *Art*, New York, 1914.
Bell Daniel, *The Divided Society : On the Disjunction of Culture and Social Structure*, New York, 1972.
Berenson, Bernard, *The Italian Painters of the Renaissance*, 2 Vols, London, 1968.
Bergson, Henri, Laughter : *An Essay on the Meaning of the Comic*, New York, 1911.
Bosanquet, Bernard, *Three Lectures on Aesthetics*, London, 1915.
Bosanquet, Bernard, *A History of Aesthetics*, New York, 1957.
Bradley, A. C., *Oxford Lecturers on Poetry*, New York, 1909.
Butcher, S. H., *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, New York, 1923.

Caritt, E. F., *The Theory of Beauty*, London, 1928.
Caritt, E. F., *An Introduction to Aesthetics*, London, 1949.
Caudwell, Christopher, *Studies and Further Studies in A Dying Culture*, New York, 1971.
Chambers Frank P., *The History of Taste*, Columbia University Press, 1932.
Chaudhuri, Prabasjiban, *Studies in Aesthetics*, Calcutta, 1964.
Chiari, J., *Aesthetics of Modernism*, New York, 1971.

Chipp, Herschell B., *Theories of Modern Art*, University of California Press, 1968.
Collingwood, R. G., *Principles of Art*, London, 1970.
Clark, Kenneth, *The Nude*, London, 1976.
Coomarswamy, Anananda, *The Transformations of Nature in Art*, Cambridge, Mass., 1934.
Coomarswamy, Anananda, *Rajput Paintings*, Delhi, 1976
Crawford, Donald W., *Kant's Aesthetic Theory*, University of Wisconin, 1974.
Croce, Benedetto, *Aesthetics as Science of Expression and General Linguistic*, Calcutta, (No Date).
Dasgupta, Surendranath, *Fundamentals of Indian Art*, Bombay, 1954.
De, Sushil Kumar, *Studies in the History of Sanskrit Poetics*, London, 1923-25.
Dewey, John, *Art as Experience*, New York, 1934.
Dickie, George, *Aesthetics : An Introduction*, New York, 1971.

Ehrenzweig, Anton, *The Hidden Order of Art*, University of California Press, 1967.
Eliot, T. S., *Selected Essays*, 1917-1932, New York, 1950.
Elton, William, ed., *Aesthetics and Language*, Oxford, 1954.

Fischer, E., *Art Against Ideology*, London, 1969.
Fleming, William, *Arts and Ideas*, New York, 1974.
Focillon, Henry, *The Life of Forms in Art*, Yale University, 1942.
Focillon, Henry, *The Art of the West*, 2 Vols, London, 1969.
Freud, Sigmund, *General Introduction to Psycho-Analysis*, London, 1922 ; *New Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, London, 1932.
Fry Roger, *Transformations*, London, 1920.
Fry, Roger, *Last Lectures*, New York, 1939.

Gilson, Etienne, *Painting and Reality*, Pantheon, 1957.
Gilson, Etienne, *The Arts of the Beautiful*, New York, 1965.
Gnoli, Raniero, *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta*, Varanasi, 1968.
Goldmann, Lucien, *The Hidden God*, London, 1964.
Goldwater Robert, (with Treves, Marco,) *Artists on Art, from the XIV to the XX Century*, Pantheon.
Gombrich, E. H., *Art and Illusion*, London, 1960.
Gombrich, E. H., *Norm and Form*, New York, 1966.
Gombrich, E. H., *Meditations on a Hobby Horse and Other Essays on Theory of Art*, London, 1971.
Gombrich, E. H., *Illusion in Nature and Art*, London, 1973.
Goodman, Nelson, *Language of Arts*, New York, 1968.
Gotshalk, D. W., *Art and the Social Order*, Dover, 1962.
Greenough, Horatio, *Form and Function*, University of California Press, 1957.
Gregory, R. L., ed., *Eye and Brain* : the psychology of seeing, London, 1973.
* Greene, Theodore M., *The Arts and the Art of Criticism*, Princeton, 1940.

Hampshire, Stuart, *Feeling and Expression*, London, 1961.
Hauser, Arnold, *Social History of Art*, 4 vols., London, 1951.
Havell, E. B., *The Ideals of Indian Art*, London, 1911.

Havell, E. B., *Indian Architecture : its Psychology, Structure and History*, London, 1927.

Hegel, G. W. F., *Hegel's Aesthetics : Lectures on Fine Arts*, 2 vols., Oxford, 1975.

Heidegger, Martin, *Poetry, Language, Thought*, New York, 1971.

Hiriyanna, H., *Art Experience*, Mysore, 1954.

Hoffman, Frederick J., *Freudianism and the Literary Mind*, Louisiana State University Press, 1945.

Hofstader, Albert, *Truth and Art*, Columbia University Press, 1965.

Hospers, John, *Meaning and Truth in the Arts*, University of North Carolina, 1946.

Hospers, John, ed., *Artistics Expression*, New York, 1971.

Jha Ganganath, *Kavyaprakasha of Mammata*, Varanasi, 1967.

Jung, C. G., *The Spirit in Man, Art and Literature : Collected Works*, vol. 15, Princeton, 1972.

Kant, Immanual, *Critique of Judgment*, New York, 1972.

Keith, A. B., *A History of Sanskrit Literature*, Delhi, 1973.

Khandalavala, Karl, *The Development of Style in Indian Painting*, Delhi, 1974.

Kramrisch, Stella, *Indian Sculpture*, London, 1938.

Kramrisch, Stella, *The Art of India : Tradition of Indian Sculpture, Painting, and Architecture*, London, 1954.

Kris, Ernst, *Psychoanalytic Explorations in Art*, New York, 1958.

Langer, Susanne K., ed., *Reflections on Art*, John Hopkins Press, 1958.

Langer, Susanne K., *Feeling and Form*, New York, 1953.

Lewis, C. I., *An Analysis of Knowledge and Valuation*, La Salle, Illinois, 1946.

Lucas, F. L., *Style*, New York, 1955.

Malraux, Andre, *The Psychology of Art*, Pantheon, 1949.

Marcuse, Herbert, *Eros and Civilization*, New York, 1962.

Margolis, Joseph, ed., *Philosophy Looks at the Arts*, New York, 1962.

Maritine, Jacques, *Art and Scholasticism*, New York, 1930.

Marx, Karl and Engels, Frederick, *On Literature and Art*, Progress Publishers, Moscow, 1978.

Masson, J. L., (and Patwardhan, M. V.,) *Santarasa and Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics*, Poona, 1969.

Meiss, Millard, *Painting in Florence and Siena after the Black Death*, Princeton, 1951.

Mitter, Partha, *Much Maligned Monsters : History of European Reaction to Indian Art*, Oxford, 1977.

Moholy-Nagy, Lazlo, *The New Vision*, New York, 1964.

Moore, G. E., *Principia Ethica*, Cambridge, 1903.

Mukherjee, Ramaranjan, *Literary Criticism in Ancient India*, Calcutta, 1966.

Munro, Thomas, *The Arts and their Interrelations*, New York, 1949.

Murray, J. Middleton, *The Problem of Style*, Oxford, 1922.

Merleau-Ponty, M., *Phenomenology of Perception*, London, 1970.

Nahm, Milton C., *The Artist as Creator*, John Hopkins Press, 1956.

Ogden C. K., Richards, I. A., and Wood, James, *The Foundations of Aesthetics*, New York, 1948.
Osborne, Harold, *Aesthetics in the Modern World*, London, 1968.
Ozenfant, *Foundations of Modern Art*, Dover, 1952.

Panofsky, Erwin, *Idea : A Concept in Art Theory*, University of South Caroline Press, 1968.
Parker, Dewitt Henry, *The Analysis of Art*, Yale University Press, 1926.
Parker, Dewitt Henry, *Human Values*, New York, 1931.
Pepper, Stephen, *Principles of Art Appreciation*, New York, 1949.
Perry, R. B., *Realms of Values*, Cambridge, Mass., 1954.
Plekhanov, George V., *Art and Social Life*, London, 1953.
Rader, Melvin., ed., *A Modern Book of Esthetics*, New York, 1973.
Raghavan, V., *The Number of Rasas*, Madras, 1967.
Rawson, Philip, ed., *Primitive Erotic Art*, London, 1973.
Ray, Niharranjan, *Idea and Image in Indian Art*, New Delhi, 1973.
Ray, Niharranjan, *An Approach to Indian Art*, Chandigarh, 1974.
Read, Herbert, *Art and Alienation*, London, 1967.
Read, Herbert, *The Forms of Things Unknown*, London, 1960.
Read, Herbert, *Icon and Idea*, Cambridge, Mass., 1955.
Reid, Louis Arnauld, *Meaning in the Arts*, New York, 1969.
Richards, I. A., *Practical Criticism*, New York, 1929.
Ricoeur, Paul, *The Rule of Metaphor*, London, 1978.

Santayana, George, *The Sense of Beauty*, New York, 1955.
Saw, R. L., *Aesthetics*, New York, 1971.
Sartre, Jean-Paul, *What is Literature*, London, 1967.
Sartre, Jean-Paul, *The Psychology of Imagination*, London, 1972.
Scruton, Roger, *Art and Imagination*, London, 1974.
Sesonske, Alexander, ed., *What is Art ? Aesthetic Theory From Plato to Tolstoy*, Oxford, 1965.
Smith, Braddley, *Erotic Art of the Masters*, New Jersey.
Smith, Vincent Arthur, *A History of Fine Art in India*, Bombay, 1962.
Sparshott, F. E., *The Structure of Aesthetics*, Toronto, 1963.
Stace, W. T., *The Meaning of Beauty*, London, 1929.
Stevenson, C. L., *Ethics and Language*, Yale University, 1944.
Stolnitz, Jerome, *Aesthetics and the Philosophy of Art Criticism*, Boston, 1960.
Saraswati, Sarasi Kumar, *A Survey of Indian Culture*, Calcutta, 1957.
Saraswati, Sarasi Kumar, *Eighteenth Century North Indian Painting*, Calcutta, 1969.

Tolostoy, Leo, *What is Art ?* London, 1896.
Tomas, Vincent, ed., *Creativity in the Arts*, New Jersey, 1964.
Trotsky, Leon, *Literature and Revolution*, New York, 1957.

Vasari, Giorgi, *The Lives of the Painters, Sculptors and Architects*, 4 Vols., Everyman's Library, 1970.
Veron, Eugene, *Aesthetics*, 1879.
Vivas, Eliseo, and Krieger, Murray, eds., *The Problems of Aesthetics*, New York, 1953.

Weitz, Morris, *Philosophy of the Arts*, Harvard, 1950.
Wellek, Rene, *A History of Modern Criticism*, Yale University Press, 1955.
Wellek, Rene, *Concepts of Criticism*, Yale University Press, 1963.
Wertheimer, Max, *Productive Thinking*, New York, 1959.
Wismatt, William K., Jr., and Brooks, Cleanth, *Literary Criticism : A Short History*, New York, 1957.
Wollheim, Richard, *Art and Its Objects : An Introduction to Aesthetics*, New York, 1968.
Wollheim, Richard, *On Art and the Mind*, London, 1973.
Wiltgenstein, Ludwig, *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religions Beliefs*, University of California Press, 1966.

পদ ও নামকোষ



কনস্টেব্‌ল্। নিসর্গ দৃশ্য।



ডালি। যুদ্ধের মু



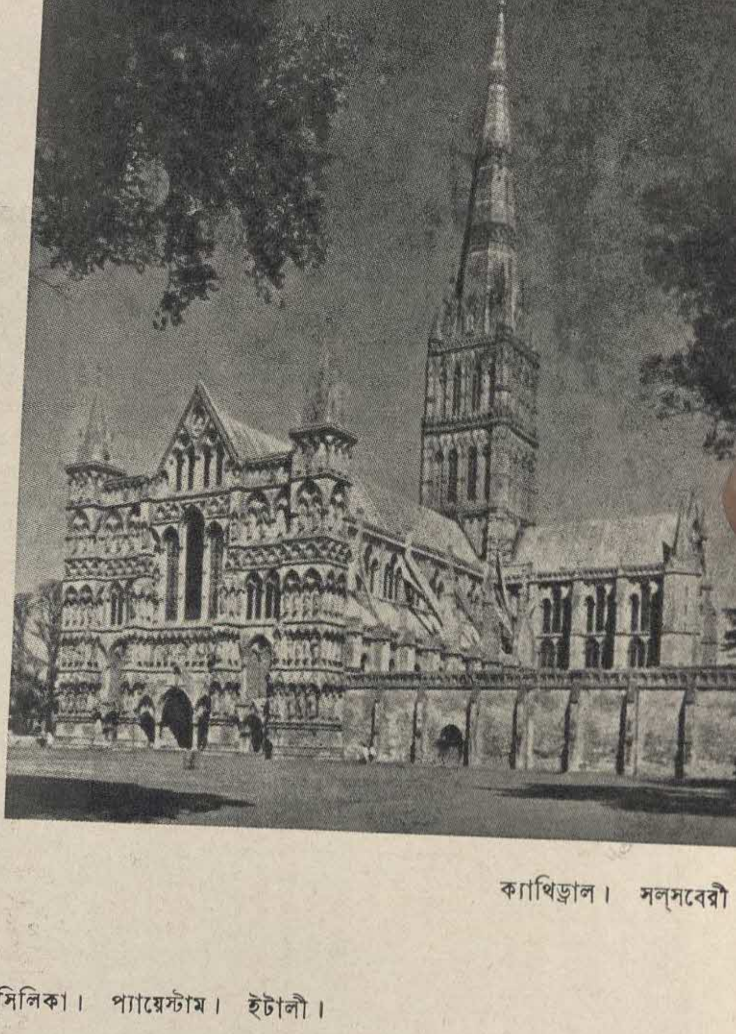
ডালি। পিকাসোর প্রতিকৃতি।



তক্ষশীলা। বুদ্ধ।



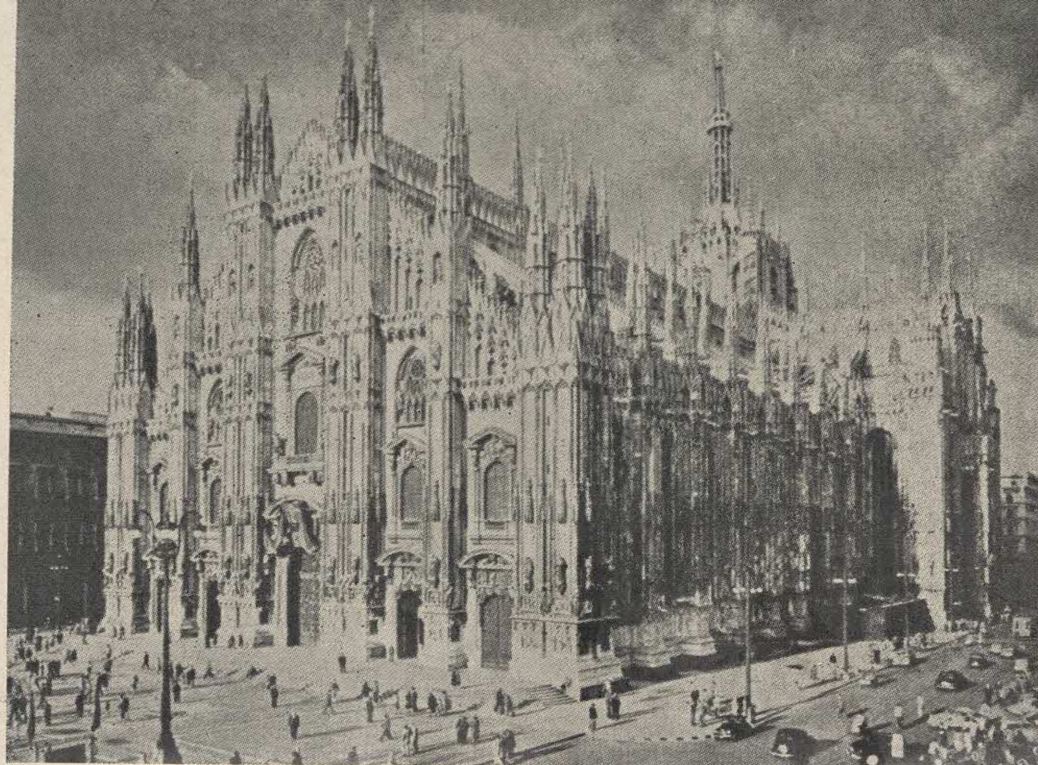
এথেন্স। পার্থিনন।



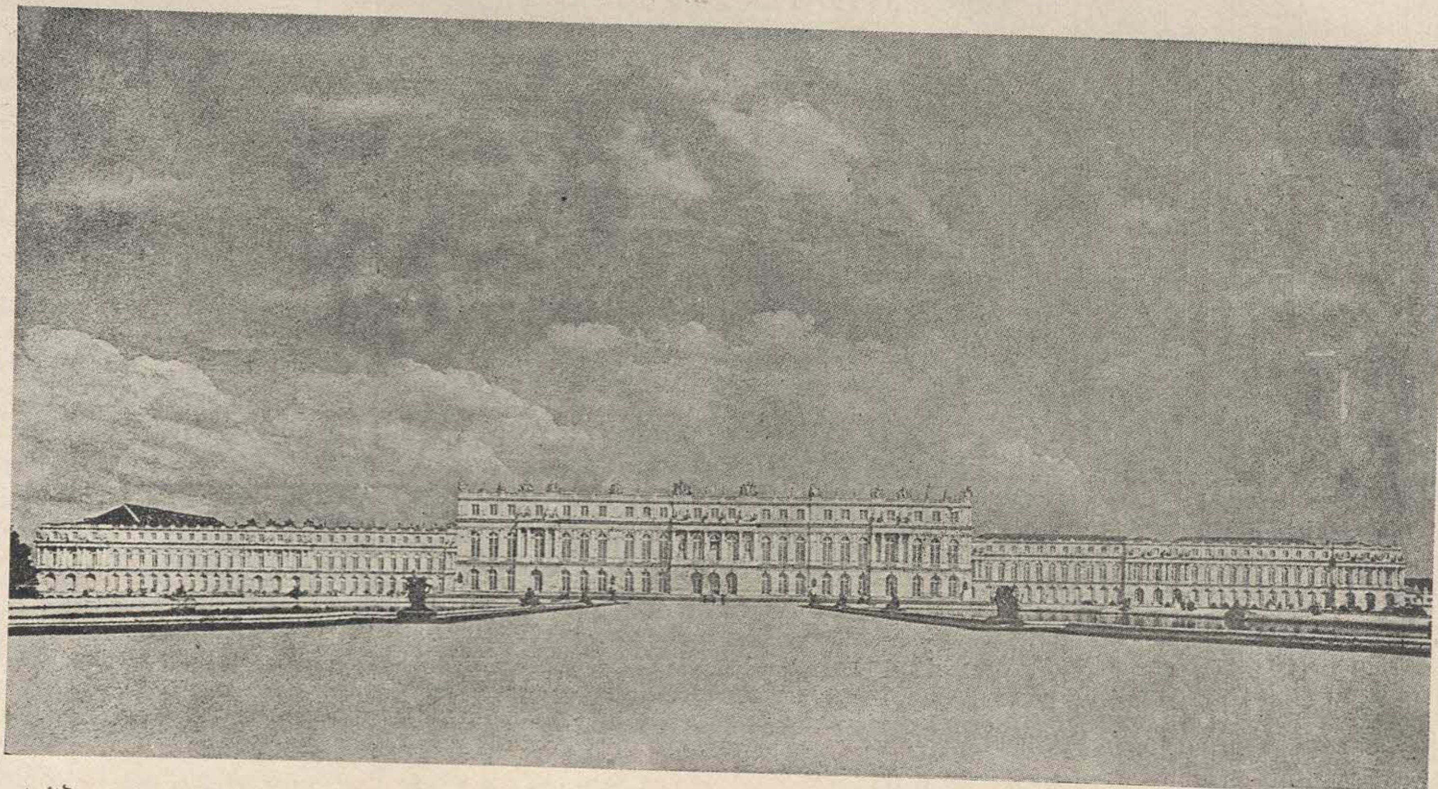
ক্যাথিড্রাল। সল্সবেরী

ানেইডনের মন্দির ও ব্যাসিলিকা। প্যায়েস্টাম। ইটালী।





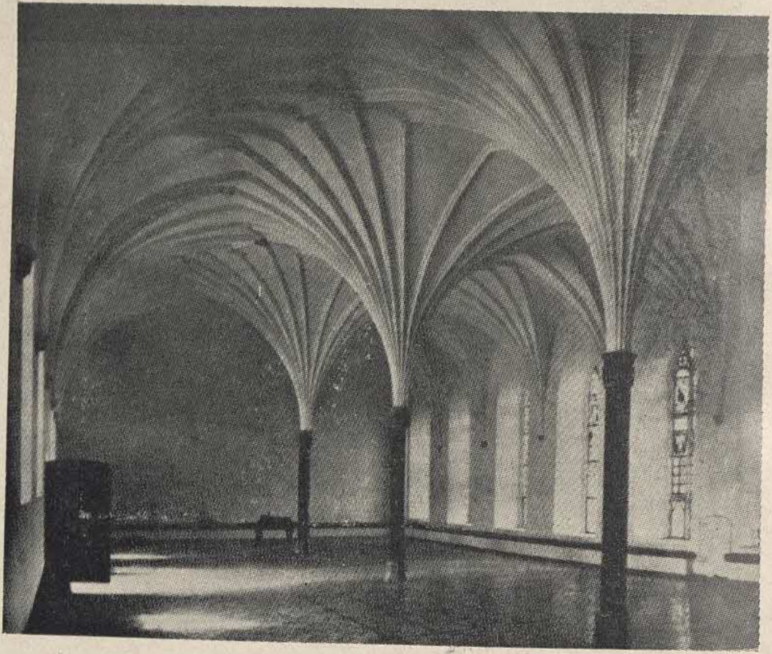
মিলান। ক্যাথিড্রাল।



ভার্সাই প্রাসাদ।



ভুবনেশ্বর। মন্দির।



মারিয়েনবুর্গের রাজপ্রাসাদ। তারকা-স্তম্ভ।



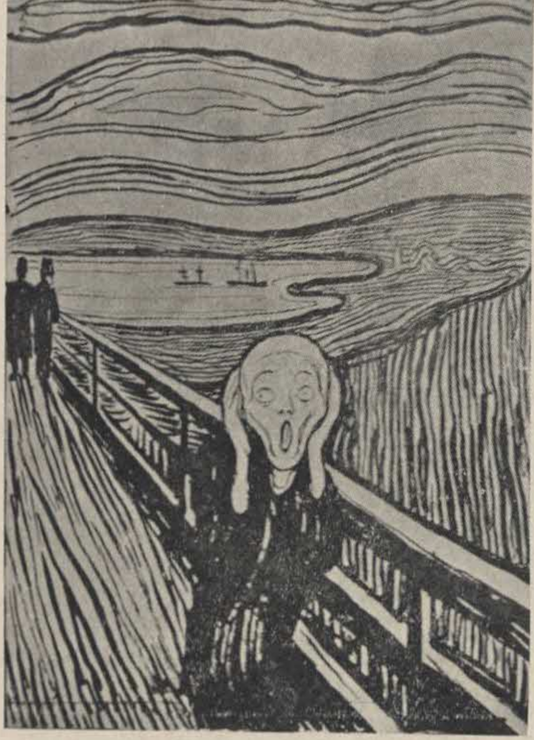
যামিনী রায়।   উপবিষ্টা ত্রিসুন্দরী।



এঁগ্রেস। নগ্ন (তুর্কী) স্নান।



অমরাবতী। বৃন্দনৃত্য।



মুঙ্ক।
চীৎকার।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
হাস্য।





নন্দলাল বসু। গোপালপুরের জেলেরা।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মাছ।



বোচ্চিওনি।
দৈশিক রূপ-পারম্পর্য।



ডোনাতেল্লো। ডেভিড।



মিকেলেঞ্জেলো। ডেভিড।



ক্নাইডিয়ান ভেনাস।



মাইলোর ভেনাস।



রেণোয়া। স্বর্ণকেশী স্নানার্থিনী।



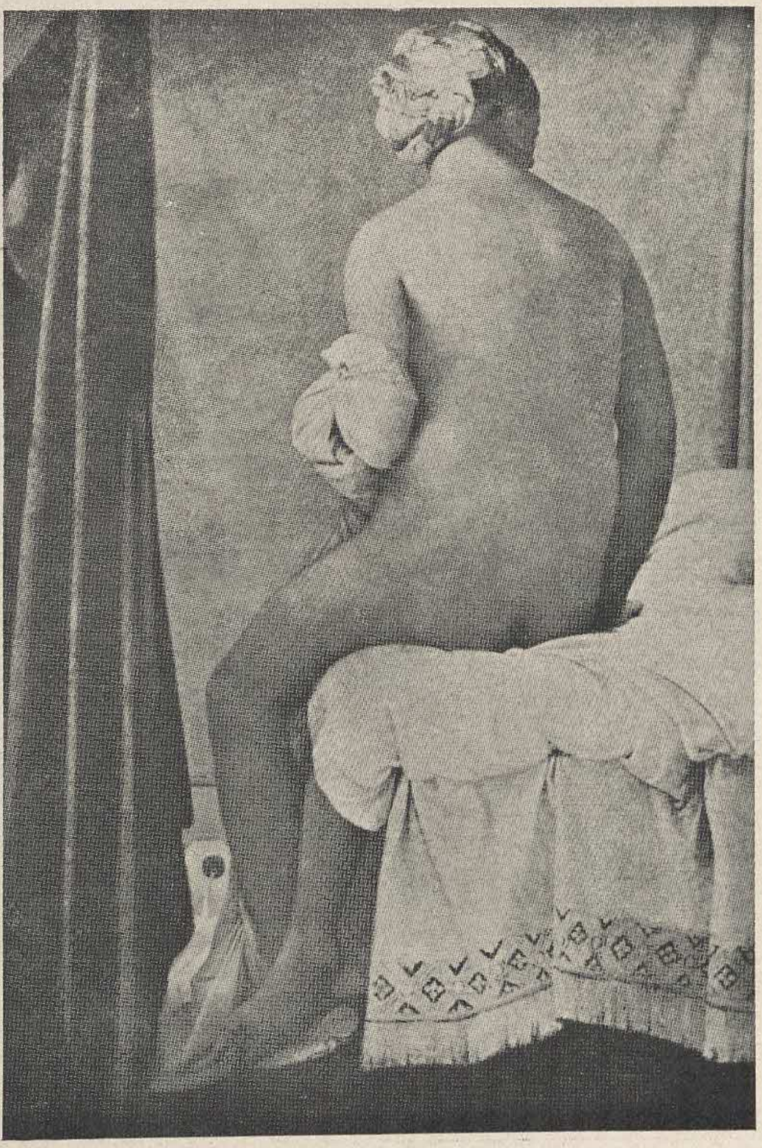
টিশিয়ান। ভেনাস।



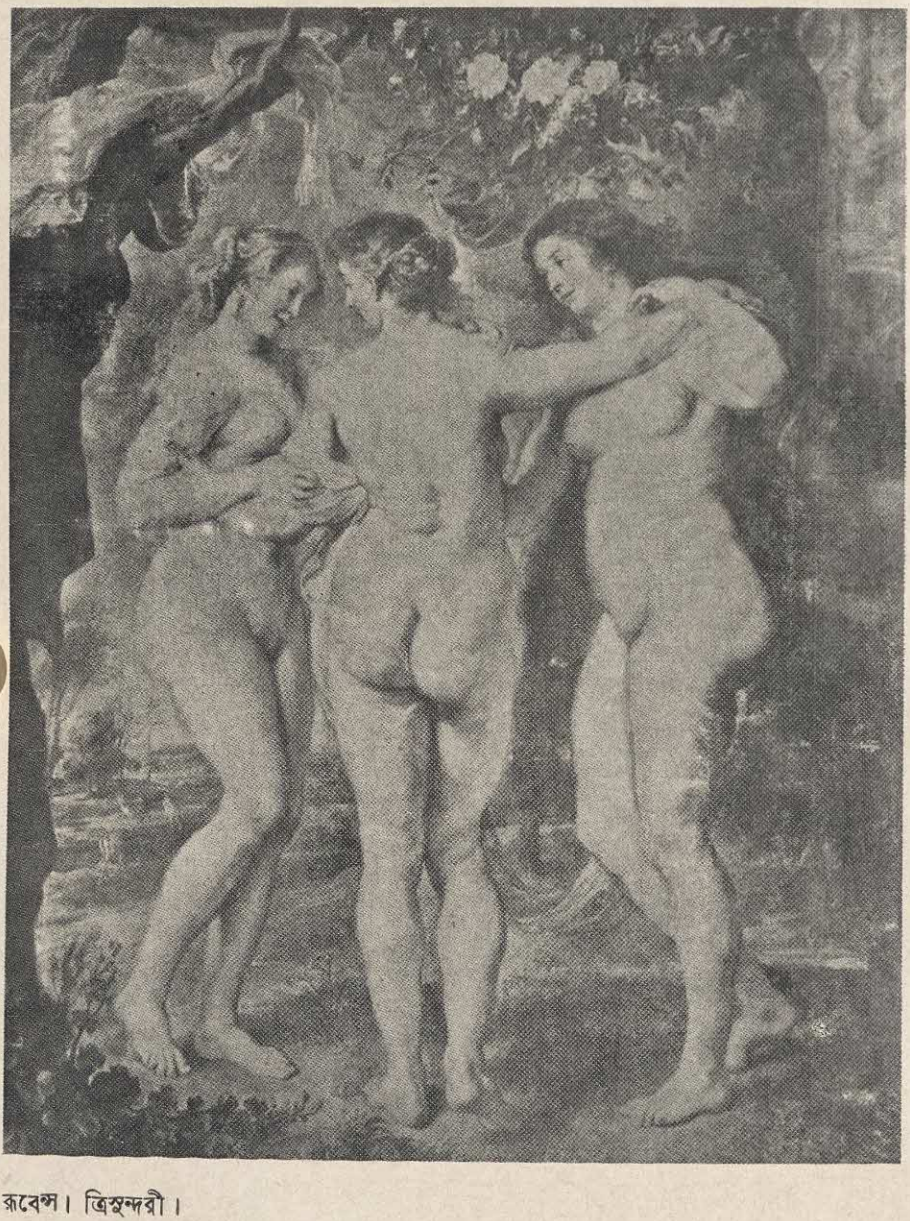
গিওর্‌গিওন। ভেনাস।



অমৃতা শের-গিল। স্নানার্থিনী।



এঁগ্রেস। স্নানার্থিনী।



রূবেন্স। ত্রিসুন্দরী।



বত্তিচেলি। ত্রিসুন্দরী।



মাগ্রিৎ। বলাৎকার।